ভাবনার ভাস্কর্য

প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমালোচনা

১৯৫৭-১৯৫৯

কেতকী কুশারী ডাইসন

দে'জ পাবলিশিং। কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং । ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : শ্রীঅরিজিৎ কুমার
টেকনোপ্রিণ্ট । ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুখবন্ধ

এই প্রবন্ধগুলি এবং গ্রন্থসমালোচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে 'পরিচয়', 'হীনযান', 'দেশ', 'বিভাব', 'কবি ও কবিতা', 'তথ্যকেন্দ্র', 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা' এবং 'জিজ্ঞাসা'-র বিভিন্ন সংখ্যায়। " 'বিষ্ণুর বই' প্রসঙ্গে" নামক প্রবন্ধটি অন্নদাশঙ্কর রায়ের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শিবনারায়ণ রায় কর্তৃক সম্পাদিত প্রবন্ধসংকলন 'বিবেকী শিল্পী অন্নদাশঙ্কর'-এর (ডি. এম. লাইব্রেরি) অন্তর্গত হয়েছে।

কেতকী কুশারী ডাইসন

সূচি

'ভোমা' : একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

'ভোমা' আমার দেখাই হতো না।

সতেরই জুন, শুক্রবার, আমাকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়েছিল। এ দিকে ব্যাগে ছিল 'ভোমা'-র টিকিট। কলকাতার ট্রেন ধরার জন্য বিকেলের দিকে পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটলাম। বর্ধমানের লোকেরা জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার ? আমার বক্তব্য, কলকাতায় একটা নাটক দেখবার এনগেজমেণ্ট আছে। তাঁদের প্রশ্ন, নাটকটা কি না-দেখলেই নয় ? আমার জবাব, দেখতেই হবে, শুনেছি দারুণ ব্যাপার।

সেই সকাল সাতটায় ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলাম। ট্রেনে উঠে খানিকটা টিফিন খেলাম, কিন্তু ভোমাভূত আত্মার খিদে মোটেও মিটল না। হাওড়ায় পৌঁছে বুঝলাম ট্যাক্সি না নিতে পারলে 'ভোমা' দেখা হবে না। অথচ 'ভোমা'-র দুনিয়ায় সেটা সহজসাধ্য নয়। সেদিনই আবার ট্যাক্সির জন্য লাইন দেওয়া 'হচ্ছে না'। 'আজকে কিউ নেই।' যে যেটা পারছে নিয়ে নিচ্ছে। আমার দুর্ভাগ্যবশত কলেজ স্ট্রীটে কোনো ট্যাক্সি যেতে চাইছে না। একজন বললেন, পুলিশকে ধরে দিতে বলুন না। পুলিশের লোকটি আম কিনছিলেন। তাঁকে সবিনয়ে বললাম, দাদা, কোনো ট্যাক্সি আমাকে নিতে চাইছে না। তিনি হেসে বললেন, আপনি দিদি দরজা খুলে উঠে পড়ুন···। তারপর ঐ স্টেশনে ছায়ামূর্তির মতো যেসব ভোমারা বিচরণ করেন তাঁদেরই একজন চায়ের পয়সার বিনিময়ে ট্যাক্সি ডেকে দিলেন।

কিন্তু হ্যারিসন রোড মানেই তো 'ভোমা'-র কলকাতা। বাস্তবের 'ভোমা'-র ট্র্যাফিক জ্যাম অতিক্রম করে অভিনয়ের 'ভোমা'-য় পৌঁছনো কি সহজ ব্যাপার! অনেক ঘুরে বেঁকে অন্য রাস্তা দিয়ে কোনো মতে কলেজ স্ট্রীটে আসা গেল। এক চেনা প্রকাশকের দোকানে খুব তাড়াতাড়ি চা-সিঙাড়া গিলে (নয়তো ভোমা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তে হতো) অবশেষে অভিনয়গৃহে পৌঁছলাম।

বাদল সরকার আর তাঁর দলের নাম শুনেছিলাম, কিন্তু তাঁদের নাট্য-প্রচেষ্টার সঙ্গে এই প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়। প্রথম পরিচয়েই বুঝলাম অত কাণ্ড ক'রে 'নাটক দেখতে আসা' সার্থক হয়েছে।

বাদলবাবু প্রচলিত থিয়েটারের আঙ্গিকগুলোকে ভেঙেছেন, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। পরীক্ষামূলকভাবে আঙ্গিক হয়তো অনেকেই ভাঙতে পারেন, কিন্তু আঙ্গিক ভাঙলেই নতুন শিল্পসত্তার জন্ম দেওয়া হয় না। বাদলবাবু কতগুলো জিনিস ভেঙেচুরে আবার একটা নতুন জিনিস গড়েছেন, এবং যা গড়েছেন তা একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদের থিয়েটার, ভারতে যার একান্ত প্রয়োজন ছিল, এবং এখানেই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত সার্থকতা।

যেসব সত্যের মুখোমুখি আমরা কেউ কেউ হতে চাই না—বিবেকের নিচে কবর দিয়ে রাখি, বা মনের মধ্যে ফুঁসে উঠলেও প্রকাশ্যে বলতে সাহস পাই না, বা প্রকাশ্যে বলবার সাহস অর্জন করে থাকলেও শিল্পের শুদ্ধিতে রূপান্তরিত করতে শিখে উঠিনি, সেসব সত্যকে সার্থক শিল্পরূপ দিতে পেরেছেন বাদলবাবু। থিয়েটারের মাধ্যমে অনেক কথা খুব প্রত্যক্ষভাবে তুলে ধরা যায় যা ছাপানো কাগজের সাহিত্যের পরোক্ষতায় অত স্পষ্ট ক'রে বলা যায় না। এ ব্যাপারে নাট্যমাধ্যমের সুযোগ সুবিধাগুলিকে বাদলবাবু ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর এক-একটি বক্তব্য বিস্ফোরণের মতো আমাদের সামনে ফেটে পড়তে থাকে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে এমনই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের শিল্পসচেতন কমিক চাতুর্য যে না হেসে পারছিলাম না। আমি অনেক হেসেছি, এবং অন্যান্য দর্শকেরা যে কী ক'রে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন সেটাই আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকছিল। প্রতিবাদের থিয়েটারের দর্শক হিসেবে আমাদের উচিত ছিল অত প্রতিক্রিয়াশূন্য মুখে বসে না থেকে আরও খানিকটা সক্রিয় অংশভাক্—**participant** হয়ে ওঠা। বাদলবাবু আমাদের যেভাবে উত্তেজিত করেছিলেন তাতে আমাদের চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে তাঁর দলের অভিনেতাদের সঙ্গে অভিনয়ে নেমে পড়লেই উপযুক্ত হতো ; অভিনেতা আর দর্শক, অভিনয়ের 'ভোমা' আর বাস্তবের 'ভোমা' একাকার হয়ে যেত। যেদিন সেরকম দৃশ্য দেখা যাবে সেদিন বোঝা যাবে যে বাদলবাবুর বক্তব্য আমাদের চৈতন্যে **fermenting yeast**-এর মতো কাজ করেছে।

'ভোমা'-য় বাদলবাবু রূপক এবং প্রতীকের ব্যবহারে স্মরণীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'ভোমা কে বা কী'—এই প্রশ্নটা বারবার তুলে ধ'রে, নানান দিক থেকে আলোকপাত ক'রে, তিনি আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করেছেন। ভোমার অর্থ এবং স্বরূপ আমাদের মানসে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ভোমাকে কখনও ভূমির কখনও ভূমার অনুষঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। ভোমা মাটির কাছাকাছি খেটে-খাওয়া প্রাকৃত মানুষ, আইরিশ কবি প্যাট্রিক কাভানা-র

বিখ্যাত দীর্ঘকবিতা The Great Hunger-এর নায়ক প্যাট ম্যাগুইয়ারের মতো ভুখা মানুষ, সভ্যতার ভিত্। কখনও দর্শকদেরই চেয়ারের মাঝখানে ভিখারির গোঙানির মধ্যে তার আর্তি শ্রুতিগোচর হয়ে ওঠে। কখনও অসুস্থ সমাজের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে সে হয়ে ওঠে একান্তভাবে অন্বেষী। আমরা থেকে থেকে তার সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করতে পারি ; ভোমা হয়ে পড়ে Everyman। ভোমার হদিশ পাওয়া, ভোমার তাৎপর্য বুঝতে পারা হয়ে পড়ে সেই বাঞ্ছিত ভূমা যাকে ছাড়া কোনো তৃপ্তি হতে পারে না। তার বিপরীত মেরুতে দেখতে পাই শহুরে যুবসমাজের অনুকরণসর্বস্ব প্রমোদ, 'অল্প'-কে নিয়েই যারা সন্তুষ্ট তাদের ইডিয়টিক অঙ্গভঙ্গি। তখন ভোমাই রিয়ালিটি, সেই বাস্তব যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই ঐ অভিনয়ের অবতারণা, যে বহুমাত্রিক সত্যকে আমরা অভিনয় চলাকালীন মুহূর্তে মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারি।

যাঁরা 'ভোমা' দেখতে এসেছিলেন তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের চারদিকের জগতকেই ঐ নাটকে প্রতিবিম্বিত দেখতে পেয়েছিলেন। সেই দুনিয়ার মৌলিক অসাধুতা এবং কপটতা, তার অগণিত স্ববিরোধ, তার অন্তঃসারশূন্য হাস্যকর grotesque দম্ভ, সবই নিপুণভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্যাম্‌বার্ড কোম্পানির গোটা এপিসোডটি, উন্নয়নপরিকল্পনাসমূহে কলকাতাকেন্দ্রিক চিন্তার অসারত্ব প্রতিপাদন (পাতাল রেল, দ্বিতীয় সেতু, স্টেডিয়ম নিয়ে অহেতুক হৈ চৈ), এমনকি কলকাতা-উন্নয়নের প্রচেষ্টাতেও চূড়ান্ত ব্যর্থতার ইঙ্গিত (কারণ তা বস্তুত গর্ত খোঁড়া গর্ত বোঁজাতেই নিঃশেষিত), বৈদেশিক মুদ্রার জন্য হতশ্রী প্রার্থনা, আমিত্বের প্রতিযোগী দৌড়, অনুমিত ঈশ্বরের বৃহৎশক্তিতুল্য ভণ্ডামি (কারণ তিনি হয় ভক্তদের 'জিনিস' পাইয়ে দেন, নয় অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে 'জিনিস' কেড়ে নেন), বা পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে আমাদের অপরিণামদর্শী ভয়ংকর আত্মপ্রবঞ্চনার রূপায়ণ—এসব উপাদানে প্রথম শ্রেণীর স্যাটায়ারের স্বাদ পাই। 'ভোমা'য় শ্রেণীসংঘাতের যুগধর্মী পরিপ্রেক্ষিত অবশ্যই আছে, আবার সেই উত্তাল তরঙ্গরাশির অপর পারে প্রাপণীয় অবিভক্ত মানবিক পরিপ্রেক্ষিতও আছে (প্রেমশূন্যতার হাহাকার বা পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত বিকিরণের ফলে genetic mutation-এর সর্বগ্রাসী সম্ভাবনা)। 'ভোমা'-য় জীবনের ব্যাপ্তি ও অখণ্ডতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। জঙ্গল হাসিল করা, খেতে জল আনা, ফসল ফলানো, বন্যার জলের সঙ্গে লড়াই করার মতো 'ভালোবাসা আছে' এই আকুল বিশ্বাসকেও মানুষের অস্তিত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্ভর হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ফলে আমরা যখন অভিনয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসি তখন একটা সদর্থক অনু-ভূতিতে আপ্লুত হয়েই বেরিয়ে আসি, যেন অপ্রয়োজনীয়কে ভাঙা এবং প্রয়োজনীয়কে গড়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত এমন একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে। জীবন আর শিল্পের মাঝখানে সরলরেখা টানা হয়ে যায়। সৎশিল্পের প্রাসঙ্গিকতা কী বা প্রাসঙ্গিক শিল্প কাকে বলে সেটা জানতে বাকি থাকে না। দুঃখ বা গ্লানিকে উপকরণ করেও 'ভোমা' এমন এক শিল্পসত্তা যার একটা উল্লেখযোগ্য হ্লাদিনী শক্তি আছে।

অভিনয় সর্বত্র সাবলীল এবং অভিনেতাদের গোষ্ঠীগত সহযোগিতা বিশেষ-ভাবে প্রশংসনীয়। শুধু chantingটা আমার শেষের দিকে একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর—মুদ্রাদোষের মতো—ঠেকছিল। এখানে যেন একটু বৈচিত্র্যের দরকার ছিল। থ্যাটায়ারধর্মী নাট্যকলার সঙ্গে খাপ খায় এমন সংগীতাংশ রচনার ব্যাপারে হয়তো অনেক কিছু করণীয় আছে। অবশ্য কী পেলাম না 'ভোমা'-র ক্ষেত্রে সেটা কোনো জরুরি কথাই নয়। যদি বলি যে 'ভোমা'-র আবহসংগীত একমাত্র স্ত্রাভিনস্কি-ই সৃষ্টি করতে পারতেন তাহলে 'ভোমা'-র স্রষ্টাকেই প্রকারান্তরে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করা হয়।

কবি অ্যান স্টিভেনসন : একটি প্রতিকৃতি

অক্সফোর্ড শহরের কবিতার জগতে সকলের পরিচিত একটি মানুষ কবি অ্যান স্টিভেনসন। অন্যান্য শহরের মতো এখানেও কবিদের নানান দল আছে। সামাজিক স্তরবিভাগের সঙ্গে এই দলানুগত্যের তথা বর্ণভেদের খানিকটা সংযোগও আছে। একেবারে উপরের দিকে ধর্তব্য কিছু 'এস্টাব্লিশমেন্ট'-এর কবি। এঁরা সংখ্যায় কম, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতার চেয়ারের অধিকারী, হয়তো নামজাদা এমন কোনো কবি যাঁর সৃষ্টিশীল রচনার কাল মোটামুটি পেরিয়ে গেছে। একেবারে নিচের দিকে ছাত্র কবি, হিপি কবি, প্রতিবাদপন্থী ও 'বিকল্প' জগতের কবি, সোশ্যাল ওয়ার্কার কবি. ইত্যাদি। এই দুই মেরুর মাঝখানে একটা পাঁচমিশালী দুনিয়া। অ্যান স্টিভেনসন সকলের সঙ্গেই মিশতে পারেন, এবং মিশেও স্বতন্ত্র থাকতে পারেন। একদিকে অক্সফোর্ড য়ুনিভর্সিটি প্রেস থেকে তাঁর তিনখানা কবিতার বই বেরিয়েছে, ফলত তিনি মার্কিন হয়েও ইংল্যাণ্ডে জাতে উঠতে পেরেছেন. এবং এ ব্যাপারে তাঁর সহায় হয়েছে তাঁর বৈবাহিক মর্যাদা. কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইংরেজ অধ্যাপকের স্ত্রী. যদিও তাঁর নিজের অনুরূপ কোনো স্থায়ী পদ পাবার সম্ভাবনা অনিশ্চিত। এসটাব্লিশমেন্টের লোকেদের তিনি চেনেন এবং অধ্যাপকজায়া হিসাবে তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সমতা বজায় রাখার অধিকার তাঁর আছে। (হয়তো আমার এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটা কারও কাছে অলীক ঠেকছে, কিন্তু সামাজিক স্তরভেদ অক্সফোর্ডীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য !) অন্য দিকে প্রকৃত কাব্যানুরাগীদের জন্য তিনি পরিচালনা করেন একটি পোয়েট্রি ওয়ার্কশপ্, এবং ডাকেন সকলের জন্য উন্মুক্ত কবিতাপাঠের সভা, যেখানে পঞ্চাশ পেনির বিনিময়ে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার, এবং যেখানে নিমন্ত্রিত কবিদের সঙ্গে শ্রোতাদের আলাপ-আলোচনাও চলতে পারে। এসব কার্যকলাপের জন্য তিনি সরকারী সংস্কৃতিদপ্তরের সামান্য সাহায্যও পেয়ে থাকেন। তাঁর নম্র, নমনীয় ও বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের কাব্যপ্রচেষ্টাকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন এবং এই শহরের কাব্যচর্চাকে একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র সরবরাহ করেন, অথচ গুরুগিরি করায় এবং চেলাসংগ্রহে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় না। ওয়ার্কশপের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়।

পাতলা ছিপছিপে, সুন্দর নরম চেহারা, বয়স চুয়াল্লিশে ঠেকেছে এবং তিনটি ছেলেমেয়ের মা, কিন্তু দেখতে অনায়াসে ত্রিশের কোঠাতেই, মুখে সর্বদাই লেগে আছে একটুখানি মিষ্টি হাসির রেশ, কানে একটু কম শোনেন ব'লে কখনো কখনো কানের পিছনে হাত ঠেকিয়ে কথা শোনেন এবং তার ফলে তাঁর কোমল মুখ-খানিতে আসে একটা উদ্‌গ্রীব মনোযোগের ভাব যা তাঁর সর্বদা অমায়িক ব্যবহারকে আরও একটু মধুরতা দেয়। যাঁর কথা তিনি শুনছেন তাঁর মনে হবে যে ঐ মুহূর্তে অ্যান তাঁকেই তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছেন, ফলে আদান-প্রদানে একটু যেন অতিরিক্ত নৈকট্য এবং আন্তরিকতা সহজেই অনুভব করা যায়। চালিয়াতি জিনিসটি অ্যান একেবারেই রপ্ত করতে পারেননি।

ইংল্যাণ্ডের কেম্‌ব্রিজে ১৯৩৩ সালে তাঁর জন্ম হয়। বাবা-মা মার্কিন। তাঁর বাবা দর্শনের অধ্যাপক, নীতিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, ঐ সময়ে অস্থায়ী সময়ের জন্য কেম্‌ব্রিজে ছিলেন। মা লেখিকা ছিলেন, কিন্তু যত লিখতেন তার তুলনায় প্রকাশ করতেন অনেক কম। অ্যানের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অ্যান আর্বরে, মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংগীত এবং ফরাসী সাহিত্যের স্নাতক, পারিবারিক ঐতিহ্যে সংগীতের একটি ধারা আছে, নিজে চেলো বাজান। চলতি অ্যাকাডেমিক বছরে অ্যান রেডিং শহরের একটি কলেজে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের 'ফেলো'। এর আগে ডাণ্ডী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অক্সফোর্ডের একটি কলেজে অনুরূপ অস্থায়ী ফেলোশিপের অধিকারিণী ছিলেন। ইংরেজ স্বামী মার্ক এলভিন অক্সফোর্ডে চৈনিক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। এটি অ্যানের দ্বিতীয় বিবাহ।*

অ্যানের কবিতার যে বৈশিষ্ট্য মনোযোগী পাঠকের সর্বাগ্রে চোখে পড়বে তা এক সুষম ভারসাম্যমণ্ডিত লাবণ্য। তাঁর কবিতায় লিরিক এবং নাটকীয় উপাদানের প্রাধান্য স্বীকার্য, অথচ আবেগকে এবং নাটকীয় প্রকাশভঙ্গিকে নিপুণ কারিগরির রাশে সংযত ক'রে রাখতে জানেন তিনি। কাব্যোচিত বৌদ্ধিক গুণে, বিশ্লেষক

---

* অ্যান স্টিভেনসনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যেসব তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটি বর্তমানে আর সত্য নয়। তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ স্থায়ী হয়নি এবং তিনি এখন আর অক্সফোর্ডের বাসিন্দা নন। তাঁর তৃতীয় বিবাহও স্থায়ী হয়নি। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ***Minute by Glass Minute*** এবং ভবিষ্যতে তাঁর কবিতার একটি ***Collected Poems*** সংস্করণ বার হবে।

*ক্ষমতায়, শ্লেষাত্মক উক্তিতে তিনি অনায়াসে পুরুষ কবিদের সমকক্ষ, কিন্তু সে-*সবের পিছন থেকে সর্বদা ঠিকরে বেরোয় তাঁর সংবেদনশীল নারীমন, তাঁর উষ্ণ অনুভূতির দ্যুতি।

বর্তমান ব্রিটেনে এক দল কবি আছেন যাঁদের কাছে wit বা conceit-ই সব। অষ্টাদশ শতকের গৌণ কবিদের সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্য স্পষ্ট। এঁদের রচনায় অনুভূতির বিশেষ বালাই থাকে না, শব্দের তথা চিন্তার নানান জুজুৎসুই এঁদের সম্বল। এঁদের এক একটি কবিতা যেন পোস্টকার্ডে সাংকেতিক ভাষায় লেখা মজাদার চিঠি, একবার অর্থোদ্ধার করতে পারলেই তাদের মজা ফুরিয়ে যায়। অক্সফোর্ডের দু'জন কবি, যাঁরা এই স্টাইলে লিখে থাকেন, তাঁদের সম্বন্ধে অ্যান একবার বলেছিলেন, 'এঁদের ধ'রে সমুদ্রের ওপারে কোথাও চালান ক'রে দেওয়া উচিত। কবিতার সম্বন্ধে যত ভ্রান্ত ধারণার উৎস এঁরা। যদি চালাকি আর ভাবুকত্বের মধ্যে বেছেই নিতে হয়, তবে আমি ভাবুকত্বের পক্ষে। কবিদের থাকা উচিত মিষ্টিকদের সঙ্গে, শো-ম্যান্‌দের সঙ্গে নয়।'

অথচ ওয়ার্কশপের সভ্যরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে অ্যানের কাব্যরুচি উদার, পরীক্ষামূলক রচনার এবং নানান আঙ্গিকের কবিতার রসগ্রহণ করতে প্রস্তুত তিনি। বৈদগ্ধ্যে তাঁর অবশ্যই আপত্তি নেই—তাঁর নিজের কবিতাই যথেষ্ট বিদগ্ধ—তবে বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি অনুভূতির স্পর্শটুকুও থাকা চাই, এ-ই তাঁর মত। অ্যানের কবিতায় বৈদগ্ধ্য এবং অনুভূতির একটি শাণিত-শীতল সমন্বয় আমাকে টানে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যানের দু'খানি কবিতার বই বেরোয়: ***Living in America*** (১৯৬৫) এবং '***Reversals***' (১৯৬৯)। এই দু'টি ব্রিটেনে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রিটেনে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতার বই '***Travelling behind Glass***'-এ (১৯৭৪) * উনচল্লিশটি কবিতার মধ্যে সাতাশটি ঐ দু'টি বই থেকে সংকলিত। গ্রন্থটির অন্যতম বিষয়বস্তু তাঁর কৈশোর ও প্রথম যৌবনে জানা মার্কিন জীবন। প্রথম কবিতাটিতেই পাওয়া যাবে বুর্জোয়া মার্কিন পরিবারের মহিলাদের কর্মহীন অবসরমন্থর জীবনের একটি অনুপম চিত্র। সারা দুপুর তাঁরা ব'সে আছেন তাঁদের স্বামীদের কর্মস্থল থেকে ফেরার প্রতীক্ষায়; তাৎপর্যশূন্য, প্রতীক্ষাসর্বস্ব এবং ইন্দ্রিয়বিলাসী তাঁদের কালাতিপাত :

---

* প্রকাশক : অক্সফোর্ড য়ুনিভর্সিটি প্রেস। দাম : দেড় পাউণ্ড।

Women, waiting for their husbands,
sit among dahlias all the afternoons,
while quiet processional seasons
drift and subside at their doors like dunes,
and echoes of ocean curl from the flowered wall.

The room is a murmuring shell of nothing at all.

('The Women')

ছন্দের ওঠা-নামার সঙ্গে পরস্পরসংলগ্ন চিত্রকল্পগুলি মনোজ্ঞভাবে গ্রন্থিত হয়েছে।

মার্কিন সভ্যতার স্রষ্টা একাধিক ইয়োরোপীয় দলের মধ্যে ইতালীয়েরা একটি দল। এই দলের বেহিসাবী বেপরোয়া পুরুষদের অর্থোপার্জনের নেশা এবং অর্থব্যয়ের উদ্দামতার কথা অ্যান লিখেছেন আধা-আত্মজৈবনিক একটি কবিতায় :

"Life is what you make of it", my half-Italian
grandmother used to say. ......
...... I know that brave cliché
was a legacy from her father. His western dream
was a palace of chequered aprons. Ambition was colour
and doom as he roared through four fortunes, strewing
sheep, gold, horses and diamonds like sawdust
all over Kentucky.

('The Dear Ladies of Cincinnati')

এই সমাজের মহিলাদের আলংকারিক জায়াসত্তার আড়ালে অবরুদ্ধ অবদমিত উচ্ছল ব্যক্তিত্বকে অসামান্য চাতুর্য এবং দরদের সঙ্গে চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতো উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরেছেন অ্যান। শ্লেষাত্মক বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজবিজ্ঞানীর উপযুক্ত বিশ্লেষণ ও ভাষ্য :

Uselessness
was the use they made of their half raw beauty,
and they all found husbands who, liking their women gay,
preserved them in an air-tight empire made of soap
and mattresses. There, for years, they manufactured

their own climate, generated events to keep
everybody laughing. Outside, the luck of Republicans
fluctuated, stocks were uncertain. Sadness perplexed them, but
the aunts kept their chins up trying on hats,
called everybody "sugar", remembered the words of hit tunes
they'd been courted to, avoided the contagion of thought
so successfully...

('The Dear Ladies of Cincinnati')

কবিতাটির শেষে এই অগ্রবর্তী প্রজন্মের মহিলাদের আলস্য ও কৌতুকে স্নাত বারান্দাবিলাসের একটি মর্মভেদী শট্‌-এর পরেই ঐ জীবনধারার পৃষ্ঠপোষক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আভাস দেওয়া হয়েছে :

And the ladies, the ladies still sit on the stone verandah,
in the bamboo chairs upholstered with chintz geraniums,
with the white painted wrought iron furniture still in bloom,
laughing and rocking and talking their father's language
while the city eats and breathes for them in the distance,
and the river grows ugly in their perpetual service.

('The Dear Ladies of Cincinnati')

যন্ত্রশিল্পনির্ভর আধুনিক মার্কিন নগরজীবন, তার পণ্যসম্ভার, দানবীয় ভোগ, এবং দূষিত প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের কথা মাত্র দু'টি মিতবাক্‌ পঙ্‌ক্তিতে ইশারায় ব'লে পূর্বসূরিদের সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত ক'রে কবিতাটি শেষ করেছেন অ্যান। এই সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আগ্রহী কিন্তু মার্গনির্ণয়ে দিশাহারা, জ্যাজ-মত্ত, নব্য মরমিয়াবাদে গা-ভাসানো নিউ ইয়র্কের রোম্যান্টিক মেজাজকে মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে সার্থকভাবে মূর্ত করেছেন অ্যান অন্য একটি ছোট কবিতায় :

This addiction !
The ones who get drunk on it easily !
The romantic, sad-hearted,
expensive inhabitants
who have to believe there is no way out,

who tear at themselves and each other
under the drumbeats while everyone
dances or weeps
or takes off clothes hopefully,
half sure that the quivering bedstead
can bring forth leaves,
that love, love, love
is the only green in the jungle. ('New York')

সামাজিক বিষয়বস্তুকে এমন স্মরণীয়ভাবে কবিতার ভাষার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেবার ক্ষমতা একটি বলিষ্ঠ শিল্পী-সত্তারই পরিচয় দেয়। সন্দেহ নেই যে তাঁর ব্রিটেনে প্রবাস মার্কিন জীবন সম্পর্কে তাঁকে একটি বস্তুনিষ্ঠ, তন্ময় দৃষ্টিকোণ দিতে পেরেছে। মার্কিন এবং ব্রিটিশ দুই জগতেরই বাসিন্দা তিনি, উভয় ক্ষেত্রেই যুগপৎ ভিতরের লোক এবং বাইরের দর্শক। ফলে তাঁর দুই জগতের বিশ্লেষণই ক্ষুরধার ও অন্তর্ভেদী। ফরাসী সাহিত্য মারফৎ ইয়োরোপ তাঁর কাছাকাছি প্রাঙ্গণ; তা ছাড়া তাঁর স্বামীর চৈনিক বিদ্যার মাধ্যমে তিনি পান প্রাচ্যের এবং তৃতীয় দুনিয়ার স্বাদ। শুনেছি এলভিন সাহেবদের পরিবারে একজন ভারতীয় বধূও আছেন: নৃত্যশিল্পী সূর্যকুমারী। অ্যানের মানসলোক অনিবার্যতই বিশ্বনাগরিক, এবং হয়তো এ কারণেও তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব আমাকে টানে। একটি আশ্চর্য কবিতা 'England', যা তাঁর মতো একাধারে ভিতরের লোক এবং বাইরের লোক ছাড়া কেউ লিখতে পারতো না। বহুদর্শী তাঁর চোখের সামনে ইংল্যাণ্ডের একান্ত নিজস্ব নরম আলোয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এই জটিল, বিদগ্ধ, অতিমার্জিত সভ্যতাটির দোলাচল সত্তা, তার প্রাকৃতিক পরিবেশের এবং অনিশ্চিত জলবায়ুর অস্থির, মেদুর সৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটের উপর আরোপিত প্রয়োগকুশল একটি জাতির সাম্প্রতিক জীবনধারার গ্লানি, নিঃসঙ্গতা ও নির্বেদের ইঙ্গিত।

Summer, and the shine of white leaves against thunder.
Ploughland where the wind throws the black soil loose
and horses pull clumsily as though through surf
or stand, hoofs clapped to the earth like bells,
braced in their pastures between churches and seagulls.
England. Cool and in bloom,

where the light grows like grass out of the ground,
where the sky begets colours on uneasy seasons
and the hills lie down patiently in the rain.

Nowhere as in England is severity cherished
for its own sake or loneliness so compatible.
Where wilderness is scarcer than gardens,
bare land is less dangerous than a cage of chimneys,
and the torn man flies to the small desolations
where the wind can persuade him of vanity
without diminishing his human importance.

('England')

আধুনিক যন্ত্রশিল্প-দ্বারা প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের দূষণ অ্যানের একটি জরুরী বক্তব্য। তাই হেমন্তের লণ্ডনের স্মরণার্হ আলেখ্য আঁকতে আঁকতেও তিনি তার বিষাক্ত সৌন্দর্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :

Come with me. Look. The city
nourished by its poisons, is beautiful in them.
A pearly contamination strokes the river
as the cranes ride or dissolve in it,
and the sun dissolves in the hub of its own explosion.

('England')

প্রকৃত শিল্পীর হাতে একটি হ্রস্বায়তন বর্ণনাও ব্যঞ্জনার কতখানি ঘনতা তথা বিস্ফোরক শক্তি বহন করতে পারে তা উপরের লাইন ক'টির খুঁটিনাটির দিকে একটু মনঃসংযোগ করলেই বোঝা যাবে। প্রথমত, লাইনগুলি পড়লেই অন্তত আমার মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে 'Prothalamion' নামক কবিতায় এলিজাবেথীয় কবি এডমাণ্ড স্পেন্সারের আঁকা টেম্‌স্‌ নদীর মনোজ্ঞ ও প্রথিত চিত্র : ষোড়শ শতাব্দীর টেম্‌স্‌, নির্মল, রজতোজ্জ্বল, রাজহংস-অধ্যুষিত, তার দুই তটে পুষ্পখচিত শ্যামলিমা। কবির নিজের মানসিক ওয়ার্কশপে এই বিশেষ কবিতাটির স্মৃতি সক্রিয় ছিলো কি না জানি না, তবে প্রাক্‌-শিল্পবিপ্লব যুগের টেম্‌সের একাধিক বর্ণনা ইংরেজী সাহিত্যে বিধৃত আছে, এবং অতীত ও বর্তমানের বৈসাদৃশ্যকে অ্যান যে

সচেতনভাবেই তাঁর সংকেতের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন এ অনুমান অসঙ্গত হবে না। আগেকার দিনের রূপালি নির্মলতার বদলে টেম্‌সের জলে এসেছে **'pearly contamination'**-এর আভা, এবং উদ্ধৃতিটির চতুর্থ পঙ্‌ক্তি মুহূর্তের জন্য পাঠকের চেতনায় জ্বালে দ্বন্দ্বের দেশলাইকাঠি : ভারী জিনিস তোলার ক্রেন বা কপিকলের ওঠা-নামা, যা আধুনিক শহরের আকাশপটে পরিচিত দৃশ্য, তার কথাই বলা হচ্ছে, কিন্তু তারই ফাঁকে উঁকি দিয়ে উড়ে চ'লে যায় মৌলিক অর্থের ক্রেন, বিগত দিনের বলাকা। উপরন্তু, জলযান তথা রাজহাঁসের জলের উপর ভেসে যাওয়া সম্পর্কে **'ride'** ক্রিয়াপদটি ইংরেজীতে প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত; কাজেই সাবেকী আমলের টেম্‌সে ভাসমান রাজহাঁসদের রাজকীয় ভঙ্গিটিও চকিতে দেখতে পাই। ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায় অতীত, যে তিরোধানের আভাস দেয় পর পর দু'বার ব্যবহৃত **'dissolve'** ক্রিয়াপদটি এবং হেমন্তের ধোঁয়াশার মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান সূর্যাস্তের চূড়ান্ত সামগ্রিক চিত্রটি। মনে পড়বে **'Harmonie du Soir'** কবিতাটিতে বোদলেয়ারের সেই বিখ্যাত লাইনটি— **'Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige'**—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যার অনুবাদ করেছিলেন 'ঘনীভূত নিজ শোণিতে সূর্য হয়েছে অদর্শন'।* 'নিজের ঘনীভূত রক্তে সূর্যের নিমজ্জিত (noyé) হয়ে যাওয়ার এই চিত্রকল্পটিকে খ্রীষ্টীয় ভাবমণ্ডলের অন্তর্গত ব'লে চিহ্নিত করলে ভুল হবে না। কিন্তু অ্যানের কবিতায় ঐ অনুরণনের উপর আরোপিত করা হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান থেকে নেওয়া চিত্রকল্প : এখানে সূর্য দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে নিজের বিস্ফোরণের চক্রনাভিতে। ফলে শুধু যে দিনশেষের এবং বর্ষশেষের বিদায়ী আবহটি ফুটে উঠেছে তাই নয়; মহানগরের, গোটা সভ্যতার, এমনকি সৌর জগতের সায়ন্তন দ্যুতিও আভাসিত হয়েছে। তা ছাড়া, সূর্যাস্ত যেহেতু আবর্তিত ঘটনা, তাই নগরের, সভ্যতার, বা মহাবিশ্বের আবর্তিত উত্থান-পতনের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। লণ্ডন ও ইংল্যাণ্ডের রূপায়ণে অভিনিবিষ্ট কবি-কল্পনা পরিপ্রেক্ষিতের তাগিদে আলোর গতিবেগে মহাবিশ্ব পরিভ্রমণ ক'রে এসেছে। বিশেষ থেকে সাধারণে এই অনায়াস উত্তরণে, পরিচিত জাগতিক দৃশ্যপটে মহা-জাগতিক পরিপ্রেক্ষিতের এই অতর্কিত বিস্ফোরণে লাইনগুলি মহৎ কবিতার লক্ষণে আক্রান্ত।

এবং এই গতিপথে অ্যান যে কতখানি অভ্যস্ত তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

---

* স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করলাম। সত্যেন্দ্রনাথের রচনাবলী কাছে নেই।

চৈনিক চিত্রকলার কোনো প্রসিদ্ধ নিদর্শন দেখে লেখা একটি কবিতা, যেখানে কুটীরবাসী ধ্যানীর নির্বাণস্বপ্নকে তিনি একেবারে আত্মসাৎ ক'রে ফেলেছেন, স্বকীয় চৈতন্যের বৈশ্বিক সম্প্রসারণে রূপান্তরিত করেছেন :

The soft rain dropped on the dust at nightfall,
dawns poured revelations over the peaks
until, as he slept, he could see it all—
the graceful ascent from the shelving eaves of the hut.
The ease of detachment. The flowing out of his sleeves.
The slow half sorrowful movement of regret.
as he rose with the steadying mists about his knees,
away from the rocks and the stunted, gripping pine
and the books stacked neatly out of the way of the rain.
('Dreaming of Immortality in a Thatched Hut')

বস্তুত কবিতাটির নামকরণেই কবির যাত্রাপথ সূচিত হয়েছে। এবং লক্ষণীয় যে কবিতাটির শেষ হয়েছে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নের পরিচিত পরিপার্শ্বের আবশ্যিক অবলোকনে, একই আধারে বাস্তব ও অতিবাস্তব উভয়ের স্বচ্ছ দ্রবীভবনে। শেষ লাইনে উল্লিখিত পাঁজা-করা পুঁথিগুলি যেন নবজন্ম লাভ করে ; আমরা তাদের নতুন আলোয় দেখতে পাই। রহস্যাক্রান্ত অস্তিত্বের এই বৃত্তাভাস পর্যটন, অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার এমন সংযত অথচ সুদূরপ্রসারী দ্যোতনা পাঠকের মনকে মোহাবিষ্ট করার ক্ষমতা রাখে।

ফিলিপ্ লার্কিনের মতো একান্ত ইংরেজ একজন আধুনিক কবি এবং ফরাসী সাহিত্যে নিষ্ণাত দার্শনিক, ভাবুক অ্যান ষ্টিভেনসনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বোধ হয় এখানেই। লার্কিন মার্জিত, নাগরিক, অনুপুঙ্খের পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু তাঁর কবিতায় দূরাধিরোহী কোনো পক্ষবিধূনন, অস্তিত্বের রহস্যভেদে হঠাৎ মরিয়া হয়ে ওঠা কোনো ক্রেঙ্কার শ্রুতিগোচর নয়। লার্কিনের নাম-করা কবিতা *'The Whitsun Weddings'*-এ উত্তর ইংল্যাণ্ড থেকে লণ্ডনে একটি ট্রেনযাত্রা বর্ণিত হয়েছে তার পাশে শ্রীমতী ষ্টিভেনসনের *'Travelling Behind Glass'* কবিতাটি, যে কবিতাটি থেকে আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণ, রেখে পড়লেই দুই কবির মেজাজের তফাৎ ধরা পড়বে। এই দীর্ঘ কবিতাটির বিস্তারিত

আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়, শুধু তার ভাবব্যাপ্তির আভাস দেওয়া যেতে পারে।

স্কটল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে গাড়ি ক'রে কবি আসছেন, কাচের আড়াল থেকে দেখছেন একটি জগৎকে। একের পর এক দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে, আবার নিমেষে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে। যেমন ছুটছে তাঁর যান, তেমনই ধাবমান তাঁর দুরন্ত চিন্তা, অনুসন্ধানী মন। একটি দেশের ভৌগোলিক শরীরকে যেমন ক্রমাগত অতিক্রম করছেন, তেমনই দু'পাশে ছিটকে যাওয়া অভিজ্ঞানের মাধ্যমে সংহতভাবে প্রত্যক্ষ করছেন তার ইতিহাসের গতিকে, ছুঁয়ে যাচ্ছেন তার আধুনিক জীবনের প্রাণস্পন্দনকে। কবিতাটির একেবারে মাঝখানে দৃষ্টি-আকর্ষক নকশার মতো ন্যস্ত কাটা-কাটা ছন্দে গ্রথিত একটি আশ্চর্য স্তবক তাঁর এই গতিশীল চেতনাকে স্মরণীয়ভাবে মূর্ত করে। মনে রাখতে হবে যে এখানে গাড়ি এবং কবিতা উভয়ের গতিবেগই চরমে পৌঁছেছে। গানের মতো বেজে ওঠে লাইনগুলি।

Sealed in this
carapace, my will
hurtles at seventy,
warm and still
through familiar urban
overspill.
Now and then some
shards, debris, a
tamed, vestigial century ;
gabled mansion,
timbered inn,
salvaged church in a
green pen,
steeple raised to
warn or greet
a city crawling
for its meat,
staccato, crawling

red and neat,
home to its plural
human street.

('Travelling Behind Glass')

ব্রিটেনের প্রাতিস্বিক সত্তা তাঁর দৃষ্টিপথে যে কী অকুণ্ঠভাবে ধরা দিয়েছে তা শুধু তাঁরাই বুঝতে পারবেন যাঁরা এ দেশকে ভালো ক'রে জানেন। অ্যান দেখেছেন একটি দেশের ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত শরীরের অবসাদকে, প্রকৃতির টানটোনে এবং বিশ্বকর্মা মানুষের হাতের কাজের রেখায় একটি জাতির আকৃতিকে, একটি অর্থবহ রঙ্গমঞ্চকে, যেখানের ইতিহাসের নাটক ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটকে বদলে দিয়েছে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে চিত্রকল্পের ধার ও অভিনবত্ব লক্ষণীয়।

Pylons, six shoulders to each,
six skeletal shivas.
They have taken with indifference
the prim, sacred cities of the old maps,
forcing the small passages.
Mariages de convenance.

A used country
wanting to be used.
Its history, a shell
broken, like this castle,
on the jaw of a hill
down which the cracked
chalk houses spill, an
avalanche arrested.
Hope lies at the bottom
in the valley of roofs.

('Travelling Behind Glass')

যৌন ও বলপ্রয়োগসংক্রান্ত চিত্রকল্পের মিশ্রণে, 'forcing', 'used', 'broken', 'cracked', 'spill' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে ইতিহাস কর্তৃক নিসর্গের বলাৎকার

জোরালোভাবে স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যুৎ-তারবাহী তোরণ পাইলনের সারি ব্রিটেনের চেহারাকে তিরিশের দশকেই কীভাবে বদলে দিচ্ছিলো তা লক্ষ করেছিলেন কবি স্টিফেন স্পেণ্ডার।

Now over these small hills they have built the concrete
That trails black wire :
Pylons, those pillars
Bare like nude, giant girls that have no secret.

(Stephen Spender, 'The Pylons')

অ্যানের দেওয়া কঙ্কালসার শিবলিঙ্গের সঙ্গে তুলনাটা যেন মহিলা কবিদের তরফ থেকে স্পেণ্ডারকে উদ্দিষ্ট প্রত্যুত্তর।

কিন্তু 'কাচের আড়ালে যাত্রা'-র একটি আধ্যাত্মিক আয়তনও আছে। এ একাধারে ঊর্ধ্বশ্বাস জীবনদৌড়ের এবং অস্তিত্বের অর্থসন্ধানী তীর্থযাত্রার প্রতীক। কবি নিজেকে প্রশ্ন করেন : 'আমিই কি গ্রাস করছি পথকে, না আমি সেই বস্তু যাকে গ্রাস করছে পথ?' পুনরাবৃত্ত উপত্যকাগুলি তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মতো প্রতীয়মান হ'তে থাকে। সেই সমুদ্রের কাছে তাঁর প্রার্থনা :

I would ask such a sea
to be accommodating,
to warm me, obey me,
accept me like an arm,
in time to release me
entirely, as nothing at all.
As belonging to nothing at all.

('Travelling Behind Glass')

ক্রমাগত অপস্রিয়মান শহরগ্রামগুলির কোনো সম্পূর্ণ পরিচিতি এ যাত্রায় পাওয়া যায় না। খেত-খামার, গীর্জা, সাঁকো, মানুষের ভিড়, প্র্যামে শিশু, পার্ক-করা গাড়ি, চলতি মোটরবাইক, একটি বিড়াল—সবই ঠিকরে উঠে কাটা প'ড়ে যায়। এসব শহরগাঁয়ে ধাবমান কবির দেখা করার কেউ নেই, অপরিচিত তাঁর নাম। অথচ পথের পাশে এক বৃদ্ধার মুখে কবি চকিতে আবিষ্কার করেন নিজেরই

মুখাবয়ব। পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সংশয় জাগে : এ তো শুধু চলার পথ, এখানে কি মানুষের প্রকৃত ঘরবাড়ি থাকতে পারে? নারীরা উঠানে মেলেছে কাচা কাপড়, বিশুদ্ধ সংরাগের প্রতীক ; আর এসব আঙিনাতেই কাজের শেষে সন্ধ্যায় ফিরে আসবে পুরুষেরা। পর্দা-টানা সারি সারি গার্হস্থ্য বাতায়নের পিছনে দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি অনুমান ক'রে নিয়ে তাদেরই মধ্যে নিজেকে খোঁজেন কবি : কোন বাড়িটা তাঁর, কোন জানলাটার পিছনে চলছে তাঁর নিজের জীবনের গতানুগতিকতা?

কিন্তু পারেন না কোনো উষ্ণ নীড়ের সন্ধান দিতে। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো ফেটে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে ঐ দ্বীপের ভিতরকার শাঁস আর বিচি। তার তৈলাক্ত উপরিভাগে (তখনও জীবন্ত!) তিনি একা গাড়ি চালিয়ে যান। অবশেষে যে কাচের আড়াল থেকে তিনি এতক্ষণ জগৎটাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন তা চৌচির হয়ে তারায় তারায় বিভক্ত হয়ে যায়, তারাগুলি মাছরাঙা পাখির মতো আলো ঠিকরাতে ঠিকরাতে মহাশূন্যে ছড়িয়ে যায়। এই দার্শনিক উপসংহারের সঙ্গে তুলনীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'লঘিমা' কবিতাটির অন্তিম স্তবক।

চিন্তার অনুরূপ গতিপথ লক্ষ করা যায় 'Sierra Nevada' কবিতাটিতে, যেখানে এক মহান্ গিরিনিসর্গের চেহারায় কবি চিনতে পারেন প্রাগৈতিহাসিককে ও পৌরাণিককে, সেই সার্বভৌম সত্তাকে যা নয় আত্মসচেতন, যা ধার ধারে না নামের, চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে যার নেই কোনো সম্পর্ক, আমাদের কৃতকর্মের সঙ্গে যার নেই যোগাযোগ, আমাদের সুখ-দুঃখ বিষয়ে যা নির্লিপ্ত, যা মনুষ্যার্থের সঙ্গে সম্পর্করহিত বিশুদ্ধ অস্তিত্ব, এবং সুযোগ পেলেই যার সঙ্গে আমাদের সাযুজ্য দুর্নিরোধ্য হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে বর্ণনামূলক ও মননশীল এই কবিতাটির মধ্যস্থলে আঙ্গিক-সচেতন কবি বিন্যস্ত করেছেন দুর্গম, শিলাময় গিরিনিতম্বে আরোহণের পথে বিচিত্র, সুকুমার ফুলের একটি রসসিক্ত বিবৃতি। কবিতাটির সামগ্রিক বক্তব্যের রত্নহারে এই মধ্যমণিস্বরূপ স্তবকটির স্থাপনা নৈপুণ্যে ও ঔচিত্যে এতই লক্ষ্যভেদী যে রচয়িত্রীর কবিত্বশক্তি সম্পর্কে স্তবকটির প্রথম দু'টি পঙ্‌ক্তিরই প্রতিধ্বনি করতে ইচ্ছা করে :

Now, as we climb on the high bare slopes,
the most difficult earth supports the most delicate flowers :

('Sierra Nevada')

দুরারোহ, তন্নুবাত ভাবলোকেও সফল তাঁর সাধনা, শিকড় গাড়বার পক্ষে যথেষ্ট মাটি নেই এমন শিলাগাত্রেও প্রস্ফুটিত তাঁর কবিতার সুকুমার ফুল।

একই সঙ্গে আমাদের মর্ত্য জীবনের খুঁটিনাটিকে যে কী অসামান্য আলোকে সুস্নাত ক'রে তুলতে পারেন তিনি তার নিদর্শন নারীত্বের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত তাঁর কবিতাগুলি। মা ছাড়া আর কে লিখতে পারতেন তুলনাহীন এই ছোট্ট কবিতাটি ?

The snow melts
exposing what was
buried there all winter—
tricycles and
fire-engines and
all sizes of children
waiting in boots and
yellow mackintoshes
for the mud.

('In March')

নারীর পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া সম্ভব হতো কি এই দোলা-লাগানো বসন্তসংবাদ ?—

No time, no time,
and with so many in line to be
born or fed or made love to, there is no
excuse for staring at it, though it's spring again
and the leaves have come out looking
limp and wet like little green new born babies.

The girls have come out in their new bought dresses,
carefully, carefully. They know they're in danger.
Already there are couples crumpled under the chestnuts.
The houses crowd closer, listening to each other's radios.

Weeds have got into the window boxes. The washing hangs, helpless. Children are lusting for icecream.

('The Suburb')

শহরতলিতে বসন্ত আসার বিবরণে অনুপুঙ্খ-নির্বাচনে ও উপমা প্রয়োগে নারীত্বের এই প্রাথমিক স্বাক্ষর রেখে তার অব্যবহিত পরের লাইনেই কবি ঘোষণা করেন তাঁর অন্তঃসত্ব অবস্থা ; আমরা জানতে পারি যে শুধু তাঁর ঘরের বাইরে নয়, তাঁর দেহের অভ্যন্তরেও নতুন প্রাণের স্পন্দন এসেছে। শীতপ্রধান দেশের বসন্তকালে এই অভিজ্ঞতার যে একটা বিশিষ্ট তীব্রতা আছে তা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে এই কবিতাটিতে। হয়তো এ ক্ষেত্রে আমার প্রতিক্রিয়া খানিকটা ব্যক্তিগতও বটে, কারণ অনেক বছর আগে আমিও 'হিন্দোল' নামে একটি কবিতায় একই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলাম।

বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা বিদেশী কবিতা নাড়াচাড়া ক'রে থাকেন তাঁদের কাছে কবি সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথের নাম হয়তো অজানা নয়। এক কালে 'দেশ' পত্রিকার 'বিদেশের বই' স্তম্ভে ওঁর বই 'Ariel'-এর আলোচনা করেছিলাম। সিল্‌ভিয়াও জাতে মার্কিন, ইংরেজ কবি টেড্‌ হিউজ্‌কে বিয়ে করেছিলেন। দু'টি সন্তানের জননী, ইনি ১৯৬৩ সালে আত্মহত্যা করেন। এঁর কবিতায় বারংবার হানা দেয় মৃত্যুচিন্তা এবং স্বাভাবিক জীবন থেকে চ্যুত হবার অনুভূতি, 'এলিয়েনেশন'। অ্যান স্টিভেনসন এবং সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথ্‌ দু'জনেই এক প্রজন্মের মহিলা কবি, কিন্তু তফাৎ এই যে সিল্‌ভিয়া তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ ও দুঃস্বপ্নগুলি দ্বারা একেবারে আবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং অবশেষে ভূতগ্রস্তের মতো তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, অপর পক্ষে অ্যান ঐ আত্মঘাতী পথে না গিয়ে বাঁচবার কঠিন দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করেন এবং লাভ করেন ভাবনার এবং আত্মপ্রকাশের অনাবিল ক্রমবিবর্তন। অ্যানের কবিতায় মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা গাঢ়তর, পরিণততর। অ্যান জানেন সৃষ্টির সেই আবশ্যিক একাকিত্বকে, যখন মিলনের অন্যোন্যনির্ভর আনন্দের পর পুরুষ স'রে যায় দূরে বিলীয়মান ঘণ্টাধ্বনির মতো, আর পৃথিবীতুল্য বর্তুল, গুরুভার অবস্থায় নারী বাধ্য হয় তার অভ্যন্তরস্থ ভ্রূণকে লালন করতে ('The Shape of This World' কবিতাটি দ্রষ্টব্য)। তার পরবর্তী পর্যায়ে নবজাত শিশুর দিকে তাকিয়ে তিনি বোঝেন যে জন্মদাত্রীর নয়, ঐ আপাত-অসহায় নবজাতকেরই জিৎ।

I thought you were my victory
though you cut me like a knife
when I brought you out of my body
into your life.

Snail ! Scary knot of disires !
Hungry snarl ! Small son.
Why do I have to love you ?
How have you won ?

('The Victory')

শামুকের মতো কুণ্ডলী-পাকানো কাঁদুনে শাবকটা মায়ের ভালোবাসা স্রেফ আদায় ক'রে নেয়, এবং এখানেই আমাদের জৈব ও নৈতিক জীবন পরস্পরসংশ্লিষ্ট। সর্বোপরি, ঐ ক্ষুদে শরীরটির জটিল, নিখুঁত গঠন, সেখানে অংশের সঙ্গে অংশের সূক্ষ্ম, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক অস্তিত্বের প্রাথমিক রহস্যে তাঁকে আপ্লুত, রীতিমত আক্রান্ত করে। আমাদের নানান মানসিক অবস্থার ভ্রান্তি ও স্থূলতার পাশে চেতনাহীন 'অন্ধ' শরীরসত্তার নির্ভুল কারিগরি দেখে অবাক হয়ে যান তিনি।

The spirit is too blunt an instrument
to have made this baby.
Nothing so unskilful as human passions
could have managed the intricate
exacting particulars : the tiny
blind bones with their manipulative tendons,
the knee and the knucklebones, the resilient
fine meshings of ganglia and vertebrae
in the chain of the difficult spine.

Observe the distinct eyelashes and sharp crescent
fingernails, the shell-like complexity
of the ear with its firm involutions
concentric in miniature to the minute

ossicles. Imagine the
infinitesimal capillaries, the flawless connections
of the lungs, the invisible neural filaments
through which the completed body
already answers to the brain.

('The Spirit is too Blunt an Instrument')

আসলে মর্ত্য আর অতিমর্ত্য এই দুই পরিপ্রেক্ষিতকে অ্যানের কবিতায় বেশিক্ষণ আলাদা থাকতে দেখা যায় না। উপরেব স্তবক দু'টিতে যে 'sense of wonder' ধরা দিয়েছে তা অবশ্যই দার্শনিক, এবং সিয়েরা নেভাদার উদাসীন, প্রতন গিরি-নিসর্গ দেখে, কঠিন শিলাগাত্রে প্রস্ফুটিত সুকুমার পুষ্পরাশির সূক্ষ্ম অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ ক'রে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া তার সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য নেই। দ্রষ্টব্য এই যে অনুপুঙ্খগুলির বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্যের মধ্যেই কবিতাটির সাফল্যের রহস্য লুকিয়ে আছে। বাংলা কবিতায় যখন প্রায়ই নারীদেহের ভাঁজ আর খাঁজ নিয়ে একটা উদ্‌ভ্রান্ত, নাবালক ব্যস্ততা চোখে পড়ে, সে সময়ে পাশ্চাত্য কবিতায় বৈজ্ঞানিক তথ্যচয় কীভাবে আত্মীকৃত হচ্ছে এবং বৈষয়িক যাথার্থ্য কতখানি আদৃত তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই শিশুশরীরসংক্রান্ত এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি পরিবেশন করলাম।

অভিজ্ঞতার অন্য প্রান্তে অ্যান সনাক্ত করেছেন উপায়হীন সামাজিক নারীর নিরুদ্ধ বেদনাকে—মায়ের এবং স্ত্রীর ভূমিকায়, যখন সন্তানের, স্বামীর, বহির্জগতের, এমনকি নিজের কাছ থেকেও সত্যকে লুকিয়ে রাখতে হয়, করতে হয় মিথ্যার অভিনয়, নিজেকে ব্যবহৃত হ'তে দিতে হয়, স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়, মুখে লটকে রাখতে হয় আহত আত্মার সহিষ্ণু, ম্লান হাসি। নববধূ ভাবে স্বামীর সঙ্গে তার মিল হবে—'They will fit, she thinks,'—কিন্তু সে মিলের জন্য কত বড় দাম তাকে দিতে হবে তা সে তখনও জানে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্পর্কে সত্যের মুখোমুখি হ'তে চায় না ; বাইরের লোক ভাবে তাদের জীবন মিলিত।

All would be well
if only
they could face each other.

....

They look, at least,

as if they were going
in the same direction.

('The Marriage')

কিন্তু এই মিথ্যার মধ্যে কয়েক বছর বাস করার পর আসে সম্পর্কের নাশ।

They have lived in each other so long
there is little to do there.
They have taken to patching the floor
while the roof tears.

The rot in her feeds on his woodwork.
He betters her cellar.
He camps in the ruins of her carpet.
She cries on his stairs.

('The Demolition')

আর দাম্পত্য জীবনের ভুল যদি বা শোধরানো যায়, এড়ানো যায় না প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আবর্তিত মায়েদের জীবনের চাপা দুঃখ, অভিমান এবং অভিনয় সন্তান নেয় মায়ের দুর্বলতার, সহ্যশক্তির এবং স্নেহের সুযোগ ; মা রাখেন সন্তানের কাছ থেকে সত্যকে আড়াল ক'রে। জীবননাটকের এই পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত সংহত-ভাবে আভাসিত হয়েছে রূপকধর্মী একটি ছোট্ট কবিতায় :

Know this mother by her three smiles.
One grey one drawn over her mouth by frail hooks.
One hurt smile under each eye.

Know this mother by the frames she makes.
By the silence in which she suffers each child
to scratch out the aquatints in her mind.

Know this mother by the way she says
"darling" with her cheek clenched.
By the fabulous lies she cooks.

('Generations')

Travelling Behind Glass বইটিতে আমরা পরিচয় পাই পর্যবেক্ষণে খরদৃষ্টি, শব্দনির্বাচনে নিপুণ, ছন্দে সিদ্ধকর্ণ, এবং জীবনের রঙ্গমঞ্চে তথা অস্তিত্বের বৃহত্তর ব্যাপ্তিতে সত্যসন্ধানী এক কবির। তাঁর কবিত্বশক্তির মূলধনকে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর মতো খাটিয়ে অ্যান স্টিভেনসন রচনা করেছেন তাঁর চমৎকারী আঙ্গিকের গ্রন্থ *Correspondences,** যাকে বলা চলে একটি সফল 'tour de force'। এ বইটির কবিতাগুলি পারিবারিক চিঠির বা ডায়েরির আকারে লেখা, এবং তাদের সঙ্গে আছে কিছু সংবাদপত্রের কাটিং-এর আকারে পরিবেশিত রচনা। এই অভিনব মাধ্যমে একটি মার্কিন পরিবারের দেড়শো বছরের ইতিহাসের একটি রেখাচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে তাঁর নিজের পরিবারের ছায়াতেই পরিবারটিকে আঁকতে চেয়েছিলেন অ্যান, কিন্তু তার পর ঐ সময়ের সামাজিক ইতিহাসের নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেখেন যে অন্যান্য পরিবারের ইতিহাসে আরও লোভনীয় সাহিত্যোপযোগী মালমশলা প্রাপ্তব্য। তখন একাধিক পরিবারের ইতিহাস থেকে তথ্যের অনুপুঙ্খ আত্মসাৎ ক'রে, ঔপন্যাসিকের কায়দায় সেগুলিকে জোড়া দিয়ে একটি পরিবারের ইতিহাসে রূপান্তরিত করেন। সামাজিক এবং ব্যক্তিগত, উভয় আয়তনের প্রশংসনীয় সমন্বয় ঘটেছে এই বইটিতে, যার শিরোনাম দ্ব্যর্থব্যঞ্জক : 'Correspondences', অর্থাৎ চিঠিপত্র, আবার কবি-বর্ণিত পরিবারটির বিভিন্ন প্রজন্মের জীবনের মধ্যে আনুরূপ্যও বটে। মার্কিন দুনিয়ায় বং৺টির প্রথম প্রবর্তকের 'পিউরিটান' ভাবমণ্ডল পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে কীভাবে তার আওতায় রাখছে, উত্তরসূরিরা কীভাবে ঐ জীবনদর্শনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য চেষ্টা করছেন, কীভাবে বিদ্রোহ ক'রেও আবার বাপঠাকুর্দাদের চিন্তার জালেই আটকে যাচ্ছেন, চতুর অথচ মমতাময় লেখনীর আঁচড়ে এসব বিষয়বস্তুকে কাব্যনাটকীয় স্বগতোক্তির উপাদানে পরিণত করেছেন অ্যান। 'পিউরিটান' শব্দটি দেখে কেউ যেন না ভাবেন যে শুধু যৌন শুচিবায়ুর কথা বলা হচ্ছে বিশেষণটিকে অবশ্যই ঐতিহাসিক. খ্রীষ্টীয় অর্থে বুঝতে হবে। অ্যান দেখিয়েছেন যে যখন ঐ পরিবারটির মানুষেরা আপাতদৃষ্টিতে পূর্বপুরুষদের চিন্তাজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছেন, তখনও ঐ চিন্তাধারার কতগুলি দুর্মর এবং বলা যেতে পারে শ্রেয়স্কর দিক, যেমন সত্যস্পৃহা, বিবেকী আত্মবিশ্লেষণ, কট্টর কর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও অনুশীলন, তাঁদের প্রভাবিত করছে। মহিলাদের ক্ষেত্রেও

অ্যান দেখিয়েছেন মেয়েরা কীভাবে মা-দিদিমাদের জীবন থেকে নিজেদের জীবন-কে স্বতন্ত্র করতে গিয়েও তাঁরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, কীভাবে তাদের সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। খানিকটা নিজের ছায়াতে গড়েছেন লণ্ডনপ্রবাসিনী বিরাহবিচ্ছেদোত্তর কবিচরিত্র কে বয়েড্-কে, নিজের পরলোকগত মায়ের ছায়াতে এঁকেছেন কে-র মা রুথ-কে, আর কে-র দিদিমা মরা চ্যাণ্ড্লারের পিছনে নিশ্চয় উঁকি মারছেন কবির নিজের 'half-Italian grandmother'। বিবাহিত জীবনে নারী যে অ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু তা এ বইটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে ; একটি অংশের তিনি নামই রেখেছেন 'Women in Marriage 1930-1968'। অবশ্য পরিবারটির ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিষয়বস্তুটির অবতারণা করা হয়েছে। যখন ১৮৪০ সালে চ্যাণ্ড্লার পরিবারের দক্ষিণী অর্থাৎ মার্কিন দুনিয়ার একটি দক্ষিণদেশীয় রাষ্ট্র থেকে আগত পুত্রবধূ ম্যারিয়ান্ লাভাল্ বিবাহের চার সপ্তাহ পর সিন্‌সিনাটিতে তাঁর পতিগৃহ থেকে নিউ অর্‌লিন্স-এ তাঁর মাকে চিঠি লিখছেন, তখনই শ্বশুরকুলের গোঁড়া মূল্যবোধের সঙ্গে নববধূর পিতৃকুলের মূল্যবোধের সংঘর্ষ সূচিত হয়েছে। তা ছাড়া মায়ের কাছে মেয়ে নিভৃতে পেশ করেছে তার নতুন জীবনের আরেকটি সমস্যা :

The only time I sleep is in the morning
when Reuben has left for the office.
Which brings up a *delicate* subject, Mama.

I've been thinking and thinking,
wondering whether I'll *ever* succeed in being
the tender, devoted little wife you wanted me to be.

Because ... oh, Mama,
why didn't you tell me or warn me before I was married
that a wife is expected to do it *every night* !

But how could we have guessed ?
Ruby came courting so cool and fine and polite,
while beneath that gentlemanly, educated exterior

well ! I don't like to worry you, Mama.
You know what men are like !
I remember you said once the dears couldn't help it.
('A daughter's difficulties as a wife : Mrs. Reuben Chandler to her mother in New Orleans')

বিবাহটি স্থায়ী হয় না। অর্ধ-শতাব্দী পরে, বিশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, ১লা জানুয়ারি, ১৯০০ তারিখের ডায়েরিতে ম্যারিয়ান্ লাভাল্ চ্যাণ্ড্লারের পৌত্রী মরা তাঁর বিবাহের প্রাক্কালে নিজেকে একটি জরুরী প্রশ্ন ক'রে নিজেই উত্তর সরবরাহ করেন।

What does Nature
ask of Woman ?
Give to him that needeth.
Employ the hour that passeth.
Be resolute in submission.
Love thy husband.
Bear children.
('From the journal of Maura Chandler on the eve of her marriage to Ethan Amos Boyd')

তার একটু পরেই তাঁর মুখ থেকে শোনা যায় আরেকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, বিবেকী অথচ একটুখানি সুখের কাঙাল মানুষের সেই আর্ত জিজ্ঞাসা, যার উপযুক্ত উপ-স্থাপক নারী :

If I keep every moral commandment,
fulfil every physical requirement,
feed mind into heart,
proffer heart to humanity...
stands it not then to reason
a woman will be happy
in her season ?
('From the journal of Maura Chandler', etc.)

আরেক অর্ধ-শতাব্দী পরে, ১৯৫৪ সালে, মরা চ্যাণ্ড্‌লার বয়েডের দৌহিত্রী ক্যাথি চ্যাট্‌ল্ স্নায়বিক বৈকল্যের পর হাসপাতাল থেকে তার মাকে চিঠি লিখে জানায় তার মাত্র কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার কথা। কল্পনা ক'রে নিতে হবে একটি কলেজে-পড়া মেয়েকে, যে প্রেমে প'ড়ে চটপট বিয়ে করেছে, কিন্তু তার পর জীবন যে ঠিক কেমন হবে তা ভেবে ছাখে নি। তার প্রথম সন্তানের জন্মের পর নাগরিক জীবনের নিঃসঙ্গতায় আত্মীয়কুটুম্বদের বা দাসদাসীর সহায়তা ছাড়া দিনরাত শিশুটির দেখাশোনা করতে গিয়ে সে ভেঙে পড়ে। এই পর্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতকে বুঝতে হ'লে আধুনিক পাশ্চাত্য গার্হস্থ জীবনের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। গৃহকর্মে ও সন্তানপালনের চাকায় নারীর বন্দী দশা নতুন খবর নয়, নতুন আধুনিক জীবনের অন্য কতগুলি দিক যা তার অবরোধকে দুঃসহতর করে। মনে রাখতে হবে তথাকথিত 'নিউক্লিয়ার' বা কোষ-পরিবারের প্রকৃত নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা। কর্মক্ষেত্রে মানুষের সচলতার ফলে বৃহত্তর পারিবারিক বন্ধনগুলি শিথিল হয়ে পড়েছে। সন্তানপ্রসবের পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই মাকে লেগে যেতে হয় ঘরের কাজে আর বাচ্চার তদারকিতে—বাপের বাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ তো নেই-ই, শাশুড়ী-ননদ-জায়ের দলও অবশ্যই অনুপস্থিত, উপরন্তু ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ক'মে যেতে থাকায় এবং যন্ত্রশিল্পনির্ভর সমাজে কলকারখানায় কর্মসংস্থানের সুবিধার ফলে অর্থের বিনিময়ে গৃহকর্মে বা শিশুপালনে বাইরের লোকের সাহায্য পাওয়াও একান্ত কঠিন। তা ছাড়া স্মর্তব্য যে কোষ-পরিবারে লালিত মানুষ, সে নারীই হোক বা পুরুষই হোক, কোনো ছোট শিশুর দেখাশোনা করার সঙ্গে প্রথম তখনই জড়িত হয় যখন সে নিজে মা কিংবা বাবা হয়েছে। দু'টি কি তিনটি পিঠাপিঠি সন্তানের আধুনিক পরিবারে শিশুরা মোটামুটি একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠে, ছোট ভাইবোনেদের তদারকি করার সুযোগ এরকম পরিবারে বিরল। যৌথ পরিবারপ্রথার অভাবে, কর্মক্ষেত্রে সচলতার দরুণ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়ায়, এবং বাধ্যতামূলক স্কুলশিক্ষার রুটিনে ছেলেমেয়েদের আটকা প'ড়ে যাওয়ার ফলেও, তারা যে বিভিন্ন বর্গের 'তুতো' ভাইবোনেদের দেখাশোনা করার সঙ্গে জড়িত হবে তারও বিশেষ উপায় নেই। এই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা অল্পবয়সী মা ও বাবা উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক। যখন একটি সত্যিকারের রক্তমাংসের নবজাতকের অহর্নিশ তত্ত্বাবধানের ভার তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে তখন ডঃ বেন্‌জামিন স্পকের মতো বিশেষজ্ঞদের লেখা শিশুপালন-সংক্রান্ত বইয়ের পাতা খুলে বাচ্চা মানুষ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। পুরুষ

যদি বা দিনের বেলায় কর্মস্থলে পালাতে পারে, নারী সাধারণত সঙ্গে সঙ্গে চব্বিশ-ঘণ্টাব্যাপী দায়িত্বের চাকায় একেবারে আটকে যায়, তার পালাবার পথ থাকে না। এদিকে শিক্ষায় এবং আশা-আকাঙ্ক্ষায় স্ত্রী স্বামীর চেয়ে কোনো অংশেই হীন নয়। মনে রাখতে হবে আধুনিক শিক্ষিত নারীর আত্মসচেতনতা, অধিকার-বোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বিশ্লেষক মন, জীবনের কাছ থেকে তার প্রত্যাশার উচ্চ মান। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে তার জীবনে কী ঘটে যাচ্ছে। সে যা চেয়েছিলো এবং এখন যা পাচ্ছে এ দুয়ের মধ্যে ফারাক যত বড় হয়, নতুন দায়িত্বগুলি বহনের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যগুলি যত প্রকট হয়ে ওঠে, ততই তীব্রতর হয় তার অসন্তোষ। পতিসেবা ও সন্তানপালনই যে নারীর একমাত্র ধর্ম, অসহ অবস্থাকে যে অদৃষ্টের লিখন বা বিধির বিধান হিসাবে হাসিমুখে মেনে নিতে হবে, এসব মন্ত্রে আজকের মেয়েদের আর ভোলানো যায় না। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পাদ্রী অ্যাডাম চ্যাণ্ডলারের স্ত্রী ঐসব কঠোর নীতিকে মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ১৮৫৫ সালে তাঁদের পুত্রবধূ ম্যারিয়ান স্বামীর ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ১৯০০ সালে ম্যারিয়ানের পৌত্রী মরা কলেজশিক্ষিত হয়েও প্রাচীন নীতি-গুলির কাছে নতিস্বীকার করলেন এবং একজন গোঁড়া ঈশ্বরভক্তকে বিয়ে করলেন। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে তাঁদের কন্যা সুশিক্ষিতা রুথ এক অধ্যাপককে বিয়ে করলেন, নিজে লেখিকা হলেন, এক ইংরেজ ঔপন্যাসিকের ভালোবাসা পেলেন। রুথ নিজের সংসার ভাঙলেন না, বিবাহিত জীবন ও নতুন প্রেম দু'য়ের মধ্যে আপস করলেন, উভয় পুরুষকেই স্নেহমমতা দিলেন। অবশেষে পঞ্চাশের দশকে তাঁর কন্যা ক্যাথি বিবাহিত নারীর জীবনের স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

'Motherhood will settle her nerves,'
Daddy said, who was never a mother.
I knew in the coil of my head
how I hated her ! Hated her ! (অর্থাৎ তার নবজাত শিশুকন্যাকে)

Christ, how she howled !
And nothing I could feed her ...
my milk, canned milk, powdered milk, goat's milk ...
nothing would soothe her.
The doctor ? Sympathetic but busy
And I pouring breastmilk and blood ...

uncontainable tears ···
Once, in a quiet hour, I wrote to you.
Frank burned the letter.
('From an Asylum : Kathy Chattle to her mother, Ruth Arbeiter')

ক্যাথি যখন এই প্রায়োন্মাদ অবস্থায়, ঠিক যখন তার প্রয়োজন সব রকমের সাহায্যের, ঠিক তখনই ঘটে গৃহস্থাশ্রমের বিরুদ্ধে তার স্বামীর নিজস্ব উৎকেন্দ্রিক বিদ্রোহ।

He had begun to be gnawed.
Fine unseen teeth were
gnawing him...whittling him.
Wife
forcing him into the prison of a family
Baby
shaping him into the
middle class, money-earning
ulcered American Dad
Frank's maleness, idealism ...
self-flattering, easy conceit
never could admit.
('From an Asylum', etc.)

এই অবস্থায় অনিবার্যতই তাদের সম্পর্কে ভাঙন ধরে, ঠেকিয়ে রাখা যায় না ক্যাথির মানসিক বৈকল্যকে। হাসপাতালে বন্দী ক্যাথি প্রথমে তার ভগ্ন নীড়েই ফিরে যেতে চায় :

I'll try again. The marriage.
The baby. The house. The whole damn bore !

Because for me, what the hell else is there ?
Mother, what more ? What more ?
('From an Asylum', etc.)

কিন্তু ক্যাথির বিয়ে টেঁকে না। কষ্টলব্ধ আত্মবিশ্বাসকে পাথেয় ক'রে কে বয়েড্ নামে সে শুরু করে নতুন জীবন—সুদূর লণ্ডনে লেখিকা হিসাবে।

বৃহত্তর মার্কিন জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন ইংল্যাণ্ডপ্রবাসিনী কবি এই গ্রন্থটিতে—অবশ্যই নানান চরিত্রের আড়াল থেকে। তাঁরও পরের প্রজন্মের বিদ্রোহী মার্কিন যুবসমাজকে প্রতিফলিত করেছেন কে-র ভাই নিক্ আর্বাই-টারের চরিত্রে। পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে মৌল প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে নিক্ :

We accuse you, fathers,
we accuse you of lies,
of pouring out a smoke screen
of high-minded fervor,
and then setting off to murder
under twin banners, Profit and Compromise.
We accuse you of signing on
with Corporation Hypocrisy,
of willing us a money machine
that feeds us by consuming us like fuel,
of letting cities rule
while the grass withers and the
rivers pullulate with acids,
of setting up houses like music boxes where
love is only wound up once
and then allowed to run down.
We accuse you of using reason
to sanction massacre,
of making freedom
a one way street with barbed wire.

('Nick Arbeiter writes poems on the road to Wyoming after a funeral in Vermont')

আমেরিকার সঙ্গে তাঁর নিজের জটিল সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন অ্যান গ্রন্থটির

সর্বশেষ চিঠি—কবিতায়। মা রুথের মৃত্যুর চার বছর পর কে বয়েড্ লণ্ডন থেকে চিঠি লিখছেন তাঁর বাবা অধ্যাপক আরবাইটারকে :

> But I didn't go back because I couldn't see what to
> come back to.
> I couldn't think who to go back as.
> That Kathy my name was, that Mrs. Frank Chattle
> died in New York of divorce.
> Kay Boyd, the woman, the writer, has survived.
>
> 'In the floodtides of *Civitas Mundi*
> New England is dissolving like a green chemical.
> Old England bleeds out to meet it in mid-ocean.
> Nowhere is safe.
>
> It is a poem I can't continue.
> It is America I can't contain.
>
> Dear Father, I love but can't know you.
> I've given you all that I can.
> Can these pages make amends for what was not said ?
> Do justice to the living, to the dead ?
>
> ('Epilogue : Kay Boyd to her father, Professor
> Arbeiter')

মর্মস্পর্শী এই গ্রন্থটির উপসংহারে উচ্চারিত এই পঙ্‌ক্তিগুলি যেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবির নিজেরই তমসুক।

উপযুক্তভাবেই, তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ *Enough of Green**-এর শুরু কবিজীবনের আবশ্যিক নিঃসঙ্গতার ঘোষণায়—'To be a poet / You must always be alone'—এবং বিবর্তন তাঁর বর্তমান বাসভূমি ব্রিটেনের নিসর্গের পটভূমিকায় মাতৃত্বের ক্রমবর্ধমান দায়িত্বের অভিজ্ঞতায়, ঝড়বৃষ্টির পরে নির্মল

আকাশের মতো বিদ্রোহোত্তর স্থিতধী আত্মার শান্ত অনুভূতিমালায়। বোঝা যায় যে ব্যক্তিগত অনেক সংকট পেরিয়ে কবি পৌঁছেছেন তাঁর চেতনার বর্তমান আলোকস্নিগ্ধ স্বচ্ছতায়, যেখানে মেঘের অন্ধকার সাময়িকভাবে প্রতিবিম্বিত হ'লেও মৌল স্বচ্ছতাকে ঘোলা ক'রে দিতে পারে না। *Correspondences* বইটিতে নিজের সত্তার উৎসকে বিশ্লেষণ ক'রে চিত্তশুদ্ধি করেছেন তিনি, পেরিয়ে এসেছেন শৈশবের অপাপবিদ্ধতা ও যৌবনের বিদ্রোহ দুই-ই, বুঝেছেন পূর্বসূরিদের বেদনা ও দ্বন্দ্বকে এবং ফলে তাঁদের অপরাধও ক্ষমা করতে পেরেছেন। এখন তিনি একনিষ্ঠ সাধ্যায়ত্তের সাধনায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের গঠনদায়িত্বে। কর্তব্যের যে কঠিন পথ সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথ্ ত্যাগ ক'রে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব স্বামী-সন্তান সবাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে চ'লে গিয়েছিলেন, মানুষ এবং শিল্প হিসাবে বাঁচতে কৃতপ্রতিজ্ঞ অ্যান সেই পথ দিয়ে হাঁটছেন, এখানেই তাঁর—এবং নিশ্চয় তাঁর ধর্মনিষ্ঠ পূর্বসূরিদেরও—জয়। তাই তিনি হেমন্তের গাছের পত্ররিক্ত রেখার মানেও বোঝেন—'you can see what lay under / confusing eloquence of green' ('The Sun Appears in November')—আবার শীতের পরে বসন্তের প্রায়-অলৌকিক আবির্ভাবকেও ছেলেমেয়েদের হাত ধ'রে স্বাগত জানান—'And you have to start living again when it wakes you' ('Resurrection')। তিনি বুঝেছেন যে পৃথিবীর অনেক কিছু জিনিসই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক; যা বেঁধে রাখে তা-ই হয়ে ওঠে অবলম্বন, যা আটকে রাখে তা-ই হয়ে দাঁড়ায় আশ্রয়। সাধারণ জীবনের প্রতি গভীর মমতা এবং শিল্পের সাধনায় উত্তীর্ণ হবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা দুই-ই প্রকাশিত হয়েছে নিচের আশ্চর্য লাইনগুলিতে :

Also that four-walled chrysalis
and impediment, home ;
that lamp and hearth, that easy fit
of bed to bone ;
those children, too, sharp witnesses
of all I've done.

My dear, the ropes that bind us
are safe to hold ;
the walls that crush us keep us
from the cold.

I know the price and still I pay it, pay it—
words, their furtive kiss,
illicit gold.

('The Price')

স্কটল্যাণ্ডের নৈসর্গিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব এ বইটির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অ্যানের পিতৃকুলে একটি স্কটিশ ধারা আছে। স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি খুঁজে পান দ্বিতীয় স্বদেশ। তার পাহাড়-সমুদ্র, উত্তুরে হাওয়া তাঁকে যেমন টানে, তেমন টানে সে দেশের মানুষ : এই আকর্ষণের নানান স্বাক্ষর বইটিতে ছড়িয়ে আছে।

আরও লক্ষণীয় তাঁর শৈলীর ক্রমবর্ধমান শুদ্ধি। তাঁর ভাষা এক দিকে গানের মতো সহজ, স্মরণীয়, ও ছন্দিত, অন্য দিকে চাঁছা, ধারালো, সাবলীল, সপ্রতিভ।

Blackbird, so old, so young, so
lucky to be stricken with a song
you can never choose away from.

('In the Orchard')

This sip of wine is yours,
this sieve of laughter. Yours,
too, these broken haloes
from my cigarette, these coals
that flicker when the salt wind howls
and the letter box blinks like a loud
eyelid over the empty floor.

I'll sent this, too, this gale between rains,
this wild day. Its cold is so cold
I want to break it into panes
like new ice on a pond ; then pay it
pain by pain to your account.

('After the End of It')

অনেক অনুশীলনের পর তিনি সত্যিই পৌঁছেছেন উপলব্ধি ও উক্তির সেই ঈপ্সিত অদ্বৈতে, যা স্বর্গের আভাস দিতেও অপ্রতিভ হয় না।

Reach Mallaig and discover
Heaven is real.
Herring stir the harbour
into haloes of seagulls, or else
birds in free, dissonant chorus
are themselves white angels.
('Mallaig Harbour Resembles Heaven in Spring Sunlight')

Try to forget about red.
Leave it to the professionals.
But perceive heaven as a density
blue enough to abolish the stars.
('Colours')

উঁচু মানের কবি হ'তে হ'লে যে আজীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন তার উজ্জ্বল উদাহরণ অ্যান স্টিভেনসন। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে আমি তাঁকে কতগুলি প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। টেপে ধ'রে রাখা সেই ইণ্টারভিউটি বাংলায় অনুবাদ ক'রে এখানে পেশ করছি।

[যদিও আমার ভূমিকা মুখ্যত প্রশ্নকারীর, তবু কদাচিৎ আমাদের সংলাপ ঠিক প্রশ্নোত্তরের মতো না হয়ে আলোচনার মতো হয়েছে। অতএব আমাদের দু'-জনকে আমাদের নামের আদ্য অক্ষরে চিহ্নিত করলাম।]

কে : আপনি কখন লিখতে শুরু করেন ?

অ্যা : চিরকালই লিখেছি বলা চলে। ছেলেবেলায় আমরা প্রত্যেক ক্রিসমাসে নাটক করতাম। নাটকটা আমিই লিখতাম। বাড়ির লোকেরা মিলে অভিনয় করতাম। তারপর স্কুলজীবনেও নাটক লিখেছি, একটা নাটক স্কুলে অভিনীত হয়েছিলো। কলেজ জীবনেও তাই করেছি। একবার একটা নৃত্যনাট্য লিখেছিলাম, সেটা নাচের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছিলো। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কলাসংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সে সময়ে আমি কবিতার চাইতে নাট্যশিল্প নিয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলাম।

কে : হয়তো সেজন্যেই আপনি পরবর্তীকালে 'করেস্‌পন্‌ডেন্‌সেস্‌'-এর মতো বই লেখার দিকে গেলেন।

অ্যা : আমারও তাই মনে হয়। আমি নাটক লেখায় ফিরে যেতে চাই। অবশ্য নাট্যকার হিসাবে কোনো পেশাদারী শিক্ষা আমার নেই। আমার মনে হয় যে আলাদা আলাদা কবিতার আঙ্গিকের ব্যাপারে আমি বড্ড বেশি জড়িত, মানে একজন নাট্যকারের সে ব্যাপারে যতখানি উৎসাহ থাকা উচিত আমার উৎসাহ তার চেয়ে বেশি। কিন্তু পরিণত বয়সে আমাকে একটা নাটক লিখতে হবে এরকম একটা সিদ্ধান্ত অনেক দিন যাবৎই লালন করছি। ছেলেবেলায় নাটক আমার প্রধান নেশা ছিলো। কিছু গল্পও লিখেছি। কবিতার সংখ্যা তাদের থেকে কম।

কে : অল্প বয়সে লিখতে শুরু করেছিলেন বলছেন, ঠিক কত ছোট ছিলেন ?

অ্যা : বারো-তেরো বছর বয়সে লেখা কিছু কবিতা এখনও কাছে রেখেছি। অবশ্য তার আগেও লিখতাম।

কে : বড় হয়ে উঠবার সময় আপনার উপরে উল্লেখযোগ্য কী কী প্রভাব পড়েছিলো মনে হয় ?

অ্যা : আমার বাবা আমাদের কবিতা প'ড়ে শোনাতেন। প্রত্যেক রাতে। মনে পড়ে আর্নল্‌ড্‌-এর সোহরাব ও রুস্তমের কাহিনী শোনার কথা— দারুণ ভালো লাগতো। তারপর ওয়াল্‌টার স্কটের কবিতা। বাবা খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। আমার ছন্দসচেতন কান আমি এভাবেই লাভ করেছি। যদি আমার নিজের ছেলেমেয়েদেরও কবিতা শোনায় উৎসাহিত করতে পারতাম !···

কে : জোরে জোরে কবিতা পড়াটা খুব দরকারী, তাই নয় কি ? অভ্যাসটা ছেলেবেলায় রপ্ত না হ'লে পরিণত বয়সে আসতে চায় না।

অ্যা : ঠিক।

কে : আপনি আপনার ছেলেদের কবিতা প'ড়ে শোনান কি ?

অ্যা : কবিতার ব্যাপারে ওরা বড্ড অধৈর্য। আপাতত শার্লক হোম্‌সে ওদের উৎসাহ বেশি !

কে : আমার পুত্রদের অবস্থাও তথৈবচ ! হতাশ লাগে।

অ্যা : আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আরেকটু বড় হ'লে আমার ছেলেরা কবিতাচর্চায়

আরও উৎসাহ দেখাবে। এখনও ছোট আছে। আমি অবশ্য বরাবর ওদের ছড়া প'ড়ে শুনিয়েছি।

কে : আমি নিজে কিন্তু খুব অল্প বয়স থেকে কবিতা পড়ায় উৎসাহী ছিলাম।

অ্যা : ঐ শুনিয়ে যেতে হয়—কবিতা, ছড়া। আমার মনে হয় আমার ছেলেরা যে কিঞ্চিৎ কবিতা-বিরোধী তার অন্যতম কারণ এই যে কবিতার জন্য আমাকে এত ঘরের বাইরে যেতে হয়।

কে.: হ্যাঁ, এটা একটা প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে। আপনার প্রিয় কবি কাঁরা, যাঁরা আপনাকে প্রভাবিত করেছেন?

অ্যা : আধুনিক কবিদের মধ্যে ইয়েট্‌স্‌কে আমার সর্বপ্রথমে ভালো লাগে। এককালে প্রচুর ইয়েট্‌স্ মুখস্থ ছিলো। এবং রবার্ট ফ্রস্ট। স্কুলজীবনে এঁরা ছিলেন আমার প্রথম-চেনা আধুনিক কবি। এখনও খুব ভালো লাগে এঁদের কবিতায় ফিরে আসতে। তার পরে ভালো লেগেছে ম্যারিয়ান্ মূর আর এলিজাবেথ বিশপের কবিতা*। এমিলি ডিকিন্‌সনের কবিতা প্রথমে ভালো লাগেনি; বেশি সলজ্জ, একটু যেন ন্যাকা—এরকম মনে হতো। কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে উনি একজন বড় কবি, চমৎকার কবি। তাছাড়া সাবেকী চালের কবিতাও আমি বেশ উপভোগ করতে পারি, যেমন মেকলে-র 'Lays of Ancient Rome'। হার্ডি আমার বেশ ভালো লাগে। ভালো লাগে অডেনকে, তবে প্রথম যৌবনে অডেনকে অত ভালো লাগতো না। এডওয়ার্ড টমাসকে খুব ভালো লাগে। ও হ্যাঁ, এককালে ডিলান টমাস আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। ছাত্রজীবনে ওঁর কবিতা রীতিমত ভালো লাগতো। তার পরে একটা বিতৃষ্ণা আসে। এখন আবিষ্কার করেছি যে ওঁর কবিতার ধ্বনি আমার ভালো লাগে। চেঁচিয়ে আবৃত্তি করার পক্ষে ওঁর কবিতা খুব উপযুক্ত।

কে : ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগের ব্যাপারে আপনি নিজেকে কতখানি মার্কিন এবং কতখানি ব্রিটিশ মনে করেন? একই সঙ্গে মার্কিন এবং ব্রিটিশ হওয়ার

* এলিজাবেথ বিশপের উপরে অ্যান বহুদিন আগে একটি বই লিখেছিলেন। নিউ ইয়র্ক থেকে ১৯৬৬ সালে সেটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক Twayne Publishers।

মধ্যে কোনো অসুবিধা আছে কি ? না কি আপনি মনে করেন আপনি এ দুয়ের মধ্যে একটি জগতেরই লোক, অন্যটির নন ?

অ্যা : আমার তো মনে হয় আমি দুই জগতের সুবিধাগুলিই পাই, অবশ্যই আর্থিক দিক দিয়ে নয় !···

কে : সে সুবিধাটা প্রবাসীদের ভাগ্যে সাধারণত জোটে না !

অ্যা : আমি এখনও নিজেকে মার্কিন ব'লে ভাবি—আমার প্রথম স্মৃতিগুলি সব আমেরিকার, আমেরিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব গভীর ।

কে : তাহলে আপনি নিজেকে কীভাবে চিহ্নিত করবেন. একজন প্রবাসী মার্কিন কবি হিসাবে, না একজন ইঙ্গ-মর্কিন কবি হিসাবে ? না কি এসব বর্ণবিভাগ আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়, তা-ই আপনার অভিমত ?

অ্যা : এক অর্থে এসব বর্ণবিভাগ সত্যিই অপ্রাসঙ্গিক। নিজের সম্বন্ধে আমার ধারণা এই : হ্যাঁ, আমি আমেরিকায় ফিরে যেতে চাই, কিন্তু সে বিষয়ে আমার কোনো তাড়া নেই। আমি দেখেছি যে স্কটল্যাণ্ডকে আমার খুব আপন ব'লে মনে হয় । তাছাড়া আমি অক্সফোর্ডেরও ভক্ত বটে ! বর্তমানে ব্রিটেনের আকর্ষণ এখানকার সব বন্ধুরা। আমেরিকায় সেরকম বন্ধুর দল এখন আর নেই ।···

কে : ফিরে গেলে আবার নতুন ক'রে বন্ধুত্ব পাতাতে হবে ?

অ্যা : কিছু বন্ধু আছে, কিন্তু তারা সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে। তাদের কাছ থেকে চিঠি পেতে ভালো লাগে, তাদের সঙ্গে দেখা হ'লে ভালো লাগে। কিন্তু ব্রিটেনে যাদের সঙ্গে ভাব হয়েছে তাদের সঙ্গে সর্বদা আদান-প্রদান চলছে, বিশেষত আমার এখানকার কবি-বন্ধুদের কথা ভাবছি। আমেরিকার কাব্যিক এস্‌টাব্লিশমেণ্টকে আমার মোটেও ভালো লাগে না—ভয়ানক প্রতিযোগী মনোবৃত্তি তাদের, এখানকারও বাড়া ।

কে : প্রতিযোগিতার সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কোথায় ?

অ্যা : প্রতিযোগিতায় নামতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমার ।

কে : আচ্ছা, এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ইংরেজ পরিবারের স্থান কোথায় ? ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে তারা সাহায্য করে কি ?

অ্যা : নিশ্চয়, তারা ইংরেজ, এবং নিজেকে ইংরেজ হিসেবে ভাবতে তারা আমাকে সাহায্য করে বৈ কি। যদিও তারা তাদের মার্কিন দিকটা সম্পর্কেও সজাগ। এক গ্রীষ্মে আমরা আমেরিকা বেড়াতে গিয়েছিলাম—ওদের এখনও মনে

আছে। ওরা জানে যে সেখানকার সঙ্গেও ওদের একটা যোগসূত্র আছে।

কে : 'করেস্‌পন্‌ডেন্‌সেস্‌'-এর কে বয়েড্‌ যদি খানিকটা আপনার নিজেরই মুখপাত্রী হন, তাহ'লে ঐ গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতায় আমেরিকা থেকে আপনার বিচ্ছিন্নতাবোধ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে একথা বললে কি ভুল ব্যাখ্যা করা হবে? যখন উনি বলছেন : 'But I didn't go back because I couldn't see what to come back to' অথবা 'It is America I can't contain'?

অ্যা : ঐ কবিতাটি লেখার সময় আমার মনোভাব ঠিক ঐরকমই ছিলো।

কে : আর পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে নিক্‌ আর্‌বাইটারের আনা অভিযোগগুলি?

অ্যা : ওখানে আমার পরিচয় ততটা নেই যতটা আছে হিপি ছেলেমেয়েদের পরিচয়।

কে : অর্থাৎ আপনার পরবর্তী একটি প্রজন্মের কথা বলা হয়েছে।

অ্যা : ঠিক তাই।

কে : সেজন্যই কি প্রতিবাদগুলি কে বয়েডের ছোট ভাইয়ের মুখে বসিয়েছেন?

অ্যা : আসলে ওখানে উঁকি দিচ্ছে আমার বোন! আমার আপন ভাই নেই।

কে : বোনের ছায়ায় ভাইয়ের চরিত্র গঠন করেছেন?

অ্যা : হ্যাঁ, আমার এই বোনটির অভিজ্ঞতা, ভাবনা-বেদনা আমার থেকে একেবারে আলাদা।

কে : আপনার চাইতে কতটা ছোট উনি?

অ্যা : তেরো বছরের ব্যবধান আমাদের মধ্যে।

কে : আচ্ছা? তাহ'লে উনি আমার চাইতেও ছোট।

অ্যা : ও সেই প্রজন্মের যে-প্রজন্মের ধ্যানধারণাগুলির মধ্য দিয়ে আমরা যাইনি।

কে : এ প্রসঙ্গটাই তুলতে চাইছি। এই যে বছর দশেকের ব্যবধান, এর মধ্যেই মেজাজের, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে যায় না কি?

অ্যা : অবশ্যই, ঐ দশ বছরের মধ্যে অনেক কিছুর অদলবদল হয়ে যায়, বিশেষত বর্তমান শতাব্দীতে। এই যেমন আমার বোনের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মানসিক অনিশ্চয়তা, গোটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া মূল্যবোধকে প্রত্যাখ্যান করা—এসবের মধ্য দিয়ে আমি ঠিক ওদের মতো যাইনি। এ-সব চিন্তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো তেমনভাবে যেমন হয়েছিলো

কে বয়েডের, অর্থাৎ বুর্জোয়া জীবনছন্দে আমি বাঁচতে পারছি না এই আবিষ্কারের মাধ্যমে, আর আমি ভেবেছিলাম যে আমি বাঁচতে পারছি না আমি নিজে অদ্ভুত এবং উৎকেন্দ্রিক ব'লে। অথচ ওটা অনেকের জীবনেই ঘটছিলো—বিত্তাধিক্য এবং জড়বাদের মাধ্যমে বঞ্চিত হবার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

কে : তাহ'লে সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথের মানসতার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী ?

অ্যা : এক অর্থে 'করেস্‌পন্‌ডেন্‌সেস্‌' সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথ্‌কে দেওয়া জবাব, আর কে বয়েড্‌ খানিকটা সিল্‌ভিয়া প্ল্যাথ্‌-জাতীয় চরিত্র···

কে : কিন্তু নম্রতর···

অ্যা : নম্রতর, এবং আত্মোপলব্ধিতে পরিণততর। আমি এটাই বোঝাতে চাইছি যে সে তার জীবনের সংকটময় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, এবং তার জীবন আবার চলতে থাকবে, থেমে থাকবে না। আবার শুরু হবে সব কিছু, নতুন ক'রে। সিল্‌ভিয়ার মানসতার মুশকিল এই যে সেটা একটা সুড়ঙ্গপথ, যার শেষ আত্মহননে, এবং সেটা কখনোই কবিতার প্রকৃত গতিপথ হ'তে পারে না।

কে : সিল্‌ভিয়ার ঢঙে লিখছেন এমন কবি এখনও আমেরিকায় আছেন না কি ?

অ্যা : সিল্‌ভিয়ার মৃত্যুর পরে তার ঢঙের অনুকারী কবিদের একটা বিরাট ঢেউ এসেছিলো—তার এবং অ্যান সেক্সটনের স্টাইলের অনুকরণের ঢেউ। অ্যান সেক্সটন আর সিলভিয়া প্ল্যাথ্‌ ছিলো দুই বন্ধু। দু'জনেই ছিলো রবার্ট লোয়েলের শিষ্যা। লোয়েল, অ্যান সেক্সটন, সিলভিয়া প্ল্যাথ্‌, এবং আরও কোনো কোনো কবি, যাঁদের আমি চিনতাম, যেমন ক্যাথি স্পিভ্যাক্‌,—এঁরা সবাই স্নায়বিক অসুস্থতাকে এমনভাবে পুজো করতেন যেন সেটা ইষ্ট বস্তু—ভারি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ব্যাপার।

কে : সিল্‌ভিয়ার কবিতা পড়তে পড়তে প্রায়ই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে : কেন এই বিকারপ্রীতি ?

অ্যা : কেন জীবন এত কঠিন, এত দুঃসহ হয়ে পড়েছে ? 'করেস্‌পন্‌ডেন্‌সেস্‌'-এ ঠিক ঐ প্রশ্নটাই আমি তুলতে চেষ্টা করেছিলাম। পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে অপরাধবোধের এবং আত্মমগ্ন অবস্থার একটা পটভূমিকা সেখানে বর্তমান। আমেরিকার মানুষ নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত

যে কি বলবো ! সবাই এত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ! ঐ কবিরা প্রত্যেকে অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষী—প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ কবি হ'তে চায় !

কে : সিল্‌ভিয়ার মধ্যে এই বাসনাটা স্নায়বিক উৎকণ্ঠায় পর্যবসিত হয়েছিলো।

অ্যা : সব কিছুতেই অন্য সবাইকার চাইতে ভালো হ'তে হবে এরকম একটা জেদ ওর ছিলো। ব্রিটেনে এসে সে মোহটা আমার ঘুচে গেছে। এখন যখন আমার মার্কিন জীবন সম্বন্ধে ভাবি, তখন মনে হয় : সত্যিই কী হাস্যকর এ ধরনের দুরাকাঙ্ক্ষা ! নিজের একান্ত ব্যক্তিগত সাফল্যে বা অসাফল্যে তেমন কিছু এসে যায় না, অথচ সাফল্যের লোভকে জয় করা সহজ নয়। এটা ঠিক যে আমেরিকায় আমি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, শ্রেষ্ঠ হওয়া আমার লক্ষ্য ছিলো। এবং ঐ স্নায়বিক উদ্‌বেগটাকে বাগে আনার জন্য, সেটাকে জয় করার জন্যই 'করেস্‌পন্‌ডেন্‌সেস্‌' লিখেছিলাম। ঐ সৃষ্টিক্রিয়া আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছিলো।

কে : 'করেস্‌পন্‌ডেন্‌সেস্‌' প'ড়ে এক দিক দিয়ে আমি ঈর্ষান্বিতই হয়েছিলাম, কারণ ঐ রকম আঙ্গিকে কিছু একটা লেখার ইচ্ছা আমার নিজের ছিলো—অনেক দিন থেকেই !

অ্যা : লিখুন না !

কে : বা রে, আপনি যে আগেভাগে এত সুন্দরভাবে লিখে বাজিমাৎ ক'রে এলেন ! অবশ্য রীতিটা বাংলায় প্রবর্তন করা চলে !

অ্যা : নিশ্চয়, ওটা এখন চলতি আঙ্গিক।

কে : এবং নারীদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত, কারণ এটা তাদের কথা বলতে—প্রাণ খুলে কথা বলতে—অবাধ সুযোগ দেয় ! ডায়েরি, স্মৃতিকথা, চিঠি—এই তিনে মিলে সাহিত্যের একটা শাখা যেখানে মেয়েদের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। ফদারগিল্‌-এর ডায়েরি-সমীক্ষা থেকে এই তথ্যটাই বেরিয়ে আসে।* বইটা আমি পড়েছিলাম নিজের গবেষণার ব্যাপারে। সে ক্ষেত্রেও আবিষ্কার করেছিলাম যে ভারত বিষয়ে কত সুন্দর সুন্দর ডায়েরি, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, স্মৃতিকথা, বা চিঠিপত্র ইংরেজ মহিলারা লিখে গেছেন। এখন

* দ্রষ্টব্য : Robert A. Fothergill, *Private Chronicles, A Study of English Diaries*, অক্সফোর্ড য়ুনিভর্সিটি প্রেস; ১৯৭৪।

মধ্যে মধ্যে শুনতে পাই যে এই শাখাই নাকি হবে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চারণভূমি। উপন্যাস-টুপন্যাস আর লেখা হবে না। তার বদলে আসর জমাবে মেয়েদের লেখা ডায়েরি!

অ্যা: আমি ভেবেছিলাম আইডিয়াটা মন্দ নয়! অথচ 'করেস্‌পন্‌ডেন্‌সেস্‌' তেমন স্বীকৃতি পায়নি।

কে: আমার তো দারুণ ভালো লেগেছে, সত্যিই উপভোগ করেছি।

অ্যা: আমেরিকায় বিশেষ স্বীকৃতি পায়নি। অনেকেই পড়েনি। যখন কেউ বইটি সত্যিই পড়ে, তখন অবশ্যই প্রশংসা করে।

কে: বইটির আঙ্গিক বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে আমাকে—খুঁটিনাটিগুলোকে যেভাবে জোড়া দেওয়া হয়েছে এবং পরস্পরসংলগ্ন অবস্থায় রাখা হয়েছে, যেভাবে একটা প্লট তৈরি করা হয়েছে, চরিত্রদের অন্যোন্য সম্পর্ককে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এসব। এবারে আমার পরবর্তী প্রশ্নে আসতে চাই। আপনার বোন, নিক্‌ আর্‌বাইটার, গায়িকা জোন্‌ বায়েজ্‌, এঁদের প্রজন্মের মধ্যে যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক কমিটমেণ্ট দেখতে পাই তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার স্থান কোথায়?

অ্যা: এই প্রজন্মটি সম্পর্কে আমার মতামত এই যে এঁদের কমিটমেণ্ট প্রায়ই নঙর্থক, সদর্থক নয়, অর্থাৎ এঁরা যে কিসের বিরুদ্ধে তা এঁরা জানেন, কিন্তু এঁরা যে কিসের স্বপক্ষে সে সম্বন্ধে প্রায়ই এঁদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই।

কে: উদাহরণস্বরূপ, এঁরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে···

অ্যা: যুদ্ধের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু এসবের বদলে ঠিক কী ধরনের সমাজ কাম্য সে সম্বন্ধে এঁদের চিন্তাধারা পরিষ্কার নয়। এঁদের চিন্তায় এমন একটা বিশৃঙ্খলা, এমন একটা অরাজকতা আসে, যার ফলে এঁদের প্রচেষ্টা সফল হ'তে পারেনি। উল্‌টে আমেরিকায় এক ধরনের রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়েছে: চাকরী-বাকরীর জন্য লোকে অসম্ভব খাটছে, প্রতিযোগী মনোভাব অনেকগুণ বেড়ে গেছে। কাজেই আমার নিজের মতামত মোটামুটি একরকমই রয়ে গেছে। বলা চলে যে আমার পক্ষে যতটা অজড়বাদী হওয়া সম্ভব আমি ঠিক ততটাই, অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধিতে যতখানি গ্রাহ্য ততখানি, তার বেশি নয়। উদাহরণ-স্বরূপ, আমি লিখতে চাই, লেখার জন্য সময় চাই। সেই সময়টুকু ক'রে নিতে হ'লে গৃহস্থালির কাজ দ্রুততর করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি তো লাগবেই।

কে : প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণের বিরুদ্ধে আপনি তো রীতিমত সোচ্চার।

অ্যা : হ্যাঁ, ঐ ব্যাপারে আমার কমিটমেণ্ট খুবই দৃঢ়।

কে : আপনার আর কোনো দৃঢ় কমিটমেণ্ট আছে কি ?

অ্যা : পৃথিবীর জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতিকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন আছে, একথা আমি মানি। আমাদের সময়ে এ দু'টি বিষয়ই অত্যন্ত জরুরী। তা ছাড়া পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার ব্যাপারেও আমার আন্তরিক কমিটমেণ্ট আছে।

কে : তাহ'লে এক অর্থে আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কমিটমেণ্টগুলির মধ্যে অনেক ক'টিই আপনারও কমিটমেণ্ট।

অ্যা : নিশ্চয়ই।

কে : যদিও আপনি হয়তো সেগুলিকে তাঁদের মতো চেঁচিয়ে ব'লে বেড়ান না।

অ্যা : ঠিক। একটা বিষয়ে আমার মত খুব দৃঢ় : নারীমুক্তির ব্যাপারটাকে আমাদের সময়কার সব থেকে জরুরী ব্যাপার ব'লে মনে হয় না আমার।

কে : ঠিক এ বিষয়েই আপনাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। নারী-আন্দোলন সম্পর্কে আপনার মতামত কী ? অর্থাৎ আপনার সূক্ষ্ম মতামত কী তা জানতে চাইছি। নারীদের স্বাধিকার থাকা উচিত ইত্যাদি মোটা কথা-গুলো আপনি যে মেনে নেন তা ধ'রেই নিচ্ছি।

অ্যা : হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি যে বর্তমান সময়ে এমন অনেক সুযোগসুবিধা মেয়েদের আয়ত্তে এসেছে যা আগে আদৌ প্রাপণীয় ছিলো না। কখনো কখনো আমরা বিশেষাধিকার ভোগ ক'রে থাকি বললে ভুল হবে না। কিন্তু পারিবারিক জীবন ঠিক কীভাবে নিয়ামিত হবে এটাই ভবিষ্যতে একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে ব'লে মনে হয় আমার। আমার নিজের এমন একটা পর্যায় গেছে যখন আমি পরিবারের আইডিয়াটা বর্জন করে-ছিলাম।

কে : সত্যিই ?

অ্যা : হ্যাঁ, সত্যি করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি মনে করি যে আমাদের সামনে অন্য কোনো বিকল্প নেই। খণ্ডকালীন কাজের মাধ্যমে, সহযোগিতার মাধ্যমে, যেভাবেই হোক না কেন, পুরুষদের এবং মেয়েদের একটা গার্হস্থ্য ব্যবস্থার বোঝাপড়ায় পৌঁছতেই হবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে সন্তানপালনই হচ্ছে বিবাহ বা পরিবার-নামক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ও ভূমিকা। সন্তানপালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা সমাজে রাখতেই হবে। এই

যেমন এখন শিক্ষা ব্রিটেনে সংকটাপন্ন অবস্থায়—এ ক্ষেত্রে পুরুষদের এবং মেয়েদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। কাজেই নারী-আন্দোলনের যে দলগুলি এসব ব্যাপারকে পাত্তা দেয় না তাদের সঙ্গে আমি নিজেকে মেলাতে পারি না।

কে : হ্যাঁ, কোনো কোনো দল আছে যারা সন্তানপালন ব্যাপারটিকে একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছে; তাদের পরিকল্পনায় শিশুদের কোনো স্থানই নেই।

অ্যা : তারা শিশুদের দেখে বোঝা হিসেবে, অনিবার্য দায়িত্ব হিসেবে নয়। তাদের চোখে বাচ্চা মানুষ করা একটা কাজের মতো কাজই নয়, মা হওয়ার কোনো সার্থকতাই নেই, অন্য কিছু করা উচিত, ইত্যাদি।

কে : জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে এরা পরস্পরসংশ্লিষ্ট অবস্থায় দেখতে পারেনি, ফাঁক রয়ে গেছে।

অ্যা : কাজেই মা হবার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়ে এটুকু জানি যে সন্তান-পালন একটি গুরুদায়িত্ব, একটি কঠিন কাজ। আর জনক ও জননী উভয়কেই বহন করতে হবে এই বিরাট দায়িত্ব, বিশেষত আমাদের এই আজকের দুনিয়ায়, যেখানে এত অবাধ স্বাধীনতা। ছোটদের ব্যবহার কেমন হবে, তারা কী আদর্শ বা নীতি অনুসরণ করবে, এসব ব্যাপারে কোনো সাধারণ-গ্রাহ্য নিয়ম আর চালু নেই। কাজেই এগুলি বড় বড় প্রশ্নচিহ্নে, বিতর্কিত বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছে। মেয়েদের স্বাধীনতার সঙ্গে এসব প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্বের সঙ্গে এদের অনেক বেশি যোগাযোগ।

কে : আপনার অন্যান্য কাজকর্মের সঙ্গে মাতৃত্বের সমন্বয় করতে গিয়ে নানান ব্যবহারিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন কি?

অ্যা : অবশ্যই হয়েছিলাম। সবাই হয়।

কে : আপনি যখন ডাণ্ডীতে ছিলেন তখন আপনার বাচ্চারা কোথায় ছিলো?

অ্যা : ওরা আমার কাছে ছিলো না!···

কে : এখানে, অক্সফোর্ডে ছিলো?

অ্যা : এখানে ছিলো। যখন বাচ্চারা আমার কাছে নেই তখনই আমার সব থেকে ভালো লেখাগুলো আমার হাত থেকে বেরিয়েছে।

কে : তাহ'লে এ ব্যাপারটার একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দিক রয়েছে একথা মানেন কি?

অ্যা : সর্বান্তঃকরণে মানি। বাড়ির বাইরে কাজ করতে বেরোলেই বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য কাউকে নিযুক্ত করতে হয়, দু'টো কাজ তো আর একসঙ্গে করা যায় না।

কে : হ্যাঁ, খুবই কঠিন এই বিভিন্ন দায়িত্বের সমন্বয়।

অ্যা : অত্যন্ত কঠিন। আপনি নিজেও নিশ্চয় এসব উপলব্ধি করেছেন।

কে : করেছি ব'লেই এ বিষয়ে আপনার মতামত জানবার কৌতূহল ছিলো। আপনার কবিতায় বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাববস্তু। বস্তুত, আপনার কবিতায় বিবাহ আর মাতৃত্ব যে দু'টি পৃথক্ ভাববস্তু তা বললে ভুল হবে না। আপনার মানসেও এই পার্থক্য বর্তমান কি, অর্থাৎ স্ত্রী হবার অভিজ্ঞতা আর মা হবার অভিজ্ঞতা এ দু'টোকে আপনি কি আলাদা ক'রে দেখেন ?

অ্যা : হ্যাঁ, আলাদা ক'রেই দেখি বোধ হয়।

কে : আপনার কবিতায় দু'টি পৃথক থীমের সহাবস্থিতি সুস্পষ্ট।

অ্যা : হ্যাঁ, নিশ্চয়, ভালোবাসার থীম আর শিশুদের থীম এ দুটো আলাদা বৈ কি। কারণ মানুষের পারিবারিক জীবন ঠিক রোম্যান্টিক প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—অন্তত আমার তাই মত। যৌবনে আমরা যতই ভাবি না কেন যে বিয়ে করবো এবং সেটাই জীবনের রোম্যান্টিক সম্পর্ক হবে, বিয়ের পরে ঐ রোম্যান্টিক আদর্শটা বজায় রাখা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। রোম্যান্টিক আকর্ষণের ব্যাপারটা যে অনেক দিক থেকেই এক রকমের মায়ার ছলনা তা তো আমরা মনে মনে জানিই।

কে : বিয়ের আগে ঠিক বোঝা যায় না।

অ্যা : পরে বোঝা যায়। ভালোবাসা ব্যাপারটাই একটা মায়ার খেলা। আপনি যাকেই বিয়ে করুন না কেন, পৌঁছবেন ঠিক সেই···

কে : একই কাহিনীতে !

অ্যা : ঠিক। ঘুরে ফিরে সেই একই সমস্যাগুলো দেখা দেবে : সন্তানপালনের সমস্যা, নিজের পূর্ণতাপ্রাপ্তির সমস্যা, অন্য আরেকজন মানুষের সঙ্গে একত্র বাস করার সমস্যা, দু'জন মানুষের দু'রকমের ইচ্ছার দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি। এ কারণে যা শুধুমাত্র রোম্যান্টিক প্রেমের সম্পর্ক তা সম্পর্কে আমি কিঞ্চিৎ সন্দেহ পোষণ করি, খানিকটা শ্লেষাত্মক না হয়ে পারি না।

কে : মাতৃত্বের বেদনার কথা আপনি অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, বিশেষত

'জেনারেশনস্' কবিতাটিতে। এটা কি একটা সাময়িক মেজাজ, না কোনো স্থায়ী বিশ্বাস ?

অ্যা : অংশত ওটা একটা সাময়িক মেজাজ ছিলো, কিন্তু এ কথা আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে ঠিক স্ত্রীর ভূমিকার মতোই মায়ের ভূমিকাও কখনোই পুরোপুরি সুখী নয়, দ্ব্যর্থক। এবং যেহেতু সেটা কোনো নিখুঁত আদর্শ নয়, সেহেতু তার জন্য বাঁচা এবং লড়াই করা সত্যিই অর্থবহ। দ্বন্দ্ব এড়িয়ে বাঁচা যায় এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। মরজীবন যে কখনো স্বর্গোদ্যানের মতো হ'তে পারে তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এ জীবন হলো পাপক্ষালনের, শুদ্ধির প্রেতলোক !

কে : কিন্তু স্বর্গের আভাস মেলে কখনো কখনো !

অ্যা : আভাস মেলে। ঐ আভাসটুকুই মেলে ! এবং জীবনের সমস্যাগুলি, সংকটগুলি যখন একে একে উদিত হ'তে থাকে, তখন তাদের সম্মুখীন হ'তে পারলে তাদের সমস্যা বা সংকট ব'লে চিনতে পারলে মানুষ যোগ্যতর হয়ে ওঠে।

কে : স্কটল্যাণ্ডকে আপনি একটু বিশেষভাবে ভালোবাসেন, তাই নয় কি ?

অ্যা : স্কটল্যাণ্ডে আমি সত্যিই খুব সুখী ছিলাম।

কে : কোনো পারিবারিক সংযোগ আছে কি ?

অ্যা : হ্যাঁ, স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের বংশের যোগ আছে। তা ছাড়া সমুদ্রের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ।

কে : কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কে আপনার কোনো বিশেষ মতামত আছে ?

অ্যা : আমার মনে হয় যে ভাবের থেকে আঙ্গিক জন্ম নেয়, কবিতার আইডিয়াটাই ফর্মকে সৃষ্টি করে। এজরা পাউণ্ড বলেছিলেন যে কোনো কোনো কবিতা পাত্রে ঢালা তরল পদার্থ, আধার অনুসারে তাদের আকার, আবার কোনো কোনো কবিতা গাছপালার মতো তাদের স্বাভাবিক আকৃতি খুঁজে পায়, গজিয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে আমি ওঁর সঙ্গে একমত।

কে : মূল অভিজ্ঞতাটাই আঙ্গিক সম্পর্কে নির্দেশ দেয়।

অ্যা : হ্যাঁ, কোনো কোনো কবিতাকে বেশ চমৎকারভাবেই ঐতিহ্যগত আঙ্গিকের মধ্যে বেঁধে ফেলা যায়, উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো আইডিয়ার পুনরাবৃত্তি দরকার তখন। কিন্তু যখন শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য আঙ্গিকের ব্যবহার, তখন আমি বাঁধা-ধরা ফর্মের বিরোধী। যখন কোনো শব্দকে শুধু মিলের

বা পাদপূরণের খাতিরে ব্যবহার করা হয় তখন তা অর্থরহিত হয়ে পড়ে, কবিতাকে অন্তঃসারশূন্য ক'রে ফেলা হয়।

কে : অনেক ধন্যবাদ। প্রশ্নের শেষ নেই, আরও অনেক প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিন্তু এক সময় না এক সময় থামতেই হবে। এখানেই থামছি।

যীশু কে ছিলেন ?

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হেনরি মার্টিন নামে এক ইংরেজ মিশনারি জাহাজে ক'রে ভারতে আসছিলেন। জাহাজেই শুরু ক'রে দিলেন ধর্মপ্রচারের কাজ। ভারতীয় লস্করদের প্রশ্ন করলেন যে যীশু কে ছিলেন তা তাঁরা জানেন কি না। তাঁদের নেতিবাচক জবাবের পর মার্টিন তাঁদের জানালেন যে যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন পাপীদের ত্রাণ করতে। খালাসীরা পরস্পরের মুখে চাওয়াচাওয়ি ক'রে হেসে বলেছিলেন, 'বটে, বটে ?'[১]

প্রাতিষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্মে যীশুর স্থান শুধু একজন গুরু, নীতিশিক্ষক, ধর্মপ্রচারক বা ধর্মপ্রতিষ্ঠাতার নয় : যীশু স্বয়ং ঈশ্বর, পুত্ররূপী ঈশ্বর, ঈশ্বরের একমাত্র গ্রাহ্য অবতার, যিনি পতিত মানবজাতির ত্রাণার্থে কুমারী মেরীর গর্ভ থেকে জন্মলাভ ক'রে অনেক অলৌকিক কর্মকাণ্ডের পর ক্রুশকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, মৃত্যুর পর কবর থেকে সশরীরে উঠে এসেছিলেন, স্বর্গাধিরোহণ করেছিলেন, এবং যাঁকে শেষ বিচারের দিনে গরীয়ান্ ও জ্যোতির্ময় অবস্থায় পিতৃরূপী ঈশ্বরের পাশে সমাসীন দেখা যাবে। এই মহাজাগতিক কাহিনীটি যে ঐতিহাসিক নয়, পৌরাণিক, অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে এই গল্পটির যে মূলত কোনো তফাৎ নেই, এ কথা অখ্রীষ্টানরা বলছেন আজ কয়েকশ' বছর যাবৎ, কিন্তু গোঁড়া খ্রীষ্টানরা কর্ণপাত করেননি। যীশুকে আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বর ব'লে মেনে নিতে হবে, এটাই তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী দাবি ক'রে এসেছেন, এবং এ ব্যাপারে ইহুদী-মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের মতামতের সঙ্গে আপস করতে রাজী হন-নি, তাবৎ অখ্রীষ্টান দুনিয়ার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন। ভারতবর্ষ, যেখানে ধর্ম নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা কম হয়নি, যেখানে গুরু এবং দেবতা অগুনতি, অবতার এবং পুরাণ বহুসংখ্যক, পৌরাণিক ব্যাপারস্যাপার যেখানে বিশেষ পরিচিত,

১. হেনরি মার্টিনের ডায়েরি ও চিঠিপত্র '*Journals and Letters of the Rev. Henry Martyn*' নামে ১৮৩৭ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪৩ দ্রষ্টব্য।

সেখানকার মানুষ যীশুর নীতিশিক্ষাকে শ্রদ্ধা করতে রাজী হয়েছে বরাবরই, কিন্তু তিনি যে মুক্তির একক উপায় তা মেনে নিতে পারেনি। মানুষ গুরুদের দেবত্ব-প্রাপ্তি আমাদের কাছে এত পরিচিত ঘটনা যে যীশুর ব্যাপারটা যে কোনো আলাদা পর্যায়ে পড়ে তা আমাদের মনে হয়নি। হেনরি মার্টিনও তাই দেখে-ছিলেন যে হিন্দু পণ্ডিতরা যীশুর নীতিশিক্ষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কিন্তু যীশুকে মোক্ষের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গণ্য করতে প্রস্তুত নন। সবাই গুরুকে দেবতা বানায়, এবং খ্রীষ্টানরাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন, এ কথাই বলেছিলেন তাঁরা মার্টিনসাহেবকে।[১]

আমাদের এই বিচারকে কত না অবজ্ঞা করেছেন খ্রীষ্টান দুনিয়ার মুখপাত্রেরা। হিন্দুশাস্ত্রের অধিকাংশই 'মিথ্', কিন্তু খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র নাকি সর্বাংশে তথ্য, এই ভারসাম্য-বর্জিত মতই তাঁরা বার বার ঘোষণা করেছেন। অথচ কাল নিরবধি এবং পৃথ্বী বিপুলা। খ্রীষ্টীয় ভাবমণ্ডল মধ্যযুগের ইয়োরোপে যেমন জোরদার ছিলো তেমনটি নেই বেশ অনেক দিন থেকেই। রেনেসাঁস-রেফর্মেশন, অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানচর্চা, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অনুশীলন, অখ্রীষ্টান দুনিয়ার প্রকৃত উদ্‌ঘাটন, মার্ক্সবাদ-জাতীয় নিরীশ্বর দর্শনের আক্রমণ—এসবের ঘা খেয়ে ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে খ্রীষ্টানদের বিশিষ্ট বিশ্বাসবোধ, যদিও কিছু কিছু ভক্ত ও পুরোহিত তাকে এখনও আঁকড়ে আছেন। এটা অবধারিত ছিলো যে আধুনিক ইতিহাসচর্চার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরই গবেষণার আলোয় যীশুর প্রকৃত স্বরূপ একদিন না একদিন নির্ধারিত হবে। হয়েওছে তাই। সাধারণ মানুষদের অলক্ষে পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় ঘ'টে গেছে যীশুসংক্রান্ত চিন্তাধারার একটি আমূল পরিবর্তন, প্রাক্তন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে যাকে একটি ছোটখাট বিপ্লব বললে অত্যুক্তি হবে না। সম্প্রতি ব্রিটেনের বি. বি. সি. টেলিভিশনে দু'জন ধর্মবিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়, এবং সেই অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ দু'জনের লেখা একটি বই বি. বি. সি.-র প্রকাশনী সংস্থার তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[২] লেখক দু'জনের মতে, এই নতুন জ্ঞান এত গুরুত্বপূর্ণ যে তাকে আর

১. মার্টিনের পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২, ২৬–২৭, ৭৭ দ্রষ্টব্য।

২. Don Cupitt and Peter Armstrong, *Who was Jesus ?*; প্রকাশক : বি. বি. সি., লণ্ডন, ১৯৭৭; দাম দু' পাউণ্ড পঁচিশ পেন্সি।

বিশেষজ্ঞগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা যায় না, তাকে সাধারণ্যে প্রকাশ করার সময় এসে পড়েছে।

পণ্ডিতী গবেষণার যেসব ফলাফল বইটিতে প্রকাশিত হয়েছে তা যুগান্তকারী ; তাতে এতদিনকার পরিচিত প্রাতিষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্মের দাবিদাওয়ার অবসান ঘটলো এবং যীশু সম্পর্কে অখ্রীষ্টান দুনিয়া বরাবর যে রায় দিয়ে এসেছে তার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হলো। এই নতুন জ্ঞানের সারাংশকে বাঙালী পাঠকদের কাছে পরিবেশন করার তাগিদেই এই প্রবন্ধের জন্ম। প্রধানত আলোচ্য গ্রন্থটিকেই অনুসরণ করছি, তবে বাঙালী পাঠকদের কাছে বক্তব্যকে পরিষ্কার করার চেষ্টায় কোনো কোনো ভাববস্তু বা দৃষ্টান্তকে সম্প্রসারিত করতে হয়েছে, বা কোথাও কোথাও ভারতীয় তুলনার সূত্রপাত করতে হয়েছে। মধ্যে মধ্যে যোজিত হয়েছে আমার নিজের কিছু প্রতিক্রিয়া, কিছু প্রশ্ন। পরিশেষে, লেখক দু'জন তাঁদের উপসংহারে যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন সেগুলির কোনো কোনো অংশকে সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছি।

লেখকদ্বয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য 'যীশু কে ছিলেন ?' এই প্রশ্নটির সদুত্তর সন্ধান, যীশু' নামটির পিছনে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য এবং কতখানি পৌরাণিক কাহিনী লুকিয়ে আছে তার একটা হিসাব-নিকাশের চেষ্টা। এই প্রচেষ্টা বর্তমান যুগে যতটা সার্থক হ'তে চলেছে অতীতে তার সত্যিই সম্ভাবনা ছিলো না। তার কারণ এই যে প্রথমত যীশু যে দুনিয়ায় বাস করেছিলেন প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে তার চমৎকারী উদ্ঘাটন হচ্ছে, এবং দ্বিতীয়ত এ যুগেই প্রথম সম্ভব হলো ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতা, যা ছাড়া ঐতিহাসিক যীশুর পুনরুদ্ধার করতে যাওয়া শুধু পণ্ডশ্রম নয়, হাস্যকরও বটে। গোটা বাইবেল, বিশেষত নিউ টেস্টামেণ্ট, এবং তারও মধ্যে 'সুসমাচারগ্রন্থ' চারটিকে আধুনিক ইতিহাসবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে খুঁটিয়ে পড়া, এ কাজে ভাষাতত্ত্বের সাহায্য নেওয়া, ঐ গ্রন্থগুলির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের সঙ্গে ইহুদী এবং অনিহুদী প্রাচীন জগতের সাক্ষ্য তথা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলিকে মিলিয়ে দেখা, এভাবেই চলেছে সত্য এবং পুরাণের জট ছাড়ানোর চেষ্টা।

লেখকরা না বললেও এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই ঘটনাচক্রের একটি রাজনৈতিক নিয়ামক আছে। আধুনিক রাষ্ট্র ইস্রায়েলের পত্তন না হ'লে এ গবেষণা সম্ভব হতো না। ঠিক যেমন, আমার মনে হয়, প্রাচীন ইস্রায়েলের পতন না ঘটলে হতো না ইহুদী ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র কোনো খ্রীষ্টীয় ধর্মের অভ্যুত্থান। রোমান

সৈন্যদের হাতে প্রাচীন জেরুজালেমের পতন হয় ৭০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইহুদী জাতি স্বায়ত্তশাসনবঞ্চিত, পৃথিবীর নানা দেশে বিকীর্ণ। জেরুজালেমে ইহুদীদের প্রবেশও নিষিদ্ধ ছিলো। এটা ভাবা অসংগত হবে না যে এসব ঘটনা না ঘটলে যীশু কালক্রমে ইহুদীদের অন্যতম পয়গম্বর ব'লে স্বীকৃতি পেতে পারতেন এবং ওল্ড টেস্টামেণ্টে স্থান পেতেন। কিন্তু তার বদলে ইহুদী সমাজের এই নির্ভীক সমালোচকের নামকে ঘিরে গ'ড়ে উঠলো সম্পূর্ণ আলাদা আরেকটি ধর্ম। এই এত দিন পরে 'নিকট প্রাচ্যে' ইহুদী শাসনের একটি ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। ঐতিহ্যগর্বিত ইহুদীদের পক্ষে এত দিন বাদে সম্ভব হয়েছে পুরাতত্ত্বের স্থানীয় 'ফীল্ড ওয়ার্ক'। ইহুদীরা পৃথিবীতে তাদের বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে, আর তারা খ্রীষ্টানদের করুণা, অবজ্ঞা, বা বিদ্বেষের পাত্র নয়। খ্রীষ্টান এবং ইহুদী পণ্ডিতদের সমবেত প্রচেষ্টায় উচ্চস্তরের ঐতিহাসিক গবেষণা তাই আমাদের যুগেই সম্ভব হলো।

বর্তমান শতকের গোড়াতে জার্মানীর কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী এই মত প্রকাশ করেন যে যীশু আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, সম্পূর্ণই কল্পিত পৌরাণিক চরিত্র। প্রাচীন জগতে অবতারবাদের প্রাবল্যের ফলেই নাকি যীশুসংক্রান্ত গোটা কাহিনীটির জন্ম হয়। এই মত অনুসারে সুসমাচারগ্রন্থগুলি উপন্যাসধর্মী সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। তরুণ লেনিন এই চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং এই মতবাদ সাম্যবাদী সোভিয়েৎ দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্গত হয়ে পড়ে।

কিন্তু আধুনিক গবেষণা বলছে যে সব সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখলে এটাই প্রতিভাত হয় যে যীশু নামে একজন ইহুদী ধর্মগুরু সত্যিই দেহধারণ করেছিলেন। সাক্ষ্য আসে সন্ত পলের রচনাবলী থেকে, যা খ্রীষ্টের মৃত্যুর আঠারো থেকে তিরিশ বছর পরে রচিত; আসে বিশাল ইহুদী গ্রন্থ 'তাল্‌মুদ্' থেকে, যার মধ্যে ইহুদীরা তাদের প্রাচীন রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যাবার পর তাদের নানান ঐতিহ্য, প্রবাদ, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি ধ'রে রাখতে চেষ্টা করেছিলো; আসে আনুমানিক ৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইহুদী ইতিহাসবিদ্ ফ্লাভিয়ুস্ যোসেফুস্-এর 'ইহুদীদের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে; আসে রোমান পণ্ডিত তাসিতুস্-এর লেখায় প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থেকে। দেখা যাচ্ছে যে ১১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাসিতুস্ খবর রাখেন যে রোমান সম্রাট তিবেরিয়ুস্-এর রাজত্বকালে এবং খ্রীষ্টাব্দ ২৬ থেকে ৩৬ সাল পর্যন্ত যিনি জুডিয়া অঞ্চলে রোমান শক্তির প্রতিনিধি ও প্রশাসক ছিলেন সেই পন্তিয়ুস্ পিলাতুস্-এর আদেশে খ্রীষ্টের প্রাণদণ্ড হয়, এবং সেই খ্রীষ্টের নামে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। ৬৪ সালে রোমে আগুন লাগার

পরে সম্রাট নীরো নাকি ইচ্ছে ক'রে দোষ চাপান খ্রীষ্টানদের ঘাড়ে; খ্রীষ্টানরা তখন রোমে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, এবং মোটেও জনপ্রিয় নয়। খ্রীষ্ট-সম্পর্কে এই উল্লেখটি তাসিতুস্ করেছেন নীরোর রাজত্বকাল পর্যালোচনা করতে গিয়ে। লক্ষণীয় এই যে আনুমানিক যে সময়ে খ্রীষ্টের প্রাণদণ্ড হয় তিবেরিয়ুসের রাজত্বকালের ঠিক সেই বছরগুলিরই কোনো বিবৃতি তাসিতুসের গ্রন্থে আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। এ থেকে অনুমান করা যায় যে তাসিতুস্ খ্রীষ্ট-সম্পর্কে কোনো অপ্রিয় মন্তব্য করেছিলেন, এবং মধ্যযুগীয় যে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা তাসিতুসের পুঁথির প্রতিলিপি করেছিলেন তাঁরা ঐ অংশটি একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। জোসেফুসের পুঁথিতেও লিপি-কররা অনেক অদলবদল করেছেন।

লাতিন ও হিব্রু সাহিত্যে এ প্রসঙ্গে আরও কিছু কিছু উল্লেখ আছে, তবে সব থেকে চাঞ্চল্যকর খবর এই যে সুসমাচারগ্রন্থাবলী ও জোসেফুসের পুরাবৃত্তে ইহুদী সমাজ ও সংস্কৃতির যে চিত্র, জেরুজালেম অঞ্চলের যে ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায়, আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের খোঁড়াখুঁড়িতে সেই লুপ্ত জগৎটাকে আবার ফিরে পাওয়া গেছে। ভৌগোলিক অনুপুঙ্খ, স্থাপত্য, বাড়িঘর, ঘটিবাটি, মুদ্রা—সব হুবহু মিলে যাচ্ছে। প্রাক্-পতন জেরুজালেমের ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কার একটি উত্তেজক ঘটনা, সন্দেহ নেই। যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী তাঁরা আলোচ্য গ্রন্থটির গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত ইগায়েল ইয়াদিন-সম্পাদিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক বইয়ের[৪] খোঁজ করবেন, কিন্তু খননকার্য এখনও অব্যাহত, এবং নতুন নতুন ব্যাপারে ক্রমাগতই আলোকপাত হচ্ছে। প্রায় গোয়েন্দা-অভিযানের মতোই লোমহর্ষক ব্যাপার। এ সাক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুসমাচারাবলীর লেখকদের ঔপন্যাসিক ভাবা শক্ত হয়ে পড়ে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬৩ সালে ইহুদীরা রোমান শক্তির আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রোমের পৃষ্ঠপোষকতায় সামন্ত-রাজা হেরডের বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। হেরড্ 'দ্য গ্রেট্' খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে জেরু-জালেম নগর বিত্তশালী ও স্থাপত্যসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। স্বদেশস্থ এবং

৪. Ygael Yadin (ed.), *Jerusalem Revealed: Archaeology in the Holy City, 1968-1914*, Yale University Press and Israel Exploration Society, 1976.

প্রবাসী ইহুদীদের উপর কর বসিয়ে তিনি জেরুজালেমের মন্দিরের পুনর্নির্মাণ ও সংরক্ষণ করেন। এ বিশাল মন্দিরটি ইহুদী দুনিয়ার গর্বের বস্তু হয়ে ওঠে এবং সেখানকার আচারঅনুষ্ঠানের সূত্রে জেরুজালেমে টাকার বন্যা বইতে থাকে। মন্দিরটির পরিচালনা করেন এক বিরাট অভিজাত পুরোহিতগোষ্ঠী, যাঁদের মধ্যে ক্ষমতা বংশপরম্পরায় ন্যস্ত হ'তে থাকে। এই পুরোহিততন্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত থাকতেন একজন প্রধান পুরোহিত; তাঁর নিচে থাকতেন কয়েক ডজন সহকারী পুরোহিত; তাঁদের নিচে ৭২০০ জন সাধারণ পুরোহিত এবং অসংখ্য অধস্তন কর্মচারী। উচ্চশ্রেণীর পুরোহিতেরা গ্রীকো-রোমান স্থাপত্যের প্রস্তরনির্মিত 'ভিলা'য় দারুণ বিলাসিতায় বাস করতেন। বাড়িগুলিতে মোজাইকের কাজ ও দেয়ালচিত্রের অলংকরণ, তা ছাড়া চৌবাচ্চা, গরম জলের পাইপ, কাচপাত্র, মার্বেলের টেবিল, ইতালীয় মদের কলস ইত্যাদি জীবনযাত্রার শৌখিন সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। মন্দিরটির এবং পুরোহিতদের অভিজাত বাসগৃহগুলির ভগ্নাবশেষ দেখলে বুঝতে পারা যায় যে সুসমাচারাবলীতে এই পরিপার্শ্বের বর্ণনা কাল্পনিক নয়, বাস্তবানুগ, এবং কেনই বা এই পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে যীশুর সংঘর্ষ ছিলো অনিবার্য। মন্দিরটির দক্ষিণে চৌষট্টি মিটার চওড়া এক প্রকাণ্ড সোপানশ্রেণী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে; খুব সম্ভব এখানেই যীশু তাঁর শেষ ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। রোমান প্রশাসক পন্তিয়ুস্ পিলাতুস্ যে প্রাসাদটিতে বাস করতেন তার ধ্বংসাবশেষও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

ঐ সমাজে গর্হিত দুষ্কৃতকারীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হতো ক্রুশকাষ্ঠে। প্রাচীন জেরুজালেম থেকে মাত্র মাইলখানেক উত্তরপশ্চিমে একজন ক্রুশবিদ্ধ মানুষের অস্থি পাওয়া গেছে। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কোথায় কোথায় পেরেক মারা হতো। সন্ত জনের সুসমাচারে উল্লিখিত বেথেস্‌দা সায়র ও সিলোয়ামের সায়রকেও বিশেষজ্ঞরা সনাক্ত করতে পেরেছেন। যীশুকে যে ধরনের সমাধি দেওয়া হয়েছিলো ব'লে মনে করা হয় সে ধরনের গুহাহিত সমাধিও বেশ কয়েকটি পাওয়া গেছে।

সাম্প্রত কালে মূল গ্রীক নিউ টেস্টামেণ্টের বহু প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। মিশরের শুষ্ক জলবায়ু প্রাচীন পুঁথির সংরক্ষণের পক্ষে আদর্শস্থানীয়। সেখানে প্যাপিরাসের নোটবইয়ের ছেঁড়া পাতায় নিউ টেস্টামেণ্টের বিভিন্ন গ্রন্থের খণ্ডিত অংশ পাওয়া গেছে—মোট আশিটি অংশ, হস্তলিপির শৈলী-অনুসারে যাদের ১৩০—৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফেলা যায়। এ থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে

সুসমাচারগ্রন্থগুলি সবই ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয় এবং প্রথমে সেগুলি আলাদা-আলাদাভাবে প্রচারিত হতে থাকে।

তা ছাড়া একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো 'মৃত সাগর' নামক হ্রদের তীরবর্তী কুম্‌রানে গুহাহিত রাশীকৃত প্রাচীন পুঁথি। যীশুর সময়ে কুম্‌রানে এসিন্‌ নামক একটি বিশিষ্ট ইহুদী সম্প্রদায়ের আশ্রম ছিলো। পুঁথিগুলি তাঁদেরই গ্রন্থাগারের অংশ। ৬৬-৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমানদের সঙ্গে ইহুদীদের লড়াইয়ের সময় পুঁথিগুলিকে নিরাপত্তার জন্য গুহার ভিতরে লুকিয়ে রাখা হয়। তার পর সেগুলি দৈবাৎ পুনরাবিষ্কৃত হয় ১৯৪৭ সালে। সমগ্রত কিংবা অংশত মোট ৬০০ বইয়ের হদিশ মিলেছে। এসিন্‌ সম্প্রদায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ থেকে ৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এবং খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে এঁদের চিন্তাধারার একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। এঁরা সমসাময়িক ইহুদী ধর্মের প্রতিষ্ঠিত ধারাটিকে ক্ষয়িষ্ণু বিবেচনা ক'রে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন মুসার সময়ের মরুজীবনে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে পাপাক্রান্ত ইহুদী সমাজের ক্রিয়াকলাপে ঈশ্বর অনতিবিলম্বেই হস্তক্ষেপ করবেন, মর্ত্যলোকে হবে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন ক'রে, মরুজীবনের ক্লেশ সহ্য ক'রে অধীর আগ্রহে সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করতেন তাঁরা। লক্ষণীয় যে রুটি ও মদের আনুষ্ঠানিক আহার তাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো, এবং তাঁরা নাকি দু'জন ত্রাণকর্তার আশায় ছিলেন। এসিন্‌দের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছিলেন বাপ্‌তিস্ত্‌ জন, যাঁর আবির্ভাব হয় কুম্‌রানের অনতিদূরেই। কিন্তু এসিন্‌দের মতো কোনো নির্জন জায়গায় সংঘবদ্ধ না হয়ে থেকে তিনি চেষ্টা করেছিলেন বৃহত্তর ইহুদী সমাজের কাছে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমনের কথা ঘোষণা করতে। বাপ্‌তিস্ত্‌ জনের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন যীশু; স্বর্গরাজ্যের খবর সাধারণ্যে প্রচার করার প্রেরণা তিনি জনের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। কিন্তু দীক্ষাগুরুর থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে নতুন যুগ আসন্ন নয়, আগত। প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা এক দিকে জন ও যীশুর মত স্বর্গরাজ্যের সংবাদ প্রচারের কর্তব্য মেনে নিয়েছিলেন, অন্য দিকে এসিন্‌রা যেমন ঈশ্বরের প্রতীক্ষায় নিবিষ্ট ছিলেন ঠিক তেমনভাবেই যীশুর পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষা করতেন। এই প্রত্যাশা ছিলো তীব্র ও আন্তরিক। তাঁরা সত্যিই ভাবতেন যে প্রকৃত স্বর্গরাজ্য যে কোনো দিন এসে যাবে। সম্ভবত এ কারণেই যীশুর জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ করার কোনো তাগিদ তাঁর শিষ্যেরা অনুভব করেননি। যীশুর মৃত্যু হয় ৩০ কি ৩৩ খ্রীষ্টাব্দে; সুসমাচারগুলি লিখিত হয়

আনুমানিক ৫০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, যদিও একজন পণ্ডিতের মতে প্রতিটি সুসমাচারগ্রন্থই ৭০ সালে জেরুজালেম ধ্বংস হয়ে যাবার আগেই লিখিত হয়ে থাকবে, কারণ ঐ ভয়ংকর ঘটনাটি ঘ'টে গেছে এমন কোনো স্পষ্ট সচেতনতা কোনো গ্রন্থে দেখা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে আমার তো মনে হয় শেষ মতটিই সমর্থনযোগ্য।

যীশুর জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে সুসমাচারাবলীই প্রধান সাক্ষী। সন্ত মার্কের গ্রন্থটি প্রাচীনতম ব'লে বিবেচিত; তার পর রচিত হয় ম্যাথ্যু ও ল্যুকের গ্রন্থদ্ব'টি, সর্বশেষে সন্ত জনের গ্রন্থটি। পরিচিত ঘটনার পৌরাণিকীভবন চতুর্থ গ্রন্থটিতেই সর্বাধিক লক্ষণীয়। জনের কল্পনায় যীশুর ঈশ্বররূপ, ত্রাণকর্তার রূপটি প্রাধান্য পেয়েছে। অপর গ্রন্থত্রয়ে যীশুর মানবিক রূপটি স্পষ্টতর; তাঁর ঈশ্বরত্ব, পাপীদের ত্রাণের জন্য পৃথিবীতে তাঁর সুপরিকল্পিত অবতরণ— ইত্যাদি ভাববস্তুর কোনো সুগঠিত কাঠামো পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐতিহাসিক যীশুকে ফিরে পেতে এই তিনটি বইই আমাদের সব থেকে বেশি সাহায্য করে। সে সঙ্গে এটাও ঠিক যে সন্তদের সাক্ষ্যে পরস্পরবিরোধিতা বিস্তর। তিন-চারজন সংবাদদাতা যে একটি ঘটনার একই বিবরণ পেশ করবেন এটা আমরা আজকের দিনেও প্রত্যাশা করি না, এবং এ কথা যখন আমাদের যুগেই অবিসংবাদিত তখন যে যুগে ছাপাখানা-টাইপরাইটার-সংবাদপত্র-ক্যামেরা-টেপ্‌রেকর্ডার কিছুই ছিলো না, বরং অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস ছিলো প্রবল, সে যুগে যে আরও কত বেশি প্রযোজ্য তা সহজেই অনুমেয়।

পরস্পরবিরোধিতার একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। সন্ত ম্যাথ্যুর মতে শিষ্যদের সঙ্গে যীশুর অন্তিম ভোজন অনুষ্ঠিত হয় এক বৃহস্পতিবার, ইহুদীদের বার্ষিক পরবের দিন, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় পাস্‌-ওভার। পরের দিন, শুক্রবার, হয় তাঁর ক্রুশবন্ধন। অথচ সন্ত জনের মতে যীশুর ক্রুশবন্ধন যে দিন হয় সেটা পাস্‌-ওভারের আগের দিন, প্রস্তুতিপর্বের সময়। কেন এই পার্থক্য? শুধু এই একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই, যীশুর মৃত্যুর বছর পাস-ওভার পরবটি বৃহস্পতিবারে পড়েছিলো না শুক্রবারে পড়েছিলো তা নির্ণয়ের চেষ্টাতেই পণ্ডিতেরা নাকি গোটা গোটা বই লিখে ফেলেছেন, এমনই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়! যাই হোক, একটি সন্ধানসূত্র এই যে সন্ত জন যীশুকে দেখতেন প্রতীক হিসেবে; ঐ পরবের প্রস্তুতিপর্বে মন্দিরে যে মেষবলি দেওয়া হতো যীশু যেন সেই বলিরই নূতন মেষ। তিনি হয়তো বলতে চাইছেন যে মন্দিরে যে সময়ে মেষবলি দেওয়া

হয় ঠিক সে সময়েই যীশুকেও ক্রুশকাষ্ঠে প্রতীকী অর্থে বলি দেওয়া হয়। তুলনামূলক বিচারে ম্যাথ্যুর সময়নির্দেশকেই তথ্যের নিকটতর মনে হয়।

সুতরাং এ বইগুলি থেকে ইতিহাসোদ্ধার রীতিমত সূক্ষ্ম পাণ্ডিত্যের ব্যাপার, এবং চেষ্টাও চলছে অনেক দিন যাবৎ। আধুনিক পণ্ডিতেরা অবশেষে বিশ্লেষণের এমন কতগুলি হাতিয়ার নির্দিষ্ট করেছেন যেগুলির উপযোগিতা এবং নির্ভরযোগ্যতা-বিষয়ে তাঁরা আপাতত একমত। তাঁদের অন্যতম মূল নীতি হলো এই যে সুসমাচারাবলীতে ওল্ড্ টেস্টামেণ্টের কোনো প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচর হলেই তথ্য হিসেবে সে অংশটির যাথার্থ্যকে সন্দেহ করতে হবে। আর খুঁটিয়ে পড়তে গেলেই সুসমাচারাবলীতে পাওয়া যাবে ঐ প্রতিধ্বনির ছড়াছড়ি। পাঁচ হাজার লোকের ক্ষুধার্ত জনতাকে মাত্র কয়েকটি রুটি ও মাছ দিয়ে যীশু কীভাবে অলৌকিক উপায়ে খাইয়েছিলেন, সকলের খাওয়ার পরেও কেমনভাবে কিছু কিছু টুকরো অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিলো, এই গল্পটি চারজন সন্তের সুসমাচারেই পাওয়া যায়। এ দিকে ওল্ড টেস্টামেণ্টে আছে যে পয়গম্বর এলিশা একশো লোককে অলৌকিকভাবে খাইয়েছিলেন, এবং এ কাহিনীটি রচিত হয়েছে যীশুর বা সুসমাচারাবলীর সময়ের পাঁচশো বছর আগে। অতএব এ সিদ্ধান্ত অন্যায় হবে না যে অগ্রবর্তী কাহিনীটি উত্তরসূরিদের কল্পনাকে প্রভাবিত করেছে। বলা বাহুল্য, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণও একমুঠো শাকান্নে অনেকের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তলিয়ে দেখে পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করেছেন যে সুসমাচারাবলীতে প্রায়ই যেখানে দেখা যাচ্ছে অলৌকিকের অবতারণা সেখানেই বিদ্যমান ওল্ড টেস্টামেণ্টের প্রভাব। এভাবেই তথ্যের উপরে পড়েছে কল্পনার রঙিন প্রলেপ, স্বাভাবিকের উপরে পড়েছে অতিশয়োক্তির ছায়া, স্তরে স্তরে যোজিত হয়েছে যীশুর পয়গম্বরত্ব, দেবত্ব। এরই নাম ইতিহাসের পৌরাণিকীভবন। যীশুর জন্মসংক্রান্ত যে কাহিনীটির সঙ্গে খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান তাবৎ দুনিয়া পরিচিত, ক্রিসমাস কার্ডের ছবি থেকে শুরু ক'রে ক্যারল্-গান পর্যন্ত যে গল্পের জয়জয়কার, সে গল্পের সূত্রগুলি, বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, সবই ওল্ড টেস্টামেণ্টের এখানে-ওখানে বিকীর্ণ নানান ভাববস্তু থেকে সংকলিত। বেথলেহেমের আস্তাবলে গৃহপালিত পশুদের সান্নিধ্যে কুমারী মাতার গর্ভ থেকে যীশুর অলৌকিক জন্ম, সে রাত্রের পথপ্রদর্শক পরমোজ্জ্বল নক্ষত্র, নবজাতকের সন্ধানে প্রাচ্যের তিনজন রাজার যাত্রা (এলিয়টের 'The Journey of the Magi' ও রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' স্মর্তব্য): এই সব অনুপুঙ্খের পিছনে

আছে প্রাচীন টেস্টামেণ্টে ছড়ানো-ছিটানো উক্তি। লেখক দু'জন যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে থেকে কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

> 'বেথলেহেম....তোমার ভিতর থেকে উদ্ভূত হয়েই আমার কাছে আসবেন তিনি, যিনি হবেন ইস্রায়েলের অধিনায়ক।'
>
> 'ইয়াকবের থেকে হবে এক নক্ষত্রের উদয়. ইস্রায়েল থেকে হবে এক রাজদণ্ডের উদয়।'
>
> 'অহো, গর্ভধারণ করবে এক কুমারী, জন্ম দেবে এক পুত্রকে, তার নাম রাখবে ইমানুয়েল।'
>
> 'যারা ইহুদী নয় তারা তোমার আলোকে উপনীত হবে, তোমার উদয়ের উজ্জ্বলতার দিকে রাজারা প্রত্যুদ্গমন করবে।'
>
> 'তার্শিশ্ ও দ্বীপাবলীর নৃপতিরা দানসামগ্রী আনবেন, শিবা ও সিবার রাজারা উপহার আনবেন।'
>
> 'বৃষ চেনে তার প্রভুকে, গর্দভ চেনে তার মালিকের খোঁয়াড়।'

এইসব কবিত্বময় বাক্যকে যীশুসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গ্রহণ ক'রে আদি-খ্রীষ্টানরা খাড়া করেছিলেন তাঁদের যীশুজাতক।

কুমারীর গর্ভ থেকে যীশুর জন্মের চাঞ্চল্যকর কাহিনীটি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের একটি প্রধান অঙ্গ। অথচ একটু তলিয়ে দেখলেই পাওয়া যাবে এ সমাচারের উৎস। সন্ত ম্যাথ্যু লিখছেন : 'এই সব ঘটনা ঘটেছিলো ঈশ্বরকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণে. যা উচ্চারিত হয়েছিলো পয়গম্বরের মুখে : অহো, গর্ভধারণ করবে এক কুমারী, সে জন্ম দেবে এক পুত্রকে, তার নাম রাখবে ইমানুয়েল।' পয়গম্বর ইসাইয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ম্যাথ্যু সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন টেস্টামেণ্টের গ্রীক অনুবাদ থেকে। সে বাক্যটিতে পাওয়া যাচ্ছে কুমারী-দ্যোতক গ্রীক শব্দ 'পার্থেনস্'। কিন্তু ম্যাথ্যু যদি মূল হিব্রু টেস্টামেণ্টে ফিরে যেতেন, তাহ'লে দেখতেন যে পয়গম্বর ইসাইয়া ব্যবহার করেছিলেন 'আল্মা' শব্দটি, যার অর্থ শুধুই 'তরুণী'। হিব্রু ভাষায় 'কুমারী' বোঝাতে 'বেথুলা' শব্দটি প্রচলিত, এবং ইসাইয়া ও শব্দটি আদৌ ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ পয়গম্বরের ভাষায় কোনো অতিপ্রাকৃত জন্মকাহিনীর আভাসমাত্র নেই। এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে মাতা মেরীর কৌমার্যের ব্যাপারটি একটি তুচ্ছ অনুবাদের ভ্রান্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

অতএব প্রত্নতত্ত্বের মতোই ঐতিহাসিক যীশুর পুনরুদ্ধারে পরম সহায়ক ভাষা-

তত্ত্বের চাবিকাঠি। সন্ত ল্যুকের বিবরণীতে যাওয়া যাক। শুচিবায়ুগ্রস্ত সম্প্রদায় ফ্যারিসিদের সম্বোধন ক'রে যীশু বলছেন, 'তোমরা ফ্যারিসিরা পেয়ালার বাইরের দিকটা ঘষা-মাজা করো, কিন্তু তোমাদের ভিতরে যত দুর্বুদ্ধি, যত পাপ। মূঢ়ের দল,··· যা ভিতরের জিনিস তা-ই ভিক্ষে দাও, তাহ'লেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।' এখানে খট্কা লাগা স্বাভাবিক 'যা ভিতরের জিনিস্ তা-ই ভিক্ষে দাও' বাক্যাংশটিতে। সন্দেহ জাগে বাক্যটির শুদ্ধি সম্পর্কে। যেখানে ঘষা-মাজার কথা হচ্ছিলো সেখানে হঠাৎ ভিক্ষে দেওয়ার কথা উঠলো কেন?

এখানে মনে রাখতে হবে যে সুসমাচারাবলী লিখিত হয় গ্রীক ভাষায়, অথচ যীশুর মাতৃভাষা ছিলো প্যালেস্টিনীয় আরামাইক। আরামাইক ভাষা সেমিটিক গোষ্ঠীরই অন্তর্গত; হিব্রু, ফিনিশীয় ও আরবীর সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। কথ্য এবং সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে এর ইতিহাস দীর্ঘ দিনের, প্রাদেশিক রূপও বিস্তর। নিকট প্রাচ্যের কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে ভাষাটি এখনও প্রচলিত আছে। যীশুর সময়ে আরামাইক ছিলো প্যালেস্টিনীয় সর্বসাধারণের কথ্য ভাষা, আর হিব্রু অভিজাত শ্রেণীর ও পুরোহিতদের ভাষা। বুদ্ধ যেমন সাধারণবোধ্য পালিতে ধর্মব্যাখ্যা করেছিলেন, যীশুও তেমনই আরামাইক ভাষাতে ধর্মশিক্ষা দিতেন। এ কথা ধ'রেই নেওয়া যায় যে যীশুর মৃত্যুর পর আরামাইক ভাষায় তাঁর সুভাষিতাবলী ভক্তদের মুখে মুখে ফিরতো। হয়তো তার কোনো লিখিত সংকলনগ্রন্থও তৈরি হয়েছিলো, যা এখন বিলুপ্ত। সেই ঐতিহ্যের উপর নির্ভর ক'রেই গ্রীক ভাষায় লিখেছেন সুসমাচারাবলীর লেখকেরা।

আরামাইক ভাষায় 'ভিক্ষে দেওয়া' অর্থে প্রচলিত ক্রিয়াপদটি 'জাক্কাউ', আর 'পরিষ্কার করা' অর্থে প্রচলিত 'দাক্কাউ'। হয়তো মূল সুভাষিতাবলীতে ছিলো 'দাক্কাউ', কিন্তু ল্যুক শুনেছেন বা পড়েছেন 'জাক্কাউ'। তাহ'লে আমরা ফিরে পাই এমন একটি বাক্যকে: 'মূঢ়ের দল,··· যা ভিতরের জিনিস তা-ই পরিষ্কার করো, তাহ'লেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে অর্থও পরিষ্কার হয়ে যায়। এমন কোনো কথাই যীশু নিশ্চয় বলেছিলেন, ভিক্ষে দেওয়ার কথা বলেননি। তা ছাড়া ম্যাথ্যুর সমাচারে পাচ্ছি একটি তুলনীয় উক্তি: 'অন্ধ ফ্যারিসি! আগে পেয়ালার ভিতরটা পরিষ্কার করো!'

সুসমাচারে উদ্ধৃত যীশুর উক্তিগুলিকে আরামাইকে অনুবাদ ক'রে নিলে আরেকটি ব্যাপার নাকি খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে: যীশু কবিতায় কথা বলতেন। কবিতার যে ছন্দ অনুবাদেও ধরা পড়ে তা মূলে নাকি আরও জোরালো,

অবিসংবাদিত কাব্যছন্দ। হিব্রু ও আরামাইক কবিতায় দেখতে পাওয়া যায় পরপর দু'টি সমান্তরাল শ্লোকে একই ভাবনার সম্প্রসারণ। প্রাচীন টেস্টামেণ্টের গীতাংশ দ্রষ্টব্য :

ঈশ্বর আমার আলোক ও মোক্ষ
কাকে আমার ভয় ?
ঈশ্বর আমার শরণ,
কাকে ভয় করবো আমি ?

তুলনীয় ল্যুকের সংস্করণে যীশুর বিখ্যাত উক্তি :

শত্রুদের ভালোবাসো,
যারা তোমাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট তাদের উপকার করো,
যারা তোমাদের অভিসম্পাত দেয় তাদের করো আশীর্বাদ,
যারা তোমাদের প্রতি অসদাচারী তাদের জন্য প্রার্থনা করো।

বস্তুত, যীশুর বাণীর যে একটা কাব্যরূপ আছে সেটা যাঁরা নতুন টেস্টামেণ্ট কোনো ভালো ইংরেজী অনুবাদে পড়েছেন তাঁদের কাছে নতুন খবর হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আরামাইকে এ রূপ স্পষ্টতর এ কথা জানবার পর যদি বইটির পাতা খোলা যায়, তাহ'লে যীশুর উক্তির ছত্রে ছত্রে আবিষ্কার করা যায় পুনরাবৃত্তিভিত্তিক কাব্যছন্দ, যার সঙ্গে অন্যান্য প্রাচীন চারণগীত কবিতার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে বাঙালী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ল্যুকের সুসমাচার থেকেই আরও তিনটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনটি উদ্ধৃতিই অক্সফোর্ড য়ুনিভর্সিটি প্রেস ও কেম্‌ব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক একত্রে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত নিউ টেস্টামেণ্টের আধুনিক ইংরেজী তর্জমা থেকে অনুবাদ করলাম।

ধন্য তোমরা, যারা দরিদ্র,
ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের ;
ধন্য তোমরা, যারা ক্ষুধিত,
মিটবে তোমাদের ক্ষুধা।

যদি তোমার গালে কেউ থাপ্পড় মারে,
তাকে তোমার অপর গালটি বাড়িয়ে দাও ;
যদি তোমার কোটটি কেউ ছিনিয়ে নেয়,
তাকে দিয়ে দাও তোমার শার্টটাও।

বিচার কোরো না,
তাহ'লে তোমরাও বিচারাধীন হবে না ;
দণ্ড দিও না,
তাহ'লে তোমরাও হবে না দণ্ডিত ;
খালাস করো,
তোমরাও খালাস হবে ;
দান করো,
তোমরাও পাবে উপহার ।

মনে রাখবার মতো ছোট ছোট শ্লোকে নীতিশিক্ষা দেওয়া প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদী ঐতিহ্যের অঙ্গ, এবং যীশু সেই ঐতিহ্যেরই অন্তর্গত মানুষ ।

এ কথা জোর দিয়ে বলতে হয় যে ঐতিহাসিক গবেষণা বারে বারেই প্রতিষ্ঠিত করে যীশুর ইহুদীত্বকে । কোনো নতুন ধর্মের প্রবর্তন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো না, উদ্দেশ্য ছিলো ইহুদী ধর্মকেই তার চরম পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া । ম্যাথ্যুর সাক্ষ্য অনুসারে তিনি বলেছিলেন, 'ইস্রায়েলের পথভ্রান্ত মেষদের কাছে প্রেরিত হয়েছি আমি, শুধু তাদেরই কাছে ।' অথচ তাঁর মৃত্যুর পরে আদি খ্রীষ্টীয় চার্চের উৎসাহ গেলো অনিহুদী দুনিয়াকে ধর্মান্তরিত করার দিকে । ইহুদীদের রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এই পরিণতির যোগসূত্র অবশ্যই আছে, কিন্তু এ দিকটা এ বইটিতে বিশেষ আলোচিত হয়নি ।

আঞ্চলিক দিক দিয়ে যীশু ছিলেন গ্যালিলির যুবক । সেকালে গ্যালিলি ছিলো সমৃদ্ধ কৃষিপ্রধান অঞ্চল, রপ্তানি করতো জলপাইয়ের তেল ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য । গ্যালিলির সমাজ ছিলো একদিকে সম্পন্ন জোতদার ও বণিকদের ও অন্যদিকে নিম্নবিত্ত দিনমজুরদের সমাজ, যে সমাজটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে যীশুর ছোট ছোট 'প্যারাব্‌ল্‌' বা নীতিকথামূলক গল্পগুলিতে । জেরুজালেমের মতো বিদগ্ধ শহরের চোখে গ্যালিলির লোকেরা ছিলো একটু গ্রাম্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অলৌকিকে বিশেষ বিশ্বাসী । সুসমাচারগ্রন্থগুলিকে যত্ন ক'রে পড়লে বোঝা যায় যে গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যান্য সাধুদের মতো যীশুও 'faith healing' ও ওঝাগিরি ক'রে বেড়াতেন, সাধুদের কাছ থেকে এ কাজগুলি প্রত্যাশিত ছিলো, এবং যীশুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের এ দিকটা গ্যালিলির লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত । মনে রাখতে হবে যে রোগ সারানোর আর ভূত তাড়ানোর মধ্যে প্রাক্-

বৈজ্ঞানিক মানুষ বড় একটা তফাৎ দেখে না, এবং শুধু যীশুর সময়ে বা সমাজে নয়, সাধারণভাবে প্রাক্-বৈজ্ঞানিক দুনিয়ার চিন্তাধারাতেই রোগের চিকিৎসা এবং ওঝাগিরি সমগোত্রীয় এবং শয়তানের বা অন্যান্য অশুভসত্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের পর্যায়ভুক্ত। ধর্মগুরুর ডাক্তারী ভূমিকাটা রীতিমত প্রাসঙ্গিক। যদি দেখা যায় যে ব্যাধি ও ভূতের সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ জিতে যাচ্ছে, তার মানে এই যে অশুভ সত্তারা হ'টে যাচ্ছে। এ কথা ভাবলে অন্যায় হবে না যে যীশু তাঁর চিকিৎসক ও ওঝার ভূমিকাকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখতেন, স্বর্গরাজ্যঘোষণার অঙ্গ হিসেবে, স্বর্গরাজ্যপ্রচারের কর্মসূচীতে একটি হাতিয়ার হিসেবে। সুসমাচারাবলী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে যেমন একদিকে গরীব-দুঃখী-রোগাতুর মানুষ দলে দলে তাঁর কাছে ভিড়তো আরোগ্যের আশায়, তেমন আরেকদিকে অতিপ্রাকৃত ক্রিয়া দ্বারা স্বর্গরাজ্যের আগমনকে চিহ্নিত করার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতো আরেকদল মানুষ। মার্কের সুসমাচারে পাচ্ছি নিম্নলিখিত সাক্ষ্য :

> 'তার পর ফ্যারিসিরা এসে তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়লো। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য, তারা চাইলো স্বর্গ থেকে প্রেরিত কোনো অভিজ্ঞান। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "কেন এ যুগের মানুষ দৈব অভিজ্ঞানের সন্ধানী? আমি বলছি : তোমাদের যুগকে কোনো অভিজ্ঞান দেওয়া হবে না।" এই ব'লে তিনি নৌকায় চাপলেন এবং তাদের ছেড়ে হ্রদের অপর পারে চ'লে গেলেন।'
>
> (পূর্বকথিত ১৯৬১ সালের ইংরেজী নিউ টেস্টামেণ্ট থেকে অনূদিত)

অতিক্রান্ত শতাব্দীগুলির ওপার থেকে পরিষ্কার ভেসে আসে দেবতা নয়, এক ক্ষ্যাপা সাধকের দীর্ঘশ্বাস।

যীশুর পূর্ণ জীবনী রচনা করা অসম্ভব, কিন্তু মোটামুটি একটা স্কেচ্ বইটিতে খাড়া করা হয়েছে। তাঁর জন্ম খুব সম্ভব খ্রীষ্টপূর্ব ১২ থেকে ৫ সালের মধ্যে গ্যালিলির অন্তর্গত ন্যাজারেথ নামক জনপদে, দায়ুদপুর বেথলেহেমে নয়। তিনি মেরী এবং জোসেফের সম্পূর্ণ প্রাকৃত এবং বৈধ সন্তান ছিলেন ব'লেই মনে হয়। তাঁর ভায়েদের নাম ছিলো জেম্‌স্, জোসেফ, জুডা ও সাইমন; বোনও ছিলো একাধিক। তাঁর বাবার পেশা ছিলো শুধু কাঠের কাজ নয়, বাড়ি বানানোও বটে— সে সমাজে মান্য পেশা। পরিবারটি সম্পন্ন ছিলো, নিম্নবিত্ত ছিলো না। যীশু বাপের পেশাটা শিখেছিলেন আর ধর্মশিক্ষাও পেয়েছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা ছিলো প্যালেস্টিনীয় আরামাইকের গ্যালিলীয় রূপ, এবং তাঁর মুখনিঃসৃত গোটা

ত্রিশেক মূল আরামাইক শব্দ সুসমাচারগ্রন্থগুলিতে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু হিব্রু ধর্ম-শাস্ত্রের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো ; তিনি ধর্মজ্ঞ 'রাব্বি'-দের মতো তর্ক করতে পারতেন। তিনি ছিলেন ক্ষীণকায় ছোট্টখাট্ট মানুষ ; সুপুরুষ ছিলেন না এমন মনে করার কারণ আছে। যতদূর জানা যায়, তিনি বিয়ে করেননি। আনুমানিক ২৮ খ্রীষ্টাব্দে জুডিয়া অঞ্চলের পয়গম্বর বাপ্‌তিস্ত্‌ জনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এসিন্‌দের দ্বারা প্রভাবিত জন তখন স্বর্গরাজ্যের আশু আগমনের সংবাদ ঘোষণা করছিলেন। তিনি ইহুদীদের বলছিলেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে, অনুতপ্ত হৃদয়ে জর্ডনের জলে অবগাহন ক'রে নিজেদের কলুষমুক্ত ও স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত ক'রে তুলতে। যীশু জনের কথামত নিজেকে জর্ডনের জলে পরিশোধিত করেন। ঐ অবগাহনের সময় তাঁর একটি তীব্র, প্রগাঢ় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হয়। অতঃপর তিনি পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদিত করেন। শিষ্যের দলও জুটে যায়। শিষ্যদের নিয়ে তিনি পরিব্রাজকের মতো গ্যালিলির হ্রদের তীরবর্তী শহরে গ্রামে ধর্মোপদেশ দিয়ে, রোগ এবং ভূত তাড়িয়ে বেড়ান। এই কীর্তিকলাপের ফলে তাঁর খানিকটা খ্যাতি বা কুখ্যাতি জোটে। তাঁর ভক্তদের মতে তিনি ঈশ্বরের সাহায্যে ভূত তাড়াতেন, কিন্তু তিনি শয়তানের সাহায্যে ভূত তাড়াচ্ছেন এ অপবাদ রটে। তাঁর বাড়ির লোকেরা পরিবারের দুর্নামের আশঙ্কায় খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে এরকম একটা কথা তাঁদের কানে যাওয়াতে তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যীশু কর্ণপাত করেন না।

অপবাদের আরও কারণ ছিলো। যীশুর ব্রত যেহেতু ছিলো স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা তাই তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন পাপীদের সংস্কারসাধনে। গ্যালিলির হ্রদের তীরবর্তী কাপের্‌নাউম্‌ শহরে তাঁর একটি বাড়ি ছিলো। সেখানে তিনি নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতেন সমাজের তথাকথিত 'দুশ্চরিত্র' লোকদের। পতিত-পতিতাদের সঙ্গে তাঁর অবাধ মেলামেশা ও পানাহার, গতানুগতিক আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিনিষেধের প্রতি তাঁর অবজ্ঞার মনোভাব, তথাকথিত 'পুণ্যবান্‌'-দের উদ্দেশে বর্ষিত তাঁর তিরস্কার ও বিদ্রূপ : এ সমস্ত কারণে তাঁকে বেশ কিছুটা বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হয়। আবার ভক্তদের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়তে থাকে ; বেশ কয়েকজন মহিলাও তাঁর দলে যোগ দেন। হয়তো ইতিমধ্যে ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে ইহুদীদের ঈশ্বরপ্রেরিত ত্রাণকর্তা হিসেবে ভাবতে শুরু করে। জর্ডন নদী ধ'রে তাঁরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন, জেরুজালেম, বেথানি ইত্যাদি

জনপদের উদ্দেশ্যে। জেরুজালেমের মন্দিরের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক তাঁর মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। মন্দিরের সোপানশ্রেণীতে এবং ভিতরের একটি প্রাঙ্গণে তিনি স্বর্গরাজ্যের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাশ্রয়ী কপটধর্মের নিন্দা করতে থাকেন। অনিবার্যত পুরোহিতকুলের বিষদৃষ্টিতে পড়েন তিনি। গোপনে তাঁকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে পাস্-ওভারের পরব এসে পড়ে। পরবের দিন পড়ে এক বৃহস্পতিবারে। সেদিন তাঁর বারোজন বিশেষ শিষ্যের সঙ্গে তাঁর সন্ধ্যার খাওয়া সেরে— তাঁর 'শেষ ভোজন'— তিনি জেরুজালেমের প্রান্তবর্তী জলপাইবনের পাহাড়ে রাত কাটাতে চ'লে যান। সঙ্গে দলবল ছিলো মন্দ নয়, হয়তো শ'খানেক লোক। সে রাত্রেই মন্দিরকর্তৃপক্ষের নির্দেশ-অনুসারে কোতোয়ালরা তাঁকে পাকড়াও করতে আসে। শুধু তাঁকেই গ্রেপ্তার করতে চায় তারা, তাঁর সঙ্গীদের নয়। হয়তো কিছু রোমান সৈনিকও তাদের সঙ্গে ছিলো, এবং হয়তো যীশুর শিষ্য 'বিশ্বাসঘাতক' জুডাস্ সত্যিই অন্ধকারে যীশুকে সনাক্ত করেছিলেন। তার পর যা হয়ে থাকে, যীশুর দলের কেউ কেউ তাঁদের গুরুর আরক্ষায় অসি নিষ্কোষিত করেন, বলা বাহুল্য গুরুর অহিংসাত্মক শিক্ষার বিরুদ্ধে। কিছু ধ্বস্তাধ্বস্তির পর যীশুর দলবল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায় এবং তিনি একলা ধৃত হয়ে মন্দিরে নীত হন। সেখানে প্রধান পুরোহিত ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা তাঁকে প্রশ্নাদি করেন এবং তাঁকে রোমান প্রশাসক পন্তিয়ুস্ পিলাতুস্-এর কাছে পাঠানো সাব্যস্ত করেন। শুক্রবার সকালে যীশুকে পিলাতুসের কাছে পাঠানো হয়। পিলাতুস্ কি ভেবেছিলেন? মন্দিরবিদ্বেষী ব'লেই কি যীশুর সাজা হলো? পিলাতুস্ কি পুরোহিতদের খাতির করার জন্যেই যীশুকে দণ্ড দিলেন? না কারণ আরও রাজনৈতিক? যীশুর উগ্র প্রতিবাদপন্থী এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট-বিরোধী কার্যকলাপ, তিনি ইহুদীদের ত্রাণকর্তা এরকম একটা জোর গুজব, তাঁর আরক্ষায় কোতোয়ালদের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীদের সশস্ত্র সংঘর্ষ, এ সমস্ত ঘটনায় পিলাতুস্ নিশ্চয় খুশী হননি। রাজনৈতিক অর্থে যীশুকে উপদ্রবকারী ছাড়া আর কী ভাবতে পারতেন পিলাতুস্? তিনি দেখলেন গ্যালিলির এক আধা-গেঁয়ো পাগলাটে ছোকরাকে, দলবল নিয়ে যে জেরুজালেমে মস্তানি ক'রে বেড়াচ্ছে, সঙ্গীদের মধ্যে যে বেশ 'হীরো' হয়ে উঠেছে, এবং যাকে কেন্দ্র ক'রে উৎসবমুখর উত্তেজিত জনতার মধ্যে রোমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ পর্যন্ত স্ফুরিত হ'তে পারে। সেই গোলমেলে সম্ভাবনাকে গোড়াতেই কেটে ফেলার উদ্দেশ্যে তিনি যীশুকে প্রাণদণ্ড দিলেন। শহরের বাইরে পথের পাশে তাঁর ক্রুশবন্ধন হলো। সেটা হয়তো

৩০ কিংবা ৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচীনতম সুসমাচারের লেখক মার্কের মতে যীশুর মৃত্যুর সময়ে তাঁর কোনো শিষ্য কাছে ছিলেন না। কোনো কোনো পার্শ্ববর্তী নাকি শুনেছিলেন যে তিনি মৃত্যুর আগে পয়গম্বর এলিজাকে আহ্বান করছিলেন তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার নিতে। কিন্তু অন্যদের মতে, তাঁরা ভুল শুনেছিলেন, যীশু উচ্চারণ করছিলেন ধর্মগীতিকার একটি পঙ্‌ক্তি : 'ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে তুমি?' মার্ক আরও বলেন যে যীশুর শিষ্যেরা নয়, অপরিচিত এক ধার্মিক ইহুদী তাঁকে সমাধিস্থ করেন। এটা খুবই সম্ভব, কারণ প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের কবর দিলে পুণ্য হয় এরকম ধারণা ইহুদী সমাজে প্রচলিত ছিলো।

যে যীশু কোনো নতুন চার্চ গঠন করতে চাননি সেই মানুষটির নামকে ঘিরেই দানা বাঁধলো একটি নতুন ধর্মপ্রতিষ্ঠান। যীশুকে দেখানো হলো ঐশ্বরিক সত্তার অন্তর্গত হিসেবে, স্বয়ং ঈশ্বর হিসেবে, তাঁর আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে মানবজাতির ত্রাতা হিসেবে। যীশু নিজে যা দাবি করেননি তা-ই হয়ে উঠলো চার্চের শিক্ষার খিলানমধ্যবর্তী প্রস্তর। অযৌক্তিক হ'লেও ঘটনা ঐতিহাসিক। যদিও যীশুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাববস্তু, যেমন বিশ্বাসবোধ, ঈশ্বরের কৃপা, মুক্তি ইত্যাদি নতুন ধর্মটিতে গৃহীত হলো, তবু তাতে প্রাধান্য লাভ করলো অন্য কতগুলি প্রবণতা। যীশু বলেছিলেন ঈশ্বরের রাজত্বের কথা; চার্চ ঘোষণা করলো যে তিনিই ঈশ্বর, তিনিই রাজা। যীশু বলেছিলেন যে মুক্তি আসবে ঈশ্বরের কাছ থেকে; চার্চ জানালো যে তিনিই মুক্তির উপায়, তিনিই মুক্তিদাতা। যীশু বলেছিলেন ঈশ্বরের সমগ্র বিশ্বাস অর্পণ করতে; চার্চ মানুষকে ডাক দিলো যীশুর উপরেই ভরসা রাখতে। যেখানে যীশু চেয়েছিলেন যে স্বর্গরাজ্যের নীতি এখনই মর্ত্যে গৃহীত হয়, ক্ষমা-প্রেম-অহিংসার সাম্রাজ্য এ মুহূর্তেই স্থাপিত হয়, সেখানে চার্চের শিক্ষার মধ্যে দেখা দিলো একটা টেন্‌শন্, একটা দোটানা : চার্চ বোঝালো যে মরজীবনে আপস করলেও চলবে, স্বর্গীয় আচরণের স্থান পরলোকে। এই আপসপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এবং ইহুদী ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের সংযোগচ্ছেদের ফলে ঐতিহাসিক যীশুর মূলমন্ত্রটা গেলো চাপা প'ড়ে।

কবর থেকে তাঁর পুনরুজ্জীবনের বিতর্কিত কাহিনীটির জন্যই এমন ঘটলো তা বলা চলে না। বরং ইহুদী রাষ্ট্রের পতন ও ইহুদীদের দেশত্যাগের সঙ্গে এ ঘটনাবলীর সম্পর্ক আছে। খ্রীষ্টধর্ম প্রথমদিকে ছিলো চরিত্রে ইহুদী, কিন্তু ৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর যখন স্বদেশে ইহুদীদের খুঁটি ন'ড়ে উঠলো, তখন খ্রীষ্টধর্ম নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করলো অনিহুদী দুনিয়ায় ; এলো অবতারবাদের প্রভাব। এই নতুন প্রতিষ্ঠানটির দেশী রূপটাও অনেকখানি বদলে গেলো। খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুত্থানের এই রাজনৈতিক পটভূমিটি আরও আলোচিত হ'তে পারতো বইটিতে, কিন্তু হয়-নি। চার্চের বিবর্তনে লেখকদ্বয় যেন একটু বিক্ষুব্ধ, কিন্তু সত্যিই অবাক হবার কারণ আছে কি ?

যীশু আসন্ন স্বর্গরাজ্যের ঘোষণা ক'রে যাবার পর তাঁর শিষ্যেরা কয়েক বছর ঐ ঘটনার প্রত্যাশায় এবং তারই সূত্রে তাঁদের গুরুর নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে ছিলেন। যখন বছরের পর বছর কেটে গেলো, না এলেন ঈশ্বর, না ফিরলেন যীশু, তখন যে দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো এমন অনুমান নিশ্চয় সংগত। স্বর্গরাজ্যের আগমনকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখে আপাতত যীশুকেই ঠাকুর বানানোর দিকে, দেবতা হিসেবে পূজো করার দিকে ঝোঁক গেলো। ঈশ্বর কবে আসবেন, কবে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন, তার কোনো ঠিক নেই দেখা গেলো ; অথচ ইতিমধ্যে মানুষ চায় ভক্তি করার মতো মূর্তি, পূজো করার মতো বিগ্রহ। এই তো মানবহৃদয়ের চিরাচরিত পৌত্তলিকতা, যা থেকে কোনো গুরুই রেহাই পাননি। স্বতরাং খ্রীষ্টীয় চার্চের বিবর্তনও একটি বোধগম্য ঐতিহাসিক ঘটনা।

বিশাল রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার পর খ্রীষ্ট হয়ে উঠলেন যেন একজন স্বর্গীয় সম্রাট। রেফর্মেশন আন্দোলনের পর তাঁর সেই রাজকীয় দূরত্ব খানিকটা ঘুচলো ; যুগোচিত আবহাওয়ায় তাঁকে বানানো হলো বন্ধু বা বড়দা এক পরম সুন্দর বীরপুরুষ। বিশ শতকের উপাসকদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন কখনও মানবতাবাদী জননায়ক, কখনও প্রথম প্রকৃত সমাজবাদী, কখনও জাতীয়তা-বাদী মুক্তিযোদ্ধা, কখনও বা কট্টর বিপ্লবী। লেখকেরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এই ভাবচ্ছবিগুলি ঐতিহাসিক যীশুর যথার্থ পরিচয় বহন করে না। ঠিক, আবার এটাও ঠিক যে যীশুর এই পরিণতিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ঐতিহাসিক। কারণ অতীতের গুরুদের মুকুরে বর্তমানের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করার চেষ্টাও একান্তই মানবিক। যীশুর একাধিক বাণী যে যুগ যুগ ধ'রে সমাজ-বাদীদের, সমাজসংস্কারকদের, জনসেবকদের প্রেরণা দিয়েছে সেটাও ঐতিহাসিক সত্য। তা ছাড়া, লেখকদ্বয় আলোচ্য গ্রন্থে চার্চকে যতই ঠেস দিয়ে লিখুন না কেন এটাও তো ঠিক যে তার অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও চার্চ যীশুর মূল শিক্ষাকে একেবারে পরিত্যাগ করেনি। বাইবেলই খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ, এবং সেখানেই

বিস্তৃত যীশুর নীতিশিক্ষা। পাশ্চাত্য সভ্যতায় শ্রেয়োবোধের গঠনে, কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার অগ্রগতিতে খ্রীষ্টধর্মের একটি অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে; এই ধর্মের আওতাতে পশ্চিমে এবং এর প্রভাবে পৃথিবীর অন্যত্র একাধিক জনহিতকর কার্য সাধিত হয়েছে। শিক্ষায়, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে এবং নারীস্বাধীনতায়, কুসংস্কারের উচ্ছেদে, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে, নিপীড়িত মানুষের সাহায্যে খ্রীষ্টধর্মের পৃথিবীব্যাপী ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

লেখকদ্বয় ঠিকই বলেন যে ঐতিহাসিক যীশুর দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্ণনা করা চলে একরকমের নৈতিক মৌলিকতা হিসেবে, যা একান্তভাবে ধর্মীয়, আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক নয়। যীশু ঈশ্বরকেন্দ্রিক ভাবোন্মত্ত সাধক, 'ঈশ্বরের রাজত্বে' আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন, আধুনিক অর্থে রাজনৈতিক নেতা তিনি অবশ্যই নন। কিন্তু এ থেকে লেখক দু'জন যখন দুম্ ক'রে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান যে— ইংরেজীতেই উদ্ধৃত করি— 'For him the most advanced socialist society would be just as obsolete in the face of the Kingdom of God as would be the most reactionary feudal society', তখন বলতেই হয় যে এ জাতীয় অনুমিতির কোনো প্রকৃত ভিত্তি নেই, অতএব মূল্য নেই। একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ঐতিহাসিক পুরুষই বটে, তাঁর দেশকালের সন্তান। দু'হাজার বছর পরেকার পৃথিবীকে দেখে তিনি কি বলতেন বা ভাবতেন সে নিয়ে কোনো অর্থগর্ভ আলোচনা চলতে পারে না। 'the most advanced socialist society' কাকে বলা হবে, তা আজকের, না আগামীকালের, নাকি কোনো কালাতীত ইউটোপিয়া, তারই কোনো ঠিক নেই। সামন্ততন্ত্রের চেয়ে সমাজতন্ত্র যে যীশুর কাছে এক চুলও প্রিয়তর হতো না এমন কথা কখনও বলা যায়?

কোনো মানবিক প্রকল্পই স্বয়ম্ভূ নয়, তার পিছনে থাকে বিশ্ববীক্ষার একটি মডেল; প্রত্যেক চিন্তাধারারই থাকে বনিয়াদ ও পরিমণ্ডল। ইহুদী ধর্ম, এসিন্ মতবাদ, বাপ্‌তিস্ত্ জনের বিশ্বাস, তৎকালীন ইহুদী সমাজের অন্যায়-অবিচার, শ্রেণীবৈষম্য, পুরোহিততন্ত্র: এ সবের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যীশুর চিন্তার ঐতিহাসিক পটভূমিকা। কিন্তু পুরাণের অনেক স্তর সরিয়ে ঐতিহাসিক যীশুকে উদ্‌ঘাটন করার পরেই লেখকদ্বয় আবার চ'লে যান একটি অবৈজ্ঞানিক উপসংহারে; আবার দেখতে পাই যীশুকে একক, অদ্বিতীয়, কালাতীত, ইতিহাসের বাইরে বিরাজমান সত্তা হিসেবে দেখার চেষ্টা। যে পুরাণগুলিকে তাঁরা এতক্ষণ বর্জন

করছিলেন হঠাৎ সেই পুরাণগুলির ভাষাই তাঁদের লেখনীতে ভর ক'রে বসে। ইংরেজীতে উদ্ধৃতি না দিলে মজাটা ঠিক বোঝা যাবে না। প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সব ঘাঁটাঘাঁটি করার পর বইয়ের শেষ পাতায় তাঁরা লিখছেন :

> ...As someone might convert a whole colour spectrum back into one single beam of white light, so Jesus unified all the opposites in his message, 'The Kingdom of God is at hand !'
>
> The message is final ; nothing more final can be said in language. And because Jesus grasped and lived it, he is rightly called saviour, mediator, redeemer, not because of what he is in himself, but because he was so possessed by that to which he bore witness. In that sense he is rightly called the absolute in time, the one who shows the way to the perfect world.

হঠাৎ এই বাগাড়ম্বরের অর্থ কী ? এখানে কি আবার যীশুপূজাতেই ফিরে যাওয়া হলো না ?

যীশু যে একজন উল্লেখযোগ্য ভাবুক, দ্রষ্টা ও লোকশিক্ষক ছিলেন তা আমরা সকলেই মেনে নিতে পারি। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এক শাশ্বত নৈতিক সৌন্দর্যের, চেয়েছিলেন তাকে বাস্তব করতে। নীতিকথামূলক গল্পের সাহায্যে, অর্থগর্ভ শ্লোক ও সূত্রের ধাক্কায় তিনি চেষ্টা করেছিলেন তাঁর সমকালীন মানুষদের তাঁর অন্তর্দৃষ্টির অংশভাক্ ক'রে তুলতে। ভাষাকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন মরমী কবিদের মতো ; তার চাবিকাঠির মোচড়ে, তার আকস্মিক অসিধারে খুলতে চেয়েছিলেন বোধির দরজা, ভাঙতে চেয়েছিলেন গতানুগতিকতার বন্ধন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো শ্রোতাদের অন্তঃস্থলে উপলব্ধির বিস্ফোরণ। কিন্তু তাঁকে 'পরম', 'চরম' ইত্যাদি বলার কোনো অর্থ হয় না। তিনি কি সত্যিই নিরুপম, তুলনারহিত ? পৃথিবীর অন্যান্য মরমিয়া সাধকদের সঙ্গে, সহজিয়া বৈষ্ণব বা বাউল কবি, জেন (Zen) বৌদ্ধ সাধক, মীরা-কবীর-রবীন্দ্রনাথ, এঁদের সঙ্গে তাঁর কি কোনো সাদৃশ্য নেই ? ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত যদি নিতে হয় তবে সেটা আগাগোড়াই বজায় রাখতে হবে, হঠাৎ ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রথমে ইহুদী ধর্মগুরু হিসেবে তাঁকে বুঝতে হবে, তার পর অন্যান্য সাধকদের পাশাপাশি তাঁকে দেখতে

হবে, দেবতার আসনে বসিয়ে নয়। এবং যীশুর মূল্যায়নে ঠিক যখনই দরকার তুলনামূলক আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতের, ঠিক তখনই কিউপিট্ ও আর্মস্ট্রং সাহেবের কথাবার্তা নিতান্ত দৈপ হয়ে পড়ে। কিংবা হয়তো বলা উচিত কিউপিট্ সাহেবের কথাবার্তা, কারণ মাঝখানের দু'টি অধ্যায় ছাড়া বাকি সব অধ্যায়ই কিউপিটের লেখা। অবশ্য বইটিতে যেসব মতামত ও সামগ্রিক সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে আর্মস্ট্রং সাহেবও নিশ্চয় সেগুলিকে সমর্থন করেন।

আসলে কিউপিট্, আর্মস্ট্রং এবং এঁদের মতাবলম্বী অন্যান্য তথাকথিত খ্রীষ্টীয় বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যে একটা স্ববিরোধ এসে গেছে, যদিও এঁরা কিছুতেই তা স্বীকার যাচ্ছেন না। আমি বর্তমান প্রবন্ধটি লিখতে থাকাকালীন বি. বি. সি. টেলিভিশনে আরেকটি যীশুবিষয়ক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানটিতে পল জনসন নামে একজন ঐতিহ্যপন্থী খ্রীষ্টান ডন কিউপিটের সঙ্গে তর্কে নামেন। জনসন অনেক চেষ্টা করলেন কিউপিটের বক্তব্যের স্ববিরোধী চরিত্রটা তাঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে, কিন্তু পারলেন না। কিউপিট্ যীশুকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে মানেন না, ইহুদী ধর্মশিক্ষক হিসেবে দেখেন, এবং এ প্রসঙ্গে তিনি ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা মিলে ***The Myth of God Incarnate*** নামে আরেকটি বইও লিখেছেন, কিন্তু তিনি যীশুকে একটি বিশেষ, পবিত্র, একক স্থান দেন, নিজেকে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানরূপে চিহ্নিত করেন, এবং যীশুপ্রচারিত ধর্মকে (ঐতিহাসিক খ্রীষ্টধর্মকে নয়) শ্রেষ্ঠ ধর্ম ব'লে মাননা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসৃত হ'লেও গবেষণার পরিণামে তাঁর পথ হঠাৎ পৃথক্ হয়ে যায়; পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মমতের থেকে যীশুর ধর্মকে তিনি আলাদা ক'রে দেখেন; আধুনিক মানবতাবাদীদের সমগোত্রীয় নন তিনি।

অথচ পল জনসনের মতো ঐতিহ্যপন্থী খ্রীষ্টানরা যা আশঙ্কা করছেন তা-ই হবে ব'লে মনে হয়। কিউপিট্ এবং অন্যান্যরা এখন যা-ই বলুন না কেন, যীশুর মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাঁর প্রচারিত ধর্মের জন্য আর কোনো বিশেষ সিংহাসন নির্ধারিত থাকবে না, থাকতে পারে না। আধুনিক দুনিয়ার প্রবণতা যুক্তি ও বিজ্ঞানের দিকে; এ দুনিয়ায় কোনো বিশেষ মানুষকে বা তাঁর মতবাদকে 'চরম', 'পরম', 'পরিণামী' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হবে ব'লে মনে হয় না।

যেহেতু যীশু দেবতা নন, মানুষ, তাই দেশকালের চিহ্নে অখণ্ডনীয়ভাবে চিহ্নিত তিনিও। তাঁর বাণী তাঁর প্রাতিস্বিক, ইহুদী, একেশ্বরবাদী বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িত; এবং সে বিশ্ববীক্ষা যাঁদের নেই তাঁদের কাছে, দেকার্ত্-উত্তর

যুক্তিবাদী বিজ্ঞানপন্থী আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে, বা সাধারণভাবে আজকের দিনের নিরীশ্বরবাদী দুনিয়ায় তাঁর বাণীর তাৎপর্য বা প্রাসঙ্গিকতা কী এই জটিল অথচ জরুরী প্রশ্নের উত্তর দিতে ডন কিউপিট্ চেষ্টা করেননি। যীশু আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের রাজত্বে বিশ্বাস করতেন ; আধুনিক খ্রীষ্টীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক'জন তা করতে প্রস্তুত ? যীশু ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন—ইহুদী একেশ্বরে, যিনি পিতৃতুল্য, সার্বভৌম সম্রাট, পুরুষ হিসেবে কল্পিত তো বটেই। এদিকে পিতৃতন্ত্রের আর সাম্রাজ্যের দিন গেছে ; রাজারাজড়ারা সম্মান পান না ; আর নারী-আন্দোলনের পর ঈশ্বরকে পুরুষ হিসেবে ভাবতে লজ্জা পান আধুনিক খ্রীষ্টানেরা। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, নর-নারীর সম্পর্ক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি, সর্ববিষয়েই যীশুর ধ্যানধারণা তাঁর সমকালীন ইহুদী সমাজের ভাবমণ্ডলজাত। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে: তাঁর বিশিষ্ট 'কস্‌মলজি'-কে বাদ দিয়ে তাঁর 'এথিক্যাল র‍্যাডি-ক্যালিজ্‌ম্' কতদূর চলবে ? কোনো ঐতিহ্যের 'মিথ্‌'-কে বর্জন ক'রে তা থেকে শুধু খানিকটা অম্লমধুর নৈতিক রস ছেঁকে নেওয়া যায় কি ? না কি তাকে আবার মেলাতে হয় অন্য কোনো বিশ্ববীক্ষার আধারে, স্থাপিত করতে হয় নতুন কোনো 'মিথ্‌'-এর পরিপ্রেক্ষিতে ? যেমন করেন আধুনিক দুনিয়ার মার্ক্সবাদী খ্রীষ্টানেরা ; শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যাচ্ছে অথচ ঈশ্বরের রাজত্ব আসছে না দেখে এঁরা উঠে প'ড়ে লেগেছেন তাকে আনার প্রচেষ্টায়—সাম্যবাদী বিপ্লবের মাধ্যমে।

কিউপিট্ সাহেব ঈশ্বরকে মানুষ বানানোর ঘোরতর বিরোধী। এ কথা তিনি সেদিন নিজেই ঘোষণা করলেন টেলিভিশনে। অথচ কেম্‌ব্রিজের ইমানুয়েল কলেজের অধ্যক্ষ, শাস্ত্রজ্ঞ এই ইতিহাসবেত্তা এ সামান্য দার্শনিক ব্যাপারটুকুও বোঝেন না কি, যে হয় উপনিষদের ঋষিদের মতো নির্গুণ ব্রহ্মকে জানতে হয়, নয়তো উপাসনা করতে গেলেই উপাস্যমান সত্তা হয়ে পড়ে সগুণ, **anthropomorphized** বা মানবিক ছাঁচে ঢালা। যত জন উপাসক তত রকমের ভগবান।

আমার তো মনে হয় যে যীশুকে একক বানানোর চেষ্টা হাস্যকর। তাঁর মতো প্রশংসনীয়, সম্মানার্হ মানুষ আরও জন্মেছেন, আরও জন্মাবেন। প্রয়োজন আরেক ধাপ পুরাণবর্জনের, ঈশ্বরের রাজত্বকে রূপক হিসেবে গ্রহণের, তার প্রতীকী ব্যাখ্যার। পুরাতন কোনো মতবাদকেই সম্পূর্ণভাবে, অবিমিশ্রভাবে, বিনা শর্তে, বিনা পরিবর্তনে আমরা নিই না : খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসও তা-ই প্রমাণ করে। সব কিছুরই লাগে যুগোচিত নবব্যাখ্যা, নূতন প্রসঙ্গে প্রয়োগসাফল্য।

সমকালীন মডেল ছাড়া যীশুর মন্ত্রকে আপন ক'রে নেওয়া আধুনিক জগতের

পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞান এক, কর্ম আরেক। ঐতিহাসিক যীশুকে জানা এক, তাঁর বাণীকে জীবনে প্রয়োগ করা আরেক। দ্বিতীয়টা করতে গেলেই একটি সমকালীন মডেল লাগবে। এ কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে যীশু আজকের ছেলে হয়ে জন্মালে তাঁর ইষ্ট হতো স্বর্গরাজ্য নয়, কোনো বিশ-শতকী ইউটোপিয়া। মাদার টেরেসার কল্যাণকর কার্যকলাপের প্রতি সম্পূর্ণ সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ ক'রেও এ কথা বলা চলে যে তিনি আর কয়েক দশক পরেকার আলবার্নিয়া বা যুগোস্লাভিয়ায় জন্মালে গোঁড়া সাম্যবাদী হতেন। মানুষের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে একটু আগে যা বলেছি তার সঙ্গে এই বক্তব্যের কোনো বিরোধ নেই, বরং সম্পর্ক আছে। আমরা কতগুলি প্রবণতা নিয়ে জন্মাই, এবং আমাদের দেশকাল-অনুসারে হয় সেগুলির বিশিষ্ট বিকাশ। আগেকার দিনের ভাবুকেরা ভগবান-পাগল হতেন, জাগতিক সমস্যার ঐশ্বরিক সমাধান খুঁজতেন। আজকের দিনের একই মেজাজের ভাবুকেরা সমষ্টিগত সমাধান খোঁজেন, শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেন। ভবিষ্যতের অজাত ভাবুকেরা না জানি আরও কতরকমের স্বপ্ন দেখবেন।

বুদ্ধ, কনফুশিয়াস, যীশু, মহম্মদ, মার্ক্স, গান্ধী, মাও—কারও চিন্তাই যে চূড়ান্ত প্রমাণিত হবে বা সে-হিসেবে গৃহীত হবে এমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। পৃথিবী পরিবর্তনশীল ; বিবর্তনের স্রোতে নতুন নতুন পরিস্থিতির ও দৃষ্টিভঙ্গির অভ্যুদয় অপ্রতিরোধ্য। তবে পূর্বসূরিদের কোনো কোনো অন্তর্দৃষ্টি অবশ্যই আমাদের কাছে অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক হ'তে পারে, আমাদের সমৃদ্ধ করতে পারে, আমাদের চলার পথে অন্যতম পাথেয় হ'তে পারে।

সলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গে :
নিকোলাস জার্নভের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

আলেক্সান্দার ইসায়েভিচ্ সলঝেনিৎসিন (জন্ম ১৯১৮) এ যুগের একটি বিশ্বখ্যাত নাম। বহু-বিতর্কিত এই মানুষটির লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু অনুবাদের মাধ্যমেই, কারণ রুশ ভাষা আমার জানা নেই, কিন্তু ইংরেজী অনুবাদের দর্পণে যে প্রতিমূর্তি পাই তা থেকে অন্তত এটুকু বুঝতে পারি যে তাঁকে নিয়ে ইডিওলজির বিভিন্ন পন্থাবলম্বীদের মধ্যে তর্কের ঝড় যতই চলুক না কেন—এবং তা চলবে, চলতে বাধ্য,—সাহিত্যের বিচারে তিনি একজন শক্তিশালী পুরুষ। সম্প্রতি আমার হাতে এলো তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'প্রুসকিয়ে নচি' বা 'প্রুশ রজনী'-র রবার্ট কন্‌কোয়েস্ট-কৃত ইংরেজী অনুবাদ, যেটি মাত্র গত বছর বেরিয়েছে। মনোরম দ্বিভাষিক সংস্করণ : এক দিকে রুশ, অন্য দিকে ইংরেজী. অনুবাদটিকে যথাসাধ্য মূলানুগ করার চেষ্টা করা হয়েছে।[১] মূল কবিতাটির প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৭৪ সালে, প্যারিসে। কিন্তু কবিতাটি রচিত হয় তার চব্বিশ বছর আগে, ১৯৫০ সালে, যখন সলঝেনিৎসিন স্তালিনের আমলের শ্রমশিবিরে রাজনৈতিক বন্দী অবস্থায় আটক ছিলেন। ঐ সময়ে কবিতাটি মনে মনে রচনা ক'রে স্মৃতিস্থ করেছিলেন তিনি।

'মক্-হীরোয়িক' বা শ্লেষাত্মক বীররসাশ্রয়ী শৈলীতে রচিত এই কবিতাটি কবির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জাত। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব প্রুশিয়াকে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করে যে বিজয়ী সোভিয়েত বাহিনী, সলঝেনিৎসিন ছিলেন তারই অন্তর্গত একজন গোলন্দাজী অফিসার, এবং এই এলাকাতেই ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের আজ্ঞানুসারে তিনি গ্রেপ্তার হন। কবিতাটিতে মিলিত হয়েছে দু'ধরনের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত, কবির ব্যক্তিগত জীবনের এবং সাধারণভাবে রুশ জাতির। প্রথম মহাযুদ্ধের

১. Solzhenitsyn, *Prussian Nights*, translated by Robert Conquest, Collins and Harvill Press, London, 1977 ; দাম ৩ পাউণ্ড ৭৫ পেনি।

সময়, ১৯১৪ সালে, ঐ একই অঞ্চলে সেনাধ্যক্ষ সাম্‌সনভের নেতৃত্বে এক রুশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে, যে ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে সলঝেনিৎসিন লিখেছেন তাঁর উপন্যাস 'অগাস্ট, ১৯১৪'। প্রথম মহাযুদ্ধে রুশ জাতির ভূমিকা সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকেই বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন সলঝেনিৎসিন। তার কারণ পরিষ্কার: প্রথম মহাযুদ্ধ, তার অব্যবহিত পরেই রুশ বিপ্লব, এই দুই বিশাল ঘটনার উত্তাধিকারী যে রুশ প্রজন্ম তিনি তারই অন্তর্গত। ঐ উত্তাল সময়ের জাতক তিনি, এবং তাঁর বাবা প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যদিও যুদ্ধে প্রাণ হারাননি। তৎসত্ত্বেও জন্মমুহূর্ত থেকেই পিতৃবঞ্চিত সলঝেনিৎসিন, কারণ তিনি ভূমিষ্ঠ হবার ছ'মাস আগে তাঁর বাবা দুর্ঘটনায় মারা যান, এবং তাঁর বিধবা মা অনেক কৃচ্ছ্রসাধনায় তাঁকে মানুষ করেন।[১] ঠিক যেসব প্রশ্নের জবাব ছোট ছেলেরা সাধারণত পায় তাদের বাবাদের কাছ থেকে সেগুলির উত্তর বালক সলঝেনিৎসিনকে খুঁজতে হয়েছিলো বইয়ের পাতায়। পিতৃবঞ্চিত নিজের তথা রুশ বিপ্লবের অসিঘাতে অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন তাঁর সমকালীন গোটা প্রজন্মটির উৎসকে জানবার তাগিদে ঐ যুগটি সম্পর্কে তাঁর তীব্র অনুসন্ধিৎসা জন্মায়। ১৯১৪ সালে যে পথ দিয়ে সাম্‌সনভ গিয়েছিলেন পরাজয়ের অভিমুখে, ১৯৪৫ সালে সে পথই হলো সোভিয়েত ফৌজের জয়যাত্রার পথ, এবং তরুণ সলঝেনিৎসিন তাতে অংশও নিলেন; কিন্তু ঠিক যখনই তিনি আর তাঁর সহযোদ্ধারা বিজয়োল্লসিত, ঠিক তখনই ঘটলো তাঁর জীবনের দিক-বদল: তিনি হলেন বন্দী, শত্রুর হাতে নয়, তাঁরই নিজের সরকারের হাতে, যার তরফে তিনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন। ভাগ্যের এই বিস্ময়কর ওঠা-নামার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীনকালের মৌখিক রীতির কবিতার মতো কাগজ-কলমের সহায়তা ছাড়া মনে মনে রচিত হয় বন্দীর উক্তি 'প্রুশ রজনী'। বন্দী অবস্থায় কবিতাটিকে তিনি কাগজে লিপিবদ্ধ করেননি এই কারণে যে তাহলে সেটি তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হতো।

অনুবাদের মাধ্যমেই কবিতাটি আমাকে নাড়া দেয়, এবং রুশভাষাভাষী কোনো পাঠকের সঙ্গে বইটি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা জাগে। অতঃপর যোগাযোগ স্থাপন করি আমার ছাত্রজীবনের পরিচিত ও বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিকোলাস জার্নভের সঙ্গে। ডঃ নিকোলাস জার্নভ অক্সফোর্ডের রুশ

১. দ্রষ্টব্য David Burg and George Feifer, *Solzhenitsyn, A Biography*, Hodder and Stoughton, London, 1972।

সম্প্রদায়ের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, একাধারে বিদ্বান, সাহিত্যরসিক ও মরমিয়া সাধক। ১৮৯৮ সালে মস্কোতে তাঁর জন্ম হয়। ১৯২১ সালে ছাত্রাবস্থায় খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র ভালো ক'রে অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্যে—যার সুযোগ তাঁর স্বদেশে তখন আর ছিলো না—যুগোস্লাভিয়ায় যান; সেখানে বেলগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯২৬ সালে ফ্রান্সে আসেন, এবং দেশান্তরিত রুশ ছাত্রদের খ্রীষ্টীয় আন্দোলনের কর্মসচিব হন। এই আন্দোলনের কেন্দ্র ছিলো প্যারিস, যদিও ক্রিয়াকলাপ ছিলো গোটা পশ্চিম ইয়োরোপে ব্যাপ্ত। বিশের দশকের প্যারিস ছিলো, বলাই বাহুল্য, দেশান্তরিত রুশ সম্প্রদায়ের জীবনের কেন্দ্রস্থলস্বরূপ। দিয়াগিলেফ-এর ব্যালে-দল, ইগর স্ত্রাভিনস্কি-র মতো সংগীতরচয়িতা তখন প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টীয় চার্চের ইতিহাস-সংক্রান্ত তাঁর গবেষণার জন্য ১৯৩২ সালে নিকোলাস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনের বিভিন্ন থিওলজিকাল কলেজে ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। এ সময়ে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্লাভনিক বিদ্যা বিভাগেও অধ্যাপনা করেন, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদের মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত Fellowship of St Alban and St Sergius নামক সমিতির কর্মসচিব হন। ১৯৪৭ সালে তিনি ডক্টর অফ ডিভিনিটি ডিগ্রি লাভ করেন এবং প্রাচ্য খ্রীষ্টানদের সংস্কৃতি বিষয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত স্পলডিং লেকচারশিপ-এর প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে অবসরগ্রহণ করা পর্যন্ত এই পদটি তাঁর ছিলো। এ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। ভারতেও তিনি এক বছর কাটিয়ে গেছেন: ১৯৫২-৩ সালে তিনি তদানীন্তন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত পথনমথিত্তার ক্যাথলিকেট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। রুশ ধর্ম, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি একজন পণ্ডিত মানুষ এবং একাধিক গ্রন্থের লেখক। ষাটের দশকে দু'বার সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ করেছেন।

১৯৬২ সাল থেকেই আমি তাঁর বিশেষ স্নেহধন্য। তাঁর ও তাঁর স্ত্রী মিলিৎসা-র তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সেণ্ট গ্রেগরিজ হাউস নামক ছাত্রাবাসে আমার ছাত্রজীবনের একটি সুখী বছর অতিবাহিত হয়, যার খানিকটা আভাস দিয়েছিলাম 'দেশ' পত্রিকায় বহু বছর আগে প্রকাশিত 'নারী, নগরী' নামক একটি স্কেচে। নিকোলাসের পুবে-পশ্চিমে মেলানো, রসিক, কৌতুকস্নিগ্ধ, মরমী রূপটি আমাকে বরাবর টেনেছে। একজন প্রকৃত মানবপ্রেমিকের স্বাদ তাঁর ব্যক্তিত্বে লভ্য। আমার

যখন মাত্র বাইশ বছর বয়স তখন থেকেই তিনি আমাকে অধিকার দিয়েছিলেন তাঁকে 'বন্ধু' ব'লে বিবেচনা করতে—গুরুর ভূমিকা নিতে রাজী হতেন না—এবং আমি লজ্জায় ম'রে যেতাম যখন তিনি তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের কাছে আমার পরিচয় দিতেন 'একজন ভারতীয় মিস্টিক' হিসেবে, এবং আমাকে ব্যবহার করতেন ভারত ও হিন্দুধর্ম বিষয়ে একটি সচল অভিধান হিসেবে।

'প্রুশ রজনী'-র ব্যাপারে যখন তাঁকে টেলিফোন করলাম তখন তিনি জানালেন যে ঐ বইটিই তাঁর এখনও পড়া হয়নি, যদিও সলঝেনিৎসিনের প্রায় যাবতীয় প্রকাশিত রচনাই তিনি পড়েছেন। তখন আমার নিজের বইটি তাঁকে দিয়ে আসি। তাঁর দৃষ্টিশক্তি এখন একেবারে ক্ষীণ; তাঁর স্ত্রী তাঁকে কবিতাটি মূল রুশে প'ড়ে শোনান। কিছু দিন পরে আমি আমার ক্যাসেট টেপ রেকর্ডারটি নিয়ে তাঁদের ফ্ল্যাটে হাজির হই, এবং অশীতিপর পিতৃব্যতুল্য এই বৃদ্ধ নবীনদের হার-মানিয়ে-দেওয়া উৎসাহ সহকারে একঘণ্টাব্যাপী ঠাসা আলোচনা চালালেন, 'প্রুশ রজনী' যার উপলক্ষ্যমাত্র, প্রকৃত পরিধি সলঝেনিৎসিনের সামগ্রিক মূল্যায়ন। মিলিৎসা জোগালেন চা-জলখাবার, এবং মধ্যে মধ্যে কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও। পাছে নিকোলাসের বক্তব্যের বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটে তাই কাটছাঁট করার চেষ্টা না ক'রে শুধু নামমাত্র সম্পাদনা ক'রে সেই চিত্তাকর্ষক আলোচনাটিকে এখানে বাংলা অনুবাদে পেশ করছি। বক্তারা প্রথম নামের আদ্য অক্ষর দ্বারা সূচিত। সব শেষে জুড়েছি উপসংহারস্বরূপ আমার নিজের কিছু ভাবনা।

২

নি। অনেক দিন বাদে তোমাকে আমাদের ফ্ল্যাটে পেয়ে আমরা খুব খুশী।

কে। আপনার মতো একজন রুশ-ভাষী মানুষের কাছে সলঝেনিৎসিনের মতো একজন লেখক ও মনীষীর তাৎপর্য কী?

নি। তিনি এক ক্ষণজন্মা পুরুষ, যাঁর জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা গন্তব্য আছে। রুশ সাহিত্যের মহৎ লেখকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, আমাদের জাতীয় জীবনে যাঁদের তাৎপর্য তাঁদের সাহিত্যিক মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়। রুশ সমাজে এঁদের চিরকাল লোকশিক্ষক এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হিসেবে দেখা হয়েছে। এমন মানুষ ছিলেন তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কি, এবং সলঝেনিৎসিনও তাঁদেরই দলে। তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্ব এবং রুশ সমাজের কাছে তাঁর বক্তব্য, এ দুটোকে আলাদা ক'রে দেখা আমাদের পক্ষে

অসম্ভব। উপরন্তু, তাঁর বক্তব্য ও আঙ্গিক দুটোই এত মৌলিক ও আধুনিক যে তাঁকে নিয়ে বিতর্কও স্বাভাবিক; তাঁকে চট্‌ ক'রে কোনো পরিচিত সাম্প্রতিক লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে পুরে ফেলা যায় না।

কে। 'প্রুশ রজনী' কবিতাটির প্রকরণ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? আমি এই রেকর্ডারটি চালাবার আগে আপনি বলছিলেন যে রুশে বীররসাত্মক দীর্ঘ কবিতার একটি ধারা আছে। ঠিক কোন ধারার অন্তর্গত এই কবিতাটি?

নি। 'প্রুশ রজনী' হচ্ছে সামরিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত সোভিয়েত কাব্যধারার অন্তর্গত। ঠিক এই ধরনের কবিতা বিপ্লবের আগে ছিলো না। কবিতাটিকে কবি পেশ করেছেন একজন তরুণ সামরিক অফিসারের উক্তি হিসেবে, যে সাধারণ মানুষ, বিদগ্ধ নয়। তাই এতে কোনো সূক্ষ্ম, পরিশীলিত অলংকরণ নেই। লাল ফৌজ যখন জার্মান এলাকায় প্রবেশ করলো তখন তার যে বিজয়োল্লাস, শত্রুর পরাজয়ে তার যে মত্ততা—সেই মেজাজের একটি শক্তিশালী প্রকাশ এই কবিতাটি। উপরের স্তরে কবিতাটি একজন তরুণ সামরিক অফিসারের জয়োক্তি, যে এক বিরাট গণ-অভিযানের অন্তর্গত। তার সঙ্গে আছে বহু সহযোদ্ধা। প্রচণ্ড বেগে এবং দুর্দম জেদের বশে তারা শত্রুর রাজ্যে প্রবেশ করেছে; তাদের গতিপথে যা-ই পড়ছে তা-ই তারা ধ্বংস ক'রে ফেলছে, সবাইকে হত্যা করছে, সব কিছুতে আগুন লাগাচ্ছে। কিন্তু একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে এই কবিতাটির রচয়িতা একজন অসাধারণ মানুষ। দু'টি কারণে। প্রথমত, তিনি স্কুল-জীবন থেকেই ১৯১৪ সালের রুশ পরাজয় বিষয়ে খুঁটিয়ে পড়াশোনা করেছেন,—যে পরাজয় ঘটেছিলো ঠিক ঐ অঞ্চলে, যেখানে ১৯৪৫ সালে তিনি লাল ফৌজের সঙ্গে বিজয়গর্বে প্রবিষ্ট। ঐ অঞ্চলের প্রত্যেক শহর-গ্রামের নামধাম তাঁর পূর্বপরিচিত,—সেটা যেন তাঁর চেনা দেশ। এটা একটা অসাধারণ ঘটনা। দ্বিতীয়ত, তিনি এমন একজন মানুষ যিনি ধ্বংসের তাণ্ডবে পুরোপুরি মেতে উঠতে পারছেন না,—কতগুলি নৈতিক প্রশ্ন তাঁকে বিক্ষুব্ধ করছে। তিনি বুঝতে পারছেন ১৯৪৫ সালের লাল ফৌজ ১৯১৪ সালের রুশ ফৌজের থেকে কতখানি আলাদা। ১৯১৪ সালের সৈন্যরা ছিলো একটি খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী জাতির প্রতিনিধি: উদাহরণস্বরূপ, তারা এটা মেনে নিতো যে একজন বন্দী হচ্ছে একটি অসহায় মানুষ, যাকে শ্রদ্ধা দেখানো উচিত; যে যুদ্ধ একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপার, তাকে যতটা

সম্ভব সংযত ক'রে রাখা দরকার; যে নারীরা আর শিশুরা লড়াইয়ের বাইরে; যে অসহায় মানুষকে হত্যা করা যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ১৯৪৫ সালের সোভিয়েত ফৌজ প্রতিহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত: তাদের শেখানো হয়েছে যে প্রতিশোধস্পৃহাই জীবনের মূল চালক-শক্তি। তাই এই কবিতাটিতে একের পর এক আসছে ভয়ংকর দৃশ্য; অর্থহীন ধ্বংসের লীলা; নারী, শিশু আর বন্দীদের হত্যা। দুই বাহিনীর মেজাজের এই পার্থক্য বিষয়ে সলঝেনিৎসিন সম্পূর্ণ সচেতন। কোনো খ্রীষ্টীয় পটভূমিকার রুশ পাঠক যখন কবিতাটি পড়েন, তখন রুশ সৈনিকদের এই আত্মিক পরিবর্তন তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এই কবিতার সৈনিকরাও রুশ, কিন্তু ১৯১৪ সালের রুশ সৈনিকদের থেকে ভিন্ন ধরনের মানুষ। 'অগাস্ট, ১৯১৪' নামক তাঁর উপন্যাসটিতে সলঝেনিৎসিন দেখিয়েছেন যে সে যুগের রুশ সৈনিকদের একটা নৈতিক মর্যাদা ছিলো। 'প্রুশ রজনী'-র সৈনিকরা সেটা হারিয়েছে। দুই যুগের রুশ বাহিনীর মধ্যে এই যে তফাত, এটা বোধ হয় পাশ্চাত্য পাঠক ঠিক বোঝেন না, ধরতে পারেন না; কিন্তু রুশ পাঠকদের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট।

কে: অর্থাৎ সলঝেনিৎসিন বলতে চাইছেন যে একটা নৈতিক অবনতি ঘটেছে?

নি: নৈতিক মানদণ্ড, মূল্যবোধ—সব বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

কে: এটা শুধু যুদ্ধকালীন অনিবার্য দুর্নীতির ব্যাপার নয়,—তার চেয়ে বেশি গুরুতর ব্যাপার?

নি: ঠিক, তার চাইতে বেশি গুরুতর ব্যাপার। সব যুদ্ধই নিষ্ঠুর, লড়াই মানেই মানুষ খুন করা, প্রত্যেক লড়াইয়েই কিছু নিরপরাধ মানুষকে বলি দেওয়া হয়। কিন্তু 'প্রুশ রজনী'-তে কবি দেখাচ্ছেন যে রুশ সৈনিকের পক্ষে নারী-ধর্ষণও আর নিন্দিত নয়। অতীতেও হয়তো এ কাজ করা হয়েছে, কিন্তু সে যুগে এটা গর্হিত অপরাধ ব'লে বিবেচিত হতো।

কে: এটা সত্যিই একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। আচ্ছা, কবিতাটির ছন্দ, মিল, অলংকার ইত্যাদিতে এই জঙ্গী উত্তেজনার ভাবটা কতখানি ফুটে উঠেছে? হিংসার উন্মাদনা আঙ্গিকে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে?

নি: সার্থকভাবে। একটা বিরাট বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। কোনোরকম নৈতিক দায়িত্ব নেই এই সৈনিকদের—তারা বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ছে। আর এ কাজে তাদের সাহায্য করছে আধুনিক

যানবাহন। আগেকার দিনের সৈনিকদের মতো এরা নয় পদাতিক বা অশ্বারোহী—প্রত্যেকে কোনো না কোনো মোটরচালিত গাড়িতে চেপে চলেছে—

কে : হ্যাঁ, সলঝেনিৎসিন এ ব্যাপারটার উপর জোর দিয়েছেন—

নি : কারণ. এই যন্ত্রচালিত দুরন্ত গতিবেগ তাদের ব্যক্তিগত নৈতিক দায়িত্ব কমিয়ে দিচ্ছে।

কে : কোনোরকম সৌকুমার্যের স্থান নেই এ কবিতাটিতে, যেমন থাকে প্রেমের কবিতায়। ঘটনার স্থূলতার দিকেই কবি আঙুল দেখাচ্ছেন।

নি : বিশেষত মনে রাখতে হবে যে কবিতাটি রচিত হয়েছে বন্দী-শিবিরে। প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি কবিকে স্মৃতিতে ধ'রে রাখতে হয়েছিলো। সেজন্য পুনরাবৃত্তি অবশ্যই আছে।

কে : সেটা তো এপিক ঐতিহ্যের কাব্যেও থাকে, মৌখিক রীতির কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যই এটা। লেখনীর সহায়তা ছাড়া রচিত কাব্যে পুনরা-বৃত্তি প্রত্যাশিত।

নি : কিন্তু এই আঙ্গিকের মাধ্যমে একটি যন্ত্রচালিত অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ আশ্চর্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।

কে : আচ্ছা, তাহ'লে তাঁদের আপনি কী জবাব দেবেন যাঁরা অভিযোগ করেন যে সলঝেনিৎসিন আদৌ সুলেখক নন, যাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন রাজনৈতিক কারণে নয়, তিনি নাকি বাজে লেখক, সেজন্যে? লক্ষ করেছি যে কেউ কেউ এমন মত পোষণ করেন।

নি : কেউ কেউ বলেন যে সলঝেনিৎসিন সাহিত্যিক নন, শুধুমাত্র সাংবাদিক, শুধু রিপোর্টার। আমি মনে করি যে হ্যাঁ, এক অর্থে এখানেই তো তাঁর সত্যিকারের অবদান। কারণ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যই হলো রুশ দেশে যা ঘ'টে গেছে তার আসল কাহিনীটা বলা। কাজেই তিনি স্বভাবতই কিছু বানিয়ে বলতে চান না। কাহিনীটা এমনিতেই এত ভয়ানক যে কিছু বানানো ব্যাপার তাতে জুড়তে গেলে এফেক্টটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আবার আরেক অর্থে বলতে হয় : না, তাঁর লেখা শুধু সাংবাদিকতা নয়, শিল্পীর সৃষ্টিও বটে ; কারণ অন্যান্য শিল্পীদের মতো তিনি শুধু বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত নন, বাস্তবের ব্যাখ্যাতেও ব্যস্ত বটে। আর তিনি যে একজন বড় লেখক তার

একটা চিহ্ন বা প্রমাণ অন্তত আমার কাছে এই যে তাঁর লেখা কোনো বই একবার পড়লে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না।

কে : আমার নিজের প্রতিক্রিয়াও তাই। আমার পরিচিত এক চেক দম্পতি,—যাঁরা কম্যুনিস্ট নন, অন্তত কম্যুনিস্ট চেকোস্লোভাকিয়া ছেড়ে এখন ব্রিটেনে বসবাস করছেন,—তাঁদের মতে, এবং তাঁরা বলেন যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রুশ বিভাগের কারও কারও মতেও বটে, সলঝেনিৎসিনকে নাকি উঁচু দরের শিল্পী ব'লে স্বীকার করা যায় না। শুনে আমি তো অবাক। আমি তাঁর বেশ কিছু লেখা পড়েছি—'ইভান দেনিসোভিচের জীবনে একটি দিন', 'ক্যান্সার ওয়ার্ড', 'প্রথম বৃত্ত', 'অগাস্ট, ১৯১৪', 'গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ'-এর প্রথম খণ্ড, 'জুরিখে লেনিন', তা ছাড়া তাঁর কিছু ছোট গল্প ও গদ্যকবিতা; তাঁর নাটকের চিত্ররূপও দেখেছি; এবং আপনার মতো আমারও প্রতিক্রিয়া এই যে তিনি এমন জাতের লেখক নন যাঁকে একবার প'ড়ে নিয়ে তার পর স্রেফ ভুলে ফেলা যায়। 'ক্যানসার ওয়ার্ড' বা 'প্রথম বৃত্ত'-এর স্রষ্টাকে উঁচু দরের শিল্পী ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? অনূদিত আকারেও এই উপন্যাস-গুলির মহত্ত্ব প্রতিভাত হয়। 'মাত্রিয়োনার বাড়ি'-র মতো ছোট গল্প স্পষ্টতই দীপ্ত শিল্প। বা শুকনো কাঠে অঙ্কুরোদ্‌গমের উপর তাঁর গদ্যকবিতাটিও একবার পড়লে ভোলা যায় না। অতএব কারও কারও এই বিস্ময়কর উলটো প্রতিক্রিয়ার কারণটা কী আপনার মতে? কারণটা কি মূলত রাজ-নৈতিক?

মিলিৎসা : এখানে আমি একটা কথা বলতে পারি?

কে : বলুন না কিছু।

মি : কোনো কোনো সমালোচক তাঁর স্টাইলটা পছন্দ করেন না, তলস্তয় বা দস্তয়েভস্কির সঙ্গে তুলনা ক'রে তাঁর রচনাশৈলীকে হীনপ্রভ মনে করেন। অথচ তাঁর লেখার ধরনই আলাদা—একেবারে নতুন, সমসাময়িক, যুগোচিত, এবং স্বকীয়।

কে : ওঁর স্টাইল যে আধুনিক সে তো অনুবাদেও বোঝা যায়। অথচ 'প্রথম বৃত্ত'-র মতো উপন্যাসকে রুশ ঐতিহ্যেরই যোগ্য জাতক বলতে হবে। সেই বিরাট পটভূমি, সেই জটিলতা, সেই জীবন বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি। আর শুধুমাত্র আঙ্গিকের দিকে তাকালেও দেখা যাবে কি নিখুঁত এর গঠনপদ্ধতি।

নি : হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে যাঁরা ওঁর সাহিত্যমূল্য স্বীকার করেন না তাঁদের

মনের অন্তঃস্থলে কোনো রাজনৈতিক ঝোঁকই কাজ করছে। আরও একটা ব্যাপার আছে। উনি পাঠককে গভীরভাবে বিচলিত করেন। দস্তয়েভস্কির বিরুদ্ধেও কখনও কখনও একই অভিযোগ আনা হয়। যে কারণে নাবোকভ বা বুনিনের মতো নামজাদা রুশ লেখকরাও দস্তয়েভস্কিকে বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁরা আপত্তি তোলেন : এটা আমাদের বড্ড বেশি বিচলিত করছে, অতএব এটা সাহিত্য নয়। অথচ স্বীকার করতেই হবে যে উঁচু দরের শিল্পীরাই পাঠকচিত্তকে বিচলিত করতে পারেন, যে-কেউ সে ক্ষমতার অধিকারী নন।

কে : সুতরাং ঐ ধরনের আপত্তি দ্বারা আমাদের বিচারবুদ্ধিকে বিচলিত হ'তে দেওয়া উচিত নয়!

নি : এঁরা তলস্তয়কে পছন্দ করেন কারণ তিনি শান্ত, ধীরস্থির, মসৃণ, মোলায়েম। দস্তয়েভস্কি উত্তাল। তা ছাড়া দস্তয়েভস্কি আর সলঝেনিৎসিন দু'জনেই ঘটনাকে সীমিত স্থানকালের মধ্যে অত্যন্ত ঘন ক'রে সন্নিবিষ্ট করতে পারেন। 'প্রথম বৃত্ত' যেমন। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু হচ্ছে।

কে : সেই ধ্রুপদী ঐক্যত্রয়ের ব্যাপার।

নি : ঠিক। ঐক্যত্রয়ের ব্যাপার। তিন দিনের মধ্যে—পাশ্চাত্য ক্যালেণ্ডারের ক্রিসমাসের সময়—যেটা তাৎপর্যপূর্ণ—

মিলিৎসা : প্রতীকী।

নি : আর 'ক্যানসার ওয়ার্ড'-এর দৃঢ় গঠনও লক্ষণীয়।

কে : আঙ্গিকের দিক দিয়ে এ উপন্যাসদু'টি সত্যিই ভাস্বর, তা অনুবাদেও বোঝা যায়। তাহ'লে আপনি বলছেন যে এ ব্যাপারে তাঁর সমালোচকেরা নির্ভরযোগ্য নন?

নি : নির্ভরযোগ্য নন।

মি : আরেকটা ব্যাপার এই যে উনি নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে ভালোবাসেন, নতুন ভাষা সৃষ্টি করেন। অবশ্যই, এই নতুন ভাষার কিছুটা চালু হবে, কিছুটা হবে না। আগে অন্য লেখকদের বেলাতেও তাই হয়েছে।

কে : নতুন ভাষার সৃষ্টি তো প্রতিভাধর শিল্পীর স্বাক্ষরই বহন করে।

মি : কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে উনি এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছেন।

কে : তবে উত্তাল তরঙ্গময় কতগুলো অভিজ্ঞতাকে যদি রূপ দিতে হয়, একটা জরুরী খবর দিতে হবে এমন কোনো চেতনা যদি তাঁর থাকে, যেমন

আপনারা বলছেন, তাহ'লে নতুন শব্দ সৃষ্টি করার তাগিদ অনুভব করাটাই স্বাভাবিক।

নি : ওঁর শব্দব্যবহার সম্পর্কে একটা বই বেরিয়ে গেছে এর মধ্যেই! বেশ লম্বা একটা বই।

কে : ওঁর সাহিত্যিক আর রাজনৈতিক দিককে কি তাহ'লে আলাদা ক'রে দেখতে হবে, না পরস্পরসম্পৃক্ত হিসেবে? ওঁর মহত্ত্ব কি ঐ অন্যোন্যসম্পর্কের উপরেই নির্ভরশীল?

নি : একেবারেই। দুটো দিক মিলিয়ে দেখতে হবে। পৃথিবীর কাছে তাঁর একটা জরুরী বক্তব্য রয়েছে।

মি : তাঁর শিল্পের সাহায্যে তিনি সেই বক্তব্যকে পেশ করছেন।

নি : ঠিক তাই।

কে : তাহ'লে নীতিশিক্ষক শিল্পী তিনি।

নি : নিশ্চয়, কিন্তু এটাও রুশ ঐতিহ্যেরই অংশ। ব্রিটিশ ঐতিহ্য না হ'তে পারে —এখানে ঔপন্যাসিকদের ভূমিকা লোকরঞ্জকের—কিন্তু রুশ ঐতিহ্যে একজন উঁচু দরের ঔপন্যাসিককে লোকশিক্ষক হ'তে হবে।

কে : মধ্যযুগের ব্রিটেনেও শিল্পের এই আদর্শই ছিলো। চসর বা ল্যাংল্যাণ্ড-এর যুগে। মনে করি যে ভারতবাসীদের এ ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হবে না, কারণ ভারতেও খুব বড় কোনো শিল্পীকে গুরুর আসন দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের কথা আপনি জানেন।

নি : জানি বৈ কি।

কে : তাহ'লে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদের উদ্দেশ্যেও সলঝেনিৎসিনের একটা বক্তব্য আছে?

নি : হ্যাঁ, পৃথিবীর ঐক্য হচ্ছে ঐ বার্তার মর্ম। পৃথিবীর এক প্রান্তের লোকেরা স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করবে, অন্য আরেক প্রান্তে ঐ স্বাধীনতাগুলো রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা একেবারে পদদলিত হবে, আর এই দুই বিপরীত প্রকৃতির সমাজব্যবস্থা সুখে সহাবস্থান করবে, কখনও পরস্পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না,—এটা কখনও চিরকাল চলতে পারে না। বস্তুত, একদলতন্ত্র গণতান্ত্রিক জগতে সর্বদাই হস্তক্ষেপ করছে, কিন্তু তা যদি না-ও করতো, তাহ'লেও তাঁর বার্তাটি শ্রবণযোগ্য হতো। তিনি বলছেন যে মানবসমাজ একটি দেহ; এই দেহের এক অংশে কিছু হ'লে অন্য অংশেও তার

প্রতিক্রিয়া হবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই এক-দলতন্ত্র একটি অন্তর্নিহিত বিপদ।

মি: তিনি বলছেন, 'আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখে নাও, একই গর্তে প'ড়ে যেও না।'

নি: এই সাবধানবাণীর ভাবগত ভিত্তি এই বিশ্বাস যে মানুষ নিছক দ্বিমাত্রিক জীব নয়, তার সত্তার একটা তৃতীয়, লোকোত্তর মাত্রা আছে। যখন এটাকে চাপা দেওয়া হয় তখন সে তার আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে।

কে: এবারে সলঝেনিৎসিনের ধর্মীয় মাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলুন, প্রাসঙ্গিক হবে।

নি: এ ব্যাপারে তিনি বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের অধিকাংশ যুবকের মতো তিনিও জীবন শুরু করেছিলেন নাস্তিক হিসেবে। আদর্শবাদের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন কম্যুনিস্ট, বিশ্বাস করতেন যে কম্যুনিস্ট আদর্শে পোঁছনো দরকার। তাঁর বন্দী দশায় তিনি ক্রমশ তলস্তয়ের শিক্ষার অনুরূপ একটা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন, যা ছিলো মুখ্যত মানবতাবাদী, ধর্মীয়-মাত্রা-বর্জিত। তার পরে ধীরে ধীরে তিনি খ্রীষ্ট-ধর্মকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন, তার প্রাচীন প্রাচ্য আকারে। বর্তমানে তিনি রুশ অর্থডক্স চার্চের সভ্য। তাঁর স্রষ্টার সঙ্গে ভাববিনিময়ের প্রকৃত এবং গভীর অভিজ্ঞতা আছে এমনই এক মানুষ তিনি। তাঁর একটি প্রিয় প্রার্থনা-বাণী আমাদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে, যা ধর্মীয় অভিজ্ঞতা বিষয়ে আমাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করে। যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিলাম যে বিশ্বাসে এবং আচরণে তিনি একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান।

কে: তাঁর শিল্পের উপরে এর প্রভাব কী?

নি: তাঁর শিল্প এ থেকে নতুন মাত্রা পেয়েছে। 'অগাস্ট, ১৯১৪'-তে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার একাধিক মহৎ ও মর্মস্পর্শী দৃশ্য বিধৃত হয়েছে। তাঁর আগেকার উপন্যাসগুলিতে ঠিক এরকমটি নেই। কোনো ঔপন্যাসিকের পক্ষে প্রার্থনার বাস্তবতাকে বর্ণনায় মূর্ত করা খুবই কঠিন, কারণ ভাষায় কুলাতে চায় না—

কে: কারণ সেটা একটা অত্যন্ত নিবিড় এবং ভিতরকার অভিজ্ঞতা।

নি: ঠিক তাই। তবু 'অগাস্ট, ১৯১৪'-তে তিনি সেই শোচনীয় লড়াইয়ের আগে সেনাধ্যক্ষ সাম্‌সনভের প্রার্থনাটিকে সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন। নিশ্চয় তাঁর নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতারই ফল এই সাফল্য। প্রার্থনার যে

বাস্তবধর্মী, অকৃত্রিম, প্রত্যয়জনক রূপায়ণ তিনি ঐ দৃশ্যটিতে পরিবেশন করেছেন তার তুলনা গোটা রুশ সাহিত্যে আর কোথাও খুঁজে পাই না।

কে : অবশ্য রুশ সাহিত্যিক ঐতিহ্য এমনিতেই অতিমাত্রায় আধ্যাত্মিক, তাই নয় কি? মোটের উপর তাতে একটি ধর্মীয় মাত্রা উপস্থিত, অনুপস্থিত নয়, তাই বলবেন তো?

নি : হ্যাঁ, আমি বলবো যে পুশ্‌কিন থেকে যার অভ্যুদয়, এবং লের্‌মন্তভ, গোগল, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রুশ সাহিত্যের যে বিশাল ধারাটি প্রবাহিত, সেটি প্রগাঢ়ভাবে ধর্মীয়। ধর্ম এ সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। অপরপক্ষে, কম্যুনিস্ট আমলে রুশ সাহিত্যের যে ধারাটি প্রচারিত ও বিজ্ঞাপিত হয়েছে তাতে এ স্বাদ নেই, এবং তার সাহিত্যমূল্যও অপেক্ষাকৃত কম।

কে : সোভিয়েত রাশিয়াতে এখন কি এমন কোনো লেখকবৃন্দ নেই, যাঁরা প্রাচীন ধর্মীয় মূল্যবোধগুলিকে তাঁদের লেখায় প্রতিবিম্বিত করছেন?

নি : সে জাতীয় কোনো লেখা তো সোভিয়েত রাশিয়াতে প্রকাশ করা অসম্ভব।

কে : কিন্তু আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্রেসে, 'সমিজ্‌দাত্‌'-এ, লুকিয়ে-চুরিয়ে নিশ্চয় কিছু প্রচারিত হচ্ছে?

নি : হচ্ছে বৈ কি। অবশ্য 'ডঃ জিভাগো'-র কথা মনে রাখতে হবে,—যা ঐ জাতের আরেকটি মহৎ রুশ উপন্যাস। তা ছাড়া আছে মাইকেল বুল্‌গাকভের 'মহাপ্রভু ও মার্গারিটা,' আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস যাতে ধর্মীয় উপাদান প্রচুর। আধুনিক রুশ কবিতাকেও, যেমন আনা আখ্‌মাতোভার কবিতায়, ধর্মের বলিষ্ঠ প্রকাশ মেলে। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রকাশিত কোনো সাহিত্যে কোনো সুস্পষ্ট ধর্মীয় কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় না। আমি বলবো যে সোভিয়েত রাশিয়ার লেখকদের লেখায় গূঢ় ধর্মীয় উপাদান ক্রমশই বাড়ছে, তবে সেগুলিকে সর্বদাই ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করতে হয়।

কে : সোজাসুজি আত্মপ্রকাশ করার স্বাধীনতাটুকু নেই?

নি : আজকের সোভিয়েত রাশিয়ায় ছাপা অক্ষরে কোনো অপরোক্ষ ধর্মীয় আত্মপ্রকাশ অসম্ভব।

মিলিৎসা : একটা স্থায়ী লড়াই চলছে, বলতে পারো।

কে : ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়ে যেতে হয় ?

নি : একটা ছোট অনুপুঙ্খ দিচ্ছি তোমাকে, যা থেকে আবহাওয়াটা কিরকম তা আন্দাজ করতে পারবে। সোভিয়েত রাশিয়াতে মুদ্রিত কোনো বইয়ে ঈশ্বর-বাচক শব্দটির আদ্য অক্ষর বড় হরফে ছাপা হবার জো নেই। এমনকি উনিশ শতকের ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনর্মুদ্রণে বা সম্পূর্ণ বিদেশী কোনো সাহিত্যের মুদ্রণের বেলাতেও এ নিয়ম মানতে হবে !

কে : এবারে সলঝেনিৎসিনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে কিছু বলুন। কবে এবং কোথায় দেখা হয়েছিলো ?

নি : ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় জুরিখে, উনি ইয়োরোপ ছেড়ে আমেরিকা চ'লে যাবার একটু আগে। উনি লেখার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছেন ; ওঁর মনে লেখার যে পরিকল্পনাটা রয়েছে সেটাকে কার্যে পরিণত করতে নিতান্ত ব্যগ্র। আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আরও পঞ্চাশ বছর ধ'রে লিখবার মতো উপাদান আমার হাতে রয়েছে, কিন্তু এখনই যখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছি, তখন আর পঞ্চাশ বছর সময় তো হাতে পাবো না, তাই আমার এ জীবনের কাজ শেষ ক'রে যেতে পারবো না।' তাই ওঁর প্রতিটি অবসরমুহূর্ত উনি রাখেন ওঁর কাজের জন্য। যখন ওঁকে টেলিফোন করলাম, তখন উনি বললেন যে উনি আমাকে মাত্র কয়েক মিনিট সময় দিতে পারেন। কিন্তু যখন আলাপ হলো তখন দু'ঘণ্টা কথা বলেছিলাম আমরা। দুটো জিনিস আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিলো। প্রথমত, ওঁর অসাধারণ হাসিটুকু। মানুষের হাসির ভঙ্গি তার ব্যক্তিত্বকে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করে। ওঁর তো খুব গম্ভীর, রাশভারী চেহারা ; কিন্তু যখন হাসেন,—এবং প্রায়ই হাসেন উনি—তখন ওঁর মুখে একটা নিষ্পাপ বালসরল উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে, ভারিক্কি ভাবটা একেবারে বদলে যায়। ওঁর অন্তস্থ সত্তাটিকে বুঝতে এটা খুবই সাহায্য করে। অনেকের হাসি এত অপ্রীতিকর হয় ! হয়তো প্রীতিকর মানুষই তাঁরা, কিন্তু যেই হাসতে শুরু করেন অমনি একটা নিষ্ঠুর বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভাব ঠিকরে বেরোয়। সলঝেনিৎসিনের বেলায় হয় উলটোটা : তাঁর অন্তস্থিত আলোকটি বিচ্ছুরিত হয়। অন্য যে জিনিসটি আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে তা হলো যিনি ওঁর সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর প্রতি ওঁর নিবিড় মনোযোগ। বিখ্যাত মানুষেরা প্রায়ই

শ্রোতা পেলেই বক্তৃতা দিতে উন্মুখ, কিন্তু উনি কথা শুনতে উৎসুক। এমনকি, যখন আমরা কথা বলছিলাম, তখন ওঁর হাতে একটা নোটবই পর্যন্ত ছিলো, এবং আমাদের আলোচনার সময় কোনো কথা ওঁর মনে রেখাপাত করলেই উনি সেটা টুকে নিচ্ছিলেন। ওঁর বিস্ময়কর সততা এবং সচেতনতার চিহ্ন এটা। নতুন জিনিস শিখতে এত তীব্র ওঁর আগ্রহ যে জ্ঞান আহরণের কোনো সুযোগ উনি ছাড়েন না।

কে : আপনার এই সাক্ষ্য সত্যিই চিত্তাকর্ষক। কোনো কোনো বিবরণে উলটো ছবি পেয়েছি—যে উনি নাকি খুব কঠোর প্রকৃতির।

নি : নাকি যা খুশি তা-ই ব'লে বেড়ান তাঁর পরিপার্শ্বের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়ে, ইত্যাদি।

কে : আচ্ছা, ওঁর জীবনের ব্রত সম্পর্কে ওঁর এই যে অসাধারণ সচেতনতা,—কেউ কেউ বলেন যে এটা প্রায় অন্ধ, বাতিকগ্রস্ত একদেশদর্শিতায় পরিণত হয়েছে। এ অভিযোগ কি খণ্ডনীয় ?

নি : এ বিষয়ে ওঁর একটা দৃঢ় প্রত্যয় আছে, কিন্তু আমার অর্থে ওঁকে একদেশদর্শী বা বাতিকগ্রস্ত বলা চলে না এই কারণে যে উনি অন্যের কথা শোনেন, শুনতে চান। ওসব বিশেষণ আমি তাঁকেই দিই যিনি শ্রোতার প্রতিক্রিয়ার দিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে সমানে বক্‌বক্‌ ক'রে যান। সলঝেনিৎসিন করেন এর উলটোটা : তিনি তন্ময় হয়ে কথা শোনেন। অন্য কারও কারও কাছে শুনেছি যে উনি আলাপ না ক'রে স্বগতভাষণ করেন, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা তো একেবারে আলাদা। হয়তো বিরূপ সমালোচকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ওঁর আচরণ অন্যরকম হয়—কে জানে। আমার কিন্তু ওঁকে মনে হয়েছিলো খুব আপনজন, খুব কাছাকাছি। বিদায়-মুহূর্তে আমরা যখন পরস্পরকে রুশ প্রথায় আলিঙ্গন করেছিলাম, তখন আমার সত্যিই প্রতীতি হয়েছিলো যে একজন বন্ধুকে আবিষ্কার করেছি।

কে : সলঝেনিৎসিনের 'জুরিখে লেনিন' বইটি বিষয়ে আপনার কিছু বলবার আছে কি, নিকোলাস ?

নি : আমার মতে ঐ ভীতিপ্রদ মানুষটির চরিত্রের একটি সফল অর্থোদ্ধার ঐ বইটি। তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর একজন মানুষকে ভিতর থেকে দেখতে পারার এই ক্ষমতা লেখকের প্রতিভারই পরিচায়ক। লেনিনের যে চিত্রটা পাচ্ছি সেটা বিকৃত ব্যঙ্গচিত্র নয় ; লেনিনের নিজস্ব কণ্ঠস্বরই শুনতে পাওয়া

যাবে বইটিতে। একটি আইডিয়ার প্রতি লেনিনের সম্পূর্ণ অভিনিবেশকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সলঝেনিৎসিন সম্প্রতি একটি রুশ পত্রিকায়—বলা বাহুল্য সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে—তুলনীয় একটি লেখা বার করেছেন, শেষ রুশ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস সম্পর্কে। এটাও একই রীতির শক্তিশালী রচনা, মুখ্যত জারের ডায়েরি ব্যবহার ক'রে লেখা; মানুষটির মানসিক অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি ভিতর থেকে বর্ণিত হয়েছে। এই দুই চরিত্রের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তা সাংঘাতিক। শেষ রুশ জারের ছিলো অনেক মহৎ ইচ্ছা, সদভিপ্রায়; কিন্তু উনি মন স্থির ক'রে কোনো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। কী কর্তব্য ঠিক করতে পারতেন না, দ্বিধা-গ্রস্ত হতেন। আর তাঁর প্রতিপক্ষ লেনিন ছিলেন এর উলটো, কখনও দ্বিধা করতেন না, যে কোনো অবস্থাতেই পরবর্তী কর্তব্য বিষয়ে তাঁর মন একেবারে স্থিরীকৃত থাকতো। যখন এ হেন দু' পক্ষে দ্বন্দ্ব বাধে তখন জয় হয় তারই যে নিজের মনকে জানে। তাঁর সমস্ত আদর্শবাদ ও সদিচ্ছা সত্ত্বেও জার সম্পূর্ণ হেরে গেলেন, কারণ উনি সিদ্ধান্তগ্রহণে অক্ষম ছিলেন। ব্যবহারিক সমস্যাগুলো অগণিত হয়ে ওঁর চোখের সামনে ভিড় করতো। আর লেনিন কোনো সমস্যাই দেখতে পেতেন না।

কে : সলঝেনিৎসিন কি বলছেন যে নীতিবিরুদ্ধ কিছু করতে লেনিন কুণ্ঠিত হতেন না?

নি : ঠিক তা নয়। বলছেন যে একটামাত্র আইডিয়া লেনিনকে পুরোপুরি পেয়ে বসেছিলো। একটা চূড়ান্ত আত্মাভিমান তাঁকে গ্রাস করেছিলো। সলঝেনিৎসিন আর লেনিন দু'জনেই তাঁদের জীবনব্রতে উৎসর্গিত,—এখানে দু' জনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে—কিন্তু সলঝেনিৎসিনের ব্রত হচ্ছে বিপদ বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা, আর লেনিন ভাবতেন যে তাঁর জীবনের কাজ হচ্ছে মানবজাতির পরিত্রাণ-সাধন। নিজেকে একজন ত্রাতা হিসেবে দেখতেন ব'লেই যীশুর প্রতি তাঁর ছিলো এক প্রবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। তাঁর চোখে খ্রীষ্ট ছিলেন একজন প্রবঞ্চক। তাঁর ধারণা ছিলো যে মানবজাতিকে কীভাবে বাঁচাতে হবে তা তিনিই জানেন।

কে : দাম্ভিক ছিলেন?

নি : একটামাত্র আইডিয়ার ভূতে পেলে মানুষের যা দশা হয়। তাঁর কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো না, টাকাকড়ির প্রতি লোভ ছিলো না।

অবশ্য টাকাপয়সা তিনি সাবধানেই খরচ করতেন, কিন্তু অর্থ তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না। নিজের মানবত্রাতার ভূমিকাটাই তাঁকে মোহাবিষ্ট করেছিলো। পুরোনো দুনিয়াটাকে ভেঙেচুরে মানুষকে বাঁচাতে হবে এই ছিলো তাঁর বদ্ধমূল ধারণা। এখন, ভাঙবার ক্ষমতা তাঁর ছিলো অসীম, কিন্তু গঠনমূলক চিন্তাধারা ছিলো না। তাই সেই পুরোনো জগতের ধ্বংসাবশেষের উপরে যে ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে তা তাঁর প্রতিশ্রুত ভবিষ্যতের চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আশা দিয়েছিলেন যে মানবজাতির রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণবর্জিত ঐক্য আসবে, সেনাবাহিনী আর থাকবে না। আর সোভিয়েত দুনিয়ায় এখন পৃথিবীর বৃহত্তম ফৌজ, কঠোরতম পুলিশী নিয়ন্ত্রণ। লেনিন বলেছিলেন এগুলো লুপ্ত হয়ে যাবে। কোথায়, হলো না তো? বরং এগুলো দৃঢ়তর হয়েছে।

কে : বস্তুত একদলীয় শাসনতন্ত্রে হিংসা একটি বড় রকমের শক্তি হয়ে পড়ে। আপনি কি বলবেন যে সলঝেনিৎসিনের প্রবণতা অহিংসার দিকে?

নি : আমি বলবো যে মন্দের দ্বারা যে মন্দকে পরাভূত করা যায় না তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। জগতের উদ্দেশ্যে এটাই তাঁর বাণী।

কে : যেটা ধর্মেরও বাণী।

নি : এবং যেটা—আমি বিশ্বাস করি দেখানো যেতে পারে—পরিণত বুদ্ধির বাণীর সঙ্গে একাত্ম। মানুষ যত হিংসা ব্যবহার করে তত তার ইষ্টসিদ্ধি বিঘ্নিত হয়।

কে : হিংসার জালে আরও বেশি ক'রে জড়িয়ে পড়ে।

নি : আষ্টে-পৃষ্টে জড়িয়ে পড়ে। বস্তুত, এটা সাধারণ বুদ্ধির কথা, কিন্তু ধর্মের পরিপ্রেক্ষিত এই সাধারণ বুদ্ধিকে পূর্ণ তাৎপর্য দেয়—যখন বিশ্বাস করা যায় যে মানুষের চেয়ে বড় এমন কোনো সার্বভৌম শক্তি আছে যা শুভানুধ্যায়ী।

কে : ধর্মবিশ্বাস একটা বিরাট চালক-শক্তি জোগায়—

নি : এবং আত্মবিশ্বাস। প্রত্যয় জোগায় যে অশুভ শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'তে পারবে না, কারণ মহাজাগতিক জীবনের পিছনে আরেকটি শক্তি—শুভশক্তি—আছে।

কে : সলঝেনিৎসিনকে তাঁর স্বদেশে কি আবার গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং বৃহৎ রুশ ঐতিহ্যে তাঁর মর্যাদা কি আবার প্রতিষ্ঠিত হবে? এখন থেকে সর্বদাই কি রুশ সাহিত্যের দু'টি ঐতিহ্য থাকবে, একটি দেশের ভিতরে, একটি বাইরে?

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিবাদপন্থী গোষ্ঠীগুলিতে সলঝেনিৎসিনের খ্যাতির অবস্থা এখন কিরকম ?

নি : আজকের রাশিয়ায় দুটো ঐতিহ্য নেই—রুশ ঐতিহ্য একটিই। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম সাহিত্যের ধারা প্রবর্তিত করেছে, যে ধারার লেখকদের অধিকাংশকেই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা বলতে হয়। আজকের রাশিয়ার পক্ষে সলঝেনিৎসিন বিপুলভাবে তাৎপর্যময়, কারণ তিনি এমন অনেককে মুখ খুলে কথা বলতে সাহস দিয়েছেন যাদের আগে সে সাহস ছিলো না, ভয়ে যারা আড়ষ্ট হয়েছিলো। তাঁর প্রভাবে অনেকে তাঁদের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কথা কইতে শুরু করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ গালিচ্ নামে একজন কবি, যিনি এই সম্প্রতি নির্বাসনে মারা গেলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার খুব জনপ্রিয় কবি ছিলেন, ওঁর নাটক অভিনীত হতো, ইত্যাদি। নিজের কণ্ঠস্বরে কথা কইতেন না। তার পর সলঝেনিৎসিনের প্রভাবে স্বকীয় কণ্ঠস্বরে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর হঠাৎ একজন নতুন, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী হয়ে উঠলেন। আর তার পরই সোভিয়েত রাশিয়া থেকে হলেন নির্বাসিত। একটি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন বেচারী.—বয়স তেমন কিছু হয়নি, মাত্র ষাটের কোঠায়। সলঝেনিৎসিনের অনুপ্রেরণায় হারানো প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছেন এমন মানুষ আরও আছেন। আর সেজন্যই তো সলঝেনিৎসিনকে এতটা ভয় পান সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ, সেজন্যই তাঁর বই এত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যদি তাঁর কোনো প্রভাব না থাকতো. তাহ'লে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ তাঁকে এতটা ভয়ের চোখে দেখতেন না।

কে : উপেক্ষা করতেন।

নি : ঠিক তাই।

কে : তাহ'লে সলঝেনিৎসিনের খ্যাতির পুনর্বাসন ঘটবে ?

নি : আজকের সোভিয়েত রাশিয়ায় উনি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি।

কে : কী অর্থে, নিকোলাস ?

নি : ওঁর নির্ভীকতাকে প্রত্যেকে তারিফ করে। সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, যার লেখক এখনও সোভিয়েত রাশিয়ার ভিতরেই আছেন। লেখকের নাম আলেক্সান্দার জিনোভিয়েভ। ভারী সরস, কৌতূহলোদ্দীপক বইটি, আর সলঝেনিৎসিনের

কথায় ঠাসা। ওঁর কথা বারে বারেই উল্লেখ করেছেন লেখক। বইটি বার হবার পরে লেখককে সোভিয়েত সরকারের অনেক অত্যাচার সইতে হয়েছে। তাঁর সমস্ত পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন তিনি। অ্যাকাডেমির সভ্য ছিলেন, সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। এমনকি তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রিটি পর্যন্ত সরকার কেড়ে নিয়েছেন!

কে : তাহ'লে ওখানে সলঝেনিৎসিনের লেখা কি লোকে এখনও পড়ে?

নি : সুযোগ পেলেই পড়ে। অবশ্য খুব বিপজ্জনক কাজ সেটা। তা সত্ত্বেও তিনি পাঠকমানসে অনুপ্রবিষ্ট।

কে : তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি গোপনে প্রচারিত হয়?

নি : হয় বৈ কি। এই তো প্যারিসে একটি বই বার হয়েছে—'অগাস্ট, ১৯১৪'-র উপর ভাষ্যাবলী—লিখেছেন সোভিয়েত রাশিয়ার ভিতরকার লোকেরাই। অবশ্যই তাঁদের নাম প্রকাশিত হয়নি।

কে : তাহ'লে ও ধরনের পাণ্ডুলিপি ক্রমাগত চোরা-গোপ্তা উপায়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে আনা হচ্ছে?

নি : সর্বদা।

কে : আর প্যারিসের রুশ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মস্কোর ক্রমাগত আদান-প্রদান চলছে?

নি : বর্তমানে খুব জোর আদান-প্রদান চলছে।

কে : প্যারিস কি এখনও দেশান্তরিত রুশদের কেন্দ্রস্থল?

নি : হ্যাঁ, এক অর্থে, যদিও অনেকেই চ'লে গেছেন আমেরিকায়।

কে : আমেরিকায় সলঝেনিৎসিনের ভূমিকা কী? উনি কি ওখানে দেশান্তরিত রুশদের সমবেত করছেন?

নি : না না, সেরকম কিছু করার কোনো চেষ্টা উনি করছেন না। উনি নির্জন জীবন যাপন করেন, লেখার কাজে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। ওঁর মতে ওঁর ভূমিকা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়, লেখক হিসেবে।

কে : ওঁর প্রথম স্ত্রী বলেছেন যে সলঝেনিৎসিন নাকি সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি সুবিচার করেননি, ইত্যাদি। এ বিষয়ে আপনার কি মত? এটা কি তিক্ততা?

নি : হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। ভদ্রমহিলা বইটা লিখেছিলেন 'কে. জি.বি.' বা গুপ্ত পুলিশের চাপে প'ড়ে। ওরা ওঁকে বইটা লিখতে আদেশ করে। কাজেই লেখাটা ওঁর স্বাধীন আত্মপ্রকাশ নয়। হয়তো সলঝেনিৎ-

সিনের বিরুদ্ধে ওঁর ব্যক্তিগত অসন্তোষের জন্যই উনি বইটা লিখতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে উনিও সলঝেনিৎসিনকে খুব একটা আক্রমণ করতে পারেননি। উনি অভিযোগ করেছেন যে সলঝেনিৎসিন স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, তাঁর জীবনব্রতে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট। অবশ্যই উনি ওঁর জীবনব্রতে সমর্পিত! ভদ্রমহিলা ইঙ্গিত করেছেন যে স্তালিনের আমলে সলঝেনিৎসিন যখন গ্রেপ্তার হন, তখন উনি নাকি ওঁর বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে'ছিলেন। এটা ভিত্তিহীন অপবাদ, কারণ ওঁর বন্ধুরা কেউ গ্রেপ্তার হননি, আর স্তালিনের আমলে কেউ যদি বন্ধুদের ধরিয়ে দিতো তবে তারা নির্ঘাৎ গ্রেপ্তার হতো।

কে : সলঝেনিৎসিনের হার্ভার্ডে দেওয়া বক্তৃতাটি প'ড়ে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হলো?

নি : একদলতন্ত্রের বিপদ সম্বন্ধে পশ্চিমের উদ্দেশ্যে তাঁর সাবধান-বাণীরই একটি পরিণততর রূপ বক্তৃতাটি। মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঐক্য সম্বন্ধে চেতনাও বর্ধিত করতে চেয়েছেন।

কে : বামপন্থীদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে সলঝেনিৎসিনকে পশ্চিমের চাটুকার হিসেবে দেখা।

নি : যা তিনি আদপেই নন। আবার কেউ কেউ বলেন যে উনি প্রায় গান্ধীর মতো সহজতর সরলতর জীবনে ফিরে যেতে চান, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার একেবারে বিরুদ্ধে—এটাও ওঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক বিশ্লেষণ নয়।

কে : তাহ'লে উনি পৃথিবীকে একটি সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখেন? প্রাদেশিক নন, আন্তর্জাতিক?

নি : খুবই আন্তর্জাতিক। পশ্চিমকে অবহিত করতে হবে এটা উনি তীব্রভাবে অনুভব করেন।

কে : একদলতন্ত্রের বিপদের বিরুদ্ধে?

নি : ঠিক তাই। পশ্চিম যদি তার মূল্যবোধ হারায়, তাহ'লে একদলতন্ত্রের করতলগত হয়ে পড়বে। মানুষ যখন তার ঐহিক ভোগসুখে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, নতুন গাড়ি বা রেফ্রিজরেটার ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারে না, তখন সে সহজেই একদলতন্ত্রের শিকার হয়, দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দুনিয়ার অনেকে মনে করেন যে এ জাতীয় দুর্ঘটনা নাকি পশ্চিমে হ'তে পারে না, কারণ 'প্রাচ্য দুনিয়ার মানুষ একনায়কত্ব, স্বৈরাচার, দারিদ্র্য

প্রভৃতিতে অভ্যস্ত ; তাদের ভাগ্যই তাই ; কিন্তু আমরা অন্য জাতের মানুষ, উন্নততর জীব', ইত্যাদি। কিন্তু এটা নির্জলা আত্মপ্রতারণা।

কে : এই মনোবৃত্তি অনেক দিনের ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক দম্ভের জাতক।

নি : রাশিয়ার মানুষ নাকি শ্রমশিবির পছন্দ করে! তারা নাকি দাসবৃত্তি উপভোগ করে!

কে : এশিয়ার মানুষ সম্পর্কেও এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। তারাও নাকি দাসবৃত্তি পছন্দ করে! রাশিয়ার মানুষ আর এশিয়ার মানুষ উভয় দলই নাকি বর্বর! 'ওরিয়েণ্টাল ডেস্‌পটিজ্‌ম্'-এর থিওরি অনেক দিনের পুরোনো।

নি : রাশিয়ার মানুষকে নাকি মার না দিয়ে শাসন করা যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কে : আচ্ছা, এবারে থামা যাক। অনেক ধন্যবাদ. নিকোলাস। আপনি আমাকে প্রচুর মালমশলা দিয়েছেন।

নি : বিস্তৃত আলোচনা হলো। খুবই উপভোগ করলাম। ধন্যবাদ, বিশেষ বন্ধু।

৩

উপরে যে আলোচনাটি পেশ করলাম তার উদ্দেশ্য নয় সলঝেনিৎসিন সম্পর্কে তর্কের অবসান ঘটানো বা শেষ কথা বলা, উদ্দেশ্য খানিকটা খবর দেওয়া আর খানিকটা চিন্তার উদ্দীপন। সলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গে নিকোলাস জার্নভের মতো একজন মানুষের ভাবনা-বেদনাকে এ কারণে মূল্যবান মনে করি যে নিকোলাস শুধু যে একজন রুশভাষী বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক তাই নন, উপরন্তু সেই প্রাচ্য-খ্রীষ্টীয় রুশ ঐতিহ্যের সন্তান, যা রুশ দুনিয়ার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার, যার সঙ্গে সলঝেনিৎসিন নিজেকে মেলাতে চেয়েছেন, এবং যার সঙ্গে সোভিয়েত রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিজেদের মেলানো বারণ। সলঝেনিৎসিন তাঁর স্বজাতীয় ঐতিহ্যে নিহিতমূল, বিভিন্ন ভাবধারার সারগ্রাহী একজন চিন্তাশীল লেখক। তাঁর বিবর্তন ভালো ক'রে বুঝতে হ'লে উনিশ শতকের রাশিয়ার বৌদ্ধিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে গবেষণা চলছে এবং অনেক দিন ধ'রে চলবে ; আপাতত বক্তব্য যে তাঁর বিবর্তন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও অনুধাবনযোগ্য, এবং তাঁর বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য।

এটা মনে রাখতে হবে যে মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সলঝেনিৎসিন সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভিতরেই ছিলেন। তথাকথিত লৌহযবনিকার অন্তরাল থেকে

বাইরের দুনিয়া সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য খবরাখবর কতটা পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। হয়তো সে কারণে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বাইরে যে দুনিয়া সে সম্পর্কে তাঁর কোনো কোনো মন্তব্যে বিরোধাভাস প্রাপ্তব্য। আমাদের মনে হ'তে পারে উনি উলটো-পালটা, স্ববিরোধী কথা বলছেন; গৌণ ব্যাপারে বেশি ঝোঁক দিচ্ছেন; গুরু-লঘুর তফাৎ করছেন না। যেমন কেউ কেউ অভিযোগ করেন, 'উনি বাঁ দিকের একদলতন্ত্রকে সমানে সমালোচনা ক'রে যাচ্ছেন, ডান দিকের একদলতন্ত্রও যে কতখানি খারাপ তা নিয়ে কোনো আলোচনা করছেন না কেন?' তার কারণ নিশ্চয় এই যে উনি দক্ষিণপন্থী একদলতন্ত্রে মানুষ হননি, সে সম্বন্ধে কোনো খাঁটি, তাজা খবর তাঁর দেবার নেই, বামপন্থী একদলতন্ত্র সম্বন্ধেই অনেক খবর দেবার আছে, আর প্রথম ধরণের একদলতন্ত্রের অবাঞ্ছিত দিকগুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের নতুন ক'রে কিছু বলবার প্রয়োজন কম, সে সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত।

হয়তো এটা ঠিক যে অপর জাতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবার মতো মানসিক পরিণতি কোনো জাতিরই নেই, প্রত্যেক জাতিকেই উত্তীর্ণ হ'তে হবে নিজস্ব অগ্নিপরীক্ষায়। তবুও বলতে হয় যে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় বড়-হয়ে-ওঠা এই মানুষটি জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ, স্তালিনের শ্রমশিবিরে অবরোধ, কঠিন কর্কটরোগের সঙ্গে লড়াই ক'রে জয়লাভ, সোভিয়েত রাশিয়াতে তাঁর লেখা প্রকাশের জন্য সংগ্রাম, স্বদেশ থেকে নির্বাসন, ইত্যাদি; এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে এমন একজন মানুষের সাক্ষ্য এবং সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর পৃথিবীর উদ্দেশ্যে তাঁর সাবধান-বাণী সযত্ন শুনানি দাবি করে। কম্যুনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত, চিন্তাশীল, বিজ্ঞানলালিত একটি সোভিয়েত যুবক—গণিত ও পদার্থবিদ্যার স্নাতক তিনি—কেন, কীভাবে তাঁর দেশের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার প্রখর সমালোচক হয়ে উঠলেন, ধর্মবিশ্বাসে ফিরে গেলেন, এবং কী সেই অন্তস্থ দীপ্ত প্রত্যয় যা তাঁকে দিয়ে একের পর এক উল্লেখযোগ্য বই লিখিয়ে নিচ্ছে: এই প্রশ্নগুলি নিশ্চয় ভেবে দেখবার মতো। সোভিয়েত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে আঁকা হয় একজন উৎকট কালাপাহাড় হিসেবে। কিন্তু তিনি নন নিষ্ঠুর বা বিকট, বরং একজন গভীর প্রেমিক, এবং তাঁর যে নিরন্তর সংগ্রাম তা একদলতান্ত্রিক সমাজের অপ্রেম, অসত্য, অসহিষ্ণুতা, দমননীতি, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, প্রাতিষ্ঠানিক জুগুপ্সা, ইতিহাসের প্রণালীবদ্ধ বিকৃতি, ইত্যাদিরই বিরুদ্ধে। তিনি কালাপাহাড় শুধু এই

অর্থে যে তিনি তাঁর সমাজের একজন মৌলিক সমালোচক, তার প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী, এবং প্রত্যেক সমাজেই মৌলিক প্রতিবাদের প্রয়োজন রয়েছে। ইতিহাসে বারে বারেই দেখি যে আজকে যাকে মনে হয় 'heresy' বা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধতা তা কয়েক শতাব্দী পরে মর্যাদা পায়; সলঝেনিৎসিনের চিন্তাধারার বেলাতেও একই ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি লেনিনের সমালোচনা করেছেন ব'লে বামপন্থীরা ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু এ দুনিয়ার কেউই নন সমালোচনার উর্ধ্বে স্থিত জ্যোতির্ময় গুরুদেব, বিশেষত এমন কেউ রাজনীতি যাঁর চারণভূমি, এবং যিনি বিশ্বাস করেন যে লক্ষ্যের সাধুতা ভ্রষ্ট পন্থার দোষমোচন করে। তা ছাড়া 'জুরিখে লেনিন' বইটিতে লেনিনকে দোষে-গুণে মেলানো মানবিক মাত্রাতেই আঁকা হয়েছে। যেমন দেখানো হয়েছে একটি আইডিয়ার ঘোরে মোহাবিষ্ট একটি মানুষকে. তেমন দেখানো হয়েছে প্রেমিক লেনিনকে। অন্যত্র যিনি প্রবল প্রতাপশালী দলীয় নেতা, ইনেসা আর্মাণ্ড্-এর কাছে তিনিই দুর্বল. ছেলেমানুষ।

যাঁরা মনে করেন যে সলঝেনিৎসিন পশ্চিমের মোসাহেব তাঁরা তাঁর ৮ই জুন, ১৯৭৮ তারিখে হার্ভার্ড স্কোয়ারে প্রদত্ত ভাষণটি প'ড়ে দেখবেন। ঐ বৃষ্টি-ঝরা দিনে পনেরো হাজার মানুষ ছাতা মাথায় দিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে সমবেত হন, কিন্তু পশ্চিমের প্রশংসা শোনার সৌভাগ্য তাঁদের হয়নি। ২৬শে জুলাই, ১৯৭৮ তারিখের লণ্ডন থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় ভাষণটির ইংরেজী অনুবাদ পড়লাম। ঠিক যেভাবে তিনি সোভিয়েত সমাজের সমালোচনা ক'রে থাকেন সেভাবেই তাঁর গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতারও মৌলিক, কঠোর সমালোচনা করেছেন, যা মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথকৃত পশ্চিমের সমালোচনাকে মনে করায়। পশ্চিমের জড়বাদ, ভোগবাদ, স্বার্থপরতা. কাপুরুষতা, আইনসর্বস্ব সংকীর্ণতা, এশিয়া-আফ্রিকার প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতা, ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে দায়িত্বজ্ঞানমুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতা, যৌনতার অপ-ব্যবহার, শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঔদাসীন্য, খুনজখম ও অশ্লীলতায় সমাকীর্ণ ফিল্মী জগৎ: এ সব প্রবণতার যে তীব্র সমালোচনা ভাষণটিতে বিধৃত হয়েছে তা একজন চিন্তাশীল পর্যবেক্ষককেই সূচিত করে। তিনি জানেন যে যদিও সোভিয়েত সরকার স্বৈরাচারী এবং সোভিয়েত সমাজ বিত্তসম্ভারে পশ্চিমের চেয়ে দরিদ্রতর, তবুও আইনশাসিত ও সচ্ছলতর পশ্চিমে সোভিয়েত সমাজের চেয়ে অপরাধের হার ঢের বেশি। 'যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে আজকের পশ্চিমকে আমি আমার দেশবাসীর কাছে মডেল হিসেবে নির্দিষ্ট করবো কি না,

তাহ'লে আমার উত্তর হবে স্পষ্টত নঞর্থক', পরিষ্কার বলেছেন তিনি। এর পরে তাঁকে আর যা-ই বলা যাক, পশ্চিমের তোষামোদকারী বলা চলে না। তিনি জানেন যে তথাকথিত 'প্রথম' এবং 'দ্বিতীয়' উভয় দুনিয়াই রেনেসাঁস-পরবর্তী ইয়োরোপীয় সভ্যতার দুই সন্তান, কারণ মার্ক্সবাদ ইয়োরোপীয় মানবতাবাদেরই জাতক, এবং এই দুই দুনিয়াতেই প্রেমহীন, হৃদয়হীন, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধশূন্য মানবতাবাদের ধারাটির অন্তিম ব্যর্থতা তিনি ধরতে পেরেছেন। তাই তিনি বলতে পারেন যে 'মহাকাশবিজয় সুদ্ধ যন্ত্রবিদ্যার যাবতীয় কীর্তিত প্রগতি বিশ শতকের সেই নৈতিক দীনতার ক্ষতিপূরণ করতে পারে না, যে দীনতার কথা মাত্র উনিশ শতকেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি'।

এই দুই দুনিয়ার সভ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে রহস্যাক্রান্ত সৃষ্টির সম্মুখে প্রয়োজনীয় বিনয়, যে মাত্রাটুকু ছাড়া প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব আসে না, মর্তে স্বর্গ রচিত হয় না, কীর্তি লুপ্ত হয় অসার অহমিকায়। কেউ যদি প্রমাণ করতে বসেন যে সলঝেনিৎসিন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী তা হবে নিছক বাতুলতা ; তিনি বিরোধী সেই উদ্ধত ডগ্‌মা-র বা অবধারিত মতের, যা ঐ আদর্শকে কীভাবে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে হবে সে বিষয়ে একক পন্থা স্থির ক'রে ফেলেছে এবং সর্বদাই ঘোষণা করছে যে নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে ; যা বিশ্বাস করে যে ঐ আদর্শে পৌঁছনোর পথে বেশ খানিকটা নীতিভ্রষ্ট হ'লেও কিছু এসে যাবে না, আদর্শের খাতিরে শুধু দু'একটি নিষ্ঠুর কাজ নয় শত-শত সহস্র-সহস্র মানুষের প্রতি বর্বরতাও বৈধ হবে ; যা দু'-চারজন মানুষের লেখাকে প্রামাণ্য ব'লে গ্রহণ ক'রে অন্য সবাইকার অন্তর্দৃষ্টি ও বিবেচনাকে ভ্রান্ত ব'লে নামাঙ্কিত করে ; যা সমালোচনা সহ্য করতে পারে না ; যা পৃথিবীকে সর্বদা শত্রুশিবির ও মিত্রশিবিরে বিভক্ত ক'রে দেখে। সলঝেনিৎসিন বোঝেন যে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্বের মাধ্যমে যেমন পারিবারিক শান্তি আসে না, তেমনই শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমেও মৈত্রী আসতে পারে না। সংগ্রামের মাধ্যমে বড় জোর সম্ভব এক গোষ্ঠীর হাতে আরেক গোষ্ঠীর পরাজয়, কিন্তু তা নয় প্রকৃত শান্তিতে উত্তরণের সঙ্গে সমার্থক, যেটা বিজয়ী পাণ্ডবদের বুঝতে হয়েছিলো কুরু-ক্ষেত্রের শেষে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ বংশজাত খ্যাতনামা লেখক এবং বর্ণবিভাগপ্রথার নামজাদা বিরোধী লরেন্স ভ্যান্‌ডের্‌ পোস্ট-এর একটি উক্তি। ইনি ইয়োরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানকার লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিশেছেন। বি.বি.সি. টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানে

ইনি পাশ্চাত্য জগৎ, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোভিয়েত রাষ্ট্র, প্রতিটি দুনিয়াতেই একটি দলের হাতে আরেকটি দলের নিপীড়নকে ইয়োরোপীয় ক্যাল্‌ভিনিজ্‌ম্ (Calvinism)-এর জাতকরূপে চিহ্নিত করেছেন। ইহুদীবিদ্বেষ, সোভিয়েত সমাজে প্রতিবাদীদের দমন, প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি দেখেন ক্যাল্‌ভিনীয় আত্মগরিমা এবং তার অবধারিত উলটো পিঠ, পরবিদ্বেষ। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে তিনি বর্ণনা করেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্যাল্‌ভিনিজ্‌ম্ হিসেবে। 'যারা আমার সপক্ষে নয় তারা আমার বিপক্ষে।' স্মরণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানসিকতার বিশ্লেষণেও এই সূত্রটি সাহায্য করতে পারে, কারণ সেখানেও প্রটেস্টাণ্ট-ক্যালভিনীয় মনোবৃত্তি শ্বেতসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ক্যাল্‌ভিনিজ্‌ম্ সূচিত করে দ্বিখণ্ডিত চেতনাকে। নৈতিক আত্মশ্লাঘার অনিবার্য পরিণাম আমাদের অভ্যন্তরীণ কোমল, শিশুসুলভ, প্রাকৃত, বন্য বা সংরক্ত প্রবৃত্তিগুলির দমন ; প্রেম, ক্ষমা ও অন্যান্য নারীসুলভ বৃত্তিগুলির অবমাননা ও কঠোর পৌরুষের জয়জয়কার ; সংক্ষেপে, এক ধরনের আত্মলাঞ্ছনা। আত্মলাঞ্ছনার মুকুর, মনস্তত্ত্ব বলে, পরলাঞ্ছনা। যে নিজের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে চেপে রাখে সে অপরেরও টুঁটি টিপে রাখে। এই অবস্থার প্রতিক্রিয়াতেই পাশ্চাত্য যুবসমাজ ছোটে উদ্দামতার বা হিপি-তন্ত্রের বিপরীত মেরুতে ; তার প্রতিক্রিয়ায় আবার আসে রক্ষণশীল কঠোরতা : এভাবে চলতে থাকে দ্বিধাবিভক্ত সভ্যতার দোলাচল পেণ্ডুলম্, যে অস্থিরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন অনেক শিল্পী, মানুষকে পূর্ণ ও অবিভক্ত করার প্রয়াসে। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তপস্বীর অহংকার, উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণের দমন, পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু সমাজে নারীর নিপীড়ন, ইসলামপন্থীর কাফেরবিদ্বেষ ইত্যাদি ক্যাল্‌ভিনীয় মনোবৃত্তির সমগোত্রীয়।

এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা যায় আমাদের সময়ের আরেক বিশ্বখ্যাত দরদী শিল্পীর উক্তি। বেহালাবাদক, সংগীতরসিক, ভারতপ্রেমিক, রবিশঙ্করের অনুরাগী বন্ধু য়েহুদি মেনুহিনও মানুষের অবিভাজ্য পূর্ণতার সন্ধানী এবং আক্রান্ত মূল্যবোধগুলির একজন স্পষ্টবাদী আরক্ষক। তিনি বলেন যে পৃথিবীর 'ইজ্‌ম্'-গুলিকে এক একটি দল দখল ক'রে বসে, অপর কোনো দলকে অপরাধীর কাঠগড়ায় খাড়া ক'রে তাকে হারিয়ে দিয়ে নিজেদের দলকে জেতানোর চেষ্টায় মগ্ন হয়। তাই ঐ 'ইজ্‌ম্'-গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আদর্শবাদগুলি তেতো হয়ে যায়। সোভিয়েত সাম্যবাদকে তিনিও চিহ্নিত করেন ইহুদী-খ্রীষ্টীয় ইয়োরোপীয় সভ্যতার একটি নতুন শাখারূপে, যেখানে আগেকার ইয়োরোপীয় দাম্ভিকতা ও অসহিষ্ণুতা নতুন মূর্তিতে অবতীর্ণ

হয়েছে। 'এই ঐতিহ্যের একটি প্রধান ভাববস্তু হলো যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্বের উপরে প্রভুত্ব করবার জন্য। শুধু মানুষেরই আত্মা আছে। এই ভ্রান্ত, একমাত্রিক, আদিম, পৃথিবী-একটি-সমতলক্ষেত্র জাতের ধারণা এখনও এই খ্রীষ্টীয় তরুর সাম্প্রতিকতম শাখাটির বৈশিষ্ট্য।'[১]

সলঝেনিৎসিনের ধর্মবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য তাহ'লে কী? এ ঘটনাটি বুঝতে হবে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে। মার্ক্সবাদ যে ইয়োরোপীয় মানবতাবাদের জাতক এ পর্যন্ত সলঝেনিৎসিন পরিষ্কার বুঝেছেন ইয়োরোপীয় মানবতাবাদ যে আবার ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টধর্মেরই জাতক সেটা তিনি কতটা ধরতে পেরেছেন তা বলা কঠিন। কারণ তিনি প্রাচ্য-খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের মানুষ। রুশ অর্থডক্স চার্চ বহু শতাব্দী ধ'রে পশ্চিম ইয়োরোপের ক্যাথলিক ও প্রটেস্টাণ্ট ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র, ভিন্ন পথের যাত্রী। প্রাচ্য-খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যে ক্যাল্‌ভিনিজ্‌মের কঠোরতার চেয়ে ধ্যান, মরমিয়া সাধনা, শান্ত ভক্তিরসের স্বাদটিই গাঢ়তর। এটা বিস্ময়কর নয় যে পশ্চিম ইয়োরোপের ধর্ম ও মানবতাবাদের অন্তর্বর্তী সংযোগসূত্রটি সলঝেনিৎসিনের কাছে ততটা স্পষ্ট নয়। তাঁর জীবনের সুকঠিন সংগ্রামগুলি মার্ক্সবাদের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় তাঁকে ঠেলেছে লোকোত্তর নির্ভরের সন্ধানে, আর যেটা তাঁর পক্ষে নিকটতম, পরিচিততম আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য তিনি স্বভাবতই ফিরে গেছেন তার দ্বারে, আহত শিশু যেমন যায় তার মায়ের কোলে। যাঁদের জীবনে কোনো প্রত্যক্ষ কঠিন অত্যাচার সইতে হয়নি তাঁরা যতটা স্বনির্ভর হ'তে পারেন অত্যাচারিতেরা ঠিক ততটা স্বনির্ভর হ'তে পারেন না। বিক্ষত মানুষের লাগে একটু বাড়তি স্নেহ, বিশেষ ভরসা, ছায়াময় আশ্রয়। সেই আশ্রয়, ভরসা ও প্রেমের সন্ধান সলঝেনিৎসিন পেয়েছেন তাঁর দেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে। দুঃখের সাধনায় যে নির্ভর তাঁকে বাঁচতে সাহায্য করেছে তার সম্মুখে আমাদের বিনয় ব্যতীত কোনো ভঙ্গিই শোভন নয়।

নিকোলাস জার্নভ এবং তাঁর মতো সুধীরা বলেন যে পশ্চিম ইয়োরোপীয় সভ্যতার জাতক মার্ক্সবাদ, যাকে লেনিন রাশিয়ার মাটিতে প্রোথিত করতে চেয়েছিলেন, রাশিয়ার স্বকীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূলত বিদেশী। তা রাশিয়াতে

১. দ্রষ্টব্য তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ: Yehudi Menuhin, *Theme and Variations*, Heinemann, London, 1972।

কিছুদিনের জন্য রাজত্ব করলেও তার বিরুদ্ধে প্রাচ্য-খ্রীষ্টীয় প্রতিক্রিয়া ও রুশ আধ্যাত্মিকতার নবজাগরণ অবশ্যম্ভাবী। আপাতত এটুকু স্পষ্ট যে আমাদের থেকে কোটি-কোটি-গুণ বৃহত্তর সৃষ্টির অভ্যন্তরে থেকে সুস্থ বিবর্তনের জন্য প্রত্যেক সভ্যতারই প্রয়োজন তার পূর্বপুরুষদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিগুলির সঙ্গে যোগাযোগের লাইন খোলা রাখা।

নেহরু পুরস্কার গ্রহণের সময় তাঁর প্রদত্ত ভাষণে য়েহুদি মেনুহিন বলেছিলেন **'I am a Communist with Jesus'**, 'আমি যীশুর সঙ্গে সাম্যবাদী'।[১] হয়তো সলঝেনিৎসিনও বলতে পারতেন ঐ কথা। এটুকু পরিষ্কার যে হিংসা আর প্রতিহিংসার, দমন আর প্রতিদমনের আবর্তিত চক্র থেকে যে সাম্যবাদ মুক্ত নয়, যে সাম্যবাদে প্রেমের স্থান নেই, তাতে তাঁর অন্তর সায় দেয় না।[২]

১. মেনুহিনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২. এই প্রবন্ধের উপরে সর্বশেষ টীকা হিসেবে জানাই যে অক্সফোর্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, আমাদের অনেকের প্রিয় নিকোলাস জার্নভ আর বেঁচে নেই।

—কে. কু. ডা., ১৯৮৬

সিলভিয়া প্ল্যাথের পারিবারিক চিঠিপত্র

ষাটের দশকে 'দেশ' পত্রিকার তদানীন্তন 'বিদেশের বই' স্তম্ভে অকালমৃতা কবি সিলভিয়া প্ল্যাথের মৃত্যুর-পরে-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'এরিয়েল'-এর আলোচনা পেশ করেছিলাম। সে সময়ে তাঁকে নিয়ে যেমন হৈ-চৈ চলছিলো তেমনই কঠিন ছিলো তাঁর জীবন সম্বন্ধে খাঁটি খবরাখবর জোগাড় করা। মনে আছে যে পুস্তক-আলোচনাটির সঙ্গে মুদ্রণের জন্য ফেবার প্রকাশসংস্থার কাছে শ্রীমতী প্ল্যাথের একটি আলোকচিত্র চেয়েও নিরাশ হয়েছিলাম। কবির স্বামী, খ্যাতনামা ইংরেজ কবি টেড হিউম—যাঁর বই 'লুপারকাল'-ও 'বিদেশের বই' স্তম্ভে আলোচনা করেছিলাম—মৃতা স্ত্রীর কোনো ছবি ছাপতে অনুমতি দিচ্ছিলেন না। সিলভিয়ার মৃত্যুর আগে কবিদম্পতির মধ্যে যে ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো এ খবরটাও সুবিদিত তথ্য ছিলো না; আমিও জানতাম না।

তখনকার পারিবারিক শোক, ভুল-বোঝাবুঝির পালা, পাঠকদের এবং সাংবাদিকদের উদগ্র কৌতূহলের হট্টগোলের মধ্যে আত্মঘাতিনীর নিকটস্থ মানুষ-জনের ঐ নীরবতাই ছিলো স্বাভাবিক। তার পর সময়ে অনিবার্যত স্তিমিত হয়ে এসেছে তাঁর আত্মহত্যা-ঘটিত উত্তেজনা। তাঁর জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে মূল্যবান সাক্ষ্য দিয়েছেন পরিচিতেরা, বিশেষত তাঁর স্বামী এবং মার্কিন কলেজজীবনের বান্ধবী ন্যান্সি হান্টার স্টাইনার। তাঁর কবিতার বিভিন্ন দিকও গবেষকদের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁর রচনাবলীর শক্তি, বিকারপ্রীতি, এবং তাঁর জীবন ও সৃষ্টির অন্যোন্যসম্পর্ককে চুল-চেরা বিশ্লেষণের অধীন করেছেন কবি ও সমালোচক ডেভিড হলব্রুক। সর্বোপরি, পারিবারিক ইতিহাস-সম্বলিত ভূমিকা, সিলভিয়ার বাল্যকালের ডায়েরি থেকে উদ্ধৃতি, এবং প্রচুর আলোকচিত্র সহ ১৯৫০ সালে স্মিথ্‌ কলেজে প্রবেশকাল থেকে ১৯৬৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত সিলভিয়ার বাড়িতে-লেখা চিঠিপত্রের একটি বিশাল অংশ সাধারণ্যে পরিবেশন করেছেন কবির মা শ্রীমতী অরেলিয়া শোবার প্ল্যাথ।[১]

১. প্রবন্ধে উল্লিখিত যাবতীয় বইয়ের খুঁটিনাটি প্রবন্ধের শেষে প্রদত্ত গ্রন্থ-তালিকায় প্রাপ্তব্য।

ঐ সময়ের মধ্যে সিলভিয়া নাকি বাড়িতে সর্বসমেত ৬৯৬টি চিঠি লিখেছিলেন, অধিকাংশই মায়ের কাছে, কখনও-বা ভাইয়ের কাছে, এবং কখনও কখনও, বলা বাহুল্য, দু'জনের কাছে একসঙ্গে। এ সম্ভারের সবটাই অরেলিয়া আমাদের হাতে দেননি। ঘটনাবলীর এত কাছাকাছি সময়ে, কবির জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত অনেকেরই জীবদ্দশায় ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের কিছু কিছু অংশ বাদ দিতে হয়েছে। তবুও পাঁচশ' পাতার এই বইটি কবিলিখিত তাৎপর্যপূর্ণ চিঠিপত্রের একটি বিরাট অংশ, একটি বিপুল সম্ভার। সিলভিয়ার সাহিত্যকীর্তি যাঁদেরই আলোচ্য—এবং আধুনিক ইংরেজী বা মার্কিন কবিতার চর্চা যাঁরা ক'রে থাকেন তাঁদের এই বিতর্কিত শিল্পীর রচনাবলীর সঙ্গে বোঝাপড়া না ক'রে উপায় নেই—তাঁদেরই কবিজননীসম্পাদিত চিঠিপত্রের এই মোটা সংকলনগ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য।

কন্যার আত্মহত্যার পর, একই বছর তাঁর ভয়ংকর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'দ্য বেল্ জার'-এর প্রচারের ফলে, এবং ১৯৬৫ সালে 'এরিয়েল'-এর সমান ভয়ংকর কবিতাগুলি প্রকাশিত হওয়াতে কবিজননীকে অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়। প্রশ্নগুলি কী তা আমরা সহজেই অনুমান ক'রে নিতে পারি। কেন সিলভিয়া আত্মহত্যা করলেন ? তাঁর লেখায় মৃত্যু, অপমৃত্যু, আত্মহত্যা, অপঘাত, শারীরিক-মানসিক বৈকল্য প্রভৃতি ভাববস্তুর এত সাংঘাতিক প্রাধান্য কেন ? তাঁর জীবনে এমন কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিলো যার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর লেখা এত বিকার-বিলাসী ও ভূতগ্রস্ত ? তাঁর মানসিক অস্বাস্থ্যের কোনো বীজ কি ছিলো শৈশবে নিহিত ? তিনি কি বঞ্চিত শিশু ছিলেন ? স্নেহভালোবাসা পাননি ? ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষত মনে রাখতে হবে যে মনঃসমীক্ষণ পাশ্চাত্য দুনিয়ার একটি প্রিয় কাজ ; ফলে একজন তরুণী কবির আত্মহত্যার পর সবাই যে তাঁর জীবন ও শিল্পের যোগসূত্র সন্ধানে আগ্রহী হয়ে উঠবে তা নিতান্ত প্রত্যাশিত। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েই চিঠিপত্রগুলি সাধারণের কাছে পেশ করেছেন অরেলিয়া প্ল্যাথ।

এবং মজাটা এখানেই। সিলভিয়ার জীবন ও চরিত্রের একাধিক দিকের উপরে বইটি অবশ্যই অমূল্য আলোকপাত করে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত কতগুলি অসাধারণ ভাববস্তু ও চিত্রকল্পের উৎস ধরা পড়ে। তাঁর আত্মহত্যার অব্যবহিত আগেকার মানসিক অবস্থাকেও অনেকখানিই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু যে জরুরী প্রশ্নটার জবাব মেলে না তা হলো তাঁর শিল্পের উগ্র বিকারপ্রীতি বিষয়ে। বরং, বইটি পড়ার পর সে রহস্যটা যেন আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। ঘরোয়া, প্রাণোচ্ছল,

স্বলিখিত চিঠিগুলি তাঁর মানসের আশ্চর্য স্ববিরোধকেই পাঠকের সামনে আরও তীব্রভাবে উপস্থাপিত করবে। ফলে আলোচ্য বইটি সিলভিয়া-প্রসঙ্গে দু'দিক দিয়ে একটি মূল্যবান অবদান।

সিলভিয়ার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির দিকে দ্রুত দৃষ্টিক্ষেপ করা যাক। ১৯৩২ সালে একটি উচ্চশিক্ষিত মার্কিন পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মা অরেলিয়া শোবার-এর পরিবার ছিলো মার্কিন দুনিয়ায় অস্ট্রিয়ান আগন্তুক। শিশু অরেলিয়া বাড়িতে জার্মানে কথা বলতেন। কিশোরী অবস্থায় তাঁর সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মায়। বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. অরেলিয়া বিয়ে করেন তাঁর এক অধ্যাপককে।

অটো প্ল্যাথ তার স্ত্রীর চাইতে একুশ বছরের বড় ছিলেন। তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় জার্মানীর পোলিশ করিডর অঞ্চলে। তাঁর বংশ ছিলো মূলত জার্মান, কিছু পোলিশ রক্তও ছিলো। অটো ছিলেন পণ্ডিত মানুষ, প্রধানত জীববিজ্ঞানী, কিন্তু ভাষাবিদ্‌ও বটে। অটো আর অরেলিয়ার দুই সন্তান, সিলভিয়া এবং ওয়ারেন।

সিলভিয়ার যখন আট বছর বয়স, ওয়ারেনের সাড়ে পাঁচ, তখন অটো প্ল্যাথ মারা যান। তিনি মারা গেলেন, বলতে গেলে, পরিণত ও অচিকিৎসিত ডায়াবিটিক অবস্থা থেকে। তাঁর স্বাস্থ্য যখন ক্রমাগত খারাপের দিকে, নানান উপসর্গ দৃশ্যমান, তখন অটোর ধারণা ছিলো যে তাঁর নির্ঘাৎ ক্যান্‌সার হয়েছে। তিনি কিছুতেই ডাক্তার দেখাবেন না। অবশেষে ১৯৪০ সালে তাঁর পায়ের আঙুলের একটি সামান্য ক্ষত ভয়ানক আকার ধারণ করায় ডাক্তার ডাকা ছাড়া উপায় থাকে না। তখনই রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা হয় এবং অত্যন্ত অগ্রসর ডায়াবিটিস ধরা পড়ে। তার পর তাঁর জীবন বাঁচানোর শেষ চেষ্টা চলে। গ্যাংগ্রিন-দষ্ট পা হাঁটু থেকে অ্যাম্পুটেট ক'রে বাদ দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায় না। হয়তো-বা আজকের দিনে তাঁকে বাঁচানো যেতো, কিন্তু সেটা ১৯৪০ সাল।

শিক্ষকতার কাজে কঠোর পরিশ্রম ক'রে বিধবা অরেলিয়া তাঁর সন্তান দু'টিকে মানুষ করেন। সিলভিয়া এবং ওয়ারেন পিতৃবঞ্চিত হ'লেও দাদু-দিদিমার স্নেহময় সান্নিধ্য এবং শিক্ষিতা মায়ের যত্ন পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছিলেন। তাঁদের শিক্ষায় কোনো অপূর্ণতা ঘটতে দেননি অরেলিয়া। উদয়াস্ত খেটে, নিজের ডুয়োডেনাল আল্‌সারের সঙ্গে বছরের পর বছর লড়াই ক'রে—স্বামীর জীবনের শেষ দু'বছরের অসুস্থতার সময় তাঁর এই রোগের সূত্রপাত হয়—সন্তানদের জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। সন্তানেরাও লেখাপড়ায় ভালো হয়ে, প্রশংসা

ও পুরস্কার কুড়িয়ে মায়ের জীবনে আনন্দ আনে। শৈশবে এবং কৈশোরেই লক্ষিত হয় সিলভিয়ার সৃজনীশক্তি—আত্মকথায়, ছোট গল্পে, কবিতায়।

স্মিথ্ কলেজে প্রাক্-স্নাতক ছাত্রাবস্থায় ১৯৫৩ সালের গ্রীষ্মাবকাশে সিলভিয়ার স্নায়বিক বৈকল্য ঘটে। মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। অনেক কষ্টে তাঁকে সুস্থতায়, স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনা হয়। কিছু সময় মনো-রোগবিশেষজ্ঞদের চিকিৎসাধীন থাকেন, তার পর কলেজে ফিরে যান। সেখানকার পড়াশোনা সসম্মানে শেষ ক'রে ১৯৫৫ সালে ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে ব্রিটেনের কেম্ব্রিজে আসেন। সেখানে সাক্ষাৎ হয় উদীয়মান কবি টেড হিউজের সঙ্গে। প্রচণ্ডভাবে প্রেমে প'ড়ে ১৯৫৬ সালে টেডকে বিয়ে করেন। কেম্ব্রিজে পড়াশোনা শেষ ক'রে ১৯৫৭ সালে ফিরে আসেন আমেরিকায়। সেখানে তাঁর পুরোনো কলেজ স্মিথ্-এ এক বছর পড়ান, কিন্তু অচিরেই আবিষ্কার করেন যে মার্কিন দুনিয়ায় অধ্যাপনার প্রচণ্ড চাপের সঙ্গে সৃষ্টিশীল রচনার জীবন মেলানো দুঃসাধ্য। টেড ও সিলভিয়া দু'জনেই লেখার কাজে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করতে চান। যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তৃত ভ্রমণের পর ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে কবিদম্পতি ব্রিটেনে ফিরে আসেন। লণ্ডনে একটি ফ্ল্যাট নেন ; সেখানে ১৯৬০ সালের এপ্রিলে তাঁদের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। একই বছর বার হয় সিলভিয়ার প্রথম কবিতার বই 'দ্য কলোসাস্'। এর পর তাঁর দু'টি শারীরিক ফাঁড়া যায় : তাঁর অ্যাপেনডিক্স অস্ত্রোপচার ক'রে বাদ দেওয়া হয় এবং একটি গর্ভপাত ঘটে।

১৯৬১ সালে কবিদম্পতি ডেভনে একটি বিরাট বাগানসম্বলিত সাবেকী আমলের 'কটেজ' কিনে সেখানে সংসার পাতেন। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ বাড়িতে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। ঐ বছরের গ্রীষ্মেই তাঁদের সম্পর্কে চিড় ধরে। হেমন্তে টেড ডেভন ছেড়ে লণ্ডনে চ'লে যান। অরেলিয়া সিলভিয়াকে পুত্রকন্যাসহ আমেরিকায় ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। সেখানে তাঁকে যথাসাধ্য পারিবারিক সাহায্য দেওয়া হবে এমন প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেওয়া হয়। কিন্তু সিলভিয়া আমেরিকায় ফিরে যেতে চান না।

ডিসেম্বরে সিলভিয়া একটি লণ্ডনস্থ ফ্ল্যাট ভাড়া করেন। ফ্ল্যাটটি এককালে ছিলো ইয়েট্সের বাড়ির অন্তর্গত। ডেভনের বাড়িটি তালাবন্ধ ক'রে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সেখানে উঠে যান সিলভিয়া। লণ্ডনের সাহিত্যিক পরিবেশে অল্প কিছু দিনের জন্য তিনি বেশ চাঙ্গা ও উত্তেজিত থাকেন। কিন্তু তার পরেই কুয়াশা, বরফ-ঝড়, বিদ্যুতের অভাব ইত্যাদি সহ ১৯৬২-৩ সালের দুর্দান্ত শীতকাল

জেঁকে বসে। সিলভিয়ার আত্মজৈবনিক উপন্যাসটি ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু তাঁর প্রথম আত্মহত্যার চেষ্টা : এই শিল্পকীর্তির মাধ্যমে তিনি অবশ্যই চেয়েছিলেন অতীতকে অতিক্রম করতে, চিত্তশুদ্ধিতে পৌছতে, কিন্তু বইটি যখন বার হলো তখন লেখিকা জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত, বিক্ষত। শিশু-দু'টিকে নিয়ে ঐ প্রচণ্ড শীতের মধ্যে ফ্লু সর্দিকাশি প্রভৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রে রাতের পর রাত একা। ভোরে উঠে কবিতা লিখতেন, এবং সমানে লিখে গেছেন একের পর এক শক্তিশালী অথচ ভয়ংকর কবিতা। অবশেষে ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারির এক সকালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কোলের শিশুদু'টিকে মাতৃহীন ক'রে নৈরাশ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করেন সিলভিয়া। গ্যাস-কুকারের আভেন-চেম্বারের গ্যাস-কলটি খুলে চেম্বারটির ভিতর মাথা ঢুকিয়ে দেন।

মৃত্যুর আগেই তাঁর যথেষ্ট কবিখ্যাতি জুটেছিলো। সমালোচক অ্যালভারেজ থেকে শুরু ক'রে বি.বি.সি. রেডিও পর্যন্ত তাঁকে খাতির করতেন। তা ছাড়া তিনি পত্রপত্রিকায় ছোট গল্পও লিখতেন, এবং সম্প্রতি সেগুলির বহুলাংশ সংকলিতও হয়েছে, যদিও একটি বাদে তাঁর ছোট গল্প পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে সোরগোল প'ড়ে যায়। তাঁর খ্যাতি ওঠে চরমে, এবং ভক্তদের মধ্যে তিনি হয়ে যান প্রায় ট্র্যাজিক নায়িকা। তাঁর পাণ্ডু-লিপি ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে আলোড়নকারী 'এরিয়েল' এবং আরও তিনটি কবিতার বই সংকলিত হয়।

সিলভিয়ার চিঠিগুলি একটি স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণোচ্ছল, জীবনভক্ত এবং সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। অনর্গল লিখেছেন পাতার পর পাতা। তাঁর বাঁচবার ইচ্ছা, রঙরসপ্রীতি, কলমের সাবলীলতা উপচে পড়েছে এই চিঠিগুলিতে। আবার কখনও কখনও গভীর বিষাদে মগ্ন হয়েও চিঠি লিখেছেন। বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত, সুখদুঃখের ওঠানামায় প্রত্যক্ষ এমন দীর্ঘ পত্রগুচ্ছ পৃথিবীতে খুব কম মা-ই পেয়েছেন মেয়ের কাছ থেকে।

ঘরোয়া সিলভিয়া, কবিপ্রকৃতির সিলভিয়া, দু'টি দিকেরই পরিচয় পত্রগুচ্ছে মেলে। যেখানেই যাচ্ছেন, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মনোজ্ঞ বর্ণনা দিচ্ছেন, দিচ্ছেন চার পাশের মানুষজনের মর্মভেদী বর্ণনাও। পঞ্চাশের দশকের স্মিথ্ কলেজে বা কেম্‌ব্রিজে ছাত্রজীবন, কন্টিনেন্ট ভ্রমণ, ইয়র্কশায়ারে তাঁর শ্বশুরালয়, ডেভনের নিরালা গ্রামীণ পরিবেশে তাঁর ফুলফলপরিবৃত গার্হস্থ্য জীবন, লণ্ডনের সাহিত্যিকপ্রকাশক-মহলের খ্যাতনামা চরিত্রেরা ও গল্পগুজবের স্বাদ : এ সব একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে পাঠকের

বোধে। লেখিকার বৃত্তি, গৃহিনীর ও জননীর বৃত্তি, লেখকের স্ত্রী হিসেবে তাঁর ভূমিকা : সব কিছুকেই তিনি দারুণ গুরুত্ব দিতেন। টেড ও তিনি কী কী লিখছেন, কোন লেখাটা কোথায় প্রকাশিত হচ্ছে, কোথায় কী সংবর্ধনা পেলেন, কোন্ কোন্ নামজাদা লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলো, এ সমস্ত বিষয়ে যেমন মায়ের কাছে আনুপুঙ্খিক রিপোর্ট পেশ করতেন, তেমনই জানাতেন কী কী সুস্বাদু পদ রাঁধলেন, কী রঙের পর্দা বা গালিচা কিনলেন, ছেলেমেয়েদের ক্রিয়াকলাপ, টেড এবং তাঁর মিলিত জীবনের হরেক রকমের আনন্দিত খবরাখবর। বাচ্চাদের জন্য, টেডের জন্য তাঁর গর্বের অন্ত ছিলো না। ঘরের কাজ এবং সন্তানপালন তাঁরা দু'জনে নিজেদের মধ্যে সুন্দরভাবে ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন। বিশেষত তাঁর পরবর্তী দুঃখকষ্ট এবং অন্তিম পরিণতির কথা মনে রাখলে তাঁর জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলির চিত্রাবলী পাঠকের চোখে একটি মর্মস্পর্শী রঙিন করুণতার মাত্রা লাভ করে। উদ্ধৃতি না দিলে বোঝা যাবে না, তাই প্রবন্ধের পরবর্তী খণ্ডে তাঁর বিবাহিত জীবনের সুখী মুহূর্তগুলির চিত্রণ থেকে কিছু কিছু অংশ অনুবাদে পরিবেশন করছি।

২

'আমাদের সূর্যপ্লাবিত রান্নাঘরে ব'সে এক ডেকচি ঘ্যাঁট সিদ্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। ফ্রীডা রেবেকাকে (মজা এই যে ওকে আমরা এখন ফ্রীডা ব'লে ডাকতে শুরু করেছি) দু'টোর সময় খাওয়াবো ভাবছি, তার পর রিজেন্ট পার্কে একটু হাঁটতে যাবো, আর রোদে বসবো।··· রাতে ওঠার ক্লান্তিটা এখন কাটিয়ে উঠতে পারছি। দিনেরবেলায় বাচ্চা (ঘরোয়াভাবে "দ্য পুকার" বা "পুকার পাই" নামে অভিহিত) ঘড়ি ধ'রে চারঘণ্টা বাদে বাদে জাগে, আর রাতে— বাঁচা যায়—পাঁচ ঘণ্টা বা কখনও কখনও ছ'ঘণ্টাও টানা ঘুমায়। শূকরশাবকের মতো রাক্ষুসে খিদে হয়েছে ওর।

'বেলা তিনটে পনেরো। রিজেন্ট পার্কের একটা বেঞ্চিতে ব'সে আছি, সূর্যের দিকে মুখ ক'রে। সর্বত্র লনের ঘাস কাটা হচ্ছে। কাটা ঘাস, উদ্ভিদ আর উষ্ণ পৃথিবীর গন্ধটা লোভনীয়। এপ্রিলের ইংল্যাণ্ডের মতো রমণীয় আর কিছু নেই। খালি সাধ হয়, যদি তুমি আমার সঙ্গে এখানে হাঁটতে পারতে—তুমি যত দিনে আসবে তত দিনে বাচ্চার টলমল ক'রে হাঁটতে শিখে যাওয়া উচিত! আমার আর ধৈর্য ধরছে না—ও যে কবে হাসবে, ভাববিনিময় করবে।'

(লণ্ডন, ২১শে এপ্রিল, ১৯৬০)

'এ সপ্তাহের একটা সন্ধ্যায় বাচ্চাকে 'এমার্জেন্সি বোতল' ধরানোর চেষ্টা করছি। এটা হলো ৪ঠা মে-তে টি. এস. এলিয়টের ওখানে ডিনারে যাবার জন্য প্রস্তুতি, যাতে সে দিন বাচ্চা খাওয়ানোর জন্য ছুটে ফিরে আসতে না হয়। শুধু আমরা, স্টিফেন স্পেণ্ডাররা আর এলিয়টেরা! ফেবার সংস্থার ককটেল পার্টিটা ভারী উপভোগ্য হয়েছিলো। যুগ যুগ বাদে সেই প্রথম একটু সাজগোজ করেছিলাম। সবাই তো জেনে অবাক যে মাত্র তিন সপ্তাহ আগেই আমার বাচ্চা হয়েছে।··· শ্যাম্‌পেন খেলাম, ভারী আহ্লাদিত হলাম আর টেডের গর্বে গর্বিত হলাম।'

(লণ্ডন, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৬০)

'এলিয়টরা থাকেন আশ্চর্য রকমের পাঁশুটে একটা ইটের বাড়ির দোতলায়—ভিতরে অবশ্য বিলাসিতায় সাজানো আরামের ফ্ল্যাট। তাঁর স্ত্রী ভ্যালেরি ইয়র্কশায়ারের মহিলা, সুন্দরী, ব্লণ্ড্। ত্বকে গোলাপী আভা। এলিয়ট ভারী অমায়িক, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপন ক'রে নিলেন। আমরা আমেরিকায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিনিময় করলাম, কয়লার আগুন পোহাতে পোহাতে শেরি পান করলাম। তাঁর চার দিকে মহত্ত্বের এমন একটা জ্যোতি যে আমার মনে হচ্ছিলো কোনো অবতীর্ণ দেবতার পাশে ব'সে আছি।···

'তার পর স্পেণ্ডাররা এলেন। তিনি শুভ্রকেশ ও সুপুরুষ, তাঁর স্ত্রী···তনুদেহ, স্পন্দিত, মুখর, রমণীয়। এঁর নাম নাতাশা লিড্‌ভিন, পেশাদার পিয়ানোবাদিকা। আলোচ্য বিষয় স্ত্রাভিনস্কি, অডেন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, ডি. এইচ. লরেন্স এঁদের সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ গল্প। আমি তো মুগ্ধ। ডিনার টেবিলে গেলাম যেন হাওয়ায় ভেসে, বসলাম এলিয়ট আর স্পেণ্ডারের মধ্যিখানে, পুলকিত অবস্থায়, আর ভালোই জ'মে গেলো ওঁদের সঙ্গে। টেডের গাগেনহাইম বৃত্তি পাওয়া এবং বই প্রকাশ তো ওঁদের দু'জনের পৃষ্ঠপোষকতাতেই সম্ভব হয়েছে।'

(লণ্ডন, ৫ই মে, ১৯৬০)

'কাল রাত্রে টেড আর আমি গিয়েছিলাম অডেনের সম্মানে দেওয়া ফেবার অ্যাণ্ড ফেবারের একটি ককটেল পার্টিতে। তোলা দুধ আর ন্যাপির গন্ধ থেকে একটি সন্ধ্যার জন্য ছুটি পাওয়া গিন্নী আমি সত্যিই উপভোগ ক'রে শ্যাম্‌পেন পান করলাম। এক ফাঁকে ফেবার সংস্থার চার্লস মণ্টেথ আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন

ঘেরা বারান্দায়। দেখি টেড দাঁড়িয়ে আছে ; এক দিকে এলিয়ট, অডেন আর লুই ম্যাকনীস, অন্য দিকে ষ্টিফেন স্পেণ্ডার, আর তাঁদের ছবি তোলা হচ্ছে। "চমৎকার !" বললেন চার্লস, "তিন পুরুষ ফেবার গোষ্ঠীর কবি !" অবশ্যই আমার এতো গর্ব হচ্ছিলো। মহৎ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে টেডকে একটুও বেমানান লাগছিলো না।'

(লণ্ডন, ২৪শে জুন, ১৯৬০)

'অবশেষে আমার বিশাল "পিছনের রান্নাঘর" থেকে লিখছি। অবশ্য এটা আসলে আমার রান্নাঘর নয়, আমি বারান্দার ওদিকে অন্য একটা ছোট ঘরে রাঁধি আর বাসনপত্র ধুই।··· এখানে আমার চতুর্দিকে আমার তামার ডেকচিগুলো, তোমার আনা ওলন্দাজ টি-সেটটা, সব নানান কোণ-কানাচে সুন্দর ক'রে সাজানো। একটা বড় কয়লার স্টোভ এ ঘরটাকে উত্তপ্ত রাখে আর সব জলও ফুটন্ত গরম রাখে···'

(ডেভন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)

'প্রাতরাশ সেরেই আমি সোজা উপরে চ'লে যাই আমার পড়ার ঘরে, লিখি সেই অপূর্ব রঙ-না-করা ছ'-ফুটজোড়া কাঠের টেবিলটাতে, যেটা শেষ করতে তুমি সাহায্য করেছিলে, ওয়ারেন। তখন ফ্রীডাকে নিয়ে টেড পিছনের বাগানে চ'লে যায়, হয় বাগানের কাজ নয় কাঠের কাজ করে। দুপুরে ও-ই ওকে লাঞ্চ তৈরি ক'রে দেয় আর ঘুমোতে পাঠায়। তার পর আমি নেমে আসি, আমাদের দু'জনের লাঞ্চ তৈরি করি। আমার ঘর গুছানো আর বাসনপত্র ধোওয়া যখন হয়ে যায় ততক্ষণে ফ্রীডা উঠে পড়েছে। বিকেলে আমি ফ্রীডাকে নিয়ে সামনের বাগানে কাজ করি, বা সেলাই করি ; তখন টেড থাকে তার পড়ার ঘরে। এভাবে আমরা দু'জনেই অর্ধেক দিন বাড়ির বাইরে আর অর্ধেক দিন লিখে কাটাতে পারি —এর বেশি আমরা চাইনে মোটেও—আর ফ্রীডাও সব সময় বাইরে থাকতে পারে।'

(ডেভন, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)

'টেড শীতকালের লেটুস পুঁতেছে আর একটা বিরাট স্ট্রবেরী বেড করার জন্য মাটি খুঁড়ছে। ও আমার জন্য একটা ডেস্ক, একটা সেলাইয়ের টেবিল, আর

বাচ্চার সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা বন্ধ করার গেট তৈরি করেছে। কাঠের কাজে টেডের এমন হাত, যেন জন্মগত! আমরা এত সুখী। বাহাত্তরটা আপেল গাছ!'

(ডেভন, সেপ্টেম্বরের শেষের দিক, ১৯৬১)

'আমাদের বসবার ঘরে মর্মরিত কাঠের আগুনের সামনে ব'সে আছি; আমাদের ম্যাণ্ট্‌ল্‌পিসটা এখনও লাল মোমবাতি আর প্রায় পঞ্চাশটা ক্রিসমাস কার্ডে রঙ-চঙে; আমাদের বেঁটে-মোটা ক্রিসমাস ট্রীটা রুপালী পাখি, রাংতা, আর মশলা-দেওয়া কেকের হরতন-আকৃতি টুকরো সমেত এখনও সাজানো আছে; আর আমার সদ্য-শেষ-করা লাল কর্ডের পর্দাটা টেনে দেওয়াতে ঘরটাকে এত উজ্জ্বল আর দিলখুশ লাগছে, ঠিক যেন একটা ভ্যালেণ্টাইন কার্ডের ভিতরকার ছবি···

'···ক্রিসমাসের বাকি দিনটা আমি কাটালাম আমার প্রথম অপূর্ব সোনালী-বাদামী টার্কি রান্নায়; তার সঙ্গে করেছিলাম তোমার প্রণালী অনুসারে পাঁউরুটির ড্রেসিং, ব্রাসেল্‌স্‌ স্প্রাউট্‌ ও চেস্টনাটের লেই, সুইড্‌ (স্কোয়াশের মতো তরকারী, কিন্তু কমলা রঙের), টার্কির গলা এবং অন্যান্য টুকরো-টাকরা দিয়ে তৈরি সস্‌, আর আমাদের নিজেদের যত্নসঞ্চিত আপেলের শেষ অংশ দিয়ে তৈরি আপেল-পাই। মধ্যবিকালে আমরা তিনজনে মিলে দারুণ ভোজ করলাম; ছোট্ট ফ্রীডা চামচ দিয়ে সবটুকু খেয়ে নিলো। তার পর আগুনের পাশে শান্ত সন্ধ্যা কাটালাম।'

(ডেভন, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬১; ব্রাসেল্‌স্‌ স্প্রাউট্‌ এক রকমের সব্‌জি, একরত্তি বাঁধাকপির মতো দেখতে।)

'যেমন বলছিলাম, বাড়িটা এখনও ছিমছাম হয়নি—কাঠের তক্তার মেঝেগুলো বড্ড নড়বড়ে, বেজায় শব্দ করে; কলগুলো থেকে জল চুইয়ে পড়ে; দেয়ালের কাগজ আর পলেস্তারা অনেক জায়গায় খ'সে পড়ছে। তবুও বাড়িটার একটা সত্যিকারের উদার, উষ্ণ প্রাণ আছে; আমরা যেটুকু যত্ন নিই তার প্রতিদানেই আমাদের বর্ধিত শ্রী উপহার দেয়। এখানে ব'সে গির্জাটার পিছনে সূর্যের অস্তে যাওয়া দেখতে এত ভালো লাগে। আমার তো মনে হয় যে আমাদের গাছ-গুলোতে যখন ফুল ধরবে তখন আমি পাগল হয়ে যাবো। লাইলাক গাছগুলোতে মোটা মোটা কুঁড়ি ধরেছে। মনে হচ্ছে যে ফুল আর গাছের স্বত্বাধিকারিণী হওয়াটা আমার কাছে সব চেয়ে উত্তেজক ব্যাপার।

'নিকোলাস দারুণ শক্ত ছেলে হয়েছে। স্ফিংক্সের মতো মাথা উঁচু ক'রে রাখে

অনেক ক্ষণ ধ'রে, মাথা ঘুরিয়ে সব দিকে তাকায়—পেটের উপর শোওয়ানোর জন্য এত শক্ত ঘাড় হয়েছে। মনে হচ্ছে টেডের মতো হেজ্‌ল্‌ রঙের চোখ হবে ওর—আপাতত গাঢ় স্লেট্‌-নীল। ওকে এত ভালোবাসি। বাচ্চার জন্ম দেওয়া সত্যিই আমার জীবনের সব থেকে সুখের অভিজ্ঞতা। একের পর এক বাচ্চা হয়ে চলুক এমন সাধ হয়।'

(ডেভন, ১২ই মার্চ, ১৯৬২)

'যদি তুমি আমাদের এখন দেখতে পেতে! স্বর্গীয় উষ্ণ রোদে শর্ট্‌স্‌ প'রে ডেক চেয়ারে ব'সে আছি; আমাদের দরজার কাছাকাছি তীব্রগন্ধ বক্স্‌ ঝোপ আর সদ্য-ঘাস-কাটা টেনিস কোর্ট থেকে নাকে সৌরভ আসছে; বাচ্চা নিক (ফ্রীডা তাই ব'লে ডাকে, ফলে আমরাও) ডেইজী ফুলে পরিবৃত অবস্থায় প্র্যামে নিদ্রামগ্ন; ফ্রীডা এত উত্তেজিত যে দুপুরের ঘুম মাথায় উঠেছে; আর টেড নন্দিত বদনে সেই কতিপয় স্ট্রবেরীর চারাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছে, যেগুলো গত শীতের হিমের কবল থেকে রেহাই পেয়েছে। ইস্টারের রোববারে পৃথিবী নরম হলো. বসন্ত এলো। আমাদের ড্যাফোডিলগুলি পূর্ণবিকশিত; এ সপ্তাহে আনুমানিক এক হাজারটি তুলেছি, আমার চোখের সামনে আরও কয়েক হাজার ড্যাফোডিল আক্ষরিক অর্থে সমুদ্রের মতো বিস্তৃত। থেকে থেকে আবিষ্কার করি নতুন রত্ন : লাইলাকের বেড়ার পাশে ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে ছোট ছোট হলুদ আর গোলাপী প্রিম্‌রোজ্‌, গ্রেপ্‌-হায়াসিন্‌থ্‌; শুকনো কাঁটাগাছের স্তূপের মধ্য থেকে উঁকি মারছে লিলি-অফ-দ্য-ভ্যালির-র চোখা-চোখা মাথা। ফুল আর সব্‌জি গজানোর চাইতে আর কোনো কিছু যে আদৌ বেশি ভালো লাগতে পারে তা মনে হচ্ছে না। আমার এমন বসন্ত-উন্মাদনা ঘটেছে যে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবতেই পারছি না। তুমি এসে তোমার নিজের চোখে সব কিছু দেখবে তারই অধীর প্রত্যাশায় আছি।'

(ডেভন, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৬২)

৩

সিল্‌ভিয়ার এই পত্রগুচ্ছের সংকলনটি পড়ার পর তাঁর আত্মহত্যার পটভূমিকাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর তাঁর আনন্দ ও আত্ম-বিশ্বাস প্রচণ্ডভাবে ঘা খেয়েছিলো। তাঁদের অমিলের পূর্ণ বিবরণ এ বইটিতে দেওয়া হয়নি, শুধুমাত্র আভাস দেওয়া হয়েছে। তবে ঐ ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট।

অত্যন্ত সংক্ষেপে অরেলিয়া শুধু জানিয়েছেন যে টেডের সঙ্গে অপর কোনো নারীর ঘনিষ্ঠতায় সিলভিয়া সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ এবং আহত হয়েছিলেন।

সিলভিয়া ছিলেন টেড বলতে অজ্ঞান। কৈশোরে যৌবনে তাঁর অনেক বান্ধব জুটেছিলো, কিন্তু একমাত্র টেডের মধ্যেই তিনি তাঁর নিজের যোগ্য পুরুষ, সব দিক দিয়ে উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পেয়েছিলেন। টেড সম্বন্ধে এবং তাঁদের মিলিত জীবনের সম্ভাবনাময়তা সম্বন্ধে তাঁর মাত্রা-হারানো উচ্ছ্বাসের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রত্যেকটি উদ্ধৃতিই তাঁর মায়ের কাছে লেখা চিঠি থেকে নেওয়া।

'ওর মধ্যে এমন একটা শক্তি আর কণ্ঠস্বর আছে যা পৃথিবীকে ঝাঁকুনি মেরে চেতন করবে। এমনকি তখনও, যখন ও আমার কবিতা প'ড়ে দেখবে, আমাকে সাহায্য করবে এমন এক মহিলা কবি হ'তে যাকে পৃথিবী হাঁ ক'রে দেখবে।'

(৩রা মে, ১৯৫৬)

'এমন এক পুরুষ খুঁজে পাওয়া, তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষে পরিণত করা : সারা জীবনের কাজ!'

(৯ই মে, ১৯৫৬)

'মা গো, আমি শুধু চাই যে টেডকে ভালো ক'রে জানবার সময় তোমার হয়। আমাদের দু'জনের মধ্যেই এমন শক্তি, সৃষ্টিশীলতা এবং ফলপ্রসূ নিয়মানুবর্তিতা বর্তমান যে কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবী অবাক হয়ে আমাদের তরিফ করবে।··· আমরা পরস্পরের প্রতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারে নিষ্ঠাশীল পরম আনুগত্য বজায় রাখতে সমর্থ, পরস্পরের কাছ থেকে বিপুলতম দাবি ক'রে, পরস্পরকে যোগ্যতা এবং সৃজনীশক্তির পূর্ণতায় আনবার প্রয়াসে নিবিড়ভাবে নিবেদিত হয়ে··· আমাদের শক্তি একটি বিস্ময়কর জিনিস।'

(১৮ই মে, ১৯৫৬)

'গর্বে ফেটেই পড়ছি আমি। প্রাতরাশ খাবার সময় লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিলো : "আমার স্বামী একজন প্রতিভাধর পুরুষ এবং বি.বি.সি.-তে ইয়েট্স্ পাঠ করবেন!"···

'···অধিকাংশ দম্পতিদের থেকে আমরা সত্যিই ভিন্ন জাতের ; কারণ আমরা প্রতি মুহূর্তে পরস্পরের জীবনে আরও তীব্রভাবে অংশগ্রহণ করি। টেডের সঙ্গে

এবং তার জন্য আমি যা কিছু করি, হোক না তা কেবল রান্না করা বা কাপড় ইস্ত্রি করা, সবই একটা দিব্য দীপ্তি পায়, এবং অভ্যাসে এটা বেড়েই যায়, কমে না।'

(৮ই অক্টোবর, ১৯৫৬)

এই স্বীকারোক্তিগুলির মধ্যে প্রথম যৌবনের প্রেমের রোম্যাণ্টিকতা ছাড়াও একটা অতিরিক্ত মাত্রা আছে—একটা স্ট্রেন বা জোর ক'রে টানার দিক, প্রবল প্রয়াস পাওয়ার আভাস। সিলভিয়া শুধু ভালোবেসে সন্তুষ্ট নন, ভালোবাসার পাত্রকে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করছেন, ফলে দেবতার কাছ থেকে উপাসকের যেমন টেডের কাছ থেকে তাঁরও তেমন অপরিমিত, লোভাতুর প্রত্যাশা। তিনি আশা করছেন যে টেড তাঁকে দুনিয়ার সেরা মহিলা কবি হ'তে আর তিনি টেডকে দুনিয়ার সেরা পুরুষ হ'তে সাহায্য করবেন, তাঁদের জীবনে স্বর্গীয় সাফল্যের বিস্ফোরণ ঘ'টে যাবে। মানবিক কোনো সম্পর্কের কাছ থেকে, দোষে-গুণে মেশানো মানুষের কাছ থেকে এতখানি আশা করাটা অপরিণত মানসের সূচক। হাজার প্রতিভাধর হ'লেও এমন দুর্দান্ত দাবি কে মানতে পারে?

বলা চলে যে সিলভিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবতার এবং বিনয়ের অভাব প্রকট। টেডকে তাঁর সাধারণ মনুষ্যত্বের জন্য ভালো না বেসে তাঁর অসাধারণ প্রতিশ্রুতির জন্যই যেন পাকড়াও করছেন, অপর একজন শক্তিশালী কবির মাধ্যমে তাঁর নিজের কবিজীবনে সাফল্যের রক্ষাকবচ খুঁজছেন, যে গ্যারাণ্টি কেউ কাউকে দিতে পারে না। তিনি বলছেন না, 'সাধারণ তুমি, তবুও তোমাকে ভালোবেসে ধন্য আমি', বলছেন, 'অসাধারণ তুমি, তাই তোমাকে ভালোবাসি'। এক কথায় বীরপূজা, হীরো ওয়রশিপ।

এই বীরপূজা, এই দাবিদার দখলদার দুরন্ত ভালোবাসা টেডের পক্ষে দম-আটকানো ফাঁস হয়ে উঠেছিলো কিনা কে বলবে? টেড তাঁর নিজের জবানবন্দীটা পুরোপুরি এবং অকপটে কোনো দিন সাধারণ্যে পেশ করবেন কিনা বলা বড় কঠিন। উনি ইংল্যাণ্ডের উত্তর দিকের মানুষ, ফলে খুব চাপা মানুষ—লোকে ব'লে থাকে 'কঠিন'—এবং ওঁর কবিতাও একটি ইস্পাততুল্য আত্মিক কাঠিন্যের ইঙ্গিত বহন করে। তা ছাড়া শাশুড়ী ও শ্যালক বর্তমান; ফ্রীডা ও নিকোলাসও বড় হয়ে উঠছে, সব কিছু বুঝতে শিখছে। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ সত্যটা আপাতত প্রকাশিত হবে না। তবে ভবিষ্যতে কেউ না কেউ যে টেনে বার করবেন এটা ধ'রেই নেওয়া যায়।

কোনো মানুষকে, তা তিনি স্বামীই হোন, বা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতাই হোন, দেবতার আসনে বসালে কোনো না কোনো সময়ে সে নির্বুদ্ধিতার দাম দিতে হবে। টেডের সামান্যতম চাঞ্চল্যে সিলভিয়া যদি তুলকালাম ক'রে থাকেন সেটা বিস্ময়কর নয়। যে দিকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন আঘাত যখন এলো সে দিক থেকেই, তখন পুরোপুরি টাল সামলে উঠতে পারলেন না।

বিশেষত তাঁর কোলে তখন দু'টি শিশু, ছোটটির বয়স সবে তিন-চার মাস। আধা-আধিভাবে কোনো কিছু অনুভব-করবার মতো বা করবার মতো মেয়ে তিনি ছিলেন না। চিঠিপত্রগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় কী তীব্র ছিলো তাঁর জীবনের যা কিছু অনুভূতি আর প্রতিক্রিয়া। জীবনের সব কিছু ব্যাপারকেই তিনি যে শুধু সিরিয়াসভাবে নিতেন তাই নয়, বড্ড বেশি সিরিয়াসভাবে নিতেন। যে জন্য কলেজ-জীবনে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। 'অভিমান' কথাটার যথাযথ ইংরেজী হয় না, অথচ তিনি স্পষ্টত ছিলেন দুর্দান্ত রকমের অভিমানিনী মেয়ে। অমন অভিমানিনীকে—বিশেষত যাঁর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করার রেকর্ড বর্তমান তাঁকে—দু'টি বাচ্চা মানুষ করার ভার দিয়ে টেড যে কীভাবে আলাদা হয়ে গেলেন, তা বোঝা দুষ্কর। শাশুড়ী অরেলিয়া অত্যন্ত সাবধানে চিঠিপত্র সম্পাদনা করেছেন, যাতে কেউ এমন ব্যাখ্যা না করতে পারেন যে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ জামাইয়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনছেন, উপরন্ত মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সিলভিয়ার শেষ চিঠিগুলি নৈরাশ্য ও বিষাদের এমন গভীরতা থেকে উৎসারিত যে তাদের বস্তুনিষ্ঠভাবে পড়া দুরূহ, এবং সেগুলি একটি অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির একটি দিক মাত্র। তবুও যেটুকু তথ্য বইটিতে পরিবেশিত হয়েছে তা থেকে অনুচ্চারিত একটি প্রশ্নই জেগে ওঠে, যেটি এইমাত্র উপস্থাপিত করলাম। সিলভিয়া যে শেষ মুহূর্তে সন্তান দু'টিকে মানুষ করার গুরু দায়িত্ব থেকে পালিয়ে গেলেন সেটা কেউই অস্বীকার করেন না, কিন্তু টেডই কি স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি তাঁর কর্তব্য করতে পেরেছিলেন? তাঁর মতো বিচক্ষণ একজন পুরুষের হিসাবে এতখানি ভুল হলো কেন? এবং এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের আভাসেই কূটনীতিজ্ঞ সম্পাদিকা অরেলিয়ার জিৎ।

অভিমান, আশাভঙ্গ আর বিষাদের সঙ্গে দল বেঁধে জোটে ১৯৬২-৩ সালের কুখ্যাত শীত, সিলভিয়ার শারীরিক অসুস্থতা, একাকী দু'টি কোলের শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। সিলভিয়া যখন আত্মহত্যা করলেন তখন ফ্রীডার তিন বছর পূর্ণ হয়নি, নিকোলাসের সবে এক বছর পূর্ণ হয়েছে। বস্তুত, তিনি তখনও

প্রসবোত্তর দুর্বলতা থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। টেড সপ্তাহে একবার বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতেন, কিন্তু সে আর কতটুকু সাহায্য, সন্তানপালনের চব্বিশ ঘণ্টার দায়িত্ব পড়েছিলো সিলভিয়ার ঘাড়েই। বাঙালীদের আরও মনে রাখতে হবে যে দিনরাত থাকার পরিচারিকা বিলেতে রীতিমত ধনী ছাড়া কেউ নিযুক্ত করতে পারেন না। বিলেতের শীতে কোলের শিশু মানুষ করা এমনিতেই নাকের জলে চোখের জলে হওয়ার ব্যাপার, তার উপরে তাঁর সঙ্গে স্বামী ছিলেন না, এবং সেটা বর্তমান শতাব্দীর ক্রূরতম শীতও বটে। সে শীতকালটার কথা ভুক্ত-ভোগীমাত্রেরই মনে আছে। সিলভিয়া লিখেছেন, 'এমনই পরিহাস যে বিদ্যুতের ধর্মঘটও ঘটেছে, এবং প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলো আর হীটার সমস্ত অচল হয়ে পড়ে; বাচ্চারা জ'মে একেবারে বরফ হয়ে যায়; রান্না নামানো যায় না; পাগলের মতো মোমবাতি খুঁজে বেড়াতে হয়।'

(১৬ই জানুয়ারি, ১৯৬৩)

এরকম অবস্থায় তাঁর যে প্রচণ্ড ডিপ্রেশন হবে তা আর বিচিত্র কি, তাঁর সাহিত্যিক জীবন তাঁকে মূল্যবান পাথেয় জুটিয়েছিলো, বাঁচবার সাহস ও প্রেরণা দিয়েছিলো, তবুও তিনি শেষরক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর শেষ চিঠিগুলিতে সৎসাহস ও বিষাদের করুণ দ্বন্দ্ব যে কোনো পাঠককে বিচলিত করবে।

সিলভিয়া শুধু যে সন্তানদের মাতৃহীন ক'রে গেলেন তাই নয়, গ্যাসের কল খুলে রেখে অনেকের জীবনই যথেষ্ট বিপন্ন করেছিলেন। এটাও আলোচিত হয়েছে যে তিনি সত্যি মরতে চাননি, অভিমান দেখাতে, সমবেদনা কুড়াতে, টেডের মনে অনুশোচনা জাগাতে চেয়েছিলেন। জানা গেছে যে তিনি ঘুমন্ত বাচ্চাদের ঘরে দুধের পেয়ালা রেখে এসেছিলেন, তাঁর খণ্ডকালীন জার্মান পরি-চারিকার জন্য নোট লিখে রেখে গেছিলেন। তাতে ডাক্তারের ফোন নম্বর দেওয়া ছিলো এবং ডাক্তার ডাকার নির্দেশ দেওয়া ছিলো। অর্থাৎ তিনি প্রত্যাশা করে-ছিলেন যে প্রথম বারের চেষ্টিত আত্মহত্যার সময়ে যেমন এবারেও তেমন তাঁকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে। 'চেষ্টিত আত্মহত্যা' যে প্রায়ই ভালোবাসা খরিদ করার একটি দুরন্ত প্রয়াস হ'তে পারে সে কথা মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্যই জানেন। সিলভিয়ার মনেও হয়তো অমন কোনো আকূতি প্রবল হয়ে উঠেছিলো।

স্পষ্টত, সিলভিয়ার চরিত্রের তীব্রতাই শেষ মুহূর্তে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা রাখার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। ঐ তীব্রতার চিহ্ন চিঠিপত্রের সর্বত্র, এবং কখনও কখনও

তা মাত্রাজ্ঞানরহিত এবং রসজ্ঞানবর্জিতও বটে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষায়। এটি একটি বিপজ্জনক উপসর্গ। তিনি যে শুধু পড়াশোনায় সেরা হ'তে চেয়েছিলেন তাই নয়, চেয়েছিলেন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই টপ্ স্টার হ'তে, সহপাঠিনীদের মধ্যে জনপ্রিয় হ'তে, যুবকদের মধ্যে মোহিনী হ'তে, একটি সেরা ছেলেকে বিয়ে করতে, গৃহকর্মে তথা স্ত্রী ও জননীর ভূমিকায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হ'তে, এবং যৌবনের প্রারম্ভেই নাম-করা লেখিকা হবার এক দুর্বার বাসনা—বলা চলে লোভ—তাঁকে অধিকার ক'রে বসে। এমনকি, রুটিনমাফিক রোজ কয়েক ঘণ্টা লিখতে না পারলে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যেতো। ফলে, তিনি সাফল্যে যেমন উল্লসিত হতেন, তেমনই অসাফল্যে একেবারে ভেঙে পড়তেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে মানসের এই নিত্যদোলাচলবৃত্তি থেকে মুক্তি পাননি, কোনো স্থির পরিণতিতে উত্তীর্ণ হ'তে পারেননি। তাঁর চরিত্রের এই ট্র্যাজিক ত্রুটি পত্রগুচ্ছের পাঠকদের অবশ্যই চোখে পড়বে, এবং অরেলিয়াও এ দিকে আঙ্গুলিনির্দেশ করতে বাধ্য হয়েছেন। না ক'রে তাঁর উপায় ছিলো না, কারণ আজকের দিনে মনোবিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতার দায় শৈশবের অভিজ্ঞতার উপর চাপানোটা কেতাদুরস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ সিলভিয়ার চরিত্রের দুর্বলতা যে সিলভিয়ারই, অরেলিয়ার লালনজনিত নয়, তার প্রমাণ এই বিশাল গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে। অপরের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য কেউই পেশ করতে পারেন না, কিন্তু সন্তানের শৈশব সম্পর্কে একজন বুদ্ধিমতী মায়ের সাক্ষ্য নিশ্চয়ই বিশেষ মূল্যবান। সিলভিয়ার শৈশবের যে চিত্র অরেলিয়া আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তা বহুলাংশেই সত্য হ'তে বাধ্য, এবং এই চিত্রে কোনো মানসিক অসুস্থতার অস্বাভাবিকতার চিহ্ন মেলে না। আহার, পরিধেয়, বাসস্থান, স্নেহ, শিক্ষাদীক্ষা—কোনো বিষয়েই সিলভিয়াকে বঞ্চিত শিশু বলা চলে না। তাঁর চাইতে ঢের বেশি বঞ্চিত, অনাথ শিশু পিতৃবিয়োগ, মাতৃবিয়োগ, অধিকতর দারিদ্র্য-দুঃখ, এমনকি অপমান-অত্যাচার সহ্য ক'রেও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েই প্রাপ্তবয়স্ক হ'তে পেরেছে।

পারিবারিক লালনের চাইতে বৃহত্তর পরিপার্শ্বের সঙ্গেই সিলভিয়ার চরিত্রের এ দিকটির সংযোগ আছে ব'লে মনে হয়। মার্কিন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিযোগী মনোভাব সিলভিয়ার সর্ববিধ দুরাকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দেয়। সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হবার তাঁর যে উদগ্র লোভ তা 'দ্য গ্রেট আমেরিকান ড্রীম'-এরই অন্তর্গত। খানিকটা এই সমাজের বণিক মনোবৃত্তিরও শিকার হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কোনো পত্রিকায়

তাঁর কোনো কবিতা প্রকাশিত হ'লে তিনি কখনও কখনও লিখতেন, 'আমি অমুক পত্রিকায় একটি কবিতা বেচেছি'—যে ইডিয়মটি অন্তত আমার কাছে অভাবনীয় মনে হয়েছে। পত্রগুচ্ছে মধ্যে মধ্যে শোনা যায়, 'আমি এ বছর এত ক'টি কবিতা বেচেছি, টেড এত ক'টি বেচেছে।' অথচ নিছক বাস্তব এই যে এটা কেনা-বেচার প্রশ্নই নয়। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পত্রিকায় কবিতাপ্রকাশের মানে এ নয় যে লেখাটি বিক্রি করা হলো, সম্পাদকমশাই কিনে নিলেন, এবারে ওটা তাঁরই সম্পত্তি। কপিরাইট কবিরই থাকে, এবং এই সাধারণ ব্যাপারটা সিলভিয়াও নিশ্চয়ই জানতেন। ঐ একই বণিক স্বপ্নের তাড়নায় তাঁর মতো জোরালো কলমের লেখিকা ফ্যাশন-রন্ধন-সেলাই-সংক্রান্ত মহিলাদের পত্রিকায় ছোট গল্প প্রকাশের চেষ্টায় বছরের পর বছর রক্তক্ষয় ক'রে গেছেন।

অবশ্য এর মানে এ নয় যে সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনা তাঁর একেবারে ছিলো না। বরং উলটোটাই সত্য। পত্রগুচ্ছ থেকেই জানা যায় যে 'আমেরিকায় বৃহৎ ব্যবসায় এবং জঙ্গী ক্ষমতার ভয়ংকর মিলন' সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন এবং বৃহৎ শক্তিদের মধ্যে পারমাণবিক প্রতিযোগিতা তাঁকেও আতঙ্কিত করতো (৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬১)। বিশ্বশান্তি কামনা করতেন, লণ্ডনের ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে পারমাণবিক-বোমা-বিরোধী প্রতিবাদীদের মিছিল পর্যন্ত বাচ্চা ব'য়ে দেখতে গেছিলেন, দেখে আবেগবশে অশ্রুপাতও করেছিলেন। বিশ্বধ্বংসের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে তাঁর নবজাত শিশুও যে প্রতিবাদ জানালো সে কথা ভেবে গর্বিত বোধ করেছিলেন। মা-কে লিখেছিলেন :

'প্রসঙ্গত বলি, আশা করি তুমি বা ওয়ারেন নিক্সনকে ভোট দেবে না। তাঁর ক্যালিফর্নিয়া নির্বাচনী মহড়ার সময় থেকেই তাঁর রেকর্ড অত্যন্ত কুৎসিত—একটি জঘন্যতম জাতের ম্যাকিয়াভেলি উনি। আচ্ছা, তুমি একটু খোঁজ নেবে কি, আমি কোনো উপায়ে ভোট দিতে পারি কি না। আমি কখনও ভোট দিইনি, এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়ায়—তা সে অংশগ্রহণ যত সামান্যই হোক-না-কেন—খারাপ লাগে। কেনেডি সম্পর্কে তোমার মত কী? শার্প্‌স্‌ভিলের হত্যাকাণ্ড এখানকার মানুষকে খুব বিচলিত ও ক্ষুব্ধ করেছে।'

(২১শে এপ্রিল, ১৯৬০)

কিন্তু মোটের উপর এ কথা সত্য যে সিলভিয়া পঞ্চাশের দশকের আমেরিকায় বড়-হওয়া মেয়ে, যে দশকে মৌল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা যুবসমাজে ততটা বহু-

প্রচলিত হয়নি যতটা হয়েছে পরে, যেমন ষাটের দশকের শেষের দিকে বা সত্তরের দশকের গোড়ায়। হিপিতন্ত্রের ব্যাপক প্রভাবের অগ্রবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি তিনি। তাঁর সহপাঠিনী ন্যান্সি হান্টার স্টাইনার লিখেছেন যে তাঁদের সময়কার ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন তথাকথিত 'নীরব প্রজন্ম'-এর অন্তর্গত; তাঁরা বিদ্রোহী ছিলেন না, সমাজের প্রত্যাশার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলার চেষ্টা করতেন। সিলভিয়ার জীবনে এই প্রভাব কল্যাণকর হয়নি।

৪

আগেই বলেছি যে সিলভিয়ার ঘরোয়া পত্রগুচ্ছ তাঁর কবিতা-উপন্যাসের বিকার-প্রীতির সূত্র জোগায় না, বরং তাঁর চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধকেই তীব্রতর ক'রে দেখায়।

ক্রমশ এখন কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে সিলভিয়া ছিলেন একটি দ্বিধাবিভক্ত চরিত্র বা দ্বৈত ব্যক্তিত্ব। নিজের দ্বিধাবিভক্ত খণ্ডদু'টিকে জোড়া দিতে পারেননি, ক্রূরহাস্যে তাদের পুতুলনাচের অভিনয় দেখে গেছেন। তাঁর কবিতায় বা উপন্যাসে সেই প্রাণোচ্ছল সৌন্দর্যপিপাসিনী প্রেমময়ী মেয়েটির সন্ধান মিলবে না, যাকে আমরা পাই জননীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিপত্রে। টেড হিউজের লেখার মতোই তাঁর লেখা আঙ্গিকের নৈপুণ্যে ও বলিষ্ঠতায় চমৎকারী, অথচ আত্মিক কাঠিন্যে ভয়ংকব। হয়তো-বা এ জন্যেই তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভালোবাসার কথা চিঠিপত্রে এত লিখেছেন, অথচ তাঁর কবিতা-উপন্যাসে প্রেমের স্বাক্ষর নিতান্ত দুর্লভ। যে টেডকে নিয়ে এত মাতামাতি করলেন তাঁর উদ্দেশ্যে একটিও নরম মেজাজের দরদী কবিতা নিঃসৃত হয়নি, এটা সাধারণ পাঠকের কাছে রহস্যময় বৈ কি।

নরকে অবতরণ ধ্রুপদী কাল থেকেই কাব্যের যোগ্য বিষয়বস্তু। মেফিস্টোফিলিসের সঙ্গে সংলাপচারিতাও পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক দিনের ফ্যাশন, যা বাঙালীদেরও প্রভাবিত করেছে। কিন্তু তরুণী সিলভিয়া এ সব ব্যাপারে একেবারে প্রথম সারিতে, একজন প্রকৃত সিনিক। তাঁর জরুরী রচনায় এমনকি কোনো রোম্যান্টিক ফাউস্টীয় হাহাকারের স্বাদ সেই, তাঁর ইনফার্নো-র পর কোনো পারাদিসো-র দ্যুতি নেই, আছে সেই 'experienced horror and icy, sardonic control'—জনৈক সমালোচকের ভাষা মূলেই উদ্ধৃত করলাম—যা তাঁকে জুটিয়েছে কোনো কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীর হাততালি। শুধু মৃত্যুর

আগেকার বা স্বামীর সঙ্গে অমিল হবার পরেকার লেখায় নয়, প্রায় আগাগোড়াই তিনি দুঃস্বপ্নের শিল্পী, যে দুঃস্বপ্ন ক্রমশ পরিণতি পায় যুক্তিবহির্ভূত, বিবেকবর্জিত হিংস্র ফ্যাণ্টাসিতে। কোলের ছেলেকে নিয়ে লেখা 'নিক্ অ্যাণ্ড দ্য ক্যাণ্ড্‌ল্‌স্টিক'-এর মতো গুটিকয়েক কবিতা বাদ দিলে তাঁর সমগ্র জরুরী সাহিত্যকীর্তিতেই নঞর্থক বক্তব্য ও বীভৎসরসের প্রাধান্য।

বিশেষত বাপ-মাকে নিয়ে তিনি যেন ছিনিমিনি খেলেছেন। এটা ঠিক যে শিল্প শিল্পই, আত্মজীবনী নয়। তবুও 'দ্য বেল্‌জার্' উপন্যাসটি স্পষ্টতই আত্মজৈবনিক—কতখানি, তা উপন্যাসটি এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী মিলিয়ে মিলিয়ে না পড়লে বোঝাই যাবে না। শুধু চেষ্টিত আত্মহত্যার কাহিনীটি নয়, তৎপরবর্তী তাঁর প্রথম পুরুষসংসর্গের রীতিমত অপ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা পর্যন্ত—যার বিবরণ চিঠিপত্রে নেই, কিন্তু ন্যান্সি হাণ্টার স্টাইনারের জবানবন্দীতে আছে—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপন্যাসটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন সিলভিয়া। এ হেন একটি আত্মজৈবনিক উপন্যাসে তিনি নায়িকার বিধবা মায়ের চিত্র এঁকেছেন এতখানি ঘৃণা-বিদ্বেষ মিশিয়ে যে শ্রীমতী অরেলিয়া প্ল্যাথ যে কন্যার উপন্যাসটি প'ড়ে হার্টফেল করেননি এটা অরেলিয়ারই চরিত্রের দৃঢ়তা প্রমাণ করে। এ ছাড়া সিলভিয়ার কবিতাগুচ্ছেও মায়ের মূর্তি প্রায় সর্বত্রই নঞর্থক।

অনুরূপভাবে, 'এরিয়েল'-এর অন্তর্গত 'ড্যাডি' কবিতাটি পড়বার পর কোনো পাঠকের যদি ধারণা হয় যে কবির বাবা ছিলেন একজন ক্রূরচিত্ত নাৎসী মনোভাবের জার্মান, তাহ'লে পাঠককে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না, অথচ বেচারী অটো প্ল্যাথ মোটেও তা ছিলেন না। খটকা বাধে, খুঁটিনাটির ব্যবহারে। কবির বাবাও জার্মানবংশজ ছিলেন, ভালো জার্মান জানতেন। স্বভাবতই পাঠকের মনে হবে, নিজের বাবার কথাই বলছেন নাকি ? অথচ কবির আসল বাবার কথা ঠিক বলা হচ্ছে না, অন্তত প্রধানত নয়। 'ড্যাডি' একটি প্রতীক। সিলভিয়া প্রত্যাখ্যান করছেন সব পুরুষদের : পিতাদের এবং স্বামীদের। তা ছাড়া কবিতাটি শুধু পিতৃতন্ত্রের প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে নয়, এর মেজাজ রীতিমত পুরুষ-বিদ্বেষের।

অরেলিয়া তাঁর দাম্পত্যজীবনের যেসব খুঁটিনাটি পরিবেশন করেছেন তা সিলভিয়ার কবিতার অনেক অনুপুঙ্খের উপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত করে, এবং এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আট বছর বয়সে হারানো বাবা যে কোনো কারণেই হোক কন্যার লেখায় চিত্রকল্প, প্রতীক ও ভাববস্তুর অনন্ত উৎস হয়ে পড়েছিলেন। জীববিজ্ঞানী অটো প্ল্যাথ মৌমাছিদের বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন, বই লিখে-

ছিলেন ; এবং সিলভিয়ার একাধিক কবিতা মৌমাছি-চাষ-সংক্রান্ত। পায়ের আঙুল, জুতো ইত্যাদির পুনরাবৃত্ত চিত্রকল্পও তাঁর বাবার শেষ দিনগুলির স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত। কিন্তু সিলভিয়ার কবিতায় এ সব অনুপুঙ্খের ব্যবহার ঠিক স্বাভাবিক নয়—অস্বাভাবিক। তিনি এদের দ্বারা শুধু প্রভাবিত নন ; আবিষ্ট, রীতিমত ভূতে-পাওয়া। এদের উপর তিনি আরোপ করেছেন যৌনতার মাত্রা, পিতার প্রতি কন্যার তথাকথিত আকর্ষণ 'ইলেকট্রা কম্প্লেক্স'-এর আয়তন। বস্তুত, তিনি পিতা, মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম সম্পর্কে পুরাণ রচনা করেছিলেন। পরিচিত খুঁটিনাটি-গুলোকে জোড়া-তাড়া দিয়ে, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে, ইচ্ছামত তথ্যের বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা ঘটিয়ে, নিজের অবচেতনকে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে, মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে চিত্রকল্প ধার ক'রে এবং সেগুলি তাঁর ব্যক্তিগত পর্দায় অভিক্ষিপ্ত ক'রে তিনি এমন একটি পৌরাণিক জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যার অভ্যন্তরে পরিচিত বাস্তবতা দুর্লক্ষ্য। তাঁর পুরাণরচনার নিছক কলাকৌশলকে দোষাবহ বলা চলে না,—অনেক শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির কর্মশালাই এ জাতীয়—তাঁর রচিত পৌরাণিক জগৎটিই অপ্রীতিকর।

কবি-সমালোচক ডেভিড হলব্রুক মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সিলভিয়ার কবিতা-উপন্যাসের আনুপুঙ্খিক বিশ্লেষণ ক'রে সিলভিয়ার চরিত্রকে দ্বিধাবিভক্ত 'Schizoid' লক্ষণাক্রান্ত ব'লে চিহ্নিত করেছেন। এই মানসের মানুষেরা বাস্তব জগৎকে ঠিক বাস্তব ব'লে অনুভব করতে পারেন না, আপন সত্তার বাস্তবতা বিষয়েও তাঁদের প্রকৃত প্রত্যয় থাকে না। আপন অস্তিত্বের অনিশ্চয়তার সহবর্তী হয় একদিকে জীবন-মৃত্যুর ভেদাভেদলোপ, অপরদিকে ভীত, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত আত্মগরিমা। এই মনোবৃত্তির মানুষদের যে সব কেস্-হিস্ট্রি বা বিবরণ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা দিয়েছেন, সেগুলির সঙ্গে, হলব্রুক সযত্নে দেখিয়েছেন, সিলভিয়ার কেস্‌টা হুবহু মিলে যাচ্ছে। হলব্রুক বলছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যেই যেহেতু 'Schizoid' অবস্থার লক্ষণ বিদ্যমান, সেহেতু ঐ মানসের শিল্পে আত্মপ্রকাশ এ সভ্যতায় বাহবা পেয়ে থাকে।

'স্কিৎসয়ড' মানসিক অবস্থা যে কতখানি জন্মগত 'gene'-সমষ্টির উত্তরাধিকার, আর কতখানি পরিপার্শ্বের সঙ্গে ঠোকাঠুকির ফল, সে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীরা কোনো নিশ্চিত মত দিতে পারেন না। আমার ব্যক্তিগত মতে সিলভিয়ার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটার সমাধান করা প্রায় অসম্ভব তা এই : তিনি কতখানি ডাক্তারী অর্থে সত্যিকারের 'স্কিৎসয়ড' ছিলেন, আর কতখানি—তাঁর শিল্পে—তার অভিনয় করেছিলেন।

স্মরণীয়, যে আত্মহত্যার প্রথম চেষ্টার পর সিলভিয়া মনোরোগবিশেষজ্ঞদের চিকিৎসাধীন হয়েছিলেন—পাশ্চাত্য সমাজের রীতিই তাই। খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে পাশ্চাত্য সভ্যতা আত্মহত্যার অধিকার স্বীকার করে না। ঐতিহ্যগত বিচারে আত্মহত্যা পাপ, আইনত অপরাধ, এবং ডাক্তারী মতে মানসিক অসুস্থতার পরিণাম। এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে যে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে তাঁর পক্ষে গ্লানি, লজ্জা, অপরাধবোধ কাটিয়ে ওঠা কঠিন হ'তে পারে। হয়তো যে সময়ে সিলভিয়ার প্রয়োজন ছিলো শুধু বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার এবং আপন জনের স্নেহের, সে সময়ে মনোরোগবিশারদদের হস্তক্ষেপ তাঁর পক্ষে শুভ হয়নি। তাঁর লেখাতে হাসপাতাল, ডাক্তার-নার্স তথা তাঁদের সহযোগিতায় রত মায়ের বিরুদ্ধে একটা স্পষ্ট আক্রোশ লক্ষণীয়। তা ছাড়া তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্প থেকে বোঝা যায় যে তিনি যে বৈদ্যুতিক শক্ থেরাপির অধীন হয়েছিলেন সেটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিলো।

জানা যায় যে দুর্ঘটনাটি থেকে সেরে ওঠার পরে তিনি মনোবিকারসংক্রান্ত বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। দু'টো ব্যাপার হয়ে থাকতে পারে। প্রথমত, এ কথা সুবিদিত যে আধিব্যাধিসংক্রান্ত বইপত্র নাড়াচাড়া করতে হ'লে শক্ত ডাক্তারী মন চাই; পাঠকের মন অত্যধিক সুকুমার, স্পর্শকাতর, কল্পনাপ্রবণ হ'লে তিনি যাবতীয় রোগের দুর্লক্ষণ নিজের মধ্যে খুঁজে পাবেন। মনোবিকার সম্বন্ধে বইপত্র প'ড়ে সিলভিয়ার ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে তিনি অপ্রকৃতিস্থ এবং সে অবস্থার জন্য দায়ী তাঁর 'জেনেটিক' উত্তরাধিকার তথা শৈশবের ও কৈশোরের পরিপার্শ্ব। হয়তো সে জন্য তিনি নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করেছিলেন, ভাগ্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলে তাঁর লেখায় দুনিয়ার বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে যে সুস্পষ্ট আক্রোশ সেটা সহজবোধ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, এটা হ'তে পারে যে মনোবিকার সম্বন্ধে তাঁর আহৃত জ্ঞানকে সিলভিয়া নিপুণভাবে তাঁর শিল্পে কাজে লাগিয়েছিলেন। দক্ষ শিল্পীর সূত্রধার ভূমিকার দিকটি মনে রাখতে হবে। পাব্‌লিকের মেজাজ চতুর শিল্পীর বুঝে নিতে দেরি হয় না। তার পর তিনি যা বলতে চাইছেন তা কতটা বলবেন আর লোকে যা শুনতে চাইছে তা কতটা শোনাবেন তা নির্ভর করে শিল্পীর সততার উপরে। দ্বিধাবিভক্ত আত্মার উত্তেজক শিল্পরূপ যে হাততালি পাবে এটা বুঝে নিতে সিলভিয়ার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের দেরি হবার কথা নয়—প্রথম যৌবনেই বুঝে গেছিলেন।

সিলভিয়ার চোদ্দ বছর বয়সে লেখা একটি কবিতা অরেলিয়া উদ্ধৃত করেছেন—কবিতাটি স্পষ্টত উনিশ শতকী রোম্যান্টিক বেদনার ধারার অন্তর্গত। ঐ বয়সে আমরা অনেকেই ঐ ছাঁদে লিখেছি, কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বিধাবিভক্ত সত্তায় রূপান্তরিত হইনি। সিলভিয়ার প্রথম দিককার বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক আর্তি কী ক'রে পরে স্কিৎসয়ড ফ্যান্টাসিতে রূপান্তরিত হলো সেটার রহস্য বোধ করি পাব্‌লিকের সঙ্গে শিল্পীর গূঢ় চক্রান্তের মধ্যে নিহিত আছে।

অল্প বয়স থেকেই পত্রপত্রিকায় লেখা পাঠাতেন সিলভিয়া। অরেলিয়া লিখেছেন যে সিলভিয়া কৈশোরেই আবিষ্কার করেন একটি তথ্য : যে পত্রিকা-সম্পাদকেরা শিল্পী-সত্তার নন্দিত আত্মপ্রকাশ পছন্দ করতেন না ; কি গল্পে কি কবিতায় একটু বেদনার আভাস থাকলে তবেই রচনাটি নির্বাচিত হতো। ফলে ট্র্যাজিক স্বরে লেখার দিকে ঝুঁকেছিলেন তিনি।

বাকিটা আমরা অনুমান ক'রে নিতে পারি। যিনি ট্র্যাজিক স্বরে লিখতে পারেন তিনি দরকার হ'লে 'neurotic' ঢঙেও লিখতে পারেন। সিলভিয়া যখন প্রথম যৌবনে পৌঁছলেন তখন ইঙ্গ-মার্কিন বিদগ্ধ মহল অ্যান্টি-রোম্যান্টিক, 'neurosis'-এর ভক্ত, হয়তো ডিলান টমাসের খ্যাপামিতে ক্লান্তও বটে। সে সময়ে শিল্পী যদি একাধারে নির্লিপ্ত, শীতলমস্তিষ্ক, আঙ্গিকে সংযত, এবং ভাবনায় বিকার-প্রিয় ও বিস্ফোরক হ'তে পারেন, তাহ'লে বাজিমাৎ। আত্মহত্যার প্রথম চেষ্টার পর সিলভিয়া যখন প্রকাশ্যত মানসিক বিকারের ছাপ-মারা হলেন, তখন সেটাকে মূলধন হিসেবে খাটিয়ে 'বিকারগ্রস্ত অথচ সম্পূর্ণ সংযত শিল্পী'-র ভূমিকায় বাজিমাৎ করার লোভ তিনি বোধহয় এড়াতে পারেননি। নারী হয়েও এই ভূমিকায় সফল হ'তে পারায় তিনি দ্বিগুণ হাততালি পেয়েছিলেন।

এটা খুবই সম্ভব যে একবার ঐ জাতের কবিতা লিখে প্রশংসা পাবার পর থেকে তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে আর অন্য কোনো জাতের কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সাহস পাননি, বরং শেষের দিকের অসুখী অবস্থায় ঐ ঢঙটাকেই তার চরমে নিয়ে গেছিলেন। অভিনয় করতে করতে অভিনীত ভূমিকার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেছিলেন। কিন্তু অ্যালভারেজ-প্রমুখ যেসব সমালোচকেরা তাঁকে মাথায় তুলেছিলেন তাঁরা তাঁদের প্রিয় অভিনেত্রীকে বাস্তব অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেন না, এটাই দুঃখের বিষয়।

চিঠিপত্রের ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে কবিজননী মধ্যে মধ্যে কন্যাকে আনন্দের কথা, সাধারণ মানুষের কথা নিয়ে লিখতে বলতেন। একবার, টেড

ডেভন ছেড়ে চ'লে যাবার পর, সেরকম কোনো ইঙ্গিতে সিলভিয়া খেপে উঠে মাকে লিখেছিলেন :

'দুনিয়ার প্রয়োজন প্রফুল্ল লেখাটেখা এ সব কথা আমাকে আর শুনিও না তো। শারীরিক বা মানসিক বেল্‌সেন থেকে যে বেরিয়ে এসেছে তাকে এ খবর দেবার দরকার নেই যে হ্যাঁ, পাখিরা এখনও টুই টুই ক'রে শিস দেয়, সে চায় সেই পূর্ণ জ্ঞান যে অন্য কেউও সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার সব থেকে খারাপকে জেনেছে—সেটা ঠিক যা তা-ই। সুখী বিয়ে-টিয়ের কথা শুনলে আমার এখন যে সাহায্য হবে তার চেয়ে ঢের বেশি সাহায্য হবে এ কথা শুনলে যে লোকেদের ডিভোর্স হয় এবং তারা নরকের মধ্য দিয়ে যায়। সুখী বিয়ে নিয়ে "লেডিজ হোম জার্নাল"-কে বক্তৃতা মারতে দাও।'

(২১ শে অক্টোবর, ১৯৬২)

অথচ এই 'লেডিজ হোম জার্নাল"-এ গল্প ছাপবার জন্যই এক সময়ে উঠে প'ড়ে লেগেছিলেন তিনি!

১৯৬২ সালের হেমন্তে না হয় তিনি অত্যন্ত অসুখী, কিন্তু ব্যাপার এই যে তার আগেও, তাঁর সুখী বিবাহের অভ্যন্তর থেকেই তিনি **'neurotic'** কবিতা লিখছিলেন। ১৯৫৭ সালের মার্চে মাতৃস্থানীয়া শুভাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতী অলিভ প্রাউটি তাঁকে লিখেছিলেন :

'তোমাকে নিয়ে আমার অনেক গর্ব, সিলভিয়া। তোমার গল্প সবাইকে বলতে ভালোবাসি। "অ্যাটলান্টিক" পত্রিকায় তোমার কবিতাটি প'ড়ে একজন আমাকে বললেন, "কী তীব্র!" কোনো এক সময়ে আমার জন্য এমন একটি ছোট্ট কবিতা লিখো তো, যা তীব্র নয়। বাতির আলো যদি বেশি প্রখর হয় তো তার চিমনির কাচকে ফাটিয়ে দেয়। মধ্যে মধ্যে নম্র দ্যুতিটুকু দিও, এই আমার অনুরোধ।'

কি অন্তর্ভেদী এই মন্তব্যটি! অলিভ হিগিন্‌স্ প্রাউটি ছিলেন নিজে লেখিকা, ধনী এবং বদান্য মহিলা। সিলভিয়া নানাভাবে ঋণী ছিলেন এঁর কাছে। এঁর প্রতিষ্ঠিত বৃত্তি নিয়ে তিনি স্মিথ্ কলেজে যান; তাঁর কলেজজীবনের বৈকল্যের সময় ইনি অরেলিয়াকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন; এবং সংক্ষেপে ইনি ছিলেন সিলভিয়ার সম্পদে পৃষ্ঠপোষিকা, বিপদে সাহায্যদাত্রী। এঁর চিঠি থেকে এ উদ্ধৃতিটুকু দিয়ে সম্পাদিকা অরেলিয়া এটুকু বোঝাতে চেয়েছেন যে সিলভিয়ার চরিত্রনিহিত বিপদকে পেশাদার সাহিত্যসমালোচকেরা বুঝতে পারেননি, সিলভিয়াকে

তাঁরা নাচিয়েছেন, কিন্তু পারিবারিক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পেরেছিলেন বিপদটা। হাজার হোক, সিলভিয়ার প্রথম চেষ্টিত আত্মহত্যার ব্যাপারটা তো তাঁরা ভালো ক'রে জানতেন। সিলভিয়া অবশ্য তাঁর উপন্যাসে নায়িকার মায়ের চরিত্রকে যেমন নঞর্থকভাবে এঁকেছেন তেমনই শ্রীমতী প্রাউটির মডেলে একটি চরিত্র সৃষ্টি ক'রে তাঁকেও ঢের বিদ্রূপ করেছেন। তা ছাড়া প্রাক্তন বান্ধবদেরও তুলোধুনো করেছেন।

এমনই অদৃষ্টের পরিহাস, সিলভিয়া চেয়েছিলেন একজন অস্তিবাচক, নন্দিত মহিলা কবি হ'তে, অন্তত তাঁর সুখী অবস্থায় তেমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। চেয়েছিলেন ভালোবাসা পেতে এবং দিতে (৮ ই অক্টোবর, ১৯৫৬)। লিখেছিলেন :

'আমি হবো পৃথিবীর কতিপয় মহিলা কবিদের অন্তর্গত এমন একজন যে সম্পূর্ণত আনন্দিত নারী, কোনো তিক্ত, হতাশ, বিকৃত পুরুষ-অনুকারক নয়, যে অনুকরণ অবশেষে মহিলা কবিদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি নারী এবং নারীজন্মে আনন্দিত। আমি গান গাইবো পৃথিবীর উর্বরতার, ক্ষয়-শোক-মৃত্যুর মধ্যে মানুষের উর্বরতার গান। আমি গায়িকা হবো। টেড আর আমার সুন্দর মিলিত জীবন হবে।'

(২৬ শে মে, ১৯৫৬)

কিন্তু আর যা-ই হোন তিনি, তাঁর শিল্পে আনন্দিত নারী বা উর্বরতার গায়িকা তিনি হয়ে উঠতে পারেননি। বিশেষত তাঁর শৈলী যখন আক্রমণাত্মক, বিদ্বিষ্ট, বা বিদ্রূপাত্মক হয়ে পড়ে তখন তাকে পুরুষ-অনুকরণ ব'লেই মনে হবে। যদি নামজাদা লোকেদের কথা তুলতে হয় তা হ'লে বলা চলে যে ওয়েব্‌স্টর থেকে কাফ্‌কায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে horror-এর যে ধারাটি বহমান সিলভিয়া তারই দুহিতা। এবং নারী হয়েও এই ভয়ংকর নৃত্যে দক্ষতার সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছিলেন ব'লে তিনি বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। একেবারে প্রথমে, অন্যান্য অনেক অল্পবয়স্ক কবির মতো, তিনিও গান বেঁধেছিলেন যৌবনবেদনায়, রোম্যান্টিক আর্তিতে। কিন্তু তার পরে এলিয়টীয় নৈর্ব্যক্তিক ঢঙে horror-এর কথা বলাতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সব শেষে জুড়েছিলেন ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তির মাত্রা—তাতে জয়জয়কার হয়।

এক অর্থে বলা চলে যে 'Letters Home' বইটির প্রকৃত নায়িকা সিলভিয়া

নন, অরেলিয়া। একের পর এক আঘাত সহ্য করেছেন তিনি, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। যৌবনে বিধবা হয়েছেন, অর্থ উপার্জন ক'রে সন্তানদের মানুষ করেছেন, মেয়ের দু'-দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টা, দ্বিতীয়বারে তাঁর মৃত্যু তথা তাঁর লেখায় মাতৃমূর্তির উদ্দেশ্যে বর্ষিত বিদ্বেষবিষ হজম করেছেন, জনতার কৌতূহল এবং গবেষকদের বিশ্লেষণও সহ্য করেছেন। তার পরেও এ মোটা বইটি যে তৎপরতার সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের লজ্জা দেবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার তো নেতিবাচক শিল্পীর চাইতে তাঁর জীবনযুদ্ধে জয়ী, কর্মিষ্ঠ জননীকেই অভিনন্দন জানাতে অধিকতর আগ্রহ হয়।

এই প্রবন্ধটি রচনা করার সময় নিম্নলিখিত বইপত্র ব্যবহার করেছি :

Sylvia Plath, *The Colossus*, Faber Paperback, 1975 reprint.
... *Ariel*, Faber Paperback, 1974 reprint.
... *Crossing the Water*, Faber Paperback, 1975.
... *Winter Trees*, Faber Paperback, 1975.
... *The Bell Jar*, Faber and Faber, 1971 reprint.
... *Letters Home, Correspondence 1950-1963*, selected and edited with a commentary by Aurelia Schober Plath, Faber Paperback, 1977 reprint.
... *Among the Bumblebees* (short story), *Bananas*, No. 12, autumn, 1978.

R. D. Laing, *The Divided Self*, Tavistock Publications, 1969 reprint.

David Holbrook, *Sylvia Plath : Poetry and Existence*, The Athlone Press, University of London, 1976.

Nancy Hunter Steiner, *A Closer Look at Ariel, a memory of Sylvia Plath*, Faber paperback, 1976 reprint.

ডেভিড হলব্রুকের বইখানির শেষে সিলভিয়া-সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ গ্রন্থতালিকা মিলবে। অনুসন্ধিৎসুরা সেটির সাহায্য নিলে উপকৃত হবেন। তবে নতুন বই ক্রমাগত বেরোচ্ছে, ফলে কোনো তালিকাই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। মনে হয় যে সিলভিয়ার সিরিয়াস পাঠকদের অন্তত নিম্নলিখিত বইগুলি দেখা দরকার :

Sylvia Plath, *Crystal Gazer and Other Poems,* Rainbow Press, London, 1971.

... *Johnny Panic and the Bible of Dreams and other Prose Writings.* Faber and Faber, new edition due in April, 1979.

Charles Newman (ed.), *The Art of Sylvia Plath,* a symposium, Faber and Faber, 1970.

আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনে টেলিভিশনের অভিঘাত

কিছু ব্যক্তিগত কথা দিয়ে এই আলোচনাটি শুরু করতে বাধ্য হচ্ছি। কেন, তা একটু পরেই প্রতিভাত হবে।

ব্রিটেনে সংসার পাতার পর বহু বছর যাবৎই টেলিভিশন খরিদ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিনি। যত দিন ছেলেরা আসেনি তত দিন কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। পিছনে তাকিয়ে এখন বুঝতে পারি যে ছেলেদের বয়স যখন ছিলো তিন-চার সে-সময়ে এই সমাজে, যেখানে ঘরের কাজে বা ছেলে-ভোলানোর ব্যাপারে বাইরের সাহায্য পাওয়া দুষ্কর, টেলিভিশন-নামক যন্ত্রটির কাছ থেকে আমি কিছু মূল্যবান সাহায্য পেতে পারতাম। ঐ বয়সের শিশুদের জন্য বি.বি.সি. টেলিভিশন ভারি সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান করে। শিশুদের ঐ সব অনুষ্ঠানের সামনে বসিয়ে দিয়ে মা তাঁর হাতের কাজ খানিকটা এগিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সে-সময়ে আমরা টেলিভিশন কিনিনি ; হয়তো সেটা বোকামিই হয়েছে। পাঁচ বছর বয়সে ছেলেরা যখন নার্সারি স্কুল ছেড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করলো তখন তারা ঘরে আনতে লাগলো তাদের সমাজের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান টেলিভিশন-সম্পর্কে জরুরী যত খবর। কিছু দিনের মধ্যেই সতীর্থদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে তারা বুঝে গেলো যে টেলিভিশন-নামক বস্তুটির মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার রকমের হুল্লোড়। তাদের খেয়াল হলো যে ক্লাসের আলাপ-আলোচনার একটি প্রধান বিষয়বস্তুই টেলিভিশনে দেখা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, এবং তাদের বাড়িতে একটি সেট না থাকায় ঐ আলোচনায় অংশগ্রহণ করার আনন্দ থেকে তারা নিদারুণভাবে বঞ্চিত। এই উপলব্ধি সব থেকে বেশি মর্মাহত করলো আমাদের বড় ছেলেকে ; টেলিভিশনের অভাবটা সে অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করলো, এবং আমরা তাকে কীভাবে বঞ্চিত করছি সে-সম্বন্ধে নিন্দা গীত গাইতে লাগলো। রোজ বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে সে কোনো প্রতিবেশীর বাড়ি যাবেই যাবে, টেলিভিশন দেখতে। যেতোও। না যেতে দিলে মেঝেতে শুয়ে কাতর কান্না : 'সক্কলের টেলিভিশন আছে, শুধু আমাদের নেই'। প্রায় রোজই তাকে দেখা যেতো অন্যের দোরে কড়া নাড়তে। সঙ্গে যেতো ছোটজনও। দাদা পাশের বাড়ি গেলে কোন্ ছোট ভাই সঙ্গে যেতে না চাইবে? এরকমভাবে কিছু দিন চলার পর আমাদের অগত্যা আপস করতে হলো। সৌভাগ্যক্রমে মাত্র

বিশ পাউণ্ডে একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড টেলিভিশনের অধিকারী হয়ে গেলাম আমরা, এবং বাড়িতেও খানিকটা শান্তি এলো।

সেই সেটটি এখনও বিকল হয়নি, দিব্যি চলছে, এবং আমাদের পারিবারিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছে। তার প্রভাব, তজ্জনিত লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি খতিয়ে দেখবার সময়ও এসে গেছে।

এ কথা না মেনে উপায় নেই যে আজকের যন্ত্রশিল্পনির্ভর সমাজগুলিতে টেলি-ভিশন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের কোঠায় উন্নীত এবং বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমগুলির মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। তথাকথিত অনগ্রসর দেশগুলিতেও তার প্রভাব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। টেলিভিশন থেকে নাগরিকেরা আহরণ করে তাদের প্রমোদ, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে খবরাখবর, সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডারে নানান অনুপুঙ্খ, একাধিক ঘরোয়া সমস্যার সমাধানপদ্ধতি, বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিদ্যায় বিশেষজ্ঞদের মতামত, এবং জীবনের নানান ব্যাপারে গ্রহণীয় দৃষ্টিভঙ্গি। ইডিওলজির বিকিরণ যেসব দেশে একান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন সমাজবাদী দেশগুলিতে, বা সামরিক একনায়কত্বের অধীন দেশগুলিতে, সে-সব দেশে টেলিভিশন রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সোভিয়েত দুনিয়ার বা চীনের টেলিভিশন তাদের সরকারের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখতে পারে না।

এখানে কোনো সাম্যবাদী তর্ক তুলতে পারেন যে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রে'র টেলি-ভিশনব্যবস্থাও, হোক না তা সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, তার সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকেই পৃথিবীকে দেখে। নিশ্চয়ই দেখে, কিন্তু 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' যেহেতু চিন্তার স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্যকে বিশেষ মূল্য দেয়, সেহেতু একটা প্রাথমিক উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতাও তার সামাজিক দৃষ্টিকোণেরই অন্তর্গত। অতিকায় মতৈক্য ও মত-বৈচিত্র্য, এ দুয়ের মধ্যে তফাত অবশ্যই আছে। কেউ যদি বলেন, 'এটা আমার মত; অমুক মুনি এ কথা ব'লে গেছেন, এবং তাঁর প্রতিটি কথা অভ্রান্ত; এটা শাশ্বত, নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত; যে আমার মতের বিরুদ্ধে সে সন্দেহজনক ও বিপজ্জনক ব্যক্তি', তাহ'লে শ্রোতার মনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু কেউ বলেন, 'এটা আমার মত; অমুক মুনি অবশ্য অমুক কথা ব'লে গেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই, এই এই কারণে; এ বিষয়ে আপনার কি মত?' তাহ'লে আমরা উৎসুক হয়ে বক্তার দিকে তাকাই এবং স্বকীয় মতামত ব্যক্ত করতে আরম্ভ করি। মুক্ত দুনিয়ার টেলিভিশন সম্পর্কে এটা মানতেই হয় যে তা আলোচনাপ্রিয়, যে কোনো বিষয়ে আলোচনাচক্রের আয়োজন করা তার

প্রিয় কাজ ; এবং অন্তত আমার তো মনে হয় যে একদেশদর্শিতা অপেক্ষা বহুমুখী আলোচনার মাধ্যমেই যাথার্থ্যের হদিশ পাওয়া সুকর।

অবশ্য তার মানে মোটেও এ নয় যে অবাধ স্বাধীনতা ব'লে মানুষের জীবনে কিছু আছে। নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা, এ দুয়ে মিলেই সামাজিক মানুষ, এবং সে পথেই সভ্যতার অগ্রগতি হয়ে থাকে। তবে ঐ দুই উপাদানের অনুপাত কী হবে তা নিয়ে তর্ক চলছে, চলবে। মুক্ত দুনিয়ার টেলিভিশনেও কোনো কোনো ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। সে আলোচনায় পরে আসছি।

এখানে বলা দরকার যে টেলিভিশন সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা মুখ্যত বি.বি. সি.-কে ঘিরে। কদাচিৎ 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট টেলিভিশন' বা সংক্ষেপে 'আই.টি.ভি.'-র অনুষ্ঠানও দেখে থাকি। তবে বি.বি.সি.-ই বেশি দেখা হয়, কারণ একাধারে মনোজ্ঞ ও মননশীল অনুষ্ঠান বি.বি.সি.-ই বেশি পরিবেশন ক'রে থাকে। সুবিধা এই যে প্রচারমাধ্যম ও শিল্পমাধ্যম হিসাবে বি.বি.সি. যথেষ্ট আত্মসচেতন ও বিশ্লেষণপ্রিয়। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশে-বিদেশে টেলিভিশনের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে সর্বদা আগ্রহী এবং বিভিন্ন দেশের টেলিভিশনব্যবস্থার উপরে তথ্যচিত্র প্রস্তুত করতে ব্যগ্র। এই তথ্যচিত্রগুলির অনেক জায়গা জুড়ে থাকে অন্য দেশের টেলিভিশন-অনুষ্ঠানের অংশ। এভাবে ক্যানাডা, কিউবা, ব্রাজিল, ইস্রায়েল, জার্মানী, ফ্রান্স, রুশদেশ, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, এমনকি ভারতের টেলিভিশন অনুষ্ঠান থেকেও নানান অংশ দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছে।

বি.বি.সি.-র একটি অনুষ্ঠান থেকেই জেনেছি যে বিভক্ত বার্লিনে টেলিভিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ। পূর্ব-পশ্চিম দুই বার্লিন পরস্পরের টেলিভিশন মারফৎ পরস্পরের খবরাখবরের ও চিন্তাধারার হদিশ রাখতে পারে। বিশেষত পূর্ব বার্লিনের মানুষের কাছে এর মূল্য প্রভূত, কারণ পশ্চিম সম্পর্কে খাঁটি খবর পাবার আর কোনো পথ তার নেই। পুবের খবর বা বইপত্তর পশ্চিমে ঢুকতে পারে, কিন্তু পশ্চিমের সংবাদপত্র-পুস্তকাদি পুবে ঢুকতে পারে না। বেতার বা টেলিভিশনকে বইপত্রের মতো নিষেধের কাঁটাতার দিয়ে আটকে রাখা যায় না। 'মুক্ত দুনিয়া', বিশেষত তাদেরই প্রতিবেশী পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে পূর্ব বার্লিনের নাগরিকদের কৌতূহল স্বাভাবিক বৈ নয় ; ফলে তারা যথেষ্ট আগ্রহসহকারে পশ্চিম বার্লিন-কর্তৃক প্রচারিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে এবং তার সাহায্যে 'মুক্ত দুনিয়া' সম্পর্কে নিজেদের ওয়াকিবহাল রাখে।

এও জেনেছি যে ক্যানাডার ফরাসীভাষী কুইবেক অঞ্চলে ফরাসীভাষাশ্রয়ী

টেলিভিশন ফরাসীভাষী ক্যানাডীয়দের জাতীয়তাবোধ, সংস্কৃতি-অভিমান ও রাজনৈতিক আত্মসচেতনতাকে বহুগুণ বর্ধিত করেছে এবং ইংরেজীভাষী ক্যানাডীয়দের থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতাবোধকে তথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য তাদের দাবিকেও পুষ্ট করেছে।

উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলির মাধ্যমে রিলে করা সম্ভব হওয়ায় একই টেলিভিশন অনুষ্ঠান মহাদেশ জুড়ে প্রচারিত হ'তে পারে। ভারতেও বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ইয়োরোপেও বিশেষ কোনো ঘটনা উপলক্ষ্যে এটা করা হয়। যেমন সম্প্রতি পশ্চিমে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে পুবে ইস্রায়েল ও তুরস্ক পর্যন্ত দর্শকেরা 'ইয়োরো-ভিশন'-এর মাধ্যমে একই গীতপ্রতিযোগিতা দেখতে পারলো। একই উপায়ে ফরাসী টেলিভিশনের সান্ধ্য সংবাদ-পরিবেশন কয়েক ঘণ্টা পরে ব্রিটেনে নৈশ 'তেলেজুর্নাল' (Téléjournal) আকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বত্রই এক অনুষ্ঠান দেখা সম্ভব হবে। এই নৈকট্যের ফল সুদূরপ্রসারী হ'তে বাধ্য।

২

যন্ত্র হিসেবে টেলিভিশন কতগুলি প্রচণ্ড সুবিধার অধিকারী। আকারে সেটি একটি সুইচ-সম্বলিত ছোট সাইজের বাক্স—কথ্য ইংরেজীতে ঠাট্টাচ্ছলে তাকে 'দ্য বক্স' ব'লে ডাকাও হয়ে থাকে—এবং বেতারের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সাধারণ নাগরিকদের ঘরে ঘরে একবার তার প্রবেশ ঘটলে তার জয় প্রায় অবশ্যম্ভাবী। বেতার যেখানে শুধুমাত্র ধ্বনিনির্ভর, টেলিভিশন সেখানে চোখ এবং কান দুই ইন্দ্রিয়কেই তৃপ্ত করতে সমর্থ। গতিশীল দৃশ্যাবলী এবং ধ্বনির চিত্তাকর্ষক সমন্বয়ে, সংবাদ পরিবেশনের সময় ঘটনাস্থলের সঙ্গে চোখকানের সরাসরি সংযোগস্থাপনে তার ঈর্ষণীয় ক্ষমতায়, প্রমোদবিতরণে তার যান্ত্রিক ক্লান্তিহীনতার কৌশলে টেলিভিশন যথার্থই বলতে পারে. 'আমি এলাম, দেখলাম, জয় করলাম'। প্রথমে দর্শকদের চোখকানকে, তারপর সামগ্রিক অর্থে তাদের বোধশক্তিকে টেলিভিশন অল্প আয়াসে বশে এনে ফেলতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় যে কোনো শহরে কোনো নতুন ছবি মুক্তিলাভ করার পর সিনেমাহলের সামনে মানুষের ভিড় স্মরণীয়। সাধারণ মানুষ, সে বিত্তশালী দেশের নাগরিকই হোক, আর ছা-পোষা বাঙালীই হোক, কোনো কঠোর আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত না হ'লে খোঁজে একটু প্রমোদের স্বাদ। সেই প্রমোদের অষ্টপ্রহরব্যাপী উপকরণকে যদি একটি বাক্সের

আকারে একেবারে বাড়ির ভিতরেই পাওয়া যায়, সিনেমাহলে দৌড়নোরও প্রয়োজন থাকে না, তাহ'লে সেটি যে গৃহদেবতার সমান হয়ে উঠবে তা আর বিচিত্র কি? ঠাকুরঘরে ঠাকুরের যে স্থান, পাশ্চাত্য দেশের ঘরে ঘরে টেলি-ভিশনেরও প্রায় সে স্থান হয়েছে—সে হয়ে উঠেছে বৈঠকী কামরার 'ফোকাল পয়েন্ট'।

প্রাচ্য অর্থে যৌথ পরিবারপ্রথা পশ্চিম ইয়োরোপে বহুদিন ধ'রেই বিলুপ্ত, তবে শিল্পবিপ্লবের আগেকার সমাজে বিবাহিত যুবকযুবতীরা বাপমায়ের সঙ্গে এক আস্তানাতে না থাকলেও সাধারণত এক গাঁয়ে বা কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে বাস করতো। ফলে দু-তিন পুরুষের মধ্যে লেনদেনটা বেশি হ'তে পারতো। বুড়ো-বুড়ীরা নাতিনাতনীদের সঙ্গ বা শেষ জীবনে সেবাটুকু বেশি পেতেন, যুবতী মায়েরা সন্তানপালনে মা বা শাশুড়ীর খানিকটা সাহায্য পেতে পারতেন। সে সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ়তর তো ছিলোই, পাড়াতুতো সম্পর্কগুলোও প্রবল ছিলো,—প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনতো, বিপদে-আপদে সাহায্য করতো। এক কথায়, মানুষ আরও বেশি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ছিলো। শিল্পবিপ্লবোত্তর সভ্যতায় আত্মীয়তার বন্ধন শিথিলতর। বাবা, মা, এবং নাবালক সন্তানদের যে সমষ্টিকে সমাজবিজ্ঞানীরা 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি' ব'লে অভিহিত করেন এখন হলো সেই কোষতুল্য ক্ষুদ্র পরিবারেরই যুগ। অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ছেড়েই দিলাম, কৈশোরের গণ্ডী পেরোনোর পর বাপ মা ও আপন ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কই শ্লথ হয়ে পড়ে। আর পাড়াতুতো সম্পর্কগুলো আধুনিক শহুরে জীবনে কতখানি ম্লান হয়ে যায় তা কলকাতার লোকেদেরও অজানা নেই। অথচ প্রকৃতি প্রকৃত ফাঁক পছন্দ করে না, বোধ হয় তাই গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন গৃহরূপ বাক্সে বন্দী মানুষের ত্রাণকর্তা হয়ে পড়েছে টেলিভিশন-নামক বাক্সটি। টেলিভিশন নিয়ে নিয়েছে একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক ভূমিকা: বিচ্ছিন্ন মানুষের বিচ্ছিন্নতা-বোধের সঙ্গে অহর্নিশ সংগ্রামের অস্ত্র সে।

পশ্চিমের সব দেশই ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইডেন, উত্তর আমেরিকা ইত্যাদির মতো যন্ত্রশিল্পনির্ভর ও নগরপ্রধান নয়, তবে সাধারণভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার গতি সে দিকেই। সর্বত্রই বৃহত্তর পারিবারিক এবং পাড়াতুতো সম্পর্কগুলো শিথিল হয়ে পড়ছে এবং কোষ-পরিবারের সত্তা দৃঢ় হচ্ছে। সেই সুযোগে টেলিভিশনের প্রভাবও বেড়ে চলেছে এবং তার ফলাফলও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। ইয়োরোপের একটি অপেক্ষাকৃত 'অনগ্রসর' দেশ স্পেনের

জিপ্‌সী পরিবারগুলি বেশ কয়েক শতাব্দী ধ'রে 'ফ্ল্যামেংকো' রীতির নৃত্যগীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে ও বিবর্তিত করেছে। এই শিল্পশৈলী মূলত গোষ্ঠীর জীবনজাত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে স্পেনের জিপ্‌সীরাও নগরসভ্যতা এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পাল্লায় প'ড়ে তাদের আস্তানা ছেড়ে সরকারী ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সেখানে তারা অন্যান্য শহরবাসীদের মতো কোষ-পারিবারিক টেলিভিশন-কেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, ভুলে যাচ্ছে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত নৃত্যগীতের ধারা। টেলিভিশনই যেখানে প্রমোদ জোটাতে ব্যস্ত, সেখানে নিজেদের উঠোনে নেমে নাচার বা গলা ছেড়ে গাওয়ার প্রয়োজনটা কোথায়? ফ্ল্যামেংকো শিল্পীদের মনে তাই আশঙ্কা যে অন্যান্য অনেক লোকশিল্পের মতো ফ্ল্যামেংকোও তার গোষ্ঠী-পরিবেশ হারিয়ে হয়ে পড়বে শুধু শিল্পীদেরই শিল্প। স্টুডিওতে, স্টেজে, হয়তো টেলিভিশনের পর্দাতেই তাকে 'ধ'রে রাখতে হবে'। মজা এই যে ফ্ল্যামেংকো সম্পর্কে এ খবরটিও আমি পেয়েছি টেলিভিশনের মাধ্যমেই: বি.বি.সি.-র একটি ফ্ল্যামেংকো-সমীক্ষায়।

সন্দেহ নেই যে প্রতিকূল জলবায়ুর সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত টেলিভিশনসেবনের কিছু যোগাযোগ আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবন যেমন ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে রাস্তায় উপচে পড়ে, বিকেল-সন্ধ্যায় রোয়াকে এবং দাওয়ায় আড্ডা জ'মে ওঠে, শীতপ্রধান দেশের মানুষ তেমনি ভালোবাসে দিনের কাজ শেষ ক'রে খাওয়াদাওয়া সেরে জানালার পর্দা টেনে আগুন পোহাতে, আর সেই অলস মুহূর্তে টেলিভিশন যে সাধারণ মানুষের সন্ধ্যাসঙ্গী হয়ে উঠবে তা প্রত্যাশিতই বটে। যারা রান্নাবান্নার ঝামেলার মধ্যে যেতে নারাজ তারা রেডি-মেড্ খানা চটপট গরম ক'রে নিয়ে কোলের উপর ট্রে-তে সাজিয়ে ব'সে পড়ে; খাওয়া আর টেলিভিশন দেখা একসঙ্গেই চলতে থাকে। বাইরে যখন বরফ ঝরছে বা উত্তুরে হাওয়া বইছে তখন গৃহাভ্যন্তরের নিশ্চিন্ত উষ্ণতায় সুইচ টিপে প্রাপ্তব্য প্রমোদই যে মানুষের প্রিয়তর হবে এ তো স্বাভাবিকই। এও নিজের পর্যবেক্ষণ থেকেই জানি যে এ দেশের মানুষ গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালেই বেশি ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে। টেলিভিশনে পরম আসক্ত বালকেরাও জুন-জুলাইয়ের রোদে ভরা লম্বা দিনগুলি এলে ফুটপাথে সাইকেল চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে রোদের দেশের মানুষ শীতের দেশের মানুষের চাইতে দৈনিক কত ঘণ্টা কম টেলিভিশন দেখে, জলবায়ু অনুসারে এই নেশাটা ঠিক কী হারে বাড়ে বা কমে সে-জাতীয় কোনো পরি-সংখ্যান আমার জানা নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ব্রাজিলের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও টেলিভিশন প্রতাপশালী। ব্রাজিলের টেলিভিশনে সরকারী প্রচার প্রচুর পরিমাণে হয়ে তো থাকেই, উপরন্তু একটি চ্যানেল শ্রমিকশ্রেণীর ছেদহীন চিত্তবিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট। সে চ্যানেলটিতে ভোর থেকে গভীর রাত অবধি নাচগান; ভাবাবেগে আপ্লুত নাটক, বীররসে ভরপুর আখ্যান ইত্যাদি পরিবেশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ চ্যানেলটির ভূমিকা বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রশিল্পের ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়। অপর পক্ষে কিউবাও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এবং তার টেলিভিশনও সরকারী প্রচারে নিযুক্ত, তবে দুই দেশের প্রচারে বিস্তর প্রভেদ। কিউবার টেলিভিশন কঠোর আদর্শবাদী, বিপ্লবকে সার্থক করার কাজে উৎসর্গীকৃত, এবং শুধু প্রমোদবিতরণ তার উদ্দেশ্য নয়।

৩

এবারে আসা যাক পাশ্চাত্য কোষ-পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে টেলিভিশনের কী প্রভাব তার পর্যালোচনায়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এই পরিবেশে মা ও শিশুর নিঃসঙ্গতার কথা। তৃতীয় দুনিয়ার বস্তিবাসিনী মায়ের শিশু হয়তো অপুষ্টিতে ভুগছে, তার নেই দুধ বা রোগের পথ্য, কিন্তু তাদের চারদিকে আছে মানুষের উত্তাপ ও কলরোল। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য কোষ-পরিবারের মা ও শিশু ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবৃত হয়েও মানবিক সঙ্গ থেকে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন, যেন দ্বীপবর্তী। এই নিভৃত পরিবেশে শিশুদের মুখে কথা সাধারণত একটু দেরিতেই ফোটে। একাধিক লোক শিশুদের সঙ্গে অনর্গল কথা বললে শিশুরা তাড়াতাড়ি কথা বলতে শেখে। পাশ্চাত্য কোষ-পরিবারের প্রাক্-বিদ্যালয় শিশু সারাটা দিন কাটায় শুধু মায়ের সান্নিধ্যেই। তার অন্য কোনো পরিচারিকা তো নেইই, রোজগারী বাবার সঙ্গেও তার আদান-প্রদানের প্রধান সময় হপ্তাশেষটুকু। বিশেষত স্মরণীয় যে শীতপ্রধান দেশের শিশুরা সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যায়; ফলে তাদের বাবারা যখন কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরে তখন তারা হয় শুয়ে পড়েছে নয় শুতে যাবে।

শিশুর জন্মের পর বর্ধিত গৃহকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকের দেহমনের সব কিছু খোরাক জোগানোর ভার এসে পড়ে একা যুবতী মায়ের ঘাড়ে। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়, পরিচারক-পরিচারিকার সহায়তা ছাড়া, গৃহকর্ম এবং শিশুদের তত্ত্বাবধান যে কতখানি শ্রমসাধ্য এবং কী পরিমাণ মানসিক উত্তেজনা ও ক্লেশ সৃষ্টি করতে

পারে তা যিনি এ কাজ করেননি তাঁর ধারণার বাইরে। উপরন্তু মনে রাখতে হবে যে জীবনযাত্রার উন্নত মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘরকন্না এবং সন্তানপালনের মানও পশ্চিমে রীতিমত উঁচু। নারীর কর্মকুশলতা এবং গুণবৈচিত্র্যের ব্যাপারে এ সমাজের প্রত্যাশা প্রায় অসীম, এবং এখানে সুগৃহিনী আখ্যা পাওয়া কোনো মুখের কথা নয়। 'ভালো বৌ', 'চমৎকার মেয়ে', 'দারুণ গিন্নী', এবংবিধ নাম কিনতে হ'লে প্রায় চৌষট্টি কলায় পারদর্শিনী হওয়া দবকার। শুধু বসবার ঘরটিকেই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে চলবে না, রান্নাঘরটিকেও ফিটফাট ধোপদুরস্ত পরিচ্ছন্নতায়, এমনকি বসবার ঘরের মতোই শৌখিন শোভন শ্রীতে মণ্ডিত অবস্থায় রাখতে হবে। বাড়ির সামনে বা পিছনে ফাঁকা জায়গা থাকলে তাকে মালীর সাহায্য ছাড়াই ফুল আর সব্‌জিতে ভরিয়ে তুলতে না পারলে প্রশংসা পাওয়া যাবে না। তা ছাড়াও বাড়ির ভিতরে জানালার তাকে যেখানেই রোদ পড়ে সেখানেই সারি সারি টবে ফুল বা পাতাবাহারের কেয়ারি করতে পারা চাই। পশম বোনা, শৌখিন সেলাই ইত্যাদির কথা ছেড়েই দিলাম, সে-সব ছেলেখেলা মাত্র : গাড়ি চালানো, দরজা-জানালা-দেয়াল রঙ করা, ওয়ালপেপার লাগানো, এ সব কাজে অভিজ্ঞতাও নিতান্তই প্রত্যাশিত। কাঠের কাজ এবং ইলেকট্রিক মেরামতের কাজ জানা থাকলে আরোই ভালো। রোজকার আহার জোগানো ছাড়াও হরেকরকমের মিষ্টি রান্না, কেক-পেস্ট্রি-বিস্কুটের বেকিং, পার্টির উপযুক্ত রন্ধনপ্রণালী ও পরিবেশনের কায়দাকানুন রপ্ত থাকা চাই; এবং বাজার করা থেকে শুরু ক'রে পরিবেশন করা পর্যন্ত প্রতিটি অনুপুঙ্খই নিজের হাতে করতে হবে, বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহিনীর মতো পরিচারক-পরিচারিকার সাহায্য নিয়ে নয়। এ সমাজের পুরুষেরা যদিও বাধ্য হয়েই গৃহকর্মে হাত লাগায়, তবুও মোটের উপর তারা যেহেতু দিনের অধিকাংশ সময় রোজগারে ব্যস্ত এবং ঘরের বাইরে, তাই সংসারের হাজার কাজের প্রধান দায়িত্ব অনিবার্যত স্ত্রীদের ঘাড়েই এসে পড়ে।

ফলে এ সমাজে কচি শিশুদের মায়েরা যে প্রায়ই ক্লান্তি, নৈরাশ্য, বিষাদ বা স্নায়বিক বৈকল্যের শিকার হয়ে পড়েন তা আর আশ্চর্যের কী। প্রায় নিরুপায় হয়েই মায়েরা তাঁদের শিশুদের বসিয়ে দেন টেলিভিশনের সামনে। শিশুদের কান্নাও থামে; মায়েরাও হাতের কাজ এগিয়ে নেন। যে পরিবেশে শিশুরা দ্বীপবর্তী, মানবিক ভাববিনিময় থেকে বঞ্চিত, সেখানে টেলিভিশন হয়ে ওঠে তাদের সঙ্গী, একাধারে ধাই-মা, বেবী-সিটার, খেলা-দেনে-ওয়ালী দিদি, গল্প-বলিয়ে ঠাকুমা। যারা মানুষের মুখ থেকে মাতৃভাষা শোনার সুযোগ কম পায়

তারা টেলিভিশন থেকেই অনেক নতুন শব্দ শিখে নেয়। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ব্রিটেনের শিশুরা মুখ্যত বি.বি.সি.-র 'Playschool', 'Jackanory' ইত্যাদি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান থেকেই শেখে তাদের ঐতিহ্যের ছেলে-ভোলানো ছড়া, গান এবং রূপকথাগুলি। শিশুদের বড় হয়ে ওঠার জীবননাট্যে ঠাকুমা-দিদিমা-মাসী-পিসী-মামা-কাকাদের কথকতার যে ভূমিকাটি প্রাচ্য যৌথ পরিবারে ধ'রেই নেওয়া হয় তার অভাবে পাশ্চাত্য কোষ-পরিবারে টেলিভিশনই হয়ে ওঠে আত্মীয়-তুল্য। বাক্সের পর্দাতেই চেনা হয়ে যায় অনুষ্ঠান-পরিবেশকদের মুখ ; এই 'টেলি-তুতো' মামা-কাকা ও মাসী-পিসীরাই আপন আত্মীয়স্বজনের চাইতে বেশি পরিচিত হয়ে যায়।

শিশুরা যত বড় হয়, টেলিভিশন তাদের জীবনে তত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকে। আগেকার দিনের চারণদের মতো আজকের টেলিভিশন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, শিক্ষক তথা প্রমোদ-পরিবেশক। স্কুলের ভূমিকার থেকে তার ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢের বেশি। বি.বি.সি.-র ছোটদের জন্য অনুষ্ঠানগুলি যে সত্যিই মনোজ্ঞ তা স্বীকার করার জন্য 'সাহেবদের-বুটজুতো-চাটা' হবার কোনো দরকার নেই। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার বিপুল আয়োজনে বি.বি.সি. অপরাজেয়। স্কুল-কলেজের ক্লাসঘরে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী তো আছেই, তা ছাড়াও দেশবিদেশের মানুষ, জীবনধারা, ঘটনাবলী, পশুপক্ষী, গাছপালা ইত্যাদি বিষয়ে খবরাখবর দিতে, দেশবিদেশের নানান সমস্যা সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করতে, বিজ্ঞানকে ঘরোয়া ব্যাপার ক'রে তুলতে, কিশোর-দের বিশ্বসচেতন নাগরিক হিসেবে গ'ড়ে তুলতে বি.বি.সি.-র আত্মনিবেদন সত্যিই প্রশংসনীয়। সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতি বিকালে 'John Craven's News-round'-এ ছোটদের জন্য খবর পড়া হয়, এবং খবর শোনার পর আমার ছেলেরা প্রায়ই গম্ভীর মুখে রান্নাঘরে এসে আমাকে শুনিয়ে দিয়ে যায়, 'তিমিমাছদের অবস্থা খুবই খারাপ, শিকার ক'রে ক'রে তাদের ধ্বংস ক'রে ফেলা হচ্ছে', কিংবা 'ইণ্ডিয়াতে আরেক দফা সাইক্লোনের উৎপাত হয়ে গেলো'।

এ ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ে এমন কতগুলি অনুষ্ঠান আছে যা ছোটরা বড়দের সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে দেখতে পারে। আমি ভাবছি 'Tomorrow's world', 'The World About Us', 'Horizon' ইত্যাদি সিরিজের কথা। আমি নিঃসংকোচে স্বীকার করবো যে এ জাতীয় অনুষ্ঠান থেকে আমি নিজে বিপুলা এ পৃথিবী ও বিপুলতর সৌরজগৎ সম্বন্ধে অমূল্য শিক্ষা আহরণ করেছি। নানান

অরণ্যের আদিবাসীদের জীবন, নানান সমুদ্রের তিমি-হাঙর, বরফের দেশের বল্গাহরিণ বা পেংগুইন পাখি, ব্রাজিলের কার্নিভ্যাল, কিউবার আখের ক্ষেত, চীনের 'কম্যিউন', পিকিং-এর চিড়িয়াখানা, মঙ্গোলিয়ার প্রান্তর, তিব্বতের অভ্যন্তর, মস্কোর বলশয় থিয়েটার থেকে রিলে-করা ব্যালে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাবলী, বালির সুকুমার সৌন্দর্য, শ্যামদেশের বৌদ্ধ মঠ, মালয়ের হিন্দুদের চড়কতুল্য শৈব উৎসব, মার্কিন সৈন্যদের সাইগন-ত্যাগ, উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যদের সাইগনে জয়প্রবেশ, মায় হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সত্য দৃশ্য, চাঁদে মানুষের পদক্ষেপ, বা মঙ্গলগ্রহের লাল-পাথর-ছড়ানো শরীর : এত রকমের, এত বিচিত্র দৃশ্য কি টেলিভিশন ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বাড়িতে ব'সে দেখতে পারা যেতো ? এ যেন ঘরের ভিতরেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বক্তৃতামালার চাইতেই অনুষ্ঠানগুলি সার্থকতর, সুন্দরতর, শব্দ ও দৃশ্যের সমন্বয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্যভেদী। সাম্রাজ্যের অনিবার্য অবক্ষয়ের পর ব্রিটিশ সভ্যতার প্রকৃত মূলধন তার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ, তার চিন্তাজীবনের বৈদগ্ধ্য। সেই মূলধন খাটিয়েই বি.বি.সি. টেলিভিশনের রাজা হ'তে পেরেছে। আরও উল্লেখ-যোগ্য যে ব্রিটেনের 'Open University' বা 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' বি.বি.সি.-র মাধ্যমেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে বক্তৃতামালা পেশ করে।

৪

বস্তুত, ছোটদের এবং বড়দের এই দুই দলেরই মানসিক দিগন্তের সম্প্রসারণে বি.বি.সি.-র কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সংগীত, নাটক, অপেরা ইত্যাদির পরিবেশন তো আছেই, তা ছাড়াও সাহিত্য, চিত্রকলা, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, চিকিৎসাবিদ্যা, নগরপরিকল্পনা, স্বদেশের ও বিদেশের সামাজিক সমস্যাবলী ও রাজনৈতিক প্রশ্নাদি, অপরাধ ও দণ্ডনীতি, শিক্ষা, সন্তানপালন, নারী-আন্দোলন. ···এমন বিষয় নেই যার উপরে মননশীল আলোচনাচক্র বা অন্য কোনো সুচারু অনুষ্ঠান বি.বি.সি. প্রচার করেনি। দু'-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সম্প্রতি আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের উপরে একটি সিরিজ হয়ে গেলো যার তুলনীয় কোনো আলোচনা-চক্রের আয়োজন করতে পারলে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দর্শন-বিভাগের প্রধানেরা গর্বিত বোধ করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একটি গোপন চুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার কীভাবে স্তালিনের হাতে হাজার হাজার রুশ বন্দীকে সমর্পণ করে—তাদের মৃত্যু অবধারিত তা জেনেও—সে-সম্পর্কে একটি বিস্তারিত তথ্যচিত্র

পরিবেশন ক'রে বি.বি.সি. যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক ব্রিটেনে বর্ণসমস্যা বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ আলোচনাচক্র থেকে এ প্রসঙ্গে এ দেশে যত রকমের মতামত আছে সবই জানতে পারা গেলো। সংক্ষেপে বলা যায় যে এ ধরনের চিন্তাশীল কার্যক্রম দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত, দর্শকদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'a spectrum of opinion' সেই মতামতের বর্ণালীর প্রদর্শনে দর্শকদের স্বাধীন বিচারশক্তিকে উৎসাহ দেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস যে একতরফা যুক্তির, সাফাই গাওয়ার, একপেশে মত প্রচারের সংকীর্ণতার চেয়ে এই তথ্যের সমারোহ ও মতামতের ইন্দ্রধনুই নাগরিক-দের বিশ্লেষক বুদ্ধিকে তথা সমালোচনাশক্তিকে বেশি পুষ্ট করতে পারে। এবং এ প্রসঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের পাঠকদের একটি কথা না ব'লে পারি না—ইংরেজদের আর যত দোষ থাক, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ এই যে তারা অপরকে যতটা সমালোচনা করে তার চাইতে নিজেদের স্খলন-পতন-ত্রুটির সমালোচনা করে ঢের বেশি, এবং অপরকে উপহাস না ক'রে বরং নিজেদের সমাজের হাস্যকর ব্যাপারগুলি নিয়েই হাসাহাসি করে। বি.বি.সি. সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা দেখিয়েছিলেন। ভারত বা শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে কোনো অন্যায় মন্তব্য বা অশালীনতা বি.বি.সি.-তে কখনো লক্ষ্য করিনি। অথচ রক্ষণশীল দলের নেত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচারকে প্রায়ই সূক্ষ্মভাবে ঠেস দেওয়া হয়ে থাকে, এবং তার আগে টেড্ হীথ্‌কে দেওয়া হতো। জনপ্রিয় কমিক সিরিজ 'The Goodies'-এর অভিনেতাদের নীতিবাক্য হলো: 'আমরা যেখানে যা খুশি তাই করি', এবং এদের ভাঁড়ামির পিছনে প্রায়ই থাকে যথার্থ স্যাটায়ার, শ্লেষাত্মক সামাজিক-রাজনৈতিক সমালোচনা। এই সিরিজটিতে রানী এলিজাবেথ বা হ্যারল্ড্ উইলসনকে নিয়ে যে মস্করা দেখেছি তার তুলনীয় ঠাট্টাতামাশা অন্য অনেক দেশেই অভিনেতা-প্রযোজক-পরিচালক সবাইকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়তো। স্মরণীয় যে রঙ্গতামাশার মাধ্যমে বা তার ফাঁকে ফাঁকে সীরিয়াস কিছু বলার এই চেষ্টা শেক্সপীয়র থেকে বার্নার্ড শ পর্যন্ত কমিক ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার।

আগেই বলেছি যে প্রাচীনকালের চারণদের মতো আধুনিক টেলিভিশন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, শিক্ষক তথা প্রমোদ-পরিবেশক। তবে ঐতিহ্যের সম্প্রসারণে, তাতে নতুন উপাদান বা মাত্রা যোজনার চেষ্টায় টেলিভিশন রেনেসাঁস-উত্তর যুগেরই প্রতিষ্ঠান। পাশ্চাত্য সভ্যতার আরও অনেক ক্রিয়াকলাপের মতো টেলিভিশন বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ দ্বারা আক্রান্ত: আত্মবিশ্লেষণ, আত্মসমালোচনা,

বিষয়াশ্রয়িতা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রভৃতিতে তার উৎসাহ উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানচর্চার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের ক্রমোন্নতি অবধারিত। সে প্রসঙ্গে পরে আবার আসছি। আপাতত উল্লেখ করতে চাই যে নিছক মনোরঞ্জনে টেলিভিশনের ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বৃহত্তর চলচ্চিত্রশিল্প যেমন হ'টে যাচ্ছে—আমাদের পাড়ার সিনেমাহলটিও সম্প্রতি উঠে গেলো—তেমনি, আমার বিশ্বাস, তার দৌলতে পাশ্চাত্য পুরুষের সন্ধ্যে হ'লে পাবে দৌড়নোও খানিকটা কমেছে। পাবের বিকল্প টেলিভিশন। সাধারণ নাগরিক কর্মস্থল থেকে ফিরে দু'-চার ঘণ্টা টেলিভিশন দেখে। হপ্তাশেষে টেলিভিশন-দর্শন অনেকখানি বেড়ে যায়। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই ছুটি-মার্কা বিশেষ কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। শনিবারে আসর জম-জমাট। ঐ দিন বি.বি.সি.-র যুগল চ্যানেলের প্রসাদে বাড়িতে ব'সে চার-চারটি পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম দেখা সম্ভব। রবিবারের সকালে এ দেশে অনেকেই যেহেতু বেলায় শয্যাত্যাগ করেন, সেহেতু ঐ সকালটি এশীয় আগন্তুকদের জন্য অনুষ্ঠান, ফরাসী বা জার্মান ভাষা শিক্ষার আসর, এ ধরনের কার্যক্রমের জন্য চিহ্নিত। খ্রীষ্টান দেশের মানুষের অবশ্য রবিবারে ধর্মচিন্তা করার কথা। ধর্মবিশ্বাসের স্রোত মন্দগতি হয়ে এসেছে, গির্জাগুলিতে ভিড় হ'তে চায় না। যাঁরা বাড়িতে ব'সেই উপাসনার পরিবেশটুকু পেতে চান তাঁদের জন্য কিছু রবিবাসরীয় পূজা-অর্চা, ভজনগান ইত্যাদি কোনো গির্জা বা ক্যাথিড্রাল থেকে বিলে করার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য প্রসঙ্গত এ-ও উল্লেখযোগ্য যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে প্রশ্ন ক'রে আলোচনার সূত্রপাত করতেও বি.বি.সি. পশ্চাৎপদ নয়, এবং সম্প্রতি বি.বি.সি.-র 'Who was Jesus ?' অনুষ্ঠানটি থেকেই প্রথম খবর পেলাম যে খ্রীষ্টধর্মের কোনো কোনো মুখপাত্রই বলতে শুরু করেছেন যে যীশু একজন ইহুদী ধর্মগুরু ছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের অবতার ছিলেন না।* রোববারের দুপুর থেকে বি.বি.সি.-র কার্যক্রম হালকা এবং গুরুগম্ভীর কর্মসূচীর ঠাসবুনটের একটি পরাকাষ্ঠা। তিনটি গোটা ফিল্মের ব্যবস্থা। ফলে সপ্তাহান্তে বাড়িতে ব'সে দু'দিনে সাতটি ছবি দেখা, যে-কারণে সিনেমাহলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হুল্লোড়ের ফাঁকে ফাঁকে তুষার যুগ কাকে বলে,

* সম্প্রতি এ প্রসঙ্গে আমি একটি প্রবন্ধ রচনা করেছি। "যীশু কে ছিলেন ?" এই নামে দীর্ঘপ্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে পাঠিয়েছি, আশা করছি প্রকাশিত হবে।

আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ কেন হয়, হাইডেগারের অস্তিত্ববাদের স্বরূপ কী, এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানও ঢোকানো থাকবে।

কোষ-পরিবারপ্রথার আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিণাম প্রৌঢ় বয়স থেকেই নর-নারীদের জীবনে নতুন ক'রে নিঃসঙ্গতার উদয়। প্রাক্-বিদ্যালয় পর্যায়ের শিশুকে মানুষ করার সময় যুবতী মা যে ক্লেশ ও নিঃসঙ্গতা সহ্য করেন তার খানিকটা লাঘব হয় ছেলেমেয়েদের স্কুলজীবনের সময়ে। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গীর কোঠায় চ'লে আসে, বন্ধুবান্ধব ঘরে আনে, হয়তো তাদের মায়েদের সঙ্গেও আলাপ জ'মে যায়। জন্মদিনের পার্টি এবং ক্রিসমাস উৎসব উপলক্ষ্যে বাড়িতে আনন্দের সাড়া জাগে। কিন্তু দু'টি দশক যেতে না যেতেই থেমে যায় এ কোলাহল। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে চ'লে যায় যে যার কর্মস্থলে, বা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্রিটেনে ছেলেমেয়েদের ষোল বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ; তার পর তাদের স্বতন্ত্র অর্থ নৈতিক সত্তা স্বীকৃতি পায়, এবং বেকার থাকলে তারা বেকার-ভাতার দাবিদার হ'তে পারে। ফলে এই বয়স থেকে তারা বাপ-মায়েদের থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ দেশের ছেলেমেয়েরা এমনই স্বাধীনতার ভক্ত যে বাপ-মায়ের সঙ্গে এক শহরে থাকলেও প্রায়ই চাকরি পেলেই—বিয়ের আগেই—তারা আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে যেতে চায়। তার পর তাদের নিজস্ব সংসার পাতবার, নতুন পারি-বারিক ইউনিট স্থাপন করবার সময় তো এসেই পড়ে। প্রৌঢ় বয়স থেকে আবার একলা হয়ে যান অধিকাংশ বাপ-মায়েরা। এবং স্বামী-স্ত্রীর এক মুহূর্তে মৃত্যু যেহেতু দুর্লভ, সেহেতু কোষ-পরিবারের সভ্যসংখ্যা বিলুপ্তির আগে দুই থেকে একে ঠেকে। বিধবা, বিপত্নীক, অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা টেলিভিশনের বড় রকমের গ্রাহক। দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যাগুলিতে টেলিভিশন তাঁদের সময় কাটাতে অমূল্য সাহায্য করে, নির্জন ঘরে এনে দেয় মানুষের দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর, হাস্যরোল, সান্নিধ্য। যাঁরা বিশেষভাবে জরাগ্রস্ত, বা বাতের রোগী, বা পক্ষাহত, তাঁদের পক্ষে টেলিভিশন দেবতার বরের সমান। কেউ কেউ বসবার ঘরে একটি, শোবার ঘরে একটি, দু'টি সেটের ব্যবস্থা করেন। কোনো নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়াকে আমি বলতে শুনেছি : 'টেলি-ভিশনের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। যখন একলা লাগে, তখন বোঝাই, ঐ তো পর্দায় আমার বন্ধুদের মুখ, ঐ তো ওরা হাসছে, আমার সঙ্গে কথা বলছে, রসিকতা করছে। রিচার্ড বেকার, অ্যাঞ্জেলা রিপন* এঁরা আমার দিকে, আমার মতো কত

* এঁরা বি.বি.সি. টেলিভিশনে খবর পড়েন

একলা মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে খবর পড়ছেন।' এইভাবে টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান পরিবেশকেরা বা অভিনেতারা টেলি-তারকায় রূপান্তরিত হচ্ছেন। বি.বি.সি.-র পুলিশ-সংক্রান্ত সিরিজ 'Dixon of Dock Green' বা আই.টি.ভি-র শ্রমিক শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে সিরিজ 'Coronation Street' জনমানসে প্রায় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। শুনেছি যে দর্শকদের অনেকের নাকি খেয়াল থাকে না যে চরিত্রগুলি ও ঘটনাগুলি কল্পিত, এবং গল্পের মধ্যে একজন মারা যাওয়ার পর যিনি অভিনয় করছিলেন তিনিই মারা গেছেন এই ভেবে কোনো দর্শক নাকি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সমবেদনা জানিয়ে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন, যেমন পশ্চিমে রীতি। এই ধরনের অনুষ্ঠানে পাই টেলিভিশনের একটি ঘরোয়া ঘরানা, যার ভূমিকা পারিবারিক প্রমোদবিতরণ ও সমাজের সাধারণস্বীকৃত মূল্যবোধগুলির সংরক্ষণ। আবার অন্য আরেক ধরনের অনুষ্ঠানে প্রচলিত ভাবনা বা মূল্যবোধকে প্রশ্ন বা সমালোচনা করা হয়। ফলে স্থিতি ও পরিবর্তন, সমাজব্যবস্থার এই দুই প্রবণতাই টেলিভিশনে প্রতিফলিত হয়, যেমন হয় সাহিত্যে।

৫

এবারে আসতে হয় টেলিভিশনের কতগুলি নঞর্থক দিকের আলোচনায়। প্রথমত, টেলিভিশনের উপস্থিতি দৈনন্দিন জীবনে কতগুলি অপ্রিয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। টেলিভিশনের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ছেলেবুড়ো সবাইকারই সামাজিকতায় ভাঁটা পড়ে। শুধু যে আহারনিদ্রা শিকেয় ওঠে তাই নয়, গৃহে অতিথি এলে অতিথিসৎকারে ত্রুটি হয়, অতিথির সঙ্গে কথা না ব'লে গৃহস্বামী ও গৃহিণী সম্মোহক টেলিভিশনের দিকেই তাকিয়ে থাকেন; ছোঁড়রাও উঠে দাঁড়াতে, স্বাগতসম্ভাষণ জানাতে ভুলে যায়। পাছে তাদের কোনো প্রিয় অনুষ্ঠান দেখা বাদ প'ড়ে যায় সেই ভয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা বেড়াতে যেতে পর্যন্ত চায় না, কিংবা কোথাও গেলে ফিরে আসার জন্য ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে থাকে এবং ভবিষ্যতের আনন্দকে হারানোর আশঙ্কায় বর্তমানের আনন্দটুকুকে পুরোপুরি উপভোগও করতে পারে না। টেলিভিশনের সম্মোহনশক্তিকে বোধ হয় খানিকটা এড়াতে পারে প্রথম যৌবন, হয়তো নিছক জৈব তাগিদেই। কিন্তু প্রেমে পড়ার বা সাথী খোঁজার পর্যায়টা পেরিয়ে গেলে আবার যে-কে-সেই। তখন বিবাহিত দম্পতিরা বিশ্রম্ভালাপের বদলে টেলিভিশনদর্শনে ব্যস্ত থাকেন। ফলে এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে টেলিভিশনের শারীরিক উপস্থিতি এমন একটা প্রলোভন যাকে এড়ানো কঠিন। এই

গৃহস্থিত চলচ্চিত্রের উৎসটিকে সর্বদা খুলে রাখার লোভ অনেকেই সংবরণ করতে পারেন না। ঠিক যেমন গরমের দিনে বিজলী পাখাকে কেউ বন্ধ করতে চান না, ঠিক তেমনই অনর্গল বক্‌বক্‌ করতে থাকা টেলিভিশনকে বোতাম টিপে বন্ধ ক'রে দেবার জন্য কেউ উঠতে চান না, তার জন্য যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। এই যন্ত্রটির বিরামহীন বাচালতা ও পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলী মানবিক ভাববিনিময়কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

সব থেকে বেশি বিপদ ছোটদের। একেবারে ছেড়ে দিলে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন দেখেই কাটিয়ে দিতে পারে। আগেকার দিনে আমরা জানতাম যে মেধাবী ছেলেমেয়েরা 'বইয়ের পোকা' হয়। বইয়ের পোকা হ'তে হ'লে খানিকটা মাথা খাটাতে হয়। টেলিভিশনের পোকা হওয়া তার চাইতে অনেক সহজ; মাথা ঘামানোর কোনো দরকারই নেই, সোফায় গা এলিয়ে চোখ খুলে ব'সে থাকলেই হলো। কাজেই পাশ্চাত্য সমাজের ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে টেলিভিশনের পোকা বিস্তর। বাধা দিতে গেলে সরব প্রতিবাদ অবধার্য। কোনো এক শনিবার আমার ছেলেদের আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম. বাধা না দিলে তারা কত ঘণ্টা টেলিভিশন দেখতে পারে তা দেখার উদ্দেশ্যে। সেদিন আমার বড় ছেলে সাড়ে ন' ঘণ্টা টেলিভিশন দেখেছিলো, ছোটজন তার চাইতে খানিকটা কম।

মুশকিল এই যে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে টেলিভিশন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে গেছে, এবং হাজার হাজার লোকের জীবিকা তার সঙ্গে বাঁধা। এত জন কর্মীকে কাজ জোটাতে গিয়ে তার অনুষ্ঠানসূচীও হয়ে পড়েছে বড্ড বেশি দীর্ঘকাল-স্থায়ী, ফলে ভালো-মন্দ-মাঝারিতে মেশানো। কোষ-পরিবারের নিঃসঙ্গতাকে সে যেমন দূর করে, আবার তেমনই ঘরের মধ্যে একবার খুঁটি গেড়ে বসলে অনাহূত আগন্তুকের মতো ব'সেই থাকে, উঠতে চায় না। হয়তো দু'টি ভালো অনুষ্ঠানের মাঝখানে আধঘণ্টাখানেক এমন একটি অনুষ্ঠান যা দেখা সময়ের অপচয়মাত্র। ছোটরা সাধারণত ঐ আধ ঘণ্টা উঠে অন্য কিছু করতে চাইবে না, ঠায় ব'সে থাকবে। তা ছাড়া কোনো 'সীরিয়াস ছবি'-র পক্ষে টেলি-রুটিন থেকে মেরে-কেটে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময় ক'রে নেওয়া পর্যাপ্তও নয়। আবার হয়তো যেসব অনুষ্ঠান দেখলে তারা সত্যিই লাভবান হ'তে পারতো সেগুলিকে দেখানো হচ্ছে অনেক রাতে, যখন তাদের ঘুমোতে যাবার সময়। এটা তো প্রায়ই হয়। শনিবারের সকাল ধ'রে বা সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে সন্ধ্যা ছ'টা-সাতটার 'peak

viewing time'-এ হয়তো চললো নিছক ভাঁড়ামি বা কোনো আদ্যিকালের 'Cowboys and Indians' ফিল্ম, অথচ কোনো ভালো অপেরা, ব্যালে, নাটক, ফিল্ম বা আলোচনাচক্রের সময় নির্দিষ্ট হলো রাত সাড়ে ন'টায় বা সাড়ে দশটায়। তাদের সুরুচির পরিশীলনের পক্ষে এমন ঘটনা সুযোগের শোচনীয় অপচয়।

টেলিভিশন দেখাটা এক রকমের 'passive entertainment' যা দর্শকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দাবি করে না। ফুটবল না খেলে, বাজনা না বাজিয়ে, অভিনয়ে না নেমে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে খেলাধূলা, বাজনা বা অভিনয় টেলিভিশনের পর্দাতেই দেখা যায়। এই নিষ্ক্রিয়তা দু'ভাবে ক্ষতিকর। প্রথমত, এর ফলে ছোটরা অলস হয়ে পড়ে। তাদের মূল্যবান অবসরসময়ে, যখন তারা অন্য কোনো নেশা নিয়ে মাততে পারতো, তখন তারা আজে-বাজে অনুষ্ঠান দেখে সময় নষ্ট করে। খেলাধূলা, গান-বাজনা. ছবি-আঁকা, বই-পড়া, হোম-ওয়ার্ক ইত্যাদি রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয়ত, বিশেষত সেই ক্রিয়াকলাপই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেগুলি সময়সাপেক্ষ ও অনুশীলনসাপেক্ষ, যেগুলির জন্য চাই উদ্যম ও নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ। নিছক সময়ের অপচয়ের ফলে তো বটেই, তা ছাড়াও সৃষ্টিশীল বৃত্তিগুলিতে জড়তা আসার ফলে টেলি-লালিত শিশুদের পক্ষে শিল্পী, কবি, সংগীতজ্ঞ বা গণিতজ্ঞ হয়ে ওঠা কঠিন হ'তে পারে—অন্তত আমার সেই ভয় হয়। যেসব মায়েরা চান যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের কিছু 'সীরিয়াস রুচি' থাকুক তাঁদের রীতিমত সংগ্রাম করতে হয় সন্তানদের সঙ্গে। এ দিকে কোষ-পরিবারে বাপ-মায়ের কর্তৃত্ব প্রাচীনপন্থী নয় ব'লে এই সংগ্রামের টেনশনও তীব্র এবং মায়েদের পক্ষে বিশেষ ক্লান্তিকর। যেখানে ঠাকুর্দা-জ্যাঠাদের শাসন নেই, মাসী-পিসীদের সর্দারি নেই, বড়দের চোখ-রাঙানি অনেক কম, সেখানে ছোটদের স্বাতন্ত্র্য অনেক বেশি। অন্যান্য মাতব্বরদের অনুপস্থিতিতে শিশুরা তাদের বাপ-মায়ের বেশি কাছাকাছি, সমান-সমান, বন্ধু-তুল্য। এই সাম্য নানা দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় হ'লেও কতগুলি ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এবং আলোচ্য প্রসঙ্গ সেগুলির অন্যতম। 'এখন টেলিভিশন দেখা চলবে না' বললেই কোষ-পরিবারের ছেলেরা তা মেনে নেবে না, তাদের সঙ্গে সুদীর্ঘ বিতর্কে নামতে হবে, এবং তার জন্য যে সময় ও ধৈর্যের দরকার তা কতজন মায়ের থাকতে পারে? আর বাপেরা তো হামেশাই দৃশ্যে অনুপস্থিত, স্রেফ নেপথ্যচারী। ফলে টেলিভিশন দেখা উপলক্ষ্য ক'রে মা ও ছেলেদের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক দ্বন্দ্বও পাশ্চাত্য পারিবারিক জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে।

নিষ্ক্রিয় গ্রহণশীলতার মেজাজে শিশুরা যখন টেলিভিশনের সামনে গা এলিয়ে

ব'সে থাকে তখন পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন তাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বি.বি.সি. অবশ্য বিজ্ঞাপন বহন করে না, কিন্তু আই.টি.ভি.-র অনুষ্ঠানগুলি সেই 'রেডিও সিলোন কি ব্যাপারী ভাগ', যা এখনও চালু আছে কিনা আমার জানা নেই, তারই মতো ব্যাপার : কর্মসূচীর ফাঁকে ফাঁকেই পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন। এই মানসিক ভেষজ নিয়মিত সেবন করার পর ছোটরা খবরের কাগজ পড়তে শেখার ঢের আগেই চকোলেট-লজেন্স-আইসক্রীম-সাবান ইত্যাদি ব্যাপারে এমন বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়ে যে হাতব্যাগে-সীমিত-টাকাকড়ি-ধারিণী বেচারী মায়ের পক্ষে তাদের নিয়ে হাটবাজার করাই দায় হয়, অথচ বাচ্চাদের আয়ার জিম্মায় রেখে বাজারে বেরোনোও পশ্চিমে সম্ভব নয়!

ভোগসামগ্রীর ব্র্যাণ্ড-নাম সম্পর্কে শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতা অপ্রীতিকর, অসুবিধাজনক, হয়তো অবাঞ্ছনীয়ও বটে। কিন্তু তাদের কচি মনে ফিল্মী যৌনতা ও হিংসাদৃশ্যের প্রভাব নিশ্চয় আরও অনেক গুরুতর বিষয়। এ ব্যাপারে প্রধান অপরাধী বৃহত্তর চলচ্চিত্রজগৎ থেকে প্রদর্শিত ছবিগুলি,—সংক্ষেপে বলা যায় যে যে-জগৎটা আগে সিনেমাহলে আবদ্ধ ছিলো তা এখন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে—কিন্তু টেলিভিশনের স্বনির্মিত নিজস্ব কর্মসূচীও এ গ্লানি থেকে মুক্ত নয়। এবং যতদূর শুনেছি, ব্রিটিশ টেলিভিশনে যতটা যৌনতা, মারামারি, বা খুনোখুনি দেখা যায় মার্কিন টেলিভিশনে দেখা যায় তার চাইতে ঢের বেশি। ছোটদের মনে 'টি-ভি সেক্স অ্যাণ্ড ভায়োলেন্স'-এর প্রভাব ক্ষতিকর কিনা সে-বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে তর্ক আছে, কিন্তু তর্কের মীমাংসা নেই, এবং তর্ক চলাকালীন ছোটরা সমানে টেলিভিশন দেখে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে সাধারণভাবে অভিভাবকদের উদ্বেগ অবশ্যই আছে, এবং নাগরিকদের মধ্যে টি-ভি যৌনতা ও হিংসাদৃশ্যের বিরোধী 'লবি'ও আছে। লক্ষণীয় যে যাঁরা মনে করেন যে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই তাঁরা অল্পশিক্ষিত নন, উচ্চশিক্ষিতই বটে। মনোবিজ্ঞানীরা এবং সমাজবিজ্ঞানীরা বিরোধী রায় না দেওয়া পর্যন্ত এঁরা মত বদলাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এঁরা প্রতিভাত হন পশ্চিমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈদগ্ধ্যের দাসরূপে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর এঁরা এতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যে সামাজিক মানুষকে কীভাবে সাধারণ জ্ঞান খাটাতে হয় তা ভুলে মেরে দিয়েছেন। আমি স্কুলের শিক্ষিকা, ধর্মযাজকের স্ত্রী, এ হেন শিক্ষিতা মায়েদের বলতে শুনেছি যে টি-ভি-তে প্রদর্শিত খুনখারাপি বা অশ্লীলতার কোনো কুপ্রভাব নেই। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে,

পৃথিবীতে 'সুপ্রভাব' ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে 'কুপ্রভাব'-ই বা থাকবে না কেন? আমরা কি তেমন কোনো পীর-পয়গম্বর-অধ্যুষিত পুণ্যলোকে বাস করি যেখান থেকে 'সু' ও 'কু'-র দ্বন্দ্ব নির্বাসিত হয়েছে? হয়তো যাদের পাথরের মতো নিরেট, কঠিন মন তাদের মনে সুপ্রভাব-কুপ্রভাব কিছুই পড়ে না, কিন্তু সুকুমার, স্পর্শকাতর, কল্পনাপ্রবণ মনে শুভ-অশুভের কোনো প্রভাব পড়ে না এমন কথা—বিশেষত আদম-ঈভের আপেলভোজনবৃত্তান্ত যে সভ্যতার পুরাণ তার অভ্যন্তরে ব'সে—বিশ্বাস করা শক্ত বটে।

কেউ কেউ বলেন যে টেলিভিশনে ক্রমাগত দুনিয়ার দুঃসংবাদ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, লড়াই প্রভৃতি দেখে দেখে পাশ্চাত্য মানুষের সংবেদনশীলতায় জাড্য এসে গেছে, সংবাদচিত্রে দূরের মানুষের দুঃখ আর তার মর্মে প্রবেশ করে না, প্রকৃত যুদ্ধের শট্‌-কে বানানো ফিল্ম মনে হয়। এই জড়তা অবশ্য নিয়মিত সংবাদপত্র-সেবনেও আসে, তবে ছাপার অক্ষরের চেয়ে টেলিভিশনের মতো দৃশ্যগত মাধ্যমের প্রভাব যে বেশি হবে তা বোঝার জন্য পেশাদার মনোবিজ্ঞানী হবার দরকার নেই। পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন, অশ্লীলতা বা হিংসাদৃশ্যের প্রদর্শন সম্পর্কে উদ্বেগও অনেকটা এই কারণেই বটে।

নাবালক-সাবালক উভয় দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আমার নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলি এইরকম। প্রথমত, টেলিভিশনের পর্দায় যৌন আবেদন ছোটদের মনে নরনারীর প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তি অবশ্যই সৃষ্টি করে। এবং এ আবেদন সৃষ্টির প্রধান আঙ্গিক যেহেতু মেয়েদের ন্যাকা, বোকা এবং পাকা সাজানো, সেহেতু একদিকে ছোট মেয়েরা আচরণের আদর্শ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, অন্যদিকে ছোট ছেলেরা নারীজাতি সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা পোষণ করতে শেখে ('মেয়েরা হাসির বিষয়')। এখানে আমরা একটা বিরাট বিষয়ে পদার্পণ করছি—সীরিয়াস আর্টের সততার কথা অবশ্যই বলছি না, জ্ঞানপাপীদের দ্বারা পরিচালিত সুড়সুড়ির কথাই বলছি। এই সুড়সুড়ির সমস্যা বিজ্ঞাপনে, চলচ্চিত্রে, সাহিত্যেও আছে, কিন্তু টেলিভিশন যেহেতু গৃহাভ্যন্তরস্থিত এবং ছোটদের কাছে তার আবেদন যেহেতু সাংঘাতিক, তাই শুচিবায়ুগ্রস্ত না হয়েও স্বীকার করা যায় যে টেলিভিশনের মাধ্যমে এই সুড়সুড়ির প্রচার ভাববার বিষয়। চতুর্দিকে যৌন উত্তেজনার উপাদান, অথচ বাস্তব জীবনে নন্দিত সংরাগের অভাব: এ তো পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি সুবিদিত সংকটই বটে।

দ্বিতীয়ত, দুঃখদারিদ্র্য ও সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের ছবি দেখলে অধিকাংশ

লোকই এখনও বিচলিত হয়, কিন্তু যুদ্ধের সংবাদচিত্র বড়দের গা-সওয়া হয়ে গেছে। ছোটরা, বিশেষত বলতেই হয়, ছোট ছেলেরা অভিনীত লড়াই আর সত্যিকারের যুদ্ধ দুটোই রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা নিয়ে দেখে। যদি তাদের সতর্ক ক'রে দেওয়া হয় যে যুদ্ধ ব্যাপারটা নেহাৎ রোমাঞ্চকর অ্যাড্‌ভেন্‌চার নয়, রীতিমত চোখের জলের ব্যাপার, তাহ'লে তারা তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে : 'আরে এ সব বানানো গল্প, এরকম সত্যি সত্যি হয় নাকি ?' হয় যে। যুদ্ধহীন দুনিয়া গ'ড়ে তোলা যদি কাম্য হয়, তবে আমাদের উত্তরসূরি এই বালক সম্প্রদায়ের গঠন-দায়িত্বে আমাদের ব্যবহারিক কর্তব্য কী ?

ব্রিটেনের মতো দেশের টেলিভিশন—যা চিন্তাশীল স্নাতকদের দ্বারা পরিচালিত উচ্চবর্ণের একটি প্রতিষ্ঠান, এবং সমাজের, পৃথিবীর নানা ক্ষতচিহ্ন, অন্যায়-অবিচার সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ,—তা যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী এমন কথা আমি বলছি না ; হিংসা বা যৌনতা সম্বন্ধে সমাজে, শিক্ষিত সমাজেও, যে 'double standard' বা পরস্পরবিরোধী দু'টি মানদণ্ড অবলম্বন করার প্রবণতা বর্তমান, তার প্রতিফলন টেলিভিশনেও দৃষ্টিগোচর, এ কথাই বলছি। একদলীয় শাসনে বিশ্বাসী না হয়েও বলা যায় যে মানবিক কল্যাণের খাতিরে উপরোক্ত ব্যাপারগুলিতে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে।

৬

ছোটদের কথা দিয়ে এই প্রবন্ধটি শুরু করেছিলাম, এবং ঘুরে-ফিরে তাদের কথা বারে বারেই তুলতে হয়েছে। কেন, তা পাঠকদের কাছে এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে। সামাজিক সব প্রতিষ্ঠানই দোষে-গুণে মেশানো, টেলিভিশনও ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু টেলিভিশনের সামাজিক ভূমিকা কিরকম হওয়া উচিত, তার অবাঞ্ছিত প্রয়োগ কীভাবে এড়ানো যায়, এ সব বিষয়ে পৃথিবীর সর্বত্র এবং সমাজের সর্বস্তরে বিস্তারিত গঠনমূলক আলোচনা হওয়া দরকার বিশেষত এই কারণেই যে আমাদের দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের উপরে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব পরোক্ষ নয়, একে-বারে প্রত্যক্ষ। শান্তির সময় সৈনিকদের কুচকাওয়াজ যেমন অধিকাংশ নাগরিকদের দৈনিক জীবনে দূরাগত ধ্বনিমাত্র, টেলিভিশন তেমন নয়। টেলিভিশন ঘরের ভিতরকার জিনিস, ছোটদের খুব কাছাকাছি, প্রাত্যহিক খাবারের থালার মতোই তাদের করায়ত্ত। উপরন্তু, স্কুলের থেকে টেলিভিশনের সঙ্গেই তাদের আত্মিক যোগ বেশি। শিশুমানসে স্কুল লেখাপড়ার পরিশ্রমের, নিয়মানুবর্তিতার অনুষঙ্গে

বাঁধা, কিন্তু টেলিভিশন শাসনমুক্ত 'home sweet home'-এর এবং ছুটির হুল্লোড়ের অনুষঙ্গে রাজকীয়। তারা সবাই রাজা তাদের এই রাজার রাজত্বে।

তা ছাড়া সমস্যাগুলি পশ্চিমে সীমাবদ্ধ থাকবে না, থাকতে পারে না। টেলিভিশনের ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। ইংরেজী বাগ্‌ধারার অনুসরণে বলা যায় যে সে চ'লে যাবার জন্য আসেনি, থাকতে এসেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বাড়বে এবং যন্ত্র হিসেবে তার নব নব উন্নততর রূপ দেখা দেবে। ইলেক্‌ট্রনিক দুনিয়ায় বিপ্লবের ফলে অত্যন্ত জটিল বৈদ্যুতিক সার্কিটকেও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বাঁধা যাচ্ছে। পকেট-সাইজ টেলিভিশন এখনই লভ্য, অনেকে মনে করেন যে ভবিষ্যতে টেলিভিশনকে ঘড়ি বা আংটির মতো কব্জিতে বা আঙুলে ধারণ করা যাবে। তা ছাড়া আছে দেয়াল-জোড়া পর্দায় ত্রিমাত্রিক টেলিভিশনের সম্ভাবনা। বিশেষ-গুণ-সমন্বিত আলোর উৎস লেসার (Laser)-এর উদ্ভাবনের ফলে হলোগ্রাম (hologram) নামে এক জাতীয় আলোকচিত্র তৈরি করা যাচ্ছে, যা থেকে প্রকৃত ত্রিমাত্রিক ছায়াচিত্র প্রস্তুত করা সম্ভব। আগে যেগুলিকে ত্রিমাত্রিক আলোকচিত্র বলা হতো সেগুলি বস্তুত নির্ভর করতো দৃষ্টিবিভ্রমের উপর। কিন্তু হলোগ্রাম ঠিক সেভাবেই আলো বিকিরণ করে যেভাবে করে কোনো বাস্তব সামগ্রী, ফলে ঘনত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত সত্যিই দৃষ্টিগোচর হয়। হলোগ্রাফিক টেলিভিশন এখনও নির্মিত হয়নি বটে, কিন্তু গবেষণা চলছে, এবং অদূর ভবিষ্যতেই নিশ্চিত এর দেখা মিলবে। তখন ফুটবল খেলোয়াড়েরা প্রায় দর্শকের ঘরের গালিচাতেই নেমে পড়বেন, ছায়াময়ী চিত্রতারকারা প্রায় ভক্তদের সোফা ঘেঁষেই হেঁটে যাবেন, বিজ্ঞানের মায়ার খেলায় জীবন ও টেলিভিশন একাকার হয়ে যাবে।

উপরন্তু, কোনো কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে এবং দর্শকেরা নিষ্ক্রিয়ভাবে ব'সে ব'সে দেখছেন, টেলিভিশনের এই যে বর্তমান রূপ, এটাও বদলাতে বাধ্য। ভবিষ্যতে আসবে টেলিভিশনের বিকেন্দ্রীকরণ ও সংযুক্ত টেলিফোন-টেলিভিশন। ছোট ছোট গোষ্ঠীকে ভিত্তি ক'রে এই আদানপ্রদানের জালবুনট স্থাপিত হ'তে পারবে, যার সাহায্যে গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করতে পারবেন। রাজনীতিবিশারদ ও ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক সভাও এ মাধ্যমেই সম্ভব হবে। টেলিভিশনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলে সমাজের একটি বিশেষ লাভ হ'তে পারে। দলীয় স্বার্থকে কায়েম করার জন্য বা কোনো একতরফা প্রচারের জন্য এই শক্তিশালী মাধ্যমটির একচেটিয়া ব্যবহারের সম্ভাবনা

বিনষ্ট হবে এবং টেলিভিশন সত্যিই জনগণের মধ্যে আদান-প্রদানের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারবে।

সাধারণ ক্যামেরা ও ক্যাসেট টেপরেকর্ডারের মতো টি-ভি ক্যামেরা ও ভিডিও-টেপরেকর্ডার (videotape-recorder)-এর প্রচলন এখনই ক্রমবর্ধমান। কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানকে রেকর্ড ক'রে রেখে পরে দেখা তো সম্ভবই, বাড়িতেই টি-ভি ফিল্ম তৈরি করা ও দেখাও সম্ভব। যদিও এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখন পর্যন্ত মুখ্যত শিক্ষাজগতেই আবদ্ধ, তবুও উল্লেখযোগ্য যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সার্কিটের প্রচলেনর ফলে এদের দাম বছর বছর ক'মে যাচ্ছে এবং ক্রমশ সাধারণ নাগরিকের আয়ত্তে চ'লে আসছে। এ উৎপাদনে জাপান অগ্রণী তো বটেই, তৃতীয় দুনিয়াতেও এ সব ইলেক্ট্রনিক শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল।

অনেকেই হয়তো ভাবছেন যে এ ক্ষেত্রে বেতারের ভবিষ্যৎ কী? তার জবাবে বলতে হয় যে বেতারের ব্যবহার একেবারে উঠে যাবে না, সংকুচিত হ'লেও থাকবে। তার কারণ বেতারের কতগুলি নিজস্ব সুবিধা আছে। উদাহরণস্বরূপ, কাজ করতে করতে বা গাড়ি চালাতে চালাতে বেতারের কার্যক্রম শোনা সম্ভব, যা দৃশ্যগত মাধ্যমের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাছাড়া সংগীতের প্রচারে বেতারের বিশিষ্ট ভূমিকা অনস্বীকার্য। লঘু সংগীত এবং উচ্চ মার্গের সংগীত, দুই জাতের সংগীতের প্রচারেই বি.বি.সি.-র বিখ্যাত বেতারবিভাগ এখনও টেলিভিশন-বিভাগের অগ্রবর্তী। আর যারা চলচ্চিত্রশিল্পের ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন তাঁদের বলতে হয় যে টেলি-ভিশনের সঙ্গে চলচ্চিত্রশিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী। গুণী পরিচালকেরা টেলিভিশনে প্রদর্শনের জন্যই ছায়াচিত্র তৈরি করবেন: টেলিভিশনের জন্য তৈরি ইংগ্মার বের্গমানের ছায়াছবি আমি নিজেই দেখেছি। তা ছাড়া গোষ্ঠীভিত্তিক টেলিভিশন প্রতিষ্ঠিত হ'লে এবং ভিডিওটেপরেকর্ডারের বহুল প্রচলন ঘটলে সাধারণ নাগরিকেরাই নানান ধরনের ফিল্ম নির্মাণে নেমে পড়বেন। ধনিকশ্রেণীর মালিকানায় বৃহৎ উৎপাদনের অনুষঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ চ'লে আসবে ঘরোয়া পরিবেশে। সিনেমাহলও গোষ্ঠী-কর্তৃক সমবায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হ'তে পারবে। এ সব ব্যাপারে কোনো সমাজে গুণের অভাব থাকে না, অভাব থাকে সুযোগের। প্রকৃত গণমাধ্যম হয়ে সেই সুযোগকে সাধারণ্যে বিকীর্ণ ক'রে দেবার ক্ষমতা টেলিভিশনের আছে।

প্রয়োগবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে ভাবীকালের টেলিভিশন কম্পিউটার-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ঘরে ঘরে বিশ্বকোষের মতো জ্ঞান বিতরণ করতে পারবে।

বলা বাহুল্য, খবরের কাগজের বদলে টেলিভিশনই প্রধান সংবাদদাতা হয়ে উঠবে; সাম্প্রতিকতম খবরের হেডলাইন তথা অনুপুঙ্খগুলিকেও বোতাম টিপে টেলিভিশনের পর্দায় আনা যাবে। সাংবাদিকতা উঠে যাবে না, কিন্তু কাগজকে আশ্রয় না ক'রে হবে টেলিভিশন-আশ্রয়ী। তেমনি বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও টেলিভিশনের বহুল প্রয়োগ অবধারিত।

সংক্ষেপে, শিক্ষায়, সাংস্কৃতিক জীবনে, সুরুচিসম্পন্ন প্রমোদ পরিবেশনে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সমন্বয়জাত এই বহুমুখী মাধ্যমটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবান্বিত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ব্রিটেনের সাম্প্রতিক নারী কবিদের কবিতা প্রসঙ্গে

> …সাম্প্রতিককালের সেরা কবিতা-লিখিয়েদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই নারী, এবং তাঁদের নিজস্ব, ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরটি পুরুষ কবিদের থেকে আলাদা।
>
> —হ্যারিয়েট রোজ্

> ইদানীং মেয়েরা বুঝেছেন যে দুনিয়াটা পুরুষদের আর শিশুদের জন্য যতখানি তাঁদের নিজেদের জন্যও ততখানি, তাঁরাও ঐ দুনিয়ার অন্তর্বর্তী পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি-সত্তা। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে যে কবিতাসংকলন কবিদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব দাবি করবে তার মধ্যে যতজন যোগ্য পুরুষ থাকবেন ততজন যোগ্য নারীও থাকবেন, —এমন কবি যাঁরা অনুসন্ধিৎসা জাগাতে পারেন, নিজেরাও অনুসন্ধিৎসু।
>
> —প্যাট্রিশিয়া মার্টল্যাণ্ড

এই দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে ব্রিটেনের দুজন আধুনিক নারী কবির উক্তিতে, সাম্প্রতিক নারী কবিদের কবিতার একটি পেপারব্যাক সংকলনে, আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষ্যে এদিকে সেদিকে যে বিচিত্র বইপত্র প্রকাশিত হয় তারই একটি বিনীত অথচ মনোজ্ঞ নমুনায়।[1] বইটি প্রকাশ করেছেন ব্রিটেনের অজস্র উৎকৃষ্ট 'লিট্‌ল্ প্রেস'-গুলির মধ্যে অন্যতম একটি, যেগুলি, বড় বড় প্রকাশসংস্থাগুলি নয়, এখানকার উঠতি কবিদের আত্মপ্রকাশের আসল ভরসা। সংকলিত কবিরা সবাই যে জাতে ব্রিটিশ তা নয়, তবে তাঁরা ব্রিটেনে বসবাস করেন। খ্যাতনাম্নী সকলেই যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তা-ও নয়। যা হয়ে থাকে,—কয়েকজন বাদ পড়েছেন। কারও কারও সঙ্গে সম্পাদক—হ্যাঁ, সম্পাদক একজন পুরুষ কবি ও সমালোচক, যাঁর সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকু খুব একটা জোরালো নয়—সময়মত যোগাযোগ ক'রে উঠতে পারেননি। জনতিনেক কবি এ জাতীয় সংকলনের অন্তর্গত হতে আপত্তি

১. *Contemporary Women Poets, An Anthology with Comments,* Edited by Trevor Kneale, Rondo Publications Ltd., 155/157 The Albany, Old Hall Street, Liverpool L3 9EG, 1975, £ 2.50.

জানিয়েছেন : তাঁদের মতে নারী-পুরুষ দলবিভাগে নারী কবিদের মর্যাদাহানি হয়। একটি উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি অ্যান স্টিভেনসন, যিনি সিলভিয়া প্ল্যাথের মতো মার্কিন নারী, বিবাহসূত্রে বহুকাল ব্রিটেনের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি ব্রিটিশ দুনিয়ার একজন বিশিষ্ট কবি, কিন্তু ব্রিটেনে পুস্তকাকারে তাঁর প্রথম প্রকাশ যেহেতু ১৯৭৪ সালে. বোধ করি সে কারণেই ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত এই সংকলনটি থেকে তিনি বাদ প'ড়ে গেছেন।[২]

আলাদা ক'রে নারী কবিদের কবিতাসংকলন প্রকাশ করা উচিত কি অনুচিত সে তর্কের ভিতরে যাবার আগে অন্তত এটুকু মানতেই হয় যে তেমন কোনো সংকলনকে সর্বাগ্রে কবিতাসংকলন হিসাবে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে। অর্থাৎ যিনি বা যাঁরা লিখুন না কেন, কবিতার বইকে দাঁড়াতে হবে কবিতার গুণেই, অন্য কোনো বিশেষ সুপারিশের সহায়তায় নয়। সে পরীক্ষায় আলোচ্য বইটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। একচল্লিশজন নারী কবির কবিতার এই সংকলনটি একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট নিশানা দেয় : নারীদের স্বাধিকার দাবি ক'রে যে আন্দোলনটি গত শতাব্দী থেকে বিক্ষুব্ধ তার বেশ খানিকটা ফসল আলোচ্য অঞ্চলে খামারে তোলা হয়েছে। যে ইংরেজী সাহিত্যে নারী ঔপন্যাসিকদের কৃতিত্ব আজ অন্তত দেড়শো বছর ধ'রে সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সাহিত্যে কবিতার শাখাতেও নারীদের অবদান আজ আর অস্বীকার করবার জো নেই।

দেশে-বিদেশে সাবেকী কৃষিনির্ভর সমাজে নারীরা তাঁদের সহজাত কবি-প্রতিভার নম্রদ্যুতিময় স্বাক্ষর রেখে গেছেন ছড়ায়, লোকগীতিকায়। বিদগ্ধ কাব্য-চর্চায় সে প্রতিভার যথোচিত স্ফুরণের জন্য প্রয়োজন ছিলো শুধু অনুকূল পরিবেশের। আপেক্ষিক অর্থসামর্থ্য, জীবনযাত্রার আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্য, উচ্চশিক্ষা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আত্মপ্রত্যয়, আত্মসম্মান, আত্মপ্রকাশের অবসর, সন্তানের ধারণ-জনন-পালনের জৈব চক্র থেকে আপেক্ষিক অব্যাহতি : এই ধরনের জাগতিক এবং আত্মিক কতগুলি সুযোগ যখন মেয়েদের করায়ত্ত হয়, তখন তাঁদের কবিপ্রতিভাও লালিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উত্তর আমেরিকায় এবং রুশ দুনিয়াতেও মেয়েদের কবিপ্রতিভা বিকশিত হয়েছে। ম্যারিয়ান মুর, এলিজাবেথ বিশপ, আনা আখ্‌মাতোভা, মারিনা স্‌ভেতায়েভা, বেলা আখ্‌মাদুলিনা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। শুনতে

২. অ্যান স্টিভেনসন সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ 'হীনযান' পত্রিকায় বার হবার কথা।

পাই যে বেলা আখ্‌মাদুলিনা রুশ পাঠকসমাজে এত দূর জনপ্রিয় যে তিনি প্রায় তারকাতুল্য। মঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ঘটলে শ্রোতৃবৃন্দ নাকি উতরোল হয়ে ওঠেন। একজন নারী কবির এই মর্যাদা আনন্দপ্রদই বটে।

ব্রিটেনের পাঠকেরা কবিদের নিয়ে অতটা মাতামাতি কখনও করেন না, তা তাঁরা পুরুষই হোন বা নারীই হোন, কিন্তু এখানে প্রচুর যোগ্য কবি লিখে যাচ্ছেন, এবং তাঁদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মেয়েরা। মেয়েদের কবিপ্রতিভার এই বিকাশ খাঁটি এবং তর্কাতীত : দৃঢ়প্রোথিত তার শিকড়-বাকড়।

আলোচ্য বইটিতে গ্রথিত সব কবিতারই যে রসগ্রহণ করতে পারলাম তা অবশ্যই নয়। নিকি জ্যাকোভ্‌স্কা ও পেনেলোপি শাট্‌ল্‌-এর—দুজনেরই বেশ নাম আছে—যে কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলি কিছু স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির উপস্থিতি সত্ত্বেও আমার কাছে যথেষ্ট সামগ্রিক তাৎপর্য নিয়ে হাজির হতে পারলো না। সেটা আমার রুচির সংকীর্ণতার জন্যও হতে পারে। বলা বাহুল্য, সংকলনের সীমিত নমুনা থেকে সংকলিত কবিদের সম্বন্ধে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না : হাজার হোক সম্পাদকের পছন্দ অনুসারে একেকজন কবির দুটি কি তিনটি কবিতা নিয়ে সংকলন। তবু বইটি প'ড়ে এখানকার আধুনিক নারী কবিরা কী ভাবছেন, কীভাবে লেখার চেষ্টা করছেন, তার বেশ একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

প্রথমেই বলতে হয় যে আধুনিক ইংরেজী কবিতার চারিত্র্যগত মৌলিক সদ্‌গুণগুলি এঁদের রচনায় পর্যাপ্ত মাত্রায় বর্তমান। এঁদের মধ্যে কোনোরকমের সেকেলেপনা বা আদেখলেপনা নেই। এঁরা ভাবাপ্লুত নন, সংযত, মননশীলতার দ্বারা আক্রান্ত, আবেগের লাগামকে টেনে রাখতে জানেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও এঁরা শুধু মন্ময় হয়েই থেমে থাকেননি, তন্ময় দৃষ্টিতে বাইরে তাকাতে পেরেছেন। কোনো কিছু নিরীক্ষণ করার সময়ে অহং-এর কথা যথাসম্ভব কম ব'লে নিরীক্ষিতের খুঁটিনাটির প্রতি তন্ময়ভাবে মনঃসংযোগ করাটা বিজ্ঞানপ্রভাবিত রোম্যান্টিক-উত্তর কবিদের বিশেষ প্রিয়। নারী কবিদের রচনাতেও এই একাগ্র দৃষ্টি লভ্য। এঁদের বিষয়বৈচিত্র্যের এবং তন্ময়তার নিদর্শন হিসেবে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। পল্‌ ন্যাশের একটি ছবি বিষয়ে কবিতা লিখেছেন অ্যানা অ্যাডাম্‌স্‌। কাটালনিয়া উপকূলের জেলেদের বিষয়ে একটি স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন এলিজাবেথ জেনিংস্‌। গ্ল্যাডিস্‌ মেরি কোল্‌স্‌-এর প্রথম কবিতাটি শ্রপ্‌শায়ারের একটি হ্রদ বিষয়ে, দ্বিতীয় কবিতাটি ওয়েস্টন বে-র একটি দ্বীপ থেকে টমাস বেকেট বিষয়ে চিন্তা, তৃতীয় কবিতাটি একজন রুশ এমিগ্রের জর্জিয়ায় বাল্যকাল বিষয়ে। জোন ডাওনার-

এর প্রথম কবিতাটি নরফোক অঞ্চলের পল্লী বিষয়ে, দ্বিতীয় কবিতাটি ভেনিসের গির্জায় গির্জায় তিন্‌তরেত্তো-র আঁকা ছবি বিষয়ে, তৃতীয় কবিতাটি একটি পুরোনো কবরক্ষেত্র বিষয়ে। ডেল্‌ফি প্রদর্শশালায় প্রত্যাবর্তন বিষয়ে লিখেছেন পামেলা বিটি। এলিজাবেথ স্যাক্‌সন লিখেছেন স্টোনহেন্‌জের ভগ্নাবশেষ বিষয়ে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উপকূলের একটি ধীবরপল্লী বিষয়ে; এঁর আরেকটি কবিতা অনুপ্রেরিত হয়েছে ম্যাথু আর্নল্‌ড্‌-এর ডোভার-সৈকত-বিষয়ক বিখ্যাত কবিতাটি দ্বারা।

আধুনিক ইংরেজী কবিতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য আঙ্গিকের উচ্চ মান। নারী কবিরাও সে পথের পথিক হয়ে আঙ্গিকে সিদ্ধহস্ত; শব্দার্থ, দ্যোতনা, ধ্বনি, গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন; মিতবাক্‌, মিতব্যয়ী, এবং বলা চলে জীবনে যেমন শিল্পকর্মেও তেমন ভূষণবিমুখ। বহিরঙ্গের বাহুল্যকে কেটে-ছেঁটে মজ্জার দিকে, শাঁসের দিকে, ফলের ভিতরকার আঁটির দিকে যেতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁরা। জানি না প্রগল্‌ভ বাগ্‌বিস্তারে যাঁরা বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদের কাছে এই রীতি খানিকটা কৃশ, অনুত্তেজক, কাব্যলক্ষণে দীন মনে হবে কি না। এই শৈলীর চমৎকারী উৎকর্ষ আমাকে যথেষ্ট আকর্ষণ করে। এর স্বাদ একই সঙ্গে সহজিয়া এবং বিদগ্ধ, ক্ষীরের মতো ঘন, আবার ছুরির মতো ধারালো। আধুনিক পাশ্চাত্য রুচির অন্যান্য দিকের সঙ্গে এর সংযোগ আছে। মূলত এটি একটি উত্তর-ইয়োরোপীয় ধারা। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রীতির অনাড়ম্বর আসবাবপত্র, স্টেনলেস স্টীলের ছুরিকাঁটা, চাপা দ্যুতির পালিশের রৌপ্যালংকার প্রভৃতিতে কারুকার্যের চেয়ে রৈখিক সৌন্দর্যের গুরুত্ব বেশি। যাঁরা এসব দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি শৈলীর একটি তপোমূর্তির কথা বলছি। ভারতে তৈরি আধুনিক আসবাবপত্র ও ছুরিকাঁটার ডিজাইনেও এই স্ক্যাণ্ডিনেভীয় প্রভাব খানিকটা পড়েছে, তবে গহনাপত্রে পড়েছে ব'লে জানা নেই আমার।

অতএব ভাষাব্যবহারে এঁদের কৌশল সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা চলে যে ভাষাকে এঁরা খাটাতে জানেন। এঁদের খরচ কম, আয় বেশি। বিশেষণ যথাসম্ভব কম ব্যবহার ক'রে, বিশেষ্য আর ক্রিয়াপদের জোরালো প্রয়োগের মাধ্যমে এঁরা ভাষায় আনেন এমন একটা আঁটসাঁট বাঁধুনি, এমন একটা স্নায়বিক প্রখরতা যা মুগ্ধ না ক'রে পারে না। মূল থেকে উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন।

২

হাওয়ার শব্দ থেকে নিজের নির্জনতা বিষয়ে অবহিত হয়ে রুথ ফেইন্‌লাইট তাঁর নির্জনতার তাৎপর্য অন্বেষণ করছেন। তিনি বাড়ির কাঠের মচ্‌মচ্‌ শব্দ, গাছেদের কাঁপুনি থেমে গেলে নৈঃশব্দ্যকে বিশেষ মাত্রা দেয় যে গুঞ্জনধ্বনি, এসব থেকে কোনো একটা মানে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা তর্জমার সামিল।

I'm translating sentences
From another language.
Nothing is direct. Everything
Signifies. But until I define
The crime how can I guess
The motive, know
Who committed it, whether
I am victim or criminal.

অল্প কয়েকটি আঁচড়ে কবির নৈঃসঙ্গ্য বিষয়ে একটি বিরাট মাত্রা যোজনা করা হলো। এ নৈঃসঙ্গ্য কি তিনি নিজে চেয়েছেন, না তাঁর উপরে চাপানো হয়েছে? এই সংকলনের বহির্ভূত কবি অ্যান স্টিভেনসন—যাঁর কথা আগে উল্লেখ করেছি—তাঁর একটি কবিতায় অনুরূপ এক দ্ব্যর্থবোধের ও দ্বন্দ্বের আভাস দিয়েছেন। কবি নিঃসঙ্গতাকে ভয় পান: সেটা তাঁর মানুষী দুর্বলতা। আবার সৃষ্টির তাগিদে একাকিত্বেরই একান্ত প্রয়োজন তাঁর।

ভিভিয়েন ফিন্‌চ্‌-এর একটি কবিতায় নায়কনায়িকার গোপন দেখাসাক্ষাতের পর নিজের নিজের সংসারে ফিরে যাবার সময় এসে পড়েছে। ইঙ্গিত এই যে নায়কের স্ত্রী আছে, নায়িকার স্বামী আছে। স্বল্পমেয়াদী উত্তেজনার পর তাঁদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, অপরাধবোধ জেগে উঠেছে।

We have stared too long at clouds
and they break up in embarrassment;
not even clouds can stand scrutiny.

তাঁরা দুজনেই তাঁদের বেদনাকে ঢাকতে চান। বেদনার পুনরাবর্তন অবধারিত।

all travellers have a grief
that keeps them travelling.

লাইনদুটি কবিতার শেষ দু' লাইন, এবং দ্যোতনার সম্প্রসারণে বিশেষভাবে সফল। ঐ দুটি মানুষকে ছাপিয়ে আমরা পৌঁছে যাই প্রেম তথা জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য একটি সাধারণ বক্তব্যে।

জেনি জোসেফের 'নববর্ষের জন্য' কবিতাটির প্রথম তিন লাইনও ঐরকমই ঈর্ষণীয়ভাবে সহজ অথচ সুদূরপ্রসারী :

Time heals, you said.
It moves, I amended.

But really time fills in :

পুরুষের উক্তি, নারীর উক্তি, কবির উক্তি : তিনে মিলে একটি সাংগীতিক 'মুভমেণ্ট' যেন।

কালের গতির সঙ্গে আমরা কিরকম অসহায়ভাবে বাঁধা সে-বিষয়ে সিলভিয়া কান্‌তারিজিস্-এর আশ্চর্য লাইনগুলিও সংক্ষিপ্ত পরিসরের বিপুল ব্যঞ্জনায় সমান স্মরণীয় :

Clocks stop for no man,
only for themselves, at the
wrong times. Helplessly
we revolve on a clock face,
making love clockwise,
timing eggs.

ইনি প্রথমে যখন বলছেন যে ঘড়িরা কারও জন্য থামে না, সে-মুহূর্তে ঘড়িরা মুখ্যত কালের গতিরই প্রতীক। যেই বলছেন যে ঘড়িরা শুধু নিজেদের জন্য থামে, অসময়ে, অমনি ঘড়িরা হয়ে পড়ছে আমাদেরও, মানুষদেরও প্রতীক। আমরাও ঘড়ির মতো চলি, দম ফুরিয়ে গেলে বা বিকল হয়ে গেলে অসময়ে থেমে পড়ি। তৎক্ষণাৎ ঘড়ির কাঁটার চক্রাকার গতির সঙ্গে আমরা অভেদাত্ম হয়ে যাই। এমনকি আমাদের রতিক্রিয়াও ঘড়ি ধ'রে অথবা, যেমন পশু-পাখিদের বেলায়, ঋতু অনুসারে। দুটিমাত্র শব্দে তৈরি শেষ লাইনটির ইঙ্গিত একাধিক। প্রথমত

স্মরণীয় যে পাশ্চাত্য মানুষ ডিম কতটা সিদ্ধ করতে হবে সে-বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক। প্রাতরাশের আধা-সিদ্ধ ডিম খুব সাবধানে তৈরি করা হয়। কেউ পছন্দ করেন নরম কুসুম, কেউ আরেকটু জমাট কুসুম, কেউ একেবারে জমাট। অতএব ঘড়ি দেখে তিন মিনিট, পাঁচ মিনিট, ছ'মিনিট ডিম সিদ্ধ করা হয়। এ জাতীয় কাজের জন্য পাশ্চাত্য রান্নাঘরে টাইমিং ক্লক বহুপ্রচলিত। রোস্টিং, বেকিং, ডিম সিদ্ধ করা, প্রেশার কুকারের রান্না, ইত্যাদিতে সময়ের নির্ভুল পরিমাপে টাইমিং ক্লক একটি অপরিহার্য গ্যাজেট। পাঠকেরা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন প্রচ্ছন্ন চিত্রকল্পটি নারী কবির ব্যবহারে কতখানি সার্থক। রান্নাঘরে উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে ডিমের সিদ্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন নারী। সময় মাপার এই একটা ভূমিকা তাঁর —পাচিকার ভূমিকা। তা ছাড়া আছে মা পাখির ডিমে তা দেওয়ার ইঙ্গিত, আছে নারীর ডিম্বাশয় থেকে পুষ্ট ডিম্বাণুর মাসিক নিঃসরণের ইঙ্গিত, আছে ন' মাস ধ'রে জরায়ুস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধির ইঙ্গিত। এগুলোও নারীর সময় মাপার ভূমিকা। ভারতীয় পাঠক স্মরণ করতে পারেন যে 'মাতা' শব্দটির অর্থ কখনও কখনও করা হয় 'যিনি মাপেন', যদিও ব্যুৎপত্তিটি বিতর্কিত। কবিতাটির শেষে ঘড়ি আর মানুষ, বিশেষত নারী, একাকার হয়ে যায়। আমরাই ঘড়ি, ঘড়ির কাঁটা, আমাদের ভিতরের এবং বাইরের ডিমের টাইমিং-এ ব্যস্ত।

কম কথায় যে অনেক কিছু বলা যায় তার সমর্থনে এলিজাবেথ জেনিংস-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা চলে। কাটালনিয়ার জেলেদের বিষয়ে তিনি বলছেন যে তারা 'Men of few words', কম কথা বলে। এই বাক্‌সংযম যেন 'part of their trade', তাদের জীবিকারই অঙ্গ, কেননা :

They had no romantic
Ideas of the sea.
They knew it,
By fighting with it,
And the kind of love
Which comes from fighting
Is not spoken of,
Least of all to tourists.

শব্দব্যবহারে আলোচ্য কবিদের মিতাচার যেন এই জেলেদের মতো। সমুদ্রের সঙ্গে

লড়াই ক'রে জেলেরা আহরণ করে মাছ। সেই দ্বন্দ্বজাত প্রেম সম্পর্কে বাইরের লোকেদের কাছে বক্তৃতা দিতে তারা নারাজ। কবিরাও, জীবনানন্দ দাশ ইঙ্গিত করেছেন, হাঙরের ঢেউয়ে লুটোপুটি খেয়ে আরূঢ় ভণিতা থেকে নিবৃত্ত থাকেন। নারী কবিদের পক্ষে এটা যেন আরও বেশি প্রযোজ্য। নারী তথা শিল্পী হিসেবে তাঁরা যে স্বায়ত্তশাসন পেয়েছেন তা অনেক লড়াই ক'রে। লড়াই চলছে, চলবে। ফলে তাঁদেরও পরিমিতবাক্ হওয়াটাই শোভন।

ইংরেজী ভাষার কবিরা যখন তাঁদের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত, সংহত, ঘন ক'রে পরিবেশন করতে চান, তখন তাঁরা প্রায়ই 'মনোসিল্যাবিক' বা একমাত্রিক শব্দ ব্যবহার করেন। এই কৌশলটি সব ভাষায় সমান সফল হতে পারে না; এর সাফল্য ভাষার প্রকৃতির উপরে একান্ত নির্ভরশীল। কায়দাটি ইংরেজীতে খুব খোলে। উপরে যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছি তাদের মধ্যে কতগুলি লাইন আগাগোড়াই একমাত্রিক শব্দে তৈরি।

We have stared too long at clouds

Time heals, you said

Clocks stop for no man

They knew it

একমাত্রিক এবং দ্বিমাত্রিক শব্দের সমন্বয়ে সংহত শক্তি অর্জিত হয়েছে অ্যাবিগেইল্ মোজ্‌লি-র 'জন্মদিনের কেক' নামক কবিতার নিম্নোদ্‌ধৃত লাইনগুলিতে :

I pick up the knife
the icing cracks up like an earthquake
all the candles must be blown out
happy birthday

এক সুতোয় গাঁথা হয়ে গেছে জন্ম-মৃত্যু, সঞ্জীবন-নির্বাপন। কেকের উপরের সব ক'টি মোমবাতি এক ফুঁয়ে নেভানো জন্মদিনের একটি আনন্দময় অনুষ্ঠান, আবার মোমবাতিদের নিভে যাওয়া অনিবার্যতই মৃত্যুর প্রতীক, এবং জন্মদিনমাত্রেই মৃত্যুর স্মারক, কারণ বছরে বছরে আমরা এগিয়ে চলেছি মৃত্যুর দিনটির দিকেই। কেকটাকে কাটা হচ্ছে ছুরির যে-আঘাতে তা-ও মৃত্যুকে স্মরণ করায়; ভূমিকম্পের ছবিটা সে ইঙ্গিতকে তীব্রতর ক'রে তোলে। উপমাটি চমৎকারী, আধুনিক মানসের

উপযুক্ত, সংকটাক্রান্ত। তবকটা শুধু কেকের উপরে নয়, জীবনের উপরেও,—ভঙ্গুর, অনতিগভীর, চিনির প্রলোভক প্রলেপ; ছুরির একটি ঘায়ে ভূমিকম্পের সময়ে মাটির মতো ফেটে যাচ্ছে। এ ছাড়া আরেকটি ইঙ্গিতও বোধ হয় আছে। হ্রদ বা নদীর জল যখন জ'মে বরফ হয়, তখন উপরের দিকের জলই প্রথমে জমে, নিচের দিকের জল তরল থাকে। অর্থাৎ জলের উপরিভাগে জমাট বরফের একটা আস্তরণ পড়ে। আস্তরণটা পাতলা হলে তার উপরে চলা বিপজ্জনক, যা থেকে এসেছে 'skating on thin ice' ইডিয়মটি। কেকের ফাটা আইসিং সেই ভঙ্গুর অগভীর তুষার-আস্তরণের মতো, যা ফেটে গেলে প্রমোদে মত্ত স্কেটারের জলে ডুবে মরার সম্ভাবনা। জন্মদিনপালন একরকমের স্কেটিং—পাতলা বরফের উপরে—নিচে মরণজল।

মিতাচারের মাধ্যমে বহুমুখী ব্যঞ্জনা শুধু প্রকাশগত ব্যাপার নয়। হয়তো কখনও কখনও ছন্দ-মিল-অনুপ্রাসের গুণে প্রকাশভঙ্গিটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, যেমন সিলভিয়া প্লাস্-এর লেখা নিচের লাইনগুলিতে:

Catullus, cuckolded, is mute ;
          For Lesbia is dead.
Maggots, gross ungainly worms,
          Lunge, tumble, in her bed.

অনুষঙ্গগুলো পাশ্চাত্য কবিতায় পুরোনো: অ্যান্ড্রু মার্ভেল-এর একটি বিখ্যাত কবিতার প্রতিধ্বনি আছে। কিন্তু পেনেলোপি শাট্ল্ যখন লেখেন:

All moons are old, the skies they adjust
like shawls are old

তখন বোঝা যায় যে এই সংক্ষিপ্ত আপাতসরল বাচনভঙ্গির অন্তরালে লুক্কায়িত শক্তিটা আসলে দেখার মধ্যেই, কবির দৃষ্টিতেই নিহিত। ওভাবে দেখেছেন ব'লেই লিখতে পেরেছেন অমন আশ্চর্য দুটি লাইন।

৩

এই যে চেঁছে বা ছেঁটে ফেলার প্রবণতা, ফলের নরম রসালো অংশটার নিচে কঠিন আঁটিতে পৌঁছনোর তাগিদ, তা উত্তরের কবিদের দৃশ্যপ্রীতিতেও বিধৃত।

রিক্ত ডালপালা, পাহাড়ী প্রকৃতি, পাথুরে রুক্ষতা, শিলাময় সমুদ্রতট, প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ : এসব তাঁরা রীতিমত পছন্দ করেন। তাঁদের মিতব্যয়ী আঙ্গিকের সঙ্গে এই প্রবণতাটা বেশ মিলে যায়, যে-মিলনের একটি সুন্দর নমুনা মিরিয়াম স্কটের এই লাইনগুলো :

The light off the white leaping boat
splinters into sparky threads.
The dark sea splits.
Those rocks clumped on the edge of the sea's disk
nourish dolphins
who leap and leap.

স্টোনহেন্জের প্রাগৈতিহাসিক ভগ্নাবশেষ বিষয়ে একটি কবিতা সংকলনটির অন্তর্গত, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ডের প্রতি একজন ভাস্করের দুর্নিবার আকর্ষণ ক্যাথলিন হার্বার্ট-এর একটি কবিতার বিষয়বস্তু। জোন ডাওনার লক্ষ করেছেন যে দৈত্যাকার ওক্ গাছেদের গ্রন্থিগুলো যেন আকাশের গায়ে তাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত। গের্ডা মায়ার-এর হেমন্তবর্ণনায় কীটসীয় ঋদ্ধির আভাস নেই। তিনি দেখছেন যে গ্রীষ্মের ঔজ্জ্বল্যে মরচে পড়েছে, সূর্যকরোজ্জ্বল পত্রালী ক্ষ'য়ে খ'সে পড়ছে ম্লান হয়ে যাওয়া আশার মতো। এক ঝলক কনকনে হাওয়া ক্রুদ্ধভাবে ঝরা পাতাগুলোকে এলোমেলো ক'রে দেয়। হেমন্ত এসে পড়েছে, শিগগিরই এসে পড়বে শীত। তারও ওপারে বসন্তকে তিনি দেখতে চাইছেন না আপাতত। এ যেন এক অন্বীক্ষা, প্রকৃতির শ্যামল ছলনার নিচে অস্তিত্বের স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা—আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের একটা মস্ত নেশা। অ্যান স্টিভেনসন, যাঁর কথা আগে বলেছি, তাঁর সর্বশেষ বইটির নামই দিয়েছেন 'Enough of Green', এবং একটি কবিতায় জানিয়েছেন যে গাছেদের পাতা ঝ'রে গেলে তবেই ধরা পড়ে ঐ সবুজের বিভ্রান্তিজনক মুখরতার নিচে যা ঢাকা ছিলো।

তা হলে এই কবিরা কি বসন্ত-গ্রীষ্মের পূর্ণতা ও আনন্দের কথা বলা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন ? ঠিক তা নয়। সংকলনটির প্রথম কবিতাটির নামই 'সুখ হচ্ছে মে মাসের ঝোপে ব'সে থাকা একটি পাখি', যদিও মজা এই যে এখানেও হথর্ন গাছের শ্বেত পুষ্পসম্ভারের তুলনা দিতে গিয়ে কবি অ্যানা অ্যাডামস্ আবার চ'লে গেছেন তুষারের অনুষঙ্গে :

The tree has snowed from within—
not petals, stamens, pistils ;
but efflorescent crystals
of hawthorntree desire.

শৈশবের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে সিলভিয়া ক্রুস এঁকেছেন একটি নরম ঝিলি-মিলি ছবি। 'গ্রীষ্ম ছিলো নীল', জানিয়েছেন তিনি, স্পষ্টতই আকাশের স্মরণে। 'লাইলাক ছিলো, আর ছিলো ল্যাবার্নাম।' (এ দুটির রঙ যথাক্রমে বেগনি আর হলদে।) 'পাতাগুলো ছিলো যেন জলের নিচেকার, ছায়া থেকে ছলকে পড়া। রোদ ঝ'রে পড়তো মাখনের মতো, সোনার মতো।' এই উচ্ছল বর্ণনাটিতে প্রকৃতির রঙরসের মায়ার কাছে নতিস্বীকার করেছেন কবি। কিন্তু পরের স্তবকেই বলতে বাধ্য হয়েছেন : 'শৈশব চ'লে গেছে অনেক দিন আগে, নিষ্পাপ সারল্যও। তবু আমি এখনও তাদেরই খুঁজি যারা গ্রীষ্মের মতো পরিপূর্ণ ; এবং আমার প্রথম প্রেম হারাবার হাহাকারকে আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবো না।' অবশ্যই বলতে হয় যে এই আর্তি কবিদের একটি প্রাচীন মূলধন। কবিতাটি ঐতিহ্যে প্রোথিত।

মায়ার খেলার নিচে সত্যানুসন্ধানের একটি কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত আধুনিক ইংরেজী কবিতায় অস্থিসংক্রান্ত চিত্রকল্পের প্রাচুর্য। মাংসের বদলে তার নিচে যে হাড় তাকে নিয়েই আজকের কবিদের তান্ত্রিক সাধনা যেন। ভাঙা হাড়, পোড়া হাড় ইত্যাদি এঁদের কলমের জোরে বাস্তবতার প্রতীক হতে চলেছে। নারী কবিদের সংকলনটির প্রথম পাঠেই এই লাইনগুলো উদ্ধার করেছি :

when winter burns the stubble of her fields
black to the bone.

whose bones beneath the tree ?

I am a thin sliver of bone, he said

I travel with my luggage bone to bone.

Clinging to the inscape of integrity, I was a crushed shell
a broken edge of bone wrapped in black skin.
Pain was the only integer that I could understand.

and reaching a hand out, find
each other close as bone beneath the skin.

লক্ষণীয় যে পঞ্চম উদ্ধৃতিটিতে হাড়ের অনুষঙ্গ একটি সুতীব্র ক্লেশবোধ, অথচ সর্বশেষ উদ্ধৃতিটিতে হাড়ের অনুষঙ্গ তার উলটো—প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরঙ্গতা।

আধুনিক কবিরা তাঁদের হাড়ের চিত্রকল্পে যখন দুঃখ ও দাহের জোরালো অনুষঙ্গ এনে ফেলেন, তখন হয়তো তাতে হিরোশিমা বা ভিয়েতনামের একটা ছায়া পড়ে, কিন্তু আসলে পাথর আর হাড় নিয়ে হৈ-চৈ ইংরেজী কবিতায় নতুন নয়। মনে করা যেতে পারে টি. এস. এলিয়টের 'অ্যাশ্-ওয়েড্‌নস্‌ডে' কবিতায় জুনিপার গাছের নিচে কবির বিকীর্ণ উজ্জ্বল হাড়গুলির কথা, যেগুলি সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছিলেন, 'এই হাড়গুলি কি বাঁচবে?' এবং হাড়গুলি কিচিরমিচির ক'রে জবাব দিয়েছিলো, গানও গেয়েছিলো। উপরের 'whose bones beneath the tree?' লাইনটি এলিয়টের এই অংশ দ্বারা সচেতনভাবে অনুপ্রেরিত এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না। তা ছাড়া তাঁর 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্'-এ এলিয়ট লিখেছেন সেইসব প্রাচীন শিলার আয়ুর কথা, যাদের লিপি আজও উদ্ধার করা যায়নি, লিখেছেন সৈকতের হাড়ের প্রার্থনার কথা। তারও আগে পাই জন ডানের বিখ্যাত লাইন

A bracelet of bright hair about the bone

যেখানে কবরের নিচে মৃতের কঙ্কাল-লগ্ন একগুচ্ছি চুলের বলয়ের কথা বলা হচ্ছে। তারও আগে অ্যাংলোস্যাক্‌সন কবিরা শিলাময় নিসর্গ আর অস্থি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মানুষের শরীরকে তাঁরা বলতেনই banhus, অর্থাৎ হাড়ের বাড়ি, অস্থিগৃহ। বস্তুত উত্তর ইয়োরোপের প্রাচীন জাতিরা—কেল্‌ট্‌রা, অ্যাংলো-স্যাক্‌সনরা, ভাইকিংরা—হাড় আর পাথর সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এই সহজ কারণে যে তাঁরা পাথুরে প্রকৃতি আর মৃত পশুদের কংকাল নিত্য দেখতেন, জন্তুদের শিঙ আর পাথরে জিনিসপত্র তৈরি করতেন। সে-আমলের প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ-গুলো তাঁদের কঠিন জীবনসংগ্রামের স্মারক। হাড় আর পাথরের চিত্রকল্পের সাহায্যে উত্তরের প্রাচীন জাতিদের লুপ্ত জীবনকে দুর্দান্তভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছেন সাম্প্রতিক প্রজন্মের সেরা আইরিশ কবি শেমাস্ হীনি তাঁর 'নর্থ' নামক কাব্যগ্রন্থে। একটি কবিতার নামই দিয়েছেন 'Bone Dreams'। ব্রিটেনের আধুনিক নারী কবিরাও একই প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশীদার।

৪

ব্রিটেনের সাম্প্রতিক নারী কবিরা যে আধুনিক ইংরেজী কবিতার প্রধান লক্ষণগুলি দ্বারা মোটামুটি আক্রান্ত তা এতক্ষণে নিশ্চয় প্রতিপাদিত হয়েছে। এবারে প্রশ্ন করা যেতে পারে : ব্রিটেনের পুরুষ কবিদের থেকে এঁদের একটু আলাদা করা যায় কি ?

এই প্রবন্ধের শুরুতেই হ্যারিয়েট রোজ্ নামে একজন কবির একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছি, যে নারী কবিদের নিজস্ব, ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরটি পুরুষ কবিদের থেকে আলাদা। ইনি আরও বলেছেন যে নারীদের কবিতায় ব্যক্তিগত 'আমি'-র কণ্ঠস্বরটি প্রায়ই তীব্রতর। লক্ষণীয় যে সংকলনগ্রন্থটি থেকে হাড়সংক্রান্ত যে-উদ্ধৃতি-গুলো দিয়েছি তাদের মধ্যে তীব্রতম ক্লেশানুভূতি যে-লাইনগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো এঁরই লেখা।

সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে বলা চলে যে তন্ময়তা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েও মন্ময় বৃত্তিগুলোকে নারী কবিরা পুরুষদের মতো অতটা বর্জন ক'রে চলেন না। পুরুষ কবিদের মধ্যে মাথার কাজের প্রাধান্য বেশি। তন্ময় অভিনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও নৈর্ব্যক্তিকতা এঁদের বিশেষ প্রিয়। প্রাত্যহিক সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের অনুভূতিমালা যাঁদের লেখায় যত বেশি বিরল, বরং তাদের পরিবর্তে শব্দকৌশলের সঙ্গে সঙ্গে দূরান্বয়ী অ্যালেগরি বা রূপকের পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠন দৃশ্যমান, তাঁরাই তত বেশি হাততালি পেয়ে থাকেন। টেড হিউজ্ এই রীতির প্রতিভূ-স্বরূপ। কেউ কেউ অশ্লীলতার খড়কুটো থেকে কিছুটা কাব্যরস নিংড়ানো যায় কি না সে-নিরীক্ষায় ব্যস্ত, যেমন গ্যাভিন ইউয়ার্ট। তরুণতরদের মধ্যে শাব্দিক কারসাজি আর বিদ্রূপাত্মক কৌতুকরসের একটি বিশেষ ধারা বহমান, যার উদাহরণ অক্স্‌ফোর্ডের ক্রেইগ্ রেইন্। অনুভূতিপ্রকাশে পরাঙ্‌মুখ নন এমন পুরুষ কবিও অবশ্যই আছেন—ডেভিড হল্‌ব্রুক, বা প্রতিবাদী কবিরা--আমি কাব্যিক এস্‌টা-ব্লিশ্‌মেণ্টের সাধারণ ছবিটার কথাই বলছি।

নারী কবিরা অনুভূতি প্রকাশের ব্যাপারে পুরুষদের মতো অত পর্দা মেনে চলেন না। মাথা আর হৃদয়, দুটোর দাবিই তাঁরা স্বীকার করেন। দরকার হলে যথেষ্টই তন্ময় হন, আবার দরকার হলে মন্ময়তার বিদ্যুচ্চমকে কবিতাকে প্রাণিত করতে দ্বিধা করেন না। এই অনাড়ষ্ট প্রত্যক্ষতায় তাঁরা ভারতীয় কবিদের কাছা-কাছি। নরনারীর প্রেম বিষয়ে এই নারী কবিদের জবানবন্দী খানিকটা অনুধাবন করলেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

প্রেমের সুখী মুহূর্তগুলি বিষয়ে একটি চিত্তাকর্ষক কবিতা লিখেছেন স্যু জ্যাকসন। প্রেমিক-প্রেমিকা ট্রেনে চেপে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন, কোনো শহরে একটা দিন কাটাতে। যাবার সময় তাঁদের উৎকণ্ঠা এবং উত্তেজনা যথেষ্ট। টিকিটগুলো ঠিকমত আছে কি না দেখতে গিয়ে প্রেমিকের আঙুলগুলো কাঁপে। তাঁরা তখন নেশাগ্রস্ত।

There was music on the station
You said you had arranged it

দুটি আশ্চর্য লাইন। তাঁদের দিনটির মত্ততা সূচিত হয়েছে ছন্দ-মিলের আনন্দে :

We picked the bright gilt apple
We licked the sliver milk
We kissed in the paper roses
We ripped the chinese silk

ফিরে আসার সময় টিকিটগুলো ঠিকমত আছে কি না দেখতে গিয়ে প্রেমিকের আঙুলগুলো আবার কাঁপে। কিন্তু এবারে আর কোনো সংগীত শ্রুতিগম্য হয় না, শুধুই ট্রেনের শব্দ শোনা যায়। এ জাতীয় কবিতা বাঙালী পাঠকের চেনা-চেনা মনে হবে।

ভালোবাসার প্রকৃতি সম্পর্কে সুজান নোওল্‌স্‌-এর সাক্ষ্যটি প্রাঞ্জল এবং নির্দ্বন্দ্ব :

Simple. If you love you give
Whatever's in your hand or mind or power :
It may be
A promise, the Americas,
A handful of dried peas,
The slant of Pisa's tower.

শারীরিক চাওয়াকে অনাড়ষ্ট সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন ডায়ানা হেন্‌ড্রি। তাঁর সাক্ষ্যে তেমন পুরুষই দয়িত যে তীব্রভাবে চায় :

so what has he that sets
the old jingle

to dance in my eyes
but that he yearns more
and his skin hurts him
like tight armour.

অবশ্য এ ব্যাপারে আশাভঙ্গ এবং দুঃস্বপ্নের ইঙ্গিতও কেউ কেউ দিয়েছেন, এবং সে-সাক্ষ্যেও নারীর দৃষ্টিকোণটা ধরা পড়ে। প্যাট্রিশিয়া মার্টল্যাণ্ড লিখেছেন যে কয়েকটি সন্তানের জন্মের পর দম্পতির প্রকৃত মিলন দুর্লভ হয়ে পড়ে। তাঁরা আলাদা-আলাদাভাবে বিশুষ্ক তৃষ্ণার্ত মোটরওয়েতে দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে ছুটে যেতে থাকেন। পাশ্চাত্য মোটরওয়ের ট্র্যাফিকচলাচলের রীতি জানা না থাকলে চিত্রকল্পটির বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা বোধগম্য হবে না। মোটরওয়ে কেবলমাত্র দ্রুততম গতির ট্র্যাফিকের জন্য নির্দিষ্ট, সেখানে পদচারী, সাইকেল বা শিক্ষার্থী চালকের স্থান নেই। দু' দিকের ট্র্যাফিক সম্পূর্ণ পৃথকীকৃত এবং গাড়ি ঘুরিয়ে উলটো দিকে ফিরে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। একেক দিকের ট্র্যাফিক পাশাপাশি তিনটি চ্যানেলে অগ্রসর হতে থাকে, এবং ক্রমাগত ওভারটেকিং চলতে থাকে। চালকদের বেগোন্মত্ত আচরণ উদ্দামভাবে প্রকাশ পায় এবং কুয়াশা হলেই হামেশা ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে। দুরন্ত গতিবেগ, জেদ, স্বার্থসিদ্ধির দৌড়ে ক্রমাগত ক্রূর প্রতিযোগিতা, মিলনের বদলে সমান্তরালতা বা বিপরীত গতি : ইত্যাদি অনুষঙ্গে অমিলিত রতি-ক্রিয়ার এই সার্থক রূপকটি যিনি প্রয়োগ করেছেন তিনি কবি-পরিচিতিতে জানিয়েছেন যে তিনি কুড়ি বছর ধ'রে 'অনিচ্ছুক গৃহিণী'। অর্থাৎ অনিচ্ছুক স্ত্রী নন, কিন্তু শুধুমাত্র জায়া-জননী-গৃহিণীর ভূমিকায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও সীমাবদ্ধ—বাংলায় আমরা যে-অবস্থাকে বলি 'সংসারের ঘানিতে বাঁধা প'ড়ে যাওয়া'—এবং এ অনুমান অসঙ্গত হবে না যে পূর্ণতর কর্মজীবনে আত্মপ্রকাশের সুযোগের অভাব তাঁর বিবাহ-বিষয়ক অভাববোধ বা প্রতিবাদকে তীব্রতা দিয়েছে। কারও কারও মতে, তিনি জানান, সামনে আছে শাদা গোলাপের দেশ, যেখানে শারীরিক কামনা শুধু অদ্ভুত পৌরাণিক ব্যাপারমাত্র, বর্বর এবং কদাচিৎ দীপ্ত অতীতের স্মারক। সে অতীতটা যে আদৌ ঘটেছিলো তা ভালোই, তবে তাকে পেরিয়ে আসাও ভালো। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে মৌল অসন্তোষ এই কবিতাটির বিষয়বস্তু, এবং যেহেতু নারীর বন্দিদশা বিষয়ে কবির অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ, সেহেতু এই বক্তব্যের একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ফ্লার্ অ্যাড্কক্ ডিভোর্স্ড্ নারী। কবি হিসেবে এঁর নাম আছে। ইনি

'সঙ্গমের বিরুদ্ধে' নামে একটি কবিতায় আত্মরতির স্বপক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। সঙ্গমের শ্বাসরোধকারী আলিঙ্গন, স্তনবৃন্তের নিষ্পেষণ, মুখাভ্যন্তরে অপরের জিহ্বার অনধিকারপ্রবেশ, চিবুকে ধাতব সংঘর্ষণ প্রভৃতি এঁর একেবারে অপছন্দ। ক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি তাঁকে ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত করে; নিজেকে মনে হয় সেই মহিলাটির মতো, যিনি 'দ্য সাউণ্ড অফ মিউজিক' ছবিটি ছিয়াশিবার দেখেছিলেন, কিংবা কোনো স্কুলের শিক্ষিকার মতো, যিনি সাত বছর ধ'রে সমানে প্রতি বছর এক নতুন ব্যাচ মেয়েদের নিয়ে 'এ মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রীম' নাটকটি অভিনয় করাচ্ছেন।

Pyramus and Thisbe are dead, but
the hole in the wall can still be troublesome.

শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকটির খুঁটিনাটি যাঁদের জানা আছে তাঁরা বুঝবেন যে শ্লেষটির মধ্যে বাহাদুরী আছে।

প্রেমিক-কর্তৃক ত্যক্ত বা প্রত্যাখ্যাত হবার বেদনা দেশ-বিদেশের ঐতিহ্যগত লোকগীতিকার পুরোনো বিষয়বস্তু। আধুনিক পরিপার্শ্বে ত্যাগ বা প্রত্যাখ্যান ঠিক আগেকার মতো নয়। থীমটির নতুন নাম দেওয়া চলে 'প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের ভাঙন'। এ ব্যাপারে আলোচ্য কবিদের জবানবন্দী আর দু'একটি সাবেকী প্রতিবেদন মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। প্রথমে উদ্ধৃতি দিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারোলাইনা অঞ্চলের একটি লোকগীতিকা থেকে। গানটি গেয়েছেন লোকগীতিকার স্বনামধন্য গায়িকা জোন বায়েজ্‌।

He taught me to love him and promised to love
and cherish me over all others above.
My poor heart is wandering no misery can tell.
He left me no warning nor words of farewell.

He taught me to love him and called me his flower
that was blooming to cheer him through life's weary hour.
How I long to see him and regret the dark hour!
He's gone and neglected his frail wildwood flower.

মূল ভাবটির সঙ্গে নোয়াখালি অঞ্চলের নিম্নোদ্ধৃত লোকগীতিকাটির বিশেষ পার্থক্য নেই। দেবেন ভট্টাচার্য-সংকলিত একটি অ্যালবামে গেয়েছেন জয়ন্তী ভৌমিক।

আমার নিঠুর বন্ধুর লাইগা রে
আমার পরানবন্ধুর লাইগা রে
আমার পরান বুঝি যায় রে এখনই।

আমি জ্বইলা পুইড়া মইলাম রে হায়
প্রেম কইরা বন্ধুর সাথে—
আমার পরান বুঝি যায় রে এখনই।

বন্ধুর প্রেমে মত্ত হইয়া
হইলাম ঘরের বার।
দেশবিদেশে ঘুইরা বেড়াই,
দেখা না পাই তার।

আমি জানতাম যদি যাবে গো ছেড়ে,
রাখতাম তারে নয়নকোণে।
আমার পরান বুঝি যায় রে এখনই।

প্রেম করিয়া নিঠুর বন্ধু
আমারে ছাড়িয়া—
ছেড়ে গেছে প্রাণের বন্ধু
আমায় না বলিয়া। ইত্যাদি

দেশভেদে প্রকাশভঙ্গির সামান্য তারতম্য থাকলেও আমার তো মনে হয় দুটি গানের ভাবসাদৃশ্য লক্ষ করবার মতো। আর যে ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ ঔৎসুক্যকর মনে হয় তা এই যে 'প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের ভাঙন' বিষয়ে আধুনিক নারী কবিদের সাক্ষ্যেও বেদনার উপস্থিতি সমপরিমাণ। তিনটি কবিতার দিকে তাকানো যেতে পারে।

ক্যাথ্‌লীন হার্বার্ট লিখছেন এমন দুজন মানুষের কথা যাঁদের সম্পর্কটা পুরোপুরি ভেঙে যায়নি, কিন্তু শিথিল হয়ে গেছে। পুরুষ নারীকে এখনও মধ্যে মধ্যে টেলিফোন করেন, বেড়াতে গেলে দূরদেশ থেকে পোস্টকার্ড পাঠান। কিন্তু এই সামাজিকতা বা keeping in touch-এর চেষ্টাটুকু—কবিতাটির নামই ঐ

বাক্যাংশটি—প্রেমিকার কাছে প্রতিভাত হয় পরিহাসরূপে, একটি ব্যর্থ আচার-রূপে। এক সময় দুজনার মধ্যে ছিলো নিবিড় আনন্দের বন্ধন; পরস্পরের ছোঁয়া ছিলো এমন এক পরশপাথর যার সাহায্যে দোলাচল দুনিয়াকে চালানো যেতো কোনো যানের মতো। এখন টেলিফোন-সংলাপের মৌখিক ভদ্রতা নারীকে লজ্জা দেয়। ডাকবাক্সে চিঠি আসে; তাতে পুরুষের স্বাক্ষরটি 'ক্যাজুয়াল' ও সদয়, বৃষ্টির মতো উদাসীন। একটা বিরাট প্রেমের ইতিহাস এভাবে ছোট, খেলো হয়ে যাচ্ছে।

> I have become divorced from you by such
> small tokens of regard.

সুতীব্র নৈঃসঙ্গ্য এবং বেদনাবোধের উচ্চারণে কবিতাটির পরিসমাপ্তি। 'একা আমি। তোমাকে ছুঁই আমার মন দিয়ে। চিন্তায় ছুঁই যন্ত্রণার কালো এলাকা-গুলি। ছুঁয়ে উজ্জীবিত করি অমীমাংসিত এক নৈরাশ্যকে, যা জ্বলতে থাকে শুকনো বাতাসে দাউ-দাউ-করা আগুনের মতো, যখন শীতঋতু পোড়ায় ক্ষেতের অবশিষ্ট খড়কে, হাড় অব্‌দি কালো ক'রে।'

আগে যাঁর কথা উল্লেখ করেছি সেই হ্যারিয়েট রোজ্‌ও লিখেছেন এমন একটি সম্পর্কের কথা, যা তলায় তলায় ক্ষ'য়ে গেছে, যার উপরে নেমে এসেছে পুরুষের দূরত্ব ও ঔদাসীন্য। নায়িকা পাব্‌লিক টেলিফোন ব্যবহার ক'রে নায়কের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। নায়কের কণ্ঠস্বর ফাঁপা, দূরাগত; তিনি স্পষ্টত তাঁর জীবনের ব্যবহারিক সমস্যাবলীতে নিমগ্ন; নায়িকার সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগসূত্র প্রকৃতপক্ষে ছিন্ন। নায়িকা কিছুতে তাঁকে ছুঁতে পারছেন না; ফলে তাঁর মানসিক ক্লেশ দুঃসহ। তাঁর নিজের নামটাই তাঁকে আঘাত করছে তরবারির মতো। শৈশবে শেখা প্রার্থনাগুলোর অর্ধেকই ভুলে গেছেন। অবিভক্ত পূর্ণতার নকশাটুকুকে আঁকড়ে আছেন তিনি, একটি চূর্ণ ঝিনুকের মতো, পোড়া চামড়ায় মোড়া হাড়ের মতো। ব্যথাই একমাত্র অখণ্ড সংখ্যা যা তাঁর বোধের আয়ত্তে। ক্যাফিনের বড়ি খান। জানেন যে ঐ নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত, তবু পেরে ওঠেন না। জেনে-শুনে বিষ খেয়ে চলেন। একমাত্র সাথী পোষা বিড়ালটা তাঁর মুখে মুখ ঘষে, চুমো দেয়। রাত্রে বিড়ালটার সঙ্গে উঠোনে হাঁটেন। সেখানে স্তূপীকৃত জঞ্জাল, গাড়ি আর টেলিভিশনের ভাঙা অংশ, জমাট কাদায় মাখা বিছানার গদি ইত্যাদি। এগুলো ক্লেশের প্রতীক; উঠোনময় পরিত্যক্ত

ভাঙাচোরা আসবাবপত্র দারিদ্র্য, ভাঙন, নষ্টনীড় ইত্যাদির অভিজ্ঞান। রাস্তার বাতিটাকে মনে হয় একটা মুখ, নায়কের মুখেরই হলদে কম্পমান বিকৃতি। কবিতাটির শেষ হয় দুঃস্বপ্নের আর্তনাদে :

Last night I held the head of a strange cat,
screamed "who are you" when the face turned human,
not living human, but a stark death mask.
Does the nose go wide with death ?

I am polarized toward death. I have forgotten my own name.

মিরিয়াম স্কটের কবিতায় নায়ক নায়িকাকে ছেড়ে দূরদেশে চ'লে যাচ্ছেন অন্য এক প্রণয়িনীর কাছে। আলমারি থেকে নায়ক তাঁর শার্টগুলো সব বার ক'রে নিয়েছেন, এখন ওটা শুধু নায়িকারই আলমারি। নায়ক দেয়াল থেকে তাঁর ছবিগুলোও নামিয়ে নিয়েছেন ; নায়িকার জন্য শুধু রয়েছে দেয়ালের রঙগুলোর শূন্য চাউনি। নায়িকার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় সেই দিনটি, যখন নায়কের চোখ তাঁর দিকে চাইবে না, হাত হাতে পড়বে না। দর্পণে তিনি দেখেন শুধু নিজের প্রতিচ্ছবি। ঘরটা ভ'রে যাচ্ছে কেবল রোদে আর বাতাসে ; ঘরটার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত নিঃসঙ্গ স্বত্বে তাঁর মাথা ঘুরছে। শেষ দিনের সকালে নায়িকা প্রথম এবং শেষবারের মতো নায়ককে চা ক'রে খাওয়াচ্ছেন। (হয়তো এত দিন সকালে নায়কই চা করতেন ; পাশ্চাত্য পুরুষেরা এ সব ব্যাপারে যথেষ্ট করিতকর্মা হতে পারেন।) তার পর দুজনে বাজারে বেরোলেন একটি স্যুটকেস কিনতে। নায়ক সস্নেহে কথা বলছেন, কারণ এই তো শেষবার। শেষবারের মতো দুজনে হেঁটে যাচ্ছেন স্টেশনের দিকে। নায়কের পরনে অপর প্রণয়িনীর পছন্দ-করা পোশাক। নায়কের চোখ-হাত নায়িকার চোখ-হাত থেকে স'রে যাচ্ছে। বিদায়ের মুহূর্তে নায়িকার চোখ ট্র্যাজেডিতে সিক্ত হয়ে ওঠে,—যে ট্র্যাজেডি গ্রীষ্মের মতোই স্বল্প-মেয়াদী। নায়ক চ'লে যাচ্ছেন, ক্ষমা না চেয়ে, আক্ষেপ প্রকাশ না ক'রে।

I am returning alone along the ordinary street
The sky has not fallen
I am dizzy in a room filling only with air and sunlight
The sky has not fallen.

আকাশ খ'সে পড়েনি। নায়িকা আজকের মেয়ে; তিনি লোকগীতিকার প্রত্যাখ্যাতাদের মতো বুক চাপড়াচ্ছেন না; কিন্তু ঐ সংযমের আড়ালেই হাহা-কারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই কবিতাটি, যার নাম 'For R.' এবং প্রথম লাইনেই নায়িকার পরিস্থিতির সুস্পষ্ট সংকেত—

You are leaving me—

নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জাত। মিরিয়াম স্কট জানিয়েছেন যে তিনি কবিতাকে দেখেন এমন এক সংযোগসাধনী হিসেবে যার সাহায্যে নারী অন্তত একজন শ্রোতাকে জানাতে পারেন তাঁর অনন্য সত্তার রূপ, কীভাবে বা কেন তিনি অমন হয়েছেন: কবি আর শ্রোতা-পাঠকের মধ্যেকার সম্পর্কটিতেই কবিতার প্রতিষ্ঠা।

উপরে যে কবিতাগুলি আলোচনা করলাম সেগুলি থেকে অন্তত এটুকু পরিষ্কার হয় যে নারী কবিরা নরনারীর সম্পর্ককে হালকাভাবে নেন না, যথেষ্ট সিরিয়াস-ভাবে নেন। 'দ্য ওয়েইস্ট ল্যাণ্ড'-এ টি. এস. এলিয়ট যদিও ইঙ্গিত করেছেন যে

When lovely woman stoops to folly and
Paces about her room again, alone,
She smooths her hair with automatic hand,
And puts a record on the gramophone

তবুও বলতেই হয় যে আজকের বাক্‌সমর্থ নারীদের জবানবন্দীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ঐ পুরুষোচিত সিনিসিজ্‌ম্ সারগর্ভ মনে হয় না।

পুরুষেরা তাঁদের দিকটা কবিতায় অনেক শতাব্দী ধ'রে বলেছেন। এখন মেয়েরা তাঁদের দিকটা বলতে শুরু করেছেন। খ্যাতনাম্নী কবি ফ্রান্‌সেস্ হরোভিৎস্ 'নারীরা' নামক কবিতায় আসঙ্গের মুহূর্তে নারীদের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রে তাঁদের মানসিক অবস্থার আভাস দিয়েছেন: নারীরা পুরুষদের প্রতি দরদ ও মমতা অনুভব করেন, অথচ তাঁরা নিঃসঙ্গ,—ভ্রাম্যমাণ চাঁদের মতো। পিতৃতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে মে আইভিমি-র দুটি কবিতাতেই। প্যাডি কিচেন ইঙ্গিত করেন যে কোনো কোনো পুরুষের মধ্যে স্ত্রীদের মারপিট করার যে প্রবণতাটা দেখা যায় তা বংশপরম্পরাগত, বাপের কাছ থেকে পাওয়া:

The beating the beating the
beating
beating the beating
was you wasn't you
was
your father.

ইভা বয়স্টন বলেন যে নারীর হাত সর্বদা একটা কিছুকে ধ'রে থাকে,—হাতব্যাগ, ফুলদানী, শিশু, আংটি বা একটা আইডিয়া। বাসের ভিড়ে হঠাৎ একজন খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিনীর শূন্য হাতদুটি চোখে পড়ে। প্রথমে মনে হয়, ইনি বুঝি কিছু আঁকড়ে নেই। তার পর মনে পড়ে, না, উনি ঈশ্বরকে আঁকড়ে আছেন। এই বাধ্যতামূলক ধ'রে থাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন কবি। ধ'রে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন তিনি, এবারে সব ছেড়ে দিতে চান, ছড়িয়ে দিতে চান হাঁড়ি-কুড়ি ফুল আংটি সব কিছুকে। স্বকীয় ক্ষেত্র থেকে নারীদের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদটি চড়া গলায় নয়; মৃদু কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হওয়ায় মনে আরও রেখাপাত করে।

একান্তভাবে মেয়েদের নিজস্ব কতগুলো ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতাকেও সার্থক রূপ দিয়েছেন এই কবিরা। অ্যান্‌জেলা কস্‌টেন লিখেছেন মৃত সন্তানকে জন্ম দেওয়ার শূন্যতা বিষয়ে। জীন্ ওভারটন ফুলার লিখেছেন অ্যাম্‌নেসিয়া-রোগগ্রস্ত একটি নারীর কথা, যার বিশ্বাস সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে একটি জার্মান শিশুকে খুন করেছিলো; হয়তো আসলে কোনো জার্মান সৈনিকের ঔরসে জাত নিজেরই অবৈধ সন্তানকে খুন করেছিলো মেয়েটি। ইয়োরোপে মেয়েদের যে ডাইনী ব'লে পুড়িয়ে মারা হতো তার স্মরণে সিলভিয়া ক্রুস্-এর একটি কবিতা সংকলিত হয়েছে।

একটি লক্ষণীয় বিষয়: সিলভিয়া প্ল্যাথের নেতিবাচক মানসের প্রভাব সংকলনটিতে বড় একটা চোখে পড়ে না। লিজ্ হোম্‌স্-এর 'আদর্শ আত্মহত্যা' নামে একটি কবিতা সংকলিত হয়েছে বটে, কিন্তু কবিতাটি পুরোপুরি সিরিয়াস নয়; একটা হালকা মেজাজের আভাস পাওয়া যায়, যেন আধা-ঠাট্টাচ্ছলে বলছেন। পিতৃতান্ত্রিক শতাব্দীগুলিতে মেয়েদের অবমাননার ইতিহাস বিষয়ে ভ্যালেরি সাইনাসন-এর 'একদা এক নারী ছিলো' কবিতাটিতে প্ল্যাথের ছায়া যেন খানিকটা পড়েছে ব'লে মনে হয়, তবে প্ল্যাথের মেজাজের চূড়ান্ত ভয়ংকরতা

সংকলনটির কোনো কবিতাতে নেই। বরং প্রতিবাদী কবিদের সঙ্গে এই কবিদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। এটা অবশ্য কিয়দংশে সম্পাদকের রুচিরই অভিজ্ঞান, কিন্তু অন্য সূত্রেও জানা যায়—এটা সুবিদিত তথ্যই—যে প্ল্যাথের নঞর্থক, বিদ্বেষ-নির্ভর, অহংসর্বস্ব, ক্ষয়িষ্ণু দিকটার প্রভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খানিকটা প'ড়ে থাকলেও ব্রিটেনের নারী কবিদের মধ্যে সেটা স্থায়ী হয়নি, যদিও প্ল্যাথের শব্দ-প্রয়োগের শক্তিমত্তা থেকে এঁরা নিশ্চয়ই কিছু কিছু শিখে নিয়েছেন। নারী-আন্দোলনের চেতনা থেকে উৎসারিত কবিতার স্রোতস্বিনীটি অন্তত ব্রিটেনে তিক্ততার মরুপথে ধারা হারায়নি, এবং এটাকে এ দেশের পক্ষে সৌভাগ্যই বলতে হবে।

তা ছাড়া এই নারী কবিরা শুধু নিজেদের স্বাতন্ত্র্য-স্বাধিকারের চেতনায় উদ্‌ভাসিত নন, স্বজাতির দুর্বলতাগুলি সম্বন্ধেও অবহিত। মেয়েরাও তাঁদের শাণিত ব্যঙ্গের লক্ষ্য হতে পারেন। পানপাত্র হাতে চেপে পামেলা লুইস্ একটি পার্টিতে মেয়েদের হাবভাব নিরীক্ষণ করছেন :

women whom I see
once a year
now entering middle age
getting plainer

as their dress
gets richer.
They drink champagne
and fizzle.

শেষের রূপকটি—শ্যাম্‌পেনের ফেনায়িত মর্মরের সঙ্গে মাঝবয়সের দরজায় পৌঁছনো মহিলাদের অসার উচ্ছ্বসিত পার্টি-সংলাপের প্রচ্ছন্ন তুলনা—প্রাসঙ্গিক ও লক্ষ্যভেদী।

৫

পরিশেষে, নারী কবিদের কবিতার আলাদা সংকলন বার করা উচিত কিনা সে তর্কটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে। আগেই বলেছি যে কয়েকজন কবি

আলোচ্য সংকলনটির অন্তর্ভুক্ত হতে চাননি। বইটির শেষে অন্তর্ভুক্ত কবিদের কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য যোজিত হয়েছে, যা তর্কটির উপর খানিকটা আলোকপাত করে। কিছু উদ্ধৃতি আগেই দিয়েছি; আরও কয়েকটি মতামত বিবেচনা করা যাক।

প্যাডি কিচেন জানান যে নারী কবি হিসেবে চিহ্নিত হতে তাঁর আপত্তি একেবারেই নেই, কারণ তিনি নারী তো বটেই, কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগটা তাঁর কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করেন যে আলোচ্য সংকলনটি তাঁর এই শেষোক্ত মতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারে,—হয়তো দেখা যাবে যে শ্রেণীবিভাগটা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সিলভিয়া ক্রস্ মনে করেন যে কাব্যসংকলনের সম্পাদকেরা নারী কবিদের প্রতি প্রায়ই সুবিচার করেন না; সে অবিচারের প্রতিবিধানার্থে মেয়েদের লেখার আলাদা সংকলনগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা আছে। ক্যারোলিন অ্যাল্ড্‌ক্রফ্‌ট্ ও জোন ডাওনার ইঙ্গিত করেন যে নাম-করা পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা নারী কবিদের প্রতি সুবিচার করেন না। জেনি জোসেফ বলেন তা ঠিক নয়, একটি কবিতা যদি নির্বাচিত না হয়, তার কারণ এ নয় যে সেটি মেয়ের লেখা, কারণ সেটি দাঁড়ায়নি, কিন্তু এটা তর্কাতীত যে জিজ্ঞাসার জীবন যাপন করার সুযোগ পুরুষদের চাইতে মেয়েদের কম; প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যে-জাতীয় পূর্ণ নিমজ্জন শিল্পীর পক্ষে অপরিহার্য হতে পারে তার সুযোগ মেয়েরা যথেষ্ট পান না। এ প্রসঙ্গে প্যাট্রিশিয়া মার্টল্যাণ্ড মন্তব্য করেন যে যাঁদের নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখানো হয়েছে তাঁরা যে আত্মবিশ্বাসে, ধী-শক্তিতে, সৃষ্টিশীল কল্পনায় দীন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা লিখবেন তা প্রত্যাশিতই, কিন্তু এখন অবস্থা বদলাতে শুরু করেছে, এবং ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণ।

প্রশ্ন করা যেতে পারে: ব্রিটেনের মেয়েরা যে কি-আন্দাজ প্রথম শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন, সেটা প্রমাণ করার জন্যও এ জাতীয় সংকলনের প্রয়োজন ছিলো না কি? আগেই বলেছি, কবিতার বইকে দাঁড়াতে হবে কবিতারই জোরে। সেই শর্তটা মেনে নিলে মেয়েদের লেখার আলাদা সংকলন প্রকাশ করা সিরিয়াস লেখিকাদের পক্ষে মর্যাদাহানিকর নয়। মর্যাদাহানি হয় যদি দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর লেখা দিয়ে পাতা ভরানো হয়। আমরা শুধু মেয়েদের লেখা দেখতে চাই না, দেখতে চাই মেয়েদের হাত থেকে বেরোনো ভালো লেখা। এ দাবিটা সংগত। এবং এটা মানলে 'ভারতীয় কবিতা', 'বাংলা কবিতা', 'ভারতীয়

ইংরেজী কবিতা', 'সাঁওতালী কবিতা' ইত্যাদির মতো 'মেয়েদের লেখা কবিতা'-রও একটা ন্যায্য শ্রেণী হতে বাধা নেই। এবং মেয়েরাও যে ভালো কবিতা লিখতে পারেন তা প্রমাণ ক'রে এ ধরনের বই মেয়েদের আত্মবিশ্বাস পুষ্ট করতে পারে, বিশ্বাস করেন ভ্যালেরি সাইনাসন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে নিগ্রো কবিদের কবিতার সংকলন অনুরূপভাবে অনেক কালো মানুষকে আশা, আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা জুগিয়েছে।

মেয়েদের কবিতাকে ভালো কবিতা হতে হবে তা না হয় মানা গেলো, কিন্তু ভালো কবিতার মানদণ্ডটা কিরকম হবে? যাচাইয়ের নিরিখগুলোই যদি পুরুষ-ঘেঁষা হয়, তা হলেই তো মেয়েদের প্রতি অবিচার করা হবে। মেয়েদের লেখা ভালো কবিতা আর পুরুষদের লেখা ভালো কবিতা তো সব সময় একরকম হবে না। তফাত আছে, সে কথা এ কবিরা নিজেরাই বলছেন।

এটা ঠিকই যে পুরুষ সম্পাদক-সমালোচকবৃন্দ সিলভিয়া প্ল্যাথকে নিয়ে যেমন মাতামাতি করেছিলেন, অন্যদের নিয়ে তেমন করেন না। তবে কি মেয়েদের লেখায় প্রকৃত কাব্যস্বাদের চেয়ে পুরুষ-অনুকারী উৎকেন্দ্রিকতা ও নঞর্থকতাই তাঁদের প্রিয়তর? সাহিত্যিক এস্‌টাব্লিশমেণ্টের রুচি ওরকম হলে লেখিকারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, সন্দেহ নেই। সে ক্ষেত্রে মেয়েদের লেখা আলাদা বার করার প্রয়াস ন্যায্য প্রয়াসই বটে।

পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি আর মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে খানিকটা পার্থক্য তো থাকতে বাধ্যই, যেটা কবিতাতেও প্রতিফলিত হবে, কিন্তু ব্যাপার এই যে অগ্রসর পশ্চিম দুনিয়ায় পুরুষের চৈতন্যে আর নারীর চৈতন্যে একটা বড় রকমের ফারাক এসে গেছে, যে-কারণে দৈনন্দিন জীবনেও দু' দলের মধ্যে ভাবনার বিনিময় প্রায়শই ব্যাহত। গত দুশো বছর ধ'রে এ দুনিয়ার শিক্ষিত পুরুষদের মানসিক জগৎ যে-মাত্রায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি, প্রযুক্তি, বিশ্লেষণ প্রভৃতি দ্বারা শাসিত, মেয়েদের মানসিক জগৎ অবশ্যই ঐসব অনুশীলন দ্বারা অতটা শাসিত নয়। এই উত্তরাধিকারেই পুরুষ কবিদের মধ্যে মাথার কাজ নিয়ে অতিব্যস্ততা এবং হৃদয়ের অনুভূতিকে এড়িয়ে চলা ফ্যাশন হয়েছে। এবং তাই এ সমাজে মেয়েদের কবিতার একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে সহজিয়া স্রোতটিকে বহতা রাখা, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন, **intuition** বা স্বজ্ঞার পুনর্বাসন। কবিতা যে **'an act of love'** —হ্যারিয়েট রোজ্‌কে আবার উদ্ধৃত করলাম— সেটা নারী কবিরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

এ প্রসঙ্গে অ্যান্‌জেলা কস্‌টেন-এর নিম্নলিখিত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

'মেয়েদের কবিতা আর পুরুষদের কবিতায় তফাত আছে—মেয়েরা লেখেন ভিন্ন এক চৈতন্য, ভিন্ন অভিজ্ঞতাসমষ্টি, চাওয়ার ভিন্ন একটা পরম্পরা থেকে। সাধারণত মেয়েদের কবিতা ব্যক্তিগত-নির্জন, জনতার দিকে মুখ ক'রে বলা নয়; বাইরের উদ্দেশ্যের দিকে একাগ্র নয়, ধ্যানপ্রবণ; কোনো কিছু বদলানোর চাইতে প্রতিবেদন, সংজ্ঞানির্ণয় বা নন্দনই তার অন্বিষ্ট; কদাচিৎ রোষে কবিসত্তার দিকেই তার মুখ ফেরানো। পুনর্জাত চৈতন্যের উদ্দেশ্যে যে-অভীপ্সা ক্রমশ আমাদের অতি-যান্ত্রিক অতি-মননশীল সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে, আজকের নারী-আন্দোলন তার কারণস্বরূপ নয়, বরং তার চিহ্ন। কবিতার উপস্থিতি দোটানায়; দুটি বিন্দুর মাঝখানকার হ্রস্বতম দূরত্বের নাম কবিতা; অস্তিবাচক ও নেতিবাচক মেরুদ্বয়ের মধ্যে, কারণ-অকারণের মধ্যে তার স্ফুলিঙ্গের স্ফুরণ। আজকের মেয়েরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে এ সত্যটা উপলব্ধি করার এক অনন্য সুযোগ তাঁদের।'

সৃষ্টিকর্মে তথা তার তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় নারীদের স্বকীয় দৃষ্টিকোণটা যদি কোনো সংকলনে ধরা পড়ে, তা হলে নিশ্চয়ই লাভ। উপরন্তু এটা আশাপ্রদ, যে নারীদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও পর্যাপ্ত বৈচিত্র্য বর্তমান. যে-বৈচিত্র্য ছাড়া শুভ বিবর্তন হয় না। অ্যান্‌জেলা কস্‌টেন-এর উক্তিগুলি শান্ত স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত নয়, অশান্ত বায়ুশকুন, বিক্ষোভ চলা-কালীন দিঙ্‌নির্ণয়ের প্রচেষ্টা। স্থিতির বদলে একটা দ্বান্দ্বিক, দোলাচল অবস্থারই আভাস পাচ্ছি ওঁর কথাগুলোয়।

মেয়েদের লেখার যে একটা বিস্ফোরক ভূমিকা থাকতে পারে, সে-সম্ভাবনা সম্বন্ধে পেনেলোপি শাট্‌ল্‌ খুব সচেতন। ইনি জোর দিয়ে বলেন যে মেয়েদের কল্পনাশক্তিকে এবং সৃষ্টিশীল বৃত্তিকে আগে ভয়ের চোখে দেখা হতো, যে-জন্য তাদের ডাইনী ব'লে পুড়িয়ে মারা হতো। নতুন দিনের নারীরা পুরুষদের নিষেধাজ্ঞাগুলোকে অমান্য করবেন, পুরুষরা জোর ক'রে তাঁদের যে মুখোশগুলো পরিয়েছেন সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করবেন। রিয়ালিটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের যে স্বাভাবিক সহজাত লাইন তাঁদের আয়ত্তে, তার ব্যবহারে প্রত্যক্ষ সত্যকে তাঁরা উন্মোচিত করবেন। তাঁরা যা লিখছেন বা লিখবেন তা টুঁটি-টিপে-ধরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে নির্ভর জোগাবে না, ক্রমোন্নয়নশীল নবকল্পিত দুনিয়ার দিকে এগিয়ে যাবে।

অপেক্ষাকৃত নরম গলায় মে আইভিমি বলেন যে পুরুষোচিত দু' রকম

গুণাবলীর সুষম সন্নিবেশেই মানসিক-আধ্যাত্মিক পরিণতি আসে ; একতরফা 'কমিটমেণ্ট'-এর বদলে কবিতা যদি এই ভারসাম্যকেই তার লক্ষ্য করে, তবেই মঙ্গল। আমার তো মনে হয় যে পুরুষ আর নারীর দৃষ্টিভঙ্গি মিলিত হলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সে-প্রবণতাটা খানিকটা শাসনায়ত্ত হতে পারে, যেটার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের পক্ষেও সব সময় কল্যাণকর হয়নি : আমি ভাবছি সেই ব্যাপক অমঙ্গল-বোধ এবং সর্বগ্রাসী ঘৃণার কথা, যাদের বিরুদ্ধে প্রাজ্ঞ সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব সুচিন্তিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন,[১] এবং বস্তুত যে মানসিক ফ্যাশনের পাল্লায় প'ড়েই সিলভিয়া প্ল্যাথ তাঁর প্রতিভাকে বিকৃত করলেন, উপরন্তু জীবন-টাকেও নষ্ট করলেন। বাংলা সাহিত্যে এই কেতার বিকাশ, আমার বিশ্বাস, উপরে উপরে প্রভাবের ফল : ড্রাগটি এখনও মানসের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেনি। বাঙালীরা এখনও মূলত সেন্টিমেণ্টশাসিত জাতি, ধার-করা অমঙ্গলবোধটা কেকের আইসিং-এর মতো। নারীপুরুষের মানসিক ব্যবধানটি বাঙালী সমাজে দুস্তর হয়ে পড়েনি। হাজার হোক, সভ্য দেশগুলির মধ্যে বাঙালী-অধ্যুষিত এলাকাই একমাত্র এলাকা যেখানে ঈশ্বরকে এখনও মাতৃরূপে আরাধনা করা হয়, এবং সংস্কৃতিতে তার একটা প্রভাব থাকবে বৈ কি। এই সেদিনই লিখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁর মানস ছিলো পুরুষোচিত ও নারীসুলভ গুণাবলীর সুষম সমন্বয়ে গঠিত।

আমাদের সমস্যাগুলি অগ্রসর পশ্চিম দুনিয়ার থেকে অবশ্যই আলাদা। আমরা এখনও 'অতি-যান্ত্রিক অতি-মননশীল' হয়ে পড়িনি। বস্তুত, আমাদের চাই আরও যন্ত্রপাতি, আরও প্রযুক্তিবিদ্যা, জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে আরও প্রকৃত মননশীলতা। সাহিত্যেও চাই আরও মনন, আরও নিদিধ্যাসন, আরও আঙ্গিকচেতনা। চাই নিছক কারসাজির বদলে বুদ্ধিদীপ্ত তন্ময়তা, শৈথিল্যের বদলে সংযম, উচ্ছ্বসিত ফেনার বদলে সুরাসারের ঘনত্ব। পশ্চিমের আদবকায়দাকে উপরে উপরে এবং অন্ধভাবে অনুকরণ না ক'রে পশ্চিমের—এবং বলা বাহুল্য অন্য যে-কোনো সভ্যতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য—সদ্‌গুণগুলোকে অর্জন করাই জরুরী। বিদেশী গুরুরা কখন নমস্য, কখন বা বাড়াবাড়ি করছেন, কোনটা তাঁদের স্থায়ী ও শ্রদ্ধেয় চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য, কোন আচরণটা নেশাগ্রস্ত বা চলতি ফ্যাশনমাত্র, এসব

১. তাঁর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

বুঝে নেবার মতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আয়ত্ত করা প্রয়োজন। আলোচিত নারী কবিরা বুদ্ধি ও অনুভূতির ভারসাম্য নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, তার ফলশ্রুতি আমাদের পক্ষেও ভালো হবে সে-বিশ্বাসেই এ প্রবন্ধের অবতারণা। মেয়েদের লেখা বাংলা কবিতার কোনো সংকলন আমার হাতের কাছে নেই, ফলে সে বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না, কিন্তু মেরি অ্যান দাশগুপ্ত-সম্পাদিত সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতীয় নারীদের ইংরেজী কবিতার সংকলনটি[১] মনোজ্ঞ ও উচ্চ মানের, বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবনের যোগ্য। ভারতীয় কবিতার এই শাখাটিতে নারীদের কৃতিত্ব যখন স্পষ্ট হতে চলেছে, তখন বাংলাতেই বা কেন হবে না। আমার বিশ্বাস, নারীপুরুষনির্বিশেষে সব সাহিত্যিকেরাই যদি সৃষ্টিশীল শিল্পীর অর্ধনারীশ্বর সত্তাটির সযত্ন অনুশীলন করেন, তবে তা সব সমাজেই শুভংকর হতে বাধ্য।

১. *Hers, An Anthology of Poetry in English by Indian Women* এই নামে কলকাতার রাইটার্স ওয়র্কশপ্ থেকে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত।

অনুবাদ-কবিতা

The Orient is a Western fiction ; a shorthand term for Asia and those parts of the Mediterranean world inhabited by peoples regarded as neither European nor African.

এই বিনীত স্বীকৃতি দিয়ে যে বইটির প্রস্তাবনার শুরু তা একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রচেষ্টা : তথাকথিত 'প্রাচ্য' কবিতার ইংরেজী অনুবাদের একটি তিনশতাধিক পৃষ্ঠার সংকলন।[১] যে প্রাচ্য জগতের সন্তোষজনক সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন, সেই বিশাল দুনিয়ার তেত্রিশটি ভাষা থেকে কবিতার নিদর্শন এখানে সংকলিত হয়েছে। সময়ের বিস্তারও বিরাট : প্রাচীনতম কাব্যের অংশ থেকে একেবারে হাল আমলের রচনাও স্থান পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় কাজ একজনের চেষ্টায় হয় না, এবং এ সংকলনটিও সম্ভব হয়েছে, অনেকজন অনুবাদক, বেশ কয়েকজন বিভাগীয় সম্পাদক এবং একজন প্রধান সম্পাদকের সহযোগিতায়। একেকটি ভাষা একেকটি বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, এবং প্রত্যেকটি বিভাগকে এক বা একাধিক বিভাগীয় সম্পাদকেব তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। কদাচিৎ অন্য সহযোগিতার অভাবে প্রধান সম্পাদক, যিনি নিজে কবি এবং কবিতার অনুবাদক, নিজেই বিভাগীয় দায়িত্বও পালন করেছেন। প্রত্যেকটি বিভাগের সূত্রপাতে একটি ছোট ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনাটির ক্ষেত্র যেহেতু এত সুদূরপ্রসারী, তার স্থানকালের পরিধি যেহেতু এত ব্যাপ্ত, সেহেতু বিভিন্ন ঐতিহ্যের কবিতার কিছু সীমিত নিদর্শন তুলে ধরা ছাড়া আর কোনো পন্থা পরিবেশকদের ছিলো না। প্রধান সম্পাদক কীথ্ বস্‌লি জানিয়েছেন যে চীনা, জাপানী, ভারতীয়, ফার্সী, আরবী, হিব্রু—এই নাম-করা ঐতিহ্যগুলি থেকে কবিতার সংখ্যা যথাসম্ভব কম রেখে, যেসব ভাষা তথা ঐতিহ্য পাশ্চাত্য জগতে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত বা সাধারণ পাঠকদের কাছে একেবারেই

১. *The Elek Book of Oriental Verse*, General Editor Keith Bosley, Paul Elek, London, 1979.

অপরিচিত তাদের কবিতার কিছু নমুনার জন্য জায়গা করা। উদাহরণস্বরূপ, আবখাজ নামে উত্তরপশ্চিম ককেশীয় গোষ্ঠীর একটি ভাষার কবিতা নাকি ইংরেজীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছে এই বইটিতে।

অথচ সম্পাদকীয় নীতির মধ্যে কিছু অন্তর্বিরোধ থেকে গেছে, কিংবা বলা চলে বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকেরা নির্বাচনের ভিন্ন ভিন্ন নিরিখ মেনেছেন এবং প্রধান সম্পাদকের সঙ্গে আলাদা-আলাদা বোঝাপড়া করেছেন, যার ফলে সমগ্রত একটা অসমতা এসেছে। নয়তো যেখানে আইনু, কিরঘিজ, কামাসিয়ান, ভোগল, আবখাজ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ঐতিহ্যের জন্য জায়গা করা হয়েছে, এবং যেখানে ঐ জায়গা করার খাতিরে ভারতীয় উপমহাদেশের অনেকগুলি সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে মাত্র চারটি ভাষার জন্য জায়গা করা সম্ভব হয়েছে, সেখানে বাইবেলের অনুবাদ দশ পাতা জুড়ে কেন তা বোঝা যায় না। বিশেষত যে বিখ্যাত 'অথরাইজ্‌ড্ ভার্শন' ইংরেজীভাষী পাঠকদের অচেনা এলাকা হবার কথা নয় তা থেকে সাতটি উদ্ধৃতি সংকলিত হয়েছে, অথচ যে কোরান তাঁদের নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত কম-জানা তার কাব্যাংশ থেকে কোনো উদ্ধৃতি নেই। এর কারণ হয়তো এই যে হিব্রু বিভাগের সম্পাদক তাঁর প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং প্রধান সম্পাদককে বুঝিয়েছেন যে বাইবেলের অতখানি অনুবাদ ছাড়া সে ঐতিহ্যের প্রতি সুবিচার করা যাবে না, এ দিকে আরবী বিভাগের সম্পাদকদ্বয় ঐশ্বরিক বিষয়বস্তুকে প্রায় পাশ কাটিয়ে মানবিক বিষয়বস্তুর দিকেই ঝুঁকেছেন। এতে কবিতার রসাস্বাদনে কোনো ব্যাঘাত নিশ্চয়ই হয় না, তবে এ ধরনের বই থেকে 'প্রাচ্য' কবিতা সম্পর্কে কোনো সপরিপ্রেক্ষিত মানচিত্র উদ্ধার করা অসম্ভব। এবং তেমন কোনো মানচিত্র সরবরাহ করাটা যদিও স্পষ্টতই সম্পাদকদের উদ্দেশ্য নয়, কাব্যরসনিষেকই উদ্দেশ্য, তবুও, তাঁরা না চাইলেও তিনশো পাতার সংকলনগ্রন্থে পাঠকরা সেটা খুঁজবেনই, অন্তত তাঁদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষত যেখানে বিষয়বস্তু একটি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত জগৎ। প্রাচ্য দুনিয়া সম্বন্ধে পশ্চিমে যেহেতু আবহমান কাল থেকে নানা রকমের ভুল ধারণা বর্তমান সেহেতু ভুল ধারণা বৃদ্ধির কোনো নতুন সুযোগ পাঠকদের হাতে আদৌ তুলে দেওয়া উচিত নয়। উদ্‌বেগ আরও এ কারণে যে পৃথিবীর কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষত আমেরিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায়, 'বিশ্বসাহিত্য' বা 'তুলনামূলক সাহিত্য' চিহ্নিত পাঠক্রমের পাঠ্যসূচীতে এ জাতীয় বইয়ের ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা স্পষ্টত বর্তমান ; এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হলেই কবিতার সংকলন আর শুধু কবিতার সংকলন থাকে

না, অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় সাহিত্যেতিহাসের মানচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। বিপদটা সেখানেই।

উদাহরণস্বরূপ, বইটিতে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতি সত্যিই সুবিচার করা হয়নি। এ অঞ্চলের মাত্র চারটি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: সংস্কৃত, বাংলা, তামিল এবং উর্দু। এটা ঠিকই যে পাশ্চাত্য পাঠক যেখানে আবখাজ, কিরঘিজ বা কামাসিয়ানের নামও শোনেননি, সেখানে সংস্কৃত বা বাংলার নামটা অন্তত (আশা করা যায়) শুনেছেন; তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের পরিচয় ঐ নাম-শোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গড়পড়তা ইংরেজীভাষী পাঠকের কাছে হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তেলেগু, কানাড়া ইত্যাদি আবখাজ বা কিরঘিজের মতোই অপরিচিত, এবং এ বইটি পড়বার পর ঐ অন্ধকার এলাকাগুলি আদৌ আলোকিত হবে না, সেখানেও যে কত রত্ন বর্তমান তা অজানা থেকে যাবে। যে-সংকলনে মীরা, কবীর, তুলসীদাস বা তুকারাম নেই সে-সংকলন ভারতীয় কবিতার প্রতিনিধি হিসেবে স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ।

সংস্কৃত কবিতার প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়েছে। যেখানে কোনো কোনো ভাষার দীর্ঘ কাব্য থেকে বেশ দু'-এক পাতার টানা উদ্ধৃতি স্থান পেয়েছে, সেখানে সংস্কৃত দীর্ঘ কাব্য প্রায় অনুপস্থিত। রামায়ণকে কি সতেরো লাইনে চেনা যায়? তা ছাড়া, ঐ নির্বাচিত সতেরো লাইনে সীতা স্পষ্টত রামের সঙ্গে বনবাসে যেতে চাইছেন, অথচ লাইনগুলির সূচনায় বলা হয়েছে: 'King Rama courts Sita ; she replies'—পণ্ডিতী সম্পাদনায় এরকম ভুল কী ক'রে সম্ভব হলো কে জানে।

এটা প্রায় অবিশ্বাস্য যে মহাভারতের এক লাইনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মেঘদূতের তিন জায়গা থেকে তিনটে শ্লোক অনূদিত হয়েছে: ব্যস্, কালিদাস ঐখানেই শেষ। ঐটুকু তর্জমার মাধ্যমে কালিদাসের ঈর্ষণীয় ভাবসমৃদ্ধি বা অনন্য ধ্বনিঝংকারের প্রতিধ্বনি বিদেশী পাঠকদের কাছে ধরা পড়বে না। অন্তত এক-পৃষ্ঠাব্যাপী টানা উদ্ধৃতি না থাকলে দীর্ঘ কবিতার স্বাদটা পাওয়া মুশকিল, আর দীর্ঘ কাব্যকে লিরিক বানালে পাঠকদের ঠকানোই হয়।

বাংলাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্ব করছে তাঁর একেবারে শেষ পর্যায়ের তিনটি কবিতা। এ ক্ষেত্রেও বলতে হয় যে মাত্র ঐ তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে বিদেশীরা তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কোনো যথার্থ ধারণা করতে পারবেন না। তা ছাড়া আমাদের ক্ষোভ থেকে যায় যে যেখানে অন্যান্য কোনো কোনো ঐতিহ্যের

একেবারে সাম্প্রতিক কবিতাও স্থান পেয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের তুলনীয় পর্যায়ের কবিতার কোনো নমুনা নেই। আধুনিকদের মধ্যে আছেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, এবং বুদ্ধদেব বসু ; তার পর পূর্ববঙ্গের শামসুর রাহমান এবং সৈয়দ শামসুল হক্। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশের বা ষাটের দশকের কবিদের দু'-একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা যুক্ত হলে আমাদের, বলা বাহুল্য, ভালো লাগতো।

স্পষ্টত, আলোচ্য বইটিতে স্থান আর কাল মিলিয়ে পরিধিটা বড্ড বিরাট হয়ে গেছে। হয় স্থানের, নয় কালের, কিংবা দুয়েরই বেড়টা আরও ছোট ক'রে নিলে মানচিত্রটাকে আরও আনুপুঙ্খিক ক'রে তোলা যেতো। খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কবিতাও পাচ্ছি, আবার ১৯৪৫ সালে জন্মেছেন এমন কবির কবিতাও পাচ্ছি। ভৌগোলিক বিস্তৃতিটা যখন ইউরেশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা ব্যেপে, তখন সময়ের সীমারেখাটা দৃঢ় হাতে এঁকে নেওয়া যেতো। কিংবা ভৌগোলিক ঘেরটাকেও আরেকটু ছোট ক'রে নেওয়া যেতো, তাহলে কাজটা মানানসই হতো। 'দ্য ওরিয়েন্ট' একটা দানবীয় ব্যাপার। কীথ্ বস্‌লি যদিও গোড়াতেই মেনে নিয়েছেন যে 'দ্য ওরিয়েন্ট' একটি ভৌগোলিক সত্তা নয়, বরং একটি 'Western fiction', তবু ঐ পৌরাণিক সত্তাটিকে কোনো চ্যালেঞ্জ জানানোর দরকার উনি অনুভব করেননি। গতানুগতিক বিচারে উত্তর আফ্রিকার আরবরা 'প্রাচ্য' মানুষ, অথচ এই দ্রাঘিমায় বসবাসকারী ভূমধ্যসাগরীয় ইয়োরোপীয়রা 'পাশ্চাত্য' মানুষ। মরক্কো গ্রীসের ঢের পশ্চিমে, কিন্তু মরক্কোর আরবী কবিতাকে বলা হবে 'প্রাচ্য', আর গ্রীক কবিতাকে বলা হবে 'পাশ্চাত্য'—এ জাতীয় নামকরণ মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। আলোচ্য সংকলনে প্রাচীন মিশরীয়, উগারিতিক, মেসোপতেমীয়, তুর্কী, আরবী, হিব্রু, আরমানী প্রভৃতি স্থান পেয়েছে, কিন্তু গ্রীক, বলা বাহুল্য, স্থান পায়নি। অথচ এই চিরাচরিত পৃথক্‌কীকরণের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। সত্যি, পূব কাকে বলে, পশ্চিম কাকে? মানবসভ্যতার ইতিহাসের গোড়ার দিকে এই ভেদরেখা কতখানি প্রাসঙ্গিক? বরং সংস্কৃতি-গুলিকে সম্পৃক্ত এলাকায় ভাগ ক'রে নিলে, ভাষাগুলিকে গোষ্ঠীগত বিচারে দেখলে নীতির একটা সমতা আসে। প্রাচীন হিব্রু আর প্রাচীন আরবী পাশাপাশি থাকতে পারে। আন্দালুসিয়ার আরবী কবিতা যেখানে, আন্দালুসিয়ার স্পেনীয় কবিতাও সেখানে ঠাঁই পেতে পারে। প্রাচীন ফার্সী আর সংস্কৃত কবিতা যেখানে প্রাচীন গ্রীক বা লাতিন কবিতার স্থানও সেখানে। চীনা, জাপানী, কোরিয়ান নিশ্চয়ই একটি স্বতন্ত্র, সংশ্লিষ্ট জগৎ। আজকের ইতিহাসচেতনা এই ধরনের নতুন 'গ্রুপিং'-ই

দাবি করছে, পুরনো জাতিভেদের শাশ্বতীকরণ নয়। যদি মনে করা হয় যে যেহেতু গ্রীক সাহিত্য ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে, রূপ দিয়েছে, অতএব তা 'পাশ্চাত্য', 'প্রাচ্য' নয়, তাহলে মানতে হয় যে হিব্রু সাহিত্যও খ্রীষ্টধর্মের মাধ্যমে ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে, রূপ দিয়েছে, অতএব তা-ও আজকের বিচারে 'পাশ্চাত্য'। আজকের ইজরায়েল বা তুরস্ক নিজেদের প্রতীচ্য দুনিয়ার অন্তর্গত হিসেবেই ভাবে, 'ইয়োরোভিশন' গীতপ্রতিযোগিতায় অনায়াসে অংশ নেয়। এই নতুন 'র-গ্রুপিং' মেনে নিলে এশিয়ার যে দেশগুলি নিঃসন্দেহে 'প্রাচ্য' তাদের কাব্যসম্ভারের জন্য আরও খানিকটা জায়গা করা যেতো।

এত কথার অবতারণা করছি এ কারণে যে এই ১৯৭৯ সালেও Oriental Verse ব'লে একটা শ্রেণী মেনে নেওয়া হচ্ছে। আমরা কি অনুরূপ কোনো Western Verse-এর তিনশো পাতার সংকলন প্রকাশ করার কথা ভাবতে পারি যাতে স্থান পাবে ইয়োরোপ, দুই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এমনকি আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের প্রাচীনতম পর্যায় থেকে সাম্প্রতিকতম কবিতা? 'দ্য ওরিয়েন্ট'-এর মতো 'দ্য ওয়েস্ট'-ও একটি দানবীয় সত্তা, সব শ্বেতাঙ্গ জাতির সভ্যতা যার অন্তর্গত।

যাই হোক, এসব আপত্তি তোলার পরে মানতেই হয় যে অনূদিত কবিতার সংকলন হিসেবে বইটি খুবই উপভোগ্য এবং চিত্তাকর্ষক হয়েছে। একসঙ্গে অনেকগুলি ভালো কবিতা প'ড়ে ফেলা যায়; নানান দেশের, নানান কালের বিচিত্র কাব্যসম্ভারের অন্তত কিছু কিছু টুকরো চেখে চেখে দেখা যায়,—সেটা মস্ত লাভ বৈ কি। সম্পাদকমণ্ডলী এমন সব তর্জমা পেশ করতে চেয়েছেন যেগুলি তর্জমাতেও কবিতার মাত্রা লাভ করতে পেরেছে। ফলে কখনও কখনও একেকটি অনুবাদের পিছনে আছেন দুজন অনুবাদক: একজন মূল ভাষায় বিশেষজ্ঞ, অন্যজন ইংরেজী ভাষার কবি। প্রথমজন তৈরি করেছেন আক্ষরিক অনুবাদের খসড়া,—সব সময় ইংরেজীতে নয়; দ্বিতীয়জন তা থেকে তৈরি করেছেন একটি ইংরেজী কবিতা। আবখাজের বেলায় তিনজন অনুবাদকের প্রয়োজন হয়েছে: প্রথমজন আবখাজ থেকে জর্জিয়ান ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, দ্বিতীয়জন সেটাকে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করেছেন, তৃতীয়জন তা থেকে ইংরেজী কবিতা সৃষ্টি করেছেন। কবিতার অনুবাদে এই জাতীয় সহযোগিতা আজকাল বেড়ে চলেছে, যার ফলে কবিতা-অনুবাদের মানও বেড়ে গেছে স্বীকার করতে হয়।

কবিতার অনুবাদে যেটা কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব তা হচ্ছে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং নতুন ভাষায় প্রাণশক্তি—এ দুটোর মধ্যে বোঝাপড়া করা। উপরন্তু বিশ্বস্ততা

বলতে শুধু অর্থের প্রতি বিশ্বস্ততা বোঝায় না, অঙ্গের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রশ্নও আছে। মূল কবিতায় আঙ্গিক অর্থকে যেভাবে নির্ভর জোগায় নূতন সৃষ্টিতেও তুলনীয় কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কীথ্ বস্লি জানিয়েছেন যে accuracy এবং liveliness-এর দ্বন্দ্বে তাঁরা দ্বিতীয় গুণকেই বেছে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কতখানি সফল হয়েছেন সে প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে।

সাফল্য নির্ভর করছে অনেক কিছুর উপরে। যে কবিতা যত বেশি আঙ্গিক-নির্ভর, বিশেষত ধ্বনির কারুকার্যের উপর নির্ভরশীল, নিজস্ব বিশিষ্ট সংস্কৃতিজগতে যত বেশি গভীরভাবে প্রোথিত, তার রূপান্তর তত দুরূহ হবে। হয়তো বা সে কারণেই সংস্কৃত কবিতার সংখ্যা এ বইটিতে এত কম রাখা হয়েছে। সংস্কৃত কবিতা থেকে আধুনিক ইংরেজীতে কবিতা তৈরি করা—এমন কবিতা যা মূলের ঋদ্ধির স্বাদও খানিকটা বহন করবে, আবার আজকের ইংরেজীতেও প্রাণিত কবিতা হবে—যে কতখানি দুরূহ তা তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা এই দুই ভাষার ভিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত। এ বিষয়ে অধ্যাপক ড্যানিয়েল ইন্‌গাল্‌স্-এর সুচিন্তিত ও আনুপূর্বিক আলোচনা[১] অনুসন্ধিৎসুদের অবশ্যপাঠ্য। ঐ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বইটির অনুবাদকদের চেষ্টা সম্বন্ধে কোনো কড়া কথা বলা শোভা পায় না।

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্ধরূঢ়ৈরাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্॥

Seeing the golden-tawny *nipa*,
stamens yet half-formed,
and plantains showing off new buds
along the banks,

১. *Sanskrit Poetry, from Vidyakara's "Treasury"*, translated by Daniel H. H. Ingalls, Harvard University Press, 1972.

scenting the fresh earth-fragrance
lifting clear of bone-dry woods,
the antelope will map a trail
where you may loose your rain.

এখানে কন্দলীকে কলা বানানো হয়েছে। আমি এ বিষয়ে কোনো নির্দ্বিধ মত দিতে পারি না, যদিও ব্যক্তিগতভাবে 'অনুকচ্ছম্'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ষণজাত অন্য কোনো ফুলের কথাই আমার বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়, এবং মনিয়র-উইলিয়ম্‌সের অভিধানেও তার সমর্থন মেলে। অক্‌স্‌ফোর্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বারো-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম ; উনিও বললেন যে কলা বোঝাতে চাইলে কালিদাস কদলী লিখতেন। সে যাই হোক, সেটা গৌণ ব্যাপার। আমি বলবো যে কবিতার রূপান্তর হিসেবে অনুবাদটি সৎপ্রচেষ্টা,—রমণীয় একটি ছন্দ বেজে উঠেছে ; তবু—কিংবা সে কারণেই—আক্ষেপও থাকে যে মৌলিক ভঙ্গিমাটির কাছে এসেও কাছে আসা যাচ্ছে না, সেটি অধরা থেকে যাচ্ছে। মৌলিক শব্দগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম অন্যোন্যসম্পর্ক, যে জটিল সৌকুমার্যের হাতছানি, ভরতনাট্যের মতো অলংকৃত অথচ লীলায়িত সেই সমগ্র ভঙ্গিটিকে আধুনিক ইংরেজীর পদক্ষেপে এবং মুদ্রায় বন্দী করা কী কঠিন—কী অসম্ভব কঠিন।

জালোদ্‌গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈর্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্ত-
নৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথাঃ লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতা-
পাদরাগাঙ্কিতেষু॥

Your form will swell with incense rising
from the open windows...
where women dress their hair.
Royal peacocks will dance in your honour,
come to welcome you as friend.
If your heart is travel-worn, then spend
the night high on the palace roofs,
where flowers are fragrant and paths printed
by the red-dyed feet of lovely girls.

এখানে 'ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু'-র রূপান্তরটি মনোজ্ঞ হয়েছে, কিন্তু অন্যত্র

মূলের জটিলতা খানিকটা বিসর্জন দিতে হয়েছে। জালোদ্গীর্ণ ধূপটা যে কেশ-সংস্কারের ধূপ এই তথ্যটির প্রতিষ্ঠা হয়নি : 'incense rising' এবং 'where women dress their hair' এ দুয়ের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়ায় ব্যাপারটা ভাসা-ভাসা হয়ে গেছে। অথচ দ্যোতনাটি কবিতার দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মেঘ বিরহী যক্ষেরই গতিশীল সত্তা : সে পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের কেশধূপের সঙ্গে মেঘের প্রত্যক্ষ সংযোগ, তা থেকে তার শরীরের পুষ্টি strong erotic overtones বহন করে, যে সংরক্ত ঔজ্জ্বল্য রূপান্তরে ম্লান হয়ে গেছে। এদিকে ঘরোয়া ভবনশিখীরা খামোকা রাজকীয় ব'নে যাওয়ায় গার্হস্থ জীবনের সঙ্গে তাদের হৃদ্য যোগটি—স্বগৃহ থেকে নির্বাসিত যক্ষের পক্ষে যা মূল্যবান—যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। তাদের নৃত্য যে তাদের দেওয়া প্রীতি-উপহার, ইঙ্গিতের চাবির এই আদরণীয়, বিশেষ মোচড়টি 'in your honour' ও 'welcome'-এর সাধারণত্বে ঝাপসা হয়ে গেছে।

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং
বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্ হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি
সাদৃশ্যমস্তি ॥

I see your form in the creeping vine,
your look in a deer's startled eyes ;
your cheek gleams with the moon, your hair
there in long peacock plumes.
Those sidelong glances show each time
the river gently purls...
Alas my sweet, not one place found
affording you complete.

তিনটে শ্লোকের মধ্যে এখানেই বোধ হয় সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে। 'creeping vine', 'deer's startled eyes', 'sidelong glances', 'the river gently purls' এগুলো ইংরেজীতে ক্লিশের মতো শোনায়। 'long peacock plumes'-এ বর্হভারের ভার দ্যোতিত হয় না; 'চণ্ডি' সম্বোধনের মিঠে-কড়া ভাবটি 'my sweet'-এ বড্ড বেশি মিষ্টি হয়ে যায়, চিনির রসে জড়িয়ে যায়।

এই উদাহরণগুলির সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা বজায় রেখে সংস্কৃত কবিতা থেকে ইংরেজী কবিতা সৃষ্টি করা কতখানি কঠিন। অনুবাদকরা যতটুকু সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন ততটুকুর জন্যই কবিতা-বিলাসীদের ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য।

সে তুলনায় আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে আধুনিক ইংরেজী কবিতা সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং আলোচ্য বইটিতেও তার সাক্ষ্য মেলে। 'উটপাখী' কবিতাটির রূপান্তর সুধীন্দ্রনাথ নিজেই ক'রে গেছিলেন এবং সেটিই ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধদেবের ইকারাস-বিষয়ক কবিতাটির মূল এ মুহূর্তে আমার হাতের কাছে নেই, যদিও এককালে পড়েছি : শুধুমাত্র অনুবাদটির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যে বেশ অনুবাদ হয়েছে, অর্থাৎ রূপান্তরটি নতুন সৃষ্টি হিসেবে সার্থক হয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দের 'নাবিক' মূলে আমার কাছে আছে, এবং মূলের সঙ্গে তর্জমা যেই মিলিয়ে দেখি অমনি নানান ছোটখাট খুঁতখুঁতে ভাব আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। 'পাম সারি' কেন 'a row of pines' হয়ে গেছে ? অনায়াসে 'a row of palms'-ই হতে পারতো। 'জীবাণুরা' কেন 'atoms' ? বোলতারা তর্জমায় কেন মৌমাছি হয়ে গেলো ? রাঙা রোদ 'pink sun' কেন, 'red sun' নয় কেন ?

তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার
প্রয়োজন র'য়ে গেছে :

for they are also
shores. Yet they will not do. Their wonders urge you away.

So must it be—

জীবনানন্দ দুটো আলাদা জিনিসের কথা বলছেন ; তর্জমায় সে দুটো এক হয়ে গেছে। 'Their wonders urge you away'—এ কথা বলছেন না কবি, বলছেন : Further horizons urge you away'। বিশেষ ক্ষোভ হয় যখন একটি আশ্চর্য ছবিকে অপ্রয়োজনে বদলে দেওয়া হয়।

উজ্জ্বল সময়-ঘড়ি—নাবিক— অনন্ত নীর অগ্রসর হয়।
...bright hourglass, sailor, endless water remains.

তর্জমাটির বহিরঙ্গের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে দু'লাইন আগেকার 'planes'-এর সঙ্গে মিলের খাতিরে 'remains' ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ মূল কবিতাটিতে মিল

আদৌ তত জরুরী নয়; মিলের খাতিরে একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ চূড়ান্ত চিত্রকে ভোঁতা ক'রে দেওয়া ঠিক হলো কি না সে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। 'অনন্ত' বিশেষণটি দুটো কাজ করছে: জলের পরিমাণ বোঝাচ্ছে, ঢেউদের অন্তহীন গড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতও দিচ্ছে। উজ্জ্বল সময়-ঘড়ির মতো অনন্ত নীর অনবরত এগিয়ে চলেছে; সময় যেভাবে বয়ে যায় ঢেউগুলোও সেভাবে অনিবার্য গতিতে এগোচ্ছে—endless irresistible forward rolling motion-এ; সমুদ্রের গতি সময়ের গতিকে মাপছে। এখানে অনুবাদকদ্বয় যে কী ভেবে 'remains' বসালেন তা ভেবে পাই না। এর ফলে মূলের সর্বশেষ ধাক্কাটা—ঢেউয়ের ধাক্কাটা—একেবারে স'রে যায়।

অনুবাদকদের কাজকে এতটা সূক্ষ্ম বিচারের অধীনস্থ করা হয়তো অন্যায়। কারণ আসলে মূল আর তর্জমা মিলিয়ে দেখতে বসলেই এ জাতীয় ত্রুটি চোখে পড়তে থাকে। মূল জানা থাকলেই মন খচখচ করে, জানা না থাকলে অনুসৃষ্টিতে যা পাচ্ছি তা নিয়েই তৃপ্ত থাকা যায়। মূলের শরীরের অবিকল নকলের মরীচিকা নয়, তার আত্মার অন্বেষণই অনুস্রষ্টাকে তাড়িত, উত্তেজিত করে। অবশ্য সেটা ঠিক কীভাবে করা হবে তা নিয়েই যত তর্ক আর সমস্যা।

আলোচ্য গ্রন্থে যেখানে মূল কবিতার ভাষা আমার একেবারেই অজানা সেখানে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে: বাঃ, বেশ তো, চমৎকার কাজ, ঝরঝরে এবং সাবলীল অনুবাদ হয়েছে। চীনা আর জাপানী কবিতার অনুবাদগুলি বিশেষ তৃপ্তি দেয়। আন্দাজ করলাম যে মিতবাক্ প্রকৃতির কবিতা ব'লে ইংরেজী তর্জমায় ভালো খুলেছে, তবুও অক্সফোর্ডের অধ্যাপক মার্ক এলভিনকে আমার ভালো লাগার কথা জানালাম, বইটি দেখালাম। উনি তৎক্ষণাৎ বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে ছোট ছোট খুঁত বার করতে লাগলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'মূল জানা থাকলেই কবিতার অনুবাদ বিষয়ে অন্তহীন আপত্তি উঠতে থাকে, তাই না?' উনি হেসে বললেন, 'ঠিক তাই, এবং এই মানসিক অবস্থার নাম দেওয়া যাক, আপনার নামে, Dyson syndrome।' কিন্তু উনিও এ কথা ব'লে ক্ষান্ত হলেন না, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'মর্বিড্' কৌতূহল তা নিয়ে—এবং বলা চলে তাঁর নিজস্ব 'এলভিন সিন্‌ড্রোম'-এর বশবর্তী হয়ে—মূল জাপানী হাইকুর সঙ্গে ইংরেজী তর্জমাগুলি মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। ওঁর আলোচিত দু'টি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করছি। বইটিতে পাচ্ছি একটি প্রসিদ্ধ হাইকুর নিম্নলিখিত রূপ:

There is no speech :
a host, a guest,
one white chrysanthemum.

অধ্যাপক এলভিন বললেন : 'এ ঠিক হয়নি ; ব্লাইথের অনুবাদ আরও মূলানুগ, আরও সার্থক।' ব্লাইথের বই[১] খুলে দেখালেন :

They spoke no word,
The host, the guest,
And the white chrysanthemum.

আলোচ্য সংকলনে আরেকটি বিখ্যাত হাইকু-র নিম্নলিখিত রূপ এইরকম :

Life is as drops of dew
ah yes
as drops of dew
ah yet

এবারে এলভিন সাহেব বেশ খেপে গেলেন। বললেন : 'এ যা-তা হয়েছে ; হাইকু হচ্ছে তিন লাইনের কবিতা, কক্ষনো তিন লাইনের বেশি হবে না ; আঁট ফর্মটা নষ্ট ক'রে ফেললে হাইকুর আর কী থাকে?' আবার সপ্রশংস দৃষ্টিতে ব্লাইথের অনুবাদ দেখালেন :

This dewdrop world—
It may be a dewdrop,
And yet—and yet—

অর্থাৎ ভুলচুক খুঁজতে গেলে তার আর কোনো শেষ থাকে না, এবং উনি এ-ও স্বীকার করলেন যে কবিতার অনুবাদ এমন একটা ব্যাপার যার বিচার সম্বন্ধে আগে থাকতে কোনো নিয়মকানুন খাড়া করা যায় না, কী করা গেছে তার ভিত্তিতেই আলোচনা চালাতে হয়। যিনি পারেন তিনি পারেন, ছোটখাট

১. *Haiku,* translated with a commentary by R. H. Blyth, 4 vols., Hokuseido Press, Tokyo, 1960.

আনুপূর্ব্বিক বিচ্যুতি সত্ত্বেও মূলের আত্মার পাখিকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন, যেমন এজরা পাউণ্ড, যাঁর কিছু অনুবাদ এ বইটিতে গৃহীত হয়েছে। এ-ও জানলাম যে ভাষার প্রকৃতিগত কারণে বিশেষত জাপানী কবিতা নাকি ইংরেজীতে ভালো খোলে। 'জাপানী হচ্ছে টেলিগ্রামের ইংরেজীর মতো, তাই মনোসিল্যাবিক ইংরেজীতে তার রূপদান অপেক্ষাকৃত সহজ', বললেন তিনি, 'আজকালকার তীক্ষ্ণ সংক্ষিপ্ত ইংরেজী বাচনভঙ্গির সঙ্গে জাপানী কবিতার ভঙ্গিটা বেশ মিলে যায়।' সাহস ক'রে বলি যে নিম্নলিখিত অনুসৃষ্টিগুলিকে নিছক কবিতা হিসেবে আমার তো বেশ ভালোই লাগে,—তাদের বিশ্বস্ততা যেমনই হোক না কেন :

Daybreak
and white spring frost
on the barley leaves.

Purple hibiscus by the road—
but my horse
cropped it.

Red hint of dawn—
cockcrow
among peach-flowers.

অর্থাৎ কবিতার অনুবাদ যখন শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্যে নয়, অনুসৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তখন কবিতা হিসেবে মনকে দোলা দিতে পারার ক্ষমতা তার থাকা চাই। সালংকার আড়ষ্ট কাষ্ঠপুত্তলী হয়ে ব'সে থাকলে চলবে না, তাকে নাচতে হবে। এখানে বলি যে কোনো কবিতার বই ভালো না খারাপ তা যাচাই করার একটা ব্যক্তিগত নিরিখ আমার আছে : বইটি প'ড়ে আমার নিজের মধ্যে কবিতার লাইন চাড়া দিয়ে ওঠে কি না। উঠলে বইটি ভালো, নয়তো নয়। আমার এ ব্যক্তিগত পরীক্ষায় আলোচ্য বইটি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। অনেক ক'টি কবিতা আমাকে নাড়া দেয়; উদ্‌বোধিত, অনুপ্রেরিত করে। চীন আর জাপান ছাড়াও কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং বর্মার কবিতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলাম। মহাবিশ্বের সৃষ্টিবিষয়ক একটি ব্যাবিলনীয় উদ্ধৃতির সঙ্গে ঋগ্‌-বেদের সৃষ্টিবিষয়ক ধ্যানের সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। তা ছাড়া আমাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছে জর্জিয়ান, আরমানী আর আরবী কবিতা। ১৯১৫ সালে তুর্কীদের

হাতে আরমানীদের গণহত্যার সময়ে যে লক্ষ-লক্ষ মানুষ খুন হয় সেই নিহত মানুষদের অন্যতম দু'জন কবির উল্লেখযোগ্য কবিতা জায়গা পেয়েছে। একজন মধ্যযুগীয় জর্জিয়ান কবি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান যে যিনি দীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে ভাবনাকে বুনতে না পারেন তিনি মহৎ কবি নন। একজন আধুনিক জর্জিয়ান কবির মতে :

I don't write poems...it's me they write,
my life and the poem's unfold alike.
I call a poem a torrent, a landslide.
that sweeps you off and buries you alive.

মানতেই হয়, সার্থক নতুন সৃষ্টি হয়েছে। আর যেহেতু সৃষ্টি করার লোভ লেখকের পক্ষে সামলানো দায়, তাই একটি আধুনিক আরবী কবিতা এখানে বাংলায় পেশ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। লিখেছেন মুহম্মদ আল-মাঘুত; ইংরেজীতে সরাসরি অনুবাদ করেছেন আবদুল্লা আল-উধারি। দ্বিতীয় দফায় আমি বাংলাতে তর্জমা করলাম :

॥ ডাক-পিওনের আশঙ্কা ॥
বন্দীরা, যে যেখানে আছো,
তোমাদের যা কিছু আছে সব আমাকে পাঠাও :
আতঙ্ক, আর্তনাদ, বিরক্তি।

সব সৈকতের জেলেরা,
তোমাদের যা কিছু আছে সব আমাকে পাঠাও :
শূন্য জাল আর সমুদ্রপীড়া।

সব দেশের চাষীরা,
তোমাদের যা কিছু আছে সব আমাকে পাঠাও :
ফুল, ন্যাকড়া,
কাটা স্তন,
ফাটা পেট,
উপড়ানো নখ,—
আমার ঠিকানায় পাঠাও, যে-কোনো কফির দোকানে;
দুনিয়ার যে-কোনো রাস্তায়।

মানুষের দুঃখ বিষয়ে
আমি একটা বিরাট দলিল তৈরি করছি,—
ঈশ্বরের কাছে পেশ করবো ;
ক্ষুধার্তদের ঠোঁট
আর অপেক্ষমাণদের চোখের পাতা দিয়ে
সই করিয়ে নেবো ; —
হায় দুনিয়ার সর্বহারার দল,
আমার আশঙ্কা হয়
ঈশ্বর নিরক্ষর হতে পারেন।

কীথ বসৃলি-সম্পাদিত প্রাচ্য কবিতার অনুবাদের সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে য়েহুদা আমিখাই নামে একজন ইজরায়েলী কবির একটি কবিতা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ কবি টেড হিউজের চোখে উক্ত কবি প্রাচ্য কবি নন। তাঁর মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে য়েহুদা আমিখাই পাশ্চাত্য দুনিয়ার কবি, আজকের ইজরায়েলের একজন বিশিষ্ট কবি। টেড হিউজের সহযোগিতায় আমিখাই তাঁর নিজের কবিতা হিব্রু থেকে ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন, এবং ভূমিকা লিখেছেন টেড হিউজ।[১]

১৯২৪ সালে জার্মানীতে য়েহুদা আমিখাই-এর জন্ম। ১৯৩৬ সালে পরিবারের সঙ্গে প্যালেস্টাইনে থাকতে আসেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইহুদীদের বিশিষ্ট ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতো একজন সাধারণ ইজরায়েলী নাগরিকের ব্যক্তিজীবনের নাট্য। তাঁর জাতির সম্পদ এক বিরাট আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার, সমস্যা বাঁচা-মরার, মুখের সামনেই প্রত্যক্ষ বাস্তব চ্যালেঞ্জ। এই বিচিত্র ভাগ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করার দায়িত্ব পড়েছে গড়পড়তা নাগরিকের ঘাড়ে : যে মানুষ লড়াইয়ে যায়, রোজগার করে, প্রেমেও পড়ে। টেড হিউজ বলছেন যে কবিতাগুলি মূলত কবিই অনুবাদ করেছেন, তিনি শুধু নামমাত্র সংশোধন করেছেন, এদিক ওদিক ব্যাকরণ-ইডিয়ম-শব্দবন্ধ ঠিকঠাক ক'রে দিয়েছেন। আমিখাই নিজে যখন ইংরেজীতে কথা বলেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর এবং বাচন-ছন্দ যেমনটি শোনায় সেই

১. Yehuda Amichai, *Amen,* translated from the Hebrew by the author and Ted Hughes, with an Introduction by Ted Hughes, Oxford University Press, Oxford and Melbourne, 1978.

ভাবটিই বজায় রাখতে চেয়েছেন হিউজ। অনুবাদগুলি নাকি অত্যন্ত আক্ষরিক, মূলানুগ, এবং কবির নিজস্ব ইংরেজী কবিতাই বলা চলে এগুলিকে।

আমিখাই-এর কবিতা নাকি হিব্রু ভাষার বিশেষীকৃত চারিত্র্যের উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা করে চিন্তার, চিত্রকল্পের নগ্ন স্বরূপের উপর। তাই তার রূপান্তর অপেক্ষাকৃত সহজ। চলতি বছরের বসন্তে আমিখাই অক্সফোর্ডে কবিতা-পাঠ করতে এবং নিজের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে এসেছিলেন। মূল কবিতা প'ড়ে শোনালেন, অনুবাদও নিজেই প'ড়ে শোনালেন। নিজে বেশ ভালো ইংরেজী জানেন তিনি। বোঝা গেলো যে তাঁর কবিতার এফেক্‌ট্ বিশেষ ধ্বনি-সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল নয়; তাই অনুবাদেও তার জোর বেশ বর্তমান। যেন তিনি কোনো সর্বজনীন ভাষায় লেখেন, যে-কোনো ভাষাতেই তাঁর বক্তব্যকে রূপ দেওয়া যায়। তবু মানতে হয় যে আধুনিক ইংরেজী কবিতার রিক্ত অস্থি-অন্বেষী শৈলীর সঙ্গে আমিখাই-এর উচ্চারণ চমৎকারভাবে খাপ খেয়ে যায়।

বিদেশী কবিতার রসাস্বাদনের এ এক বিরল সুযোগ: একজন বিশিষ্ট কবির নিজের অনুমোদিত, অপর একজন বিশিষ্ট কবির দ্বারা সংশোধিত অনুবাদগুচ্ছ: সংহত, ঋজু, মিতরেখ, অল্প কথায় অনেক কিছু বলার লক্ষ্যভেদী শিল্প। জাতির যন্ত্রণা এবং ব্যক্তির যন্ত্রণার নির্ভুল বয়ন।

Our baby was weaned in the first days
of the war. And I ran out to stare
at the terrible desert.

The war broke out in autumn at the empty border
between sweet grapes and oranges.

October sun warms our dead.
Sorrow is a heavy wooden board.
Tears are nails.

I give up, like a desert
which has given up all water.

The sun is circling round the earth. Yes.
The earth is flat, like a lost, floating board. Yes.
God is in Heaven. Yes.

Perhaps Jerusalem is a dead city
in which people
move and wriggle like worms.

বিভিন্ন কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম, এবং আশা করি স্পষ্ট করতে পারলাম যে উক্তিগুলি আধুনিক ইংরেজীতে লক্ষণীয়ভাবে শক্তিশালী হয়েছে। ইজরায়েলের ইতিহাস-ভূগোলের পরিপ্রেক্ষিত ব্যক্তির প্রেমকে যে বিশেষ মাত্রা দেয় তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

You are beautiful, like prophecies,
And sad, like those which come true,
Calm, with the calmness afterward.

In this burning country
Words have to be shade.

He goes out into the streets
To fight for the law
Of immunity for lovers.

To start love like this : with the shot of a gun
Like Ramadan.

Even my loves are measured by wars :

And love—those few nights
like rare stamps.

জীবন আর মৃত্যু সম্বন্ধে আমিখাই-এর সাক্ষ্য একাধারে ট্র্যাজিক এবং বিস্ময়কর-ভাবে শান্ত : তাঁর উক্তির পাত্রধৃত অনন্য সংযম অন্তত আমার মতো পাঠককে দুর্লভ চিত্তশুদ্ধির স্বাদ জোগায় :

Yet I wanted to be calm, like a mound with all its cities destroyed,
and tranquil, like a full cemetery.

To live is to build a ship and a harbor
at the same time. And to complete the harbor
long after the ship was drowned.

অথচ আমিখাই যখন অক্সফোর্ডের ব্রিটিশ কাউন্সিল কক্ষে কবিতা পড়তে এসেছিলেন তখন শহরময় 'আধুনিক ইজরায়েলের বিশিষ্ট কবির অক্সফোর্ডে পদার্পণ' ইত্যাদি পোস্টার পড়া সত্ত্বেও শ্রোতার সংখ্যা আঙুলে গোনা গেছিলো। চোদ্দপনেরো জনের বেশি শ্রোতা জমায়েত হননি। অবশ্য তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি চলছিলো, কলেজগুলি বন্ধ ছিলো; তা ছাড়া সে রাত্রে বৃষ্টিও পড়ছিলো। তবুও একজন প্রকৃত কবির এই অনাদরে মর্মাহত হয়ে আমিখাইকে যেচে ব'লে এসেছিলাম: 'আপনি কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিলে পড়তে এলে অন্তত একশো লোক হতো'। উনি হেসে বলেছিলেন: 'তাই নাকি? তাহলে তো আমাকে আপনাদের কলকাতায় পড়তে আসতে হয়।'

দু'জন অনুবাদক মিলে নতুন কবিতার সৃষ্টির আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করছি। ম্যাসিডনিয়া নামটি শুনলেই আমাদের মনে পড়বে আলেক্সান্দার দ্য গ্রেটের কথা: সুদূর অঞ্চলটির সঙ্গে ভারতের ঐ একটি অবিস্মরণীয় সংযোগ। ম্যাসিডনিয়ার মানুষ স্লাভনিক, ভাষাও স্লাভনিক গোষ্ঠীর। এখানে আলবেনীয়, রুমানীয় এবং তুর্কী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও রয়েছে। ম্যাসিডনীয় মানুষ নবম এবং দশম শতাব্দীতে প্রাচ্য খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে অঞ্চলটি অটোমান তুর্কীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং প্রচুর বিদ্রোহ সত্ত্বেও ম্যাসিডনিয়া বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত তুর্কী শাসনের অধীনস্থ থাকে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর ম্যাসিডনিয়া যুগোস্লাভ রাষ্ট্রামেলের অন্তর্গত স্বশাসিত রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

শুকনো এবং নগ্ন দেশ ম্যাসিডনিয়া: তার লোকগীতিকাতেও ছায়া পড়েছে এই কাঠিন্যের তথা দেশটির ট্র্যাজিক ইতিহাসের। এই লোকগীতিকার ঐতিহ্য নাকি ম'রে যায়নি, এখনও রীতিমত জীবিত আছে। সেই ঐতিহ্যের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি হিসেবে কতগুলি গান ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন অ্যান পেনিংটন এবং অ্যানড্রু হার্ভে।[১] অ্যান পেনিংটন অক্সফোর্ডে স্লাভনিক ভাষায় বিশেষজ্ঞ

১. *Songs from Mecedonia,* translated by Andrew Harvey and Anne Pennington, Mid-Day Publications, Oxford, 1978.

বিলয়ানা
কাপড় কাচে
অথ্ রিদ্-এর ঝর্ণাধারায়।
বেলগ্রাদের স্বরাবণিকরা
পথে যায়।
'সামলে চালান!
আমার কাপড় মাড়াবেন না—
বিয়েতে দেওয়া হবে এসব কাপড়!'
'বিলয়ানা,
যদি কাপড় মাড়াই
তো মদে দাম দিই।'
'রাখুন আপনাদের মদ!
ঐ ছোঁড়াটাকে চাই,
ঐ যেজন সামনে ব'সে
চোখের উপর টুপি টেনে
আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে।'

এবারে বিবাহোৎসব : কনের সখীদের সঙ্গে বরের সংলাপ :

'স্বাগত!
তুমি কেন এসেছো?
আমাদের সঙ্গে মাল টানতে?'

'তোমাদের বান্ধবীটিকে নিয়ে যেতে।'

'সে তো বনে পালিয়ে গেছে,
তিতির হয়ে গেছে।'

'আমি দুটো ধূসর বাজপাখি সঙ্গে এনেছি,
তারা তাকে ধ'রে আনবে!'

বিবাহিত নারীর জীবনের একটি চিত্র দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করছি :

'তুমি তখন যেমন ছিলে এখন কেন তেমন না?

সেই প্রথম গ্রীষ্মের বিকশিত ফুল…
প্রথম শীতের রক্তগোলাপ…'
'কী ক'রে তা হয় ?

শাশুড়ী চান আমি ঘর ঝাঁট দিই,
শ্বশুর চান উত্তম খানা,
ননদ বলে তার চুল বেঁধে দিতে,
স্বামী চায় সুখের বিছানা,
কোলের বাচ্চা মাই-দুধ চায়—'

'তোমায় বাঁদী কিনে দেবো—'

'যৌবন কী দিয়ে কিনে দেবে ?'

কবিরুলের কবিতা

কথা ছিলো, কবিরুল ইসলামের কবিতার ছোট সংকলনগ্রন্থ 'বিবাহ বার্ষিকী ২০'-র একটি রিভিউ লিখতে হবে। তাঁর প্রথম দু'টি কবিতার বই, 'কুশল সংলাপ' (১৯৬৭) এবং 'তুমি রোদ্দুরের দিকে' (১৯৭১) বাজারে আর পাওয়া যায় না। সে বই দুটি থেকে কিছু কবিতা আর নতুন কিছু কবিতা নিয়ে কবির বিংশতিতম বিবাহবার্ষিকী স্মরণে কবিপত্নীকে উৎসর্গীকৃত বইটি ১৯৭৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু প্রবন্ধ প্রস্তুত করার আগেই বেরিয়ে গেছে কবিরুলের সাম্প্রতিক কবিতার বই 'বিকল্প বাতাস' (১৯৭৮), যাতে 'বিবাহ বার্ষিকী'-র কিছু নতুন কবিতাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতএব শুধু একটি বইয়ের আলোচনা না ক'রে কবিরুলের কবিতার সামগ্রিক রূপ বিষয়ে কিছু চিন্তা নথিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি।

সমকালীন কবিদের মধ্যে কাউকে কাউকে যদি 'জাত-বাউল' হিসেবে চিহ্নিত করতে হয় তবে কবিরুল নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। সিউড়িনিবাসী এই কবির কবিতার সর্বাঙ্গে শুধু যে বীরভূমের জলমাটি আর আলোবাতাস লেগে আছে তাই নয়, লেগে আছে প্রকৃত মরমী অন্বেষণের স্বাদ। তিনি একজন বাঙালী ভাবুক এবং সাধক। তাঁর কবিতায় ঐতিহ্য তো আছেই, তা ছাড়াও আছে কবির স্বতন্ত্র সত্তা তথা আধুনিক মর্জি, পরিমিত অথচ পর্যাপ্ত আঁচড়ে বিশ শতকী মাত্রা (যেমন পাওয়া যায় বাউল স্টাইলের আধুনিক রচনাতেও—মফস্বলের বাসে ছোট ছেলেরা যেগুলি গেয়ে দু'পয়সা রোজগার করে), আছে সহজাত লিরিক টান, ছন্দের অব্যর্থ কান, মনের ছুঁচের ছোট্ট ছ্যাঁদার মধ্যে কথার সরু সুতোকে ভরিয়ে দিতে পারার একটা সুকুমার নিপুণতা, যা প্রায়ই লোকগীতিকার মতো সহজিয়া, আবার প্রায়ই নির্ভুলভাবে আধুনিক।

'কুশল সংলাপ'-এই আত্মপ্রকাশ করে কবিরুলের মিষ্টিক মানসতা আর কথার স্মরণীয়তা। তাঁর সত্তার ডালপালার উর্ধ্বগামী অভীপ্সা যেমন অকপট, তেমনই মাটিতে দৃঢ়প্রোথিত তাঁর মানুষী বুদ্ধির শিকড়। একদিকে খুঁজে বেড়ান মনের মানুষকে, অন্যদিকে উজাড় ক'রে নিবেদন করেন এই পৃথিবীর প্রতি তাঁর সহজাত ভালোবাসা। গোড়া থেকেই তাঁর অন্বেষণে রয়েছে দ্বন্দ্বের মাত্রা এবং দ্বন্দ্বকে মেনে নিতে পারার মতো অভিজ্ঞ বিনয়।

প্রায়শই পৃথিবীকে পরস্ত্রীর মতো মনে হয়
যে আমাকে কাছে টানে দুরন্ত ঘূর্ণীতে
উৎসের উজানে
যে আমার ভালোবাসা
জন্ম-জন্ম
অথচ যে স্বামী-গরবিনী !

তিনি জানেন যে 'এই প্রেমে শান্তি নেই'। তবু তাঁর প্রার্থনা যে এই প্রেমেই যেন তিনি ভ'রে থাকেন, 'জ্যোৎস্নার প্রান্তর হ'য়ে' দুই চোখে যেন জেলে রাখতে পারেন সেই 'অপ্রাপণীয়ার মুখ', যাকে তিনি জন্মে জন্মে ভালোবাসেন, 'অথচ যে স্বামী-গরবিনী'। মধ্যে মধ্যে তাঁর বেদনা শাশ্বত মরমী ইমেজে ঝিলিক দিয়ে ওঠে :

আমি ভয়ে ভয়ে আছি কি জানি কখন
তুমি এসে পড়তে পারো আলোর বাহিরে

অথচ আশ্চর্য আমি এই অন্ধকারে
যার সঙ্গে ঘর করি তার মুখ কখনও দেখিনি !

প্রায়শ স্বপ্নের মধ্যে তোমাকে দেখেছি
অথচ আশ্চর্য আমি তোমাকে চিনি না !
অনেক ঘুরেছি তবু লোকারণ্যে তার
মুখের আদল-টুকু ধরতে পারি না।
অথচ তোমারই জন্য সকলি প্রস্তুত :
অভ্যর্থনা তথা আয়োজনও।

তবু কবিরুলের সাধনা ঠিক পুরনো স্টাইলের ভগবান-পাগলদের মতো নয়। তাঁর কবিতার স্বাদ মীরার ভজনের ভক্তিরসের মতো নয়, আরও জটিল, আরও বিচিত্র। কখনও তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি 'নাবিকী প্রত্যয়ে শুদ্ধ' হয়ে 'তটের সমীপে' পৌঁছে গেছেন, আবার কখনও প্রত্যয়ের জন্য গভীর তাঁর আর্তি, খুঁজে বেড়ান 'প্রত্যয়ের রোপিত শিকড়'-কে। 'হৃদয়ের স্বল্প আয়োজনে' তাঁর তৃপ্তি নেই ; সে অবগাহনে তিনি কখনও মগ্ন বা মত্ত হতে পারবেন না, জানান তিনি। তাঁর দুরাশা :

রাত্রির কুয়াশা ছিঁড়ে তারাদের ঘরের খবর
জেনে নিলে কিংবা জেলে দিলে
তর্কের অতীত কিছু পাওয়া যায় যদি পাওয়া যায়।

আসলে সামান্যীকৃত উক্তিতে তাঁর লিরিকগুলির প্রতি সুবিচার করা যায় না, কারণ তাঁর ভাবনারা চঞ্চল, একেকটি কবিতায় একেকটি মেজাজ বিধৃত হয়েছে। তাঁর মানসতার বৈশিষ্ট্য একটা permanent restlessness বা সদা-অস্থিরতা। একেক সময়ে মনে হবে যে তিনি স্থিতিকে খুঁজছেন, অথচ স্থিতি তাঁর আসল লক্ষ্য নয়। তিনি জানেন যে বিশ্বে স্থিতি নেই, গতি আছে। এবং এখানে তিনি যথেষ্ট আধুনিক। তাঁর আছে 'নিত্যই নতুন' হওয়ার তাগিদ। তাই তাঁর তারে প্রত্যয়ে পৌঁছনোর জন্য আকুলতা কখনও কখনও বেজে উঠলেও, এ ইঙ্গিতও ধ্বনিত হয় যে পূর্ণ প্রত্যয়ে স্থিতিলাভ করা শুধু দুরূহ নয়, হয়তো-বা অসম্ভব। ঠিক, 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ সূর্যসন্নিধানে যেতে চায়', কিন্তু সূর্য তো কোনো স্থিতিশীল সামগ্রী নয়, বরং গতিশীল, দুরন্ত, অগ্নিগর্ভ। মহাবিশ্বকে ছাড়িয়ে দূরস্থ কোনো বিন্দুতে পৌঁছতে চাইছেন না কবিরুল, মানে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বাঁচন-মরণের এই জীবনটার মধ্যেই, চাইছেন তাতে মূল্য আরোপ করতে, যাতে তাঁর দিনরাত্রি তাৎপর্য পায়, পরিপার্শ্বের সাথে নিজেকে মেলানো যায়। জীবনবৈমুখ্যে নয়, জীবন-প্রেমের মৃৎকুম্ভেই তাঁর কাব্যরসের গাঁজন।

দিনরাত্রি পূর্ণ করা এত কি কঠিন?

আমি যেন গান হই, গান হই যেন।

এ এমন একটা সুরসঙ্গতির সাধনা যা সংকীর্ণ অর্থে ধর্মীয় বা 'থিওলজিকাল' নয়, বরং বৃহত্তর অর্থে দার্শনিক, অস্তিত্ববিষয়ী, 'এগজিস্টেন্‌শ্যাল'। তাই 'উন্নিদ্র বিষাদ' তাঁর সহোদর, তাঁর 'আবাল্য বন্ধু', এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঘর বাঁধতে হয় ভালোবাসায়:

আলো খুব ভালোবাসি। বস্তুত রক্তের
স্বধর্মই ভালোবাসা: স্বরাজ্যে সম্রাট।

বস্তুত একটিই বস্তু কবিতার জন্ম দিতে পারে:
ভালোবাসা, হে আমার বিকল্প ঈশ্বর।

তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয় যে তাঁর মরমী তাগিদ আর সৃষ্টির তপস্যা এ দুটো বস্তুত অভিন্ন,

তাদের আলাদা করা অসম্ভব। তাঁর সত্তা, তাঁর সৃষ্টিশীলতা, ঈশ্বর, প্রকৃতি, দয়িতা, 'মায়ের প্রসন্ন মুখ…চোখের শুশ্রূষা আর বুকের সুস্থতা', 'ভায়ের মুখের মতো সুস্থ সূর্যোদয়' : সকলেরই সম্মিলনে, সেই বিস্ফোরণে তিনি গান হয়ে বেজে উঠতে চান। যখন পারেন তখন খুশী, যখন পারেন না তখন রাত্রিদিন ব্যর্থ মনে হয়, বেদনার মতো বাজে। এ ব্যাপারে তাঁর মেজাজ পুরো মাত্রায় রোম্যান্টিক, এবং তাঁর স্বপ্নের ইউটোপিয়াও সেই ছাঁচে ঢালা :

এক হাজার বছর পরে যদি স্বর্ণযুগ আসে
আমি সেই স্বর্ণযুগে যেন ফিরে আসি—
এই বাংলাদেশে, এই সূর্যের সংসারে
স্ববাসে প্রবাসী কেউ যখন থাকবে না।

ভালোবাসার সুস্থতার প্রতি যে কমিটমেণ্ট 'কুশল সংলাপ'-এ বারংবার উচ্চারিত, তুমি রোদ্দুরের দিকে' বইটিতে তা গাঢ়তর মাত্রা পায়। রবীন্দ্রভক্ত এই কবি, যিনি লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথ আমার ভাষা / আমার কাঁদা হাসা', মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে প্রতিবেদন রাখতে পারেন :

ভালোবাসতাম ভালোবাসি

নিরবধি কাল এই বাঁশি
আমাদের স্তবে মনস্তাপে॥

অথবা

কিন্তু কিছু কিছু পাকা রঙ তো থাকে শতবার ধুলেও যা ধুয়ে যায় না
বরং আরো খোলে :
বৃষ্টির পরে আকাশ যে রকম
স্নানের পরে মানুষ যে রকম

তবু এই পর্যায়ে কবির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধুয়া হলো 'একদা পারতাম কিন্তু এখন পারি না'।

আমি এই খোলস বিদীর্ণ করে বেরোতে পারতাম
....
একদা পারতাম কিন্তু এখন পারি না

প্রত্যয়ে, প্রেমে, সৃজনীশক্তিতে বর্ধমান অক্ষমতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত কবি অন্বেষণ করেন 'সেই হিরণ্য আঁধার'-এর

যে আঁধারে বীজ ঝরে, মন্ত্রোচ্চারণে
খুলে যায় জন্মের জানালা
দুর স্বর্গে নিকট শিকড়ে ॥

যৌবনের রোম্যান্টিক বেদনা পেরিয়ে তিনি পৌঁছন গতিশীল বয়সের বিষাদে :

আমার যৌবন যাচ্ছে ত্বরা।

যে দিকে তাকান বন্ধ দ্বার
কে বলে পৃথিবী পান্থশালা ?

এখন মানুষে মানুষে বর্ধমান ব্যবধান, যে দূরত্ব সহজেই আধ্যাত্মিক অশান্তির মাত্রা লাভ করে :

তুমি বড্ড দূরে চলে যাচ্ছো ইদানীং
সারা দিনমান তুমি ব্যস্ততার বর্ম পরে থাকো

অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে।···
....
এই অন্ধকারে কেউ কাউকে চেনে না!

যতই বয়স বাড়ে এঘরে ওঘরে
দুস্তর আড়াল :
ঘরের ভিতরে ঘর একা পরস্পরে
সকাল বিকাল।

যদিও 'সকাল ছিলো কোরাসের' এবং দুপুর দ্বৈত প্রেমের, তবু এখন 'প্রত্যেক সূর্যাস্তে' কবি একা। এখন কবির 'আপতিক, প্রতিকারহীন' অসুখ, যা 'জলে স্থলে' ব্যাপ্ত ; পশ্চিমবঙ্গে খরা, পূর্ববঙ্গ জুড়ে 'তুলকালাম কাণ্ড'। যে পরিপার্শ্বে 'মানুষের তৈরি অন্ধকারে ভাসছে মানুষের শব', সেখানে স্বভাবতই সুখ-দুঃখ, প্রেম-ঘৃণা, বা বিরহ 'কিছুই আর ইদানীং দ্বন্দ্বাতীত নয়—কখনও ছিলো কি ?' অথচ তেমন সংশয়বাদে হৃদয়ের তৃপ্তি নেই :

তবু এরকম দ্বন্দ্ব আমি কিন্তু পছন্দ করি না।
ব্যস্ততার বর্ম ছিঁড়ে ভান ছেড়ে তোমার সহজ হওয়া চাই
বীজের খোলস ছিঁড়ে রোদ্দুরের দিকে যাওয়া চাই।

এর জন্য দরকার নিজেকে নতুন ক'রে বানানোর :

তুমি আরও একটু খুলে যাও
আরও একটু ছেড়ে দাও সুতো—
....
তুমি আরও একটু গলা ছেড়ে খুলে গাও
....
তুমি ফিরে নিজেকে বানাও ॥

দরকার ভালোবাসার অন্বেষণকে সক্রিয়, অব্যাহত রাখার :

এক বুক ভালোবাসা নিয়ে কোথা যাচ্ছো একা একা
এই সাত সকালে
আমাদের এ পাড়া আসবে না ?

চাই তেমন বন্ধু যাকে দেখানো যায় নিজের 'প্রসাধনহীন মুখ', তেমন প্রেম যাতে আছে 'মন্দাক্রান্তা অবসর'-এর অবকাশ, তেমন আস্থা যাকে খাপ খাওয়ানো যায় প্রকৃতির সহজ নিয়মের সঙ্গে :

যে বিশ্বাসে গাছ বাড়ে, ফুল ফোটে গাছে
পাখি গান গায়
যে বিশ্বাসে হৃদয় হারাতে চায় হৃদয়েরই কাছে
আমি সে নিঃশ্বাসে বিদ্ধ প্রতিদিন প্রতিদণ্ড বাঁচি
সমস্ত রাত্রির শেষে সূর্য স্থির আছে
আমি সেই লক্ষ্যে চলে যাই

তোমাকেই ভালোবেসে ঘরে ফিরে যাই ॥

কবিরুলের সর্বশেষ বই 'বিকল্প বাতাস'-এ অস্তিত্বের ঘনীভূত বিষাদ আনন্দের অভীপ্সার সঙ্গে গ্রথিত হয়ে করুণ রঙিন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রজ্ঞা, বিলাপ

এবং সংগীতের তৃপ্তিদায়ক সমন্বয় ঘটেছে এই পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছে। গানের মতো বেজে ওঠে কতগুলো প্রশ্ন, যেগুলোর উত্তর নেই, যেগুলো তোলাই কবিকৃত্য :

আমার নিজের বলে কিছু নেই
কখনও ছিল কি ?
....
বলো, কার থাকে ?

আর কেন মিথ্যা, প্রভু ?
....
আর কেন মুখোশ, প্রভু ?

এই বাঁচা কি দরকারি খুব ?
....
এই মরা কি খুব জরুরী
এই বাঁচা কি হাই-এর তুড়ির শামিল
নাকি ধাপ্পা, জলজ জোচ্চুরি ?

পৃথিবী কি কোনোদিন বাসযোগ্য ছিলো ?

সর্বশেষ প্রশ্নটি তুলে কবিরুল যে উত্তর দিতে চেয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

হয়তো বা ছিলো
হয়তো ছিলো না
হয়তো বা হবে—
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ
অনেক অনেক মাইলস্টোন সটান পেরিয়ে
তবু

এখনও অনেক দুর্গ জেতা বাকি আছে ॥

এটাই এখন তাঁর পক্ষে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত, এবং এখান থেকে আমরা সোজা পৌঁছতে পারি একটি ঔৎসুক্যকর অনুপুঙ্খে। বর্তমান প্রবন্ধের খসড়া লিখতে থাকাকালীন হঠাৎ যে আবিষ্কার আমাকে উত্তেজিত ক'রে তোলে তা 'বিকল্প বাতাস'-এ এমন ধরনের বাক্যবন্ধের প্রাচুর্য যেগুলি ব্যাকরণগত বিচারে নঞর্থক,

অর্থাৎ 'না', 'নয়' বা 'নেই' দিয়ে উক্তির ছড়াছড়ি। আগে যে অভ্যাসটা ছিলো বাড়ন্ত চারার মতো বা গানের টানের মতো—হয়তো বাউল বা শাক্ত গানের ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার, যেখানে প্রায়ই ধ্বনিত হয় 'চিনলি না', 'দেখলি না', 'বুঝলি না' প্রভৃতি—সাম্প্রতিকতম বইটিতে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি মর্মরিত বৃক্ষ বা অনুরণিত অর্কেস্ট্রা। একবার মনে হয়েছিলো যে ব্যাপারটাকে পরিসংখ্যানের অধীন করতে পারলে বেশ হতো, কিন্তু এটা শুধু পরিমাণের প্রশ্ন নয়; যেটা ঔৎসুক্যকর তা এই: কেন, কীভাবে কবি এই নঞর্থক উক্তিগুলিকে ব্যবহার করছেন, তাদের তাৎপর্য কি? একটু খুঁটিয়ে দেখলেই ধরা পড়ে যে এই উক্তিগুলি দ্বারা বিচিত্র উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে।

কখনও ধ্বনিত হয়ে উঠছে হারানো বাল্যকালের জন্য বিলাপ:

কতকাল পুকুরে নামি না
অর্থাৎ সেই বালক বয়স আর নেই।
....
কিন্তু সেই অতল জলের আহ্বান আর নেই
নেই চোখে জল-বেরনো ছাঁচি সরষের তেল
মায়ের চুলের গন্ধে আতুর গামছাও নেই।

কখনও বিলাপ স্পষ্টত গতিশীল যৌবন এবং প্রেমের জন্য:

ফুরোলে পঁয়ত্রিশ
বয়স বাঘের মতো তেড়ে আসে
শুধু দূর্বাঘাসে আর
অসুখ সারে না।

মোড়ে মোড়ে ওড়ে শিস
ঠোঁটে ঠোঁটে হয়ে যায় রীলে
একটি মাত্র তিলে আর

সাম্রাজ্য কাড়ে না।

লক্ষণীয়, যে উপরের উদাহরণটি একটি গোটা কবিতা, ফলত কবির দ্বিরুক্ত 'না' গানের ধুয়ার মতো কাজ করছে এবং অর্থ ও ধ্বনির একটি সূক্ষ্ম, সুচিন্তিত বয়নেরই অন্তর্গত, যার অন্তর্গত 'ড়' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি বা 'রীলে' আর 'তিলে'-র প্রচ্ছন্ন

মিল। তুলনীয় আরেকটি গোটা কবিতায় 'নঞ্‌'-এর ব্যবহার, যেখানে বিলাপ আরও গভীর, আরও মৌলিক :

অনেক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি রয়ে গেলো
অবশ্য রক্তের কোনো পক্ষপাত নয়
নয় কোনো অন্যমনস্কতা
শুধু কথা কয়ে কথার ভিতরে কথা
বোঝানো গেলো না
শুধু ভিতরে-ভিতরে সেই দুয়ার খোলে না
শব্দে না মন্ত্রে না ॥

কখনও 'নঞ্‌'-এর প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্নতাবোধ :

তোমার সন্তানে আর সফল সংসারে
তোমাকে স্বয়ংপূর্ণ দেখে হিংসা হয়
এই যে দেয়াল তুমি গেঁথে তোলো
দিনে দিনে
যেখানে আমার কোনো প্রবেশাধিকার নেই
মাত্র আমি দূরের দর্শক।

কখনও তা মানুষ সম্বন্ধে আশাভঙ্গ :

যতদিন যাচ্ছে ঠেকে শিখি
এ পৃথিবী পান্থশালা নয়
বিশেষত, দুঃখে দুঃসময়ে
কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে না!

কখনও তার একটা সামাজিক বক্তব্য আছে :

কে আমার কতটুকু খবরের কাগজ তা কখনও লেখে না
বেরোয় না সচিত্র সংবাদ
....
যেহেতু আমার নিজস্ব কোনো সংবাদদাতা নেই ॥

বেশ লাগে, যখন প্রতিবাদী কবিদের মতো রেগে ওঠেন সব রকমের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে :

আমার বাড়িতে কোনো পর্দাটর্দা নেই
দরজা জানালাগুলি
সব সময় জন্মদিনের পোশাক পরানো
অর্থাৎ পোশাক মানে
ছদ্মবেশের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ

প্রতিতুলনায় নিচের কবিতাটির 'নঞ্'-গুলি অনেক নরম সুরে, একটি মরমী মনস্তাপের নকৃশার অন্তর্গত :

অনেক অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি রয়ে গেলো
যার কাছে ঋণী আমি সবচেয়ে বেশি
তারই সঙ্গে দূরত্ব ঘুচলো না—
যেন পদতলে ভূমি আমি তার মর্যাদা বুঝিনি
যে ধূলিতে আমার পরম বসবাস
আমি সেই ধূলিমুঠি সর্বাঙ্গে মাখিনি ।

অবশ্য তোমার প্রস্তুতির অভাব ছিলো না
ছিলো না অমনোযোগ
অসময় সময় ছিলো না
আমি শুধু ফলাফলে তাচ্ছিল্য করেছি

আমার এর চেয়ে বেশি জানাও ছিলো না ॥

প্রথম মরমী গানের রেশ, তার পর আধুনিকতার মোচড় ; 'নঞ্'-এর যুগপৎ সাংগীতিক এবং দার্শনিক ব্যবহার । কখনও কবির 'নঞ্' নিরালম্ব অস্তিত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করার জোরালো হাতিয়ার, তাঁর নির্ভীকতার অভিজ্ঞান :

আমার তো কেউ নেই । পাখিদের নীড় আছে, নীলাকাশ আছে
এমন কি ঘুড়িরও লাটাই থাকে বালকের হাতে
কারও কারও স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর আছেন

ক্বচিৎ কখনও কারও মৃগনাভি নারী
অর্থাৎ কোথাও কোনো শিকড়-বাকড় নেই, পদচিহ্ন নেই

কখনও যেসব জিনিস আপাতদৃষ্টিতে আত্মরক্ষার অস্ত্র তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রকৃত সৎসাহসের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছেন :

বর্মে তরোয়ালে ঢালে নয়
শাস্ত্রে শস্ত্রে নয়
আমি শুধু হাতে যুদ্ধে যাবো।

কখনও 'না'-র ব্যবহার স্মরণীয়ভাবে আলংকারিক : 'না' ব'লে 'হ্যাঁ'-কে জোর দেন, দুটোকে দু' রঙের পশমের মতো বুনে ফেলেন, নিষেধের সাহায্যে সদর্থক বিবক্ষাকে নিরাবরণ করেন :

যখন সে আসে, আসে :
কোনো আবাহন নেই, গাড়িজুড়ি নেই
অদূর দুয়ারে কেউ প্রস্তুতও থাকে না
বাজে না রাত তিনটের এলার্ম—
কিংবা নোটিশ নেই এক মিনিটেরও।
....
যখন সে আসে, না এসে পারে না ॥

কিংবা

কেউ কারো নয় তবু দায় থাকে, দায়িত্বও থাকে
মানুষের জন্যে তবু শেষ পর্যন্ত অমানুষী টান
থেকে যায়। আর কিছু নয়।...

বস্তুত, নেতির বিস্ফোরণ থেকে এমন সৃষ্টিশীল শক্তিসঞ্চয় আমাদের চমৎকৃত না ক'রে পারে না। এ শুধু নিরর্থক কথার এক্‌স্‌পেরিমেন্ট নয়, এমন এক পরিণত কবির উচ্চারণ যাঁর অস্থির অন্বেষণ অনেকখানিই সফল হয়েছে। অন্বেষণটি মৌলিক ও জরুরী, বিকল্প বাতাসের অন্বেষণ, অর্থাৎ চিরাচরিত বিশ্বাসগুলির উপর যখন আর নির্ভর করা যাচ্ছে না তখন বাঁচবার বিকল্প উপায়—**alternative means of survival**—খুঁজে বার করার চেষ্টা, যে প্রচেষ্টা একটি সিরিয়াস শিল্পী-মানসেরই পরিচায়ক।

এ পর্যন্ত যেসব উদ্ধৃতি দিয়েছি তা থেকে এটুকু আশা করি স্পষ্ট হয় যে কবিরুল অল্প কথায় অনেক কিছু ব'লে ফেলতে পারেন। একদিক দিয়ে তাঁর কবিতা রেখাচিত্রের মতো, অল্প কয়েকটি আঁচড়ে অনেক কিছুর আভাস। অন্য-দিকে তাঁর কবিতায় নির্ভুল চেনা যায় গানের সুরেলা টান আর ইঙ্গিতময়তা। বোঝা যায় যে এককেটা লাইন তাঁকে গানের লাইনের মতো পেয়ে বসে, কিন্তু তিনি কথা দ্বারা আক্রান্ত হয়েই ক্ষান্ত নন, তাকে খাটিয়ে নিতে জানেন। ফলে তাঁর শৈলী সহজিয়া অথচ পরিশীলিত, দ্যোতনায় ঋদ্ধ অথচ মিতবাক্। এজন্য ছোট কবিতা তাঁর হাতে সত্যিই খোলে। আগে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি ; আরও দুটি দিই :

আমার ঘরের মধ্যে যেটুকু উঠান
উঠানের মধ্যে যে বাগান
তুমি তাব সবটুক্ জুড়ে
রোদ্দুরে রোদ্দুরে

তোমারই সমান ॥

('বাগান')

নূতন বাড়ির আলো বাতাস
আকাশ
বড লাগে

নূতন বাড়ির দিনরজনী
সজনী
ছোটো লাগে ॥

('সজনী ছোটো লাগে')

একই স্বধর্মে কবিতাকে সহজ অথচ লক্ষ্যভেদী চূড়ান্ত বক্তব্যে পৌঁছে দিতে পারার ক্ষমতাতেও তিনি ঈর্ষণীয়। কবিতার গঠন সম্বন্ধে ইনি রীতিমত অবহিত এবং এঁর কবিতার আঙ্গিক ক্রমশ দৃঢ়তর হয়ে চলেছে। নিম্নোদ্ধৃত লাইনগুলি বিভিন্ন কবিতার শেষ লাইন বা শেষ দু' লাইন :

এখন না এলে এসো অবকাশ-মতো
সব সময় আমার সময় ॥

আমার মায়াবী আঙটি প্রাচীন পুকুরে ভেসে গেছে ॥

এবং সেই সব নারী গোল হয়ে বসে ব্যস্ত ঢাকেন তাঁদের রাতুল গোড়ালি ॥

তুমিই অসুখ, তুমি বিশল্যকরণী ॥

একটু জল একটু ছায়ার বড় প্রয়োজন ছিল হে ॥

মাঝরাতেও ওভারটেকিং নেই, গন্তব্য রয়েছে ॥

এ জন্মের শেষ বাসও ঐ ছেড়ে গেলো ॥

আমাকে চমৎকৃত করে 'প্রবেশ প্রস্থান' কবিতাটির শেষ চার লাইন :

আর কোনো ঘর নেই। মানুষের ঘরবাড়ি
একবারই নারী হয়
যে গৃহে প্রবেশমাত্র
প্রস্থানের বাজনা বেজে ওঠে ॥

এখানে অনেক কিছুর ইঙ্গিত পাচ্ছি : জীবন-মৃত্যু, প্রেমের বা সংরাগের ভঙ্গুরতা, অস্তিত্বের নিত্য দ্ব্যর্থাভাস ; কিন্তু মজা এই যে চার ভাগে বিভক্ত শেষ বাক্যটি একটি প্রকৃত 'পাঞ্চ্ লাইন', যার মধ্যে আছে একটি চাবির মোচড়। মানুষের ঘরবাড়ি একবারই নারী হয়—মাতৃজঠরে থাকার সময়টুকু—যে বাড়িতে একবার ঢুকলে বেরোতেই হবে, যে ক'রে হোক, যেখানে ঢোকামাত্র অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মে শুরু হয়ে যায় নিষ্ক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব। উক্তির এই যাথার্থ্য আমাকে মুগ্ধ করে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশেষ প্রিয় কবিরুলের কবিতায় মফস্বল বাংলার ছবিগুলি : 'কখনও খরা', 'সিউড়ি পেরিয়ে', 'শীত ১৯৭৬-৭৭' ইত্যাদি। কখনও তাঁর ভাষা চকিতে মনে করায় বিষ্ণু দে-কে :

খোলস বিদীর্ণ করে হাওয়ায় রোদ্দুরে
হেঁটে চলো :
মশানজোড় বক্রেশ্বরে চলে যাও
জয়দেব নান্নুরে
শান্তিনিকেতনে চলো—

চলো চলো জলে স্থলে বাঁশি বাজছে শোনো।

সূর্য, রোদ, মেঘ, জল, বৃষ্টি, হাওয়া, ছায়া, গাছের পাতা, শিকড়: গ্রামবাংলার এই প্রাকৃতিক পরিবেশই কবিরুলের অধিকাংশ চিত্রকল্পের উৎস। এই পরিচিত দৃশ্যপটকে প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার ক'রে তিনি মধ্যে মধ্যে ডাক্তারী ইনজেকশনের মতো অনুপ্রবিষ্ট করান আধুনিক জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ: খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা, চিকিৎসার অ্যান্টিবায়টিক আর থার্মোমিটার, বাথরুমের ট্যাপ আর শাওয়ার, শ্যাম্পু, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, বর্জাইস ছাপা, মিনিবাস, ক্যাপস্টান সিগারেট, লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ইত্যাদি। পরিমিত পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এই উল্লেখগুলি অধিকতর সফল হয়, ধাক্কা দেয়। কবিরুলের চিত্রকল্প-প্রয়োগের কয়েকটি খুঁটিনাটি বিশেষ উল্লেখ দাবি করে। তাঁর কবিতায় সূর্য বা রোদ সর্বদাই সদর্থক, অস্তিত্ববাচক, এবং বীজের খোলস ছিঁড়ে আলোর দিকে যাওয়া তাঁর একটি প্রিয় ইমেজ; কিন্তু অন্ধকার কখনও নঞর্থক,— অজ্ঞতা, অবিশ্বাস, ক্লেশ, মানুষের অপরাধ ইত্যাদির অনুষঙ্গে,—আবার কখনও সৃষ্টির হিরণ্যগর্ভ ঈপ্সিত অন্ধকার। শিকড়-বাকড় কখনও প্রত্যয়ের প্রতীক, কখনও ওষুধের; যখন ওষুধের প্রতীক শিকড়-বাকড় তখন দূর্বাঘাস বা বিশল্যকরণীর সমগোত্রীয়। অসুখ আর চিকিৎসার চিত্রকল্প বিষয়ে কবিরুলের হয়তো ঈষৎ অব্‌সেশন আছে, কিন্তু অব্‌সেশন-মুক্ত কাব হয় না। কবিরুল তাঁর অব্‌সেশনকে কবিতায় খাটাতে জানেন।

আমার অসুখ জ্বলে অহোরাত্র বিদ্যুৎবাহিনী
আমার অসুখ ঝলে বজ্রে ঝড়ে
বৃষ্টিগর্ভ মেঘে
মেঘে মেঘে বিদ্যুৎবাহিনী

যে রকম অ্যান্টিবায়টিক জ্বরের কান মুলে
তাকে দ্রুত নিচে টেনে আনে বশংবদ থার্মোমিটারে

উপমা-রূপকের প্রয়োগে আমাদের সহজাত বাঙালী প্রবণতা যেহেতু প্রায়ই উচ্ছলভাবে ইন্দ্রিয়ানুগ, তাই এ ব্যাপারে কবিরুলের সংযত এক্‌সপেরিমেণ্টগুলি আমাকে বিশেষ তৃপ্তি দেয়:

…শালবীথির মতো টানা বারান্দা

…আধময়লা ঢিলে পাজামার মতো
বিবর্ণ অভ্যাসমালা

কমা দাঁড়ি বিস্ময় জিজ্ঞাসা সব কিছু
সুচেনা নড়বড়ে এক সিঁড়ির সামিল
রোজ উঠি নামি।

দেশশুদ্ধ প্রস্তুতির তাঁতের আওয়াজে
ভিত টলোমলো

……সঙ্গিনীর হাত
বাতিঘরে আলোর বিষাদ :

অবিশ্বাসী হাওয়া রটে,
পাতার আঙুল
গ'লে ঝরে পড়ে জল,
পাতা নড়ে—

একটি অলেখা কবিতার মধ্যে একটি বিশাল বছর
এক লাফে মাছের মতো হয়ে উঠতে চাইছে

তেমন ভালো এখন আর কিছুই না
অসুখের পর প্রথম দিনের পথ্যে তেতো খেতে যে রকম ভালো
একদা যেমন ভালো ছিলো
তোমার মূল চিঠির চাইতেও পুনশ্চেব সেই সব অমূল ডালপালা

আধুনিক ইংরেজ কবি ফিলিপ্ লারকিন্ সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে তাঁর কবিতায় ইংরেজত্বের একটা বিশুদ্ধ নির্যাস মেলে : একটা বিশিষ্ট ইংরেজ দৃষ্টিভঙ্গি ও বাচনভঙ্গি। তেমনই বলা চলে যে ছন্দের টানে, চিত্রকল্পের ছাঁদে, ধ্বনি আর অর্থের বিনুনিতে,—সব মিলিয়ে কবিকুল মধ্যে মধ্যে পৌঁছে যান এমন একটা মিতব্যয়ী শীতল সৌকুমার্যে, যা বাংলাভাষার স্বভাবের নির্যাস, বাংলাভাষী

মানুষদের নিজস্ব একটা দেখা-ভাবা-বলার ভঙ্গি, যার তর্জমা হয় না, যেজন্য গোড়াতেই বাউল কবিদের সঙ্গে তাঁর সমজাতিত্বের কথা বলেছি।

আয়নার পারদ ক্রমশই উঠে উঠে যায়
তুমি তো আমার আয়না ছিলে
হাতের চিরুনি তাই অপ্রস্তুত খুলে পড়ে
সিঁথির দুপাড়ে পড়ন্ত বেলা ঝিকমিক ক'রে জমে, হাসে
যে-ঘরে সংসার বহু মানে যত্নে ঘামে একদা সাজানো ছিলো
দ্যাখো, দেয়ালে প্লাস্টার
যেন বা তোমার প্রসাধন

হায়, নষ্ট হয়ে আসে ॥

আমার বিশেষ প্রিয় 'যে হেঁটেছে' কবিতাটির শেষার্ধ :

অবশ্য একবার পৌঁছে গেলে সে-দূরত্ব
ঝরে পড়ে, পালকে যেমন ঝরে জল
পলকে।
হাজার বছর ধরে যে হেঁটেছে
তার সন্ধ্যার আঁচলে পড়ে সাতটি গিঁট
চাবিগুলি
পায়ের মলের মতো
সন্ধ্যা ছেড়ে বেজে চলে

রাত্রির হৃদয়ে ॥

লাইনগুলি কবির উচ্চারণ ছেড়ে বেজে চলে—পাঠকের শ্রুতিতে, হৃদয়ে।

আমার কবিজীবন প্রসঙ্গে

এই প্রবন্ধটি লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে যেমন সম্মানিত হলাম, তেমন খানিকটা বিপদেও প'ড়ে গেলাম। নিজে কিছু কিছু লিখি, আর অন্যদের লেখা বিষয়েও কিছু কিছু লিখে থাকি; কিন্তু নিজের লেখা বিষয়ে লেখা? দিঙ্‌নির্ণয় কঠিন হবে, অহং-কেন্দ্রিকতা প্রশ্রয় পাবে; যা ঝোঁকের মাথায় করা তার জন্য পশ্চাদ্দৃষ্টিতে যুক্তিপ্রদর্শন করার লোভ সামলানো যাবে না। তার চাইতে সরাসরি নতুন কিছু কবিতা লেখা আমার পক্ষে সহজতর।

প্রত্যেক কবিরই একটা Songs of Innocence-এর পর্যায় এবং একটা Songs of Experience-এর পর্যায় থাকে কি না জানি না, তবে আমার জীবনে নিঃসন্দেহে একটা সত্যিকারের Songs of Innocence-এর পর্যায় গেছে, কারণ একেবারে ছোটবেলা থেকেই কবিতা লিখছি আমি। সত্যি বলতে কি, জীবনের এমন কোনো সময় আমার মনে পড়ে না যখন আমি কবিতা লিখতাম না। শিশু-মনস্তত্ত্বের বিচারে আমি খানিকটা অকালপক্ব ছিলাম এমন বলা চলে,—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'প্রেকশাস্',—যদিও এ প্রসঙ্গে বিশেষ কিছু বলতে যাওয়াটা অহমিকা হবে। এটুকু বলতে পারি যে খুব অল্প বয়স থেকেই ভাষার উপরে আমার একটা দখল দেখা গিয়েছিলো। এমন কোনো সময় আমার স্মৃতিস্থ নয় যখন আমি বাংলা বা ইংরেজী অক্ষর চিনতাম না। অল্পকালের মধ্যেই কবিতার প্রতি আমার দুর্মর আসক্তি লক্ষিত হলো: কবিতা পড়তাম এবং লিখতাম দুই-ই।

আমার ঐ অনুরাগের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করেছিলো আমার পরিপার্শ্বের দু'টি অনুকূল দিক: প্রথমত বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্য, দ্বিতীয়ত আমার বাবা-মা-র কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ। আমার জন্ম কলকাতা শহরেরই একটি প্রসূতিসদনে, কিন্তু শৈশবের কয়েকটি জরুরী, সংবেদনশীল বছর—যে বছরগুলি. মনস্তত্ত্বের মতে, আমাদের ভাবীকালের চালচলন এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিঙ্‌-নির্ণয় ক'রে দেয়—কাটে গ্রামবাংলায়। আমার যখন জ্ঞান হলো তখন আমি বেয়াল্লিশ সালের মেহেরপুরে এস. ডি. ও. সাহেবের প্রথমা কন্যা। বাংলো-বাড়ির বারান্দায়, উঠোনে, বাগানে, কুয়োতলায় মানুষ হলাম। সেই থেকে প্রকৃতির সঙ্গে একটা নাড়ীর যোগ রয়ে গেছে। ঘুম ভেঙে গেলেই—তখন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে

যেতো—বারান্দায় চ'লে যেতাম, পাখিদের ডাক শুনতে শুনতে সূর্যোদয় দেখতাম। বারান্দায় একটা চৌকি পাতা থাকতো, সেখানেই আমি পড়াশোনা করতাম। বারান্দাতেই প্রাতরাশ সারতাম, কখনও কখনও দুপুরের খাওয়াও। বেশ মনে পড়ে, প্রতি সকালে উঠে আমার মনে হতো যে জগৎটা পুনর্জন্ম লাভ করেছে। ঘাসের উপরে শিশির দেখতে আর সব্‌জির বাগান থেকে বেগুন তুলে আনতে খুব ভালো লাগতো। দুপুরে তন্ময় হয়ে শুনতাম ঘুঘুদের ঘু-ঘু, কাকেদের কা-কা, চিলেদের দূরাগত কান্না। রোদে ঝলসে-যাওয়া মাঠ পেরিয়ে ছায়াঘন রহস্যাক্রান্ত আম-কাঁঠালের বনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম; কুয়োতলায় বাসন-মাজার ব্যস্ততা, ঘাসে মেলা শাড়ির উপর পিঁপড়েদের হেঁটে যাওয়া, মুরগীদের কাণ্ড-কারখানা—এসব পর্যবেক্ষণ করতাম। বিকেলবেলা ভৈরবী নদীর ধারে কাশবনের দিকে বেড়াতে যাওয়া হতো। ঝাউগাছের আড়ালে চাঁদ উঠলে আমার মা গাইতেন: 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে—'; রাতে শিশুগাছ থেকে পেঁচা ডাকতো; নদীর ধারে শিয়ালরা ফেউ ডাকতো। এসব অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় ক'রেই বরান্দায় ব'সে ব'সে কবিতা লিখতাম আমি। প্রকৃতি এবং তার সঙ্গে আমার সম্পর্কই সেসব কবিতার বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে আনন্দরসে নিষিক্ত এই প্রাথমিক স্মৃতিগুলি আমার বই 'বল্কল'-এর প্রথম কবিতা "পিছুটান"-এরও বিষয়বস্তু, তা ছাড়া একেবারে সাম্প্রতিক কয়েকটি বাংলা-ইংরেজী কবিতাতেও ছায়াপাত করেছে।

কবিতাপাঠ প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাকে দৃঢ়তর ক'রে তোলে। যেহেতু আমি বাবা-মা-র প্রথম সন্তান ছিলাম এবং মফস্বলের জীবনযাত্রাও বেশ মন্দাক্রান্তা ছন্দে ছিলো, সেহেতু তাঁদের পর্যাপ্ত মনোযোগ পেয়েছিলাম। তাঁরা দুজনেই কবিতাপিপাসু ছিলেন। আমার মা বলেন যে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'-র উদাহরণ দিয়ে তিনি আমাকে মিল দিতে শিখিয়েছিলেন। আমি প্রায় প্রতি সকালেই লাইন টেনে বড় বড় অক্ষরে নিয়ম ক'রে কবিতা লিখে সগর্বে বাবা-মাকে দেখাতাম। এত উৎসাহ পেতাম যে অচিরেই বুঝে গেছিলাম কবিতা লেখাই তাঁদের খুশী করার প্রকৃষ্ট উপায়। আমার সেই আদ্যিকালের শ্লোকরচনার কিছু নমুনা তুলে ধরার লোভ সংবরণ করতে পারছি না,—আর কিছু না জোটালেও কিছু কৌতুক জোটাবে।

শ্রাবণের সন্ধ্যায় ঝুমঝুম বৃষ্টি,
বসে থাকি নিজ ঘরে, নাহি কোনো দৃষ্টি।

বসে বসে দেখি শুধু বৃষ্টির খেলা,
চারি দিকে থৈ থৈ কাদাজল মেলা।
বড় বড় গাছগুলো হেলে-দুলে সারা হলো,
আমি বসে বসে ভাবি, এ কী হলো? এ কী হলো?

মেহেরপুরের পর আমার বাবা নীলফামারিতে বদলি হলেন। সেখানকার কুঠিটা খড়ে ছাওয়া ছিলো, আর বাইরের দিকটা চুনকাম-করা ছিলো,—ব্রিটিশ রীতিতে যাকে বলে White-washed cottage। ব্রিটিশরাই করিয়েছিলেন বোধ হয়। নীলফামারিতে এসে আমার আলপথে টহল দেওয়া অভ্যাস হলো। আমার এক মামাতো মাসীকে পোস্টকার্ড ছেড়েছিলাম :

ইলুমাসী,
এখানে এসে ভালোই লেগেছে।
চারি দিক বাগানে ঘেরা।
ইয়া ইয়া ফুলের তোড়া।
উড়িয়ে পথের ধুলো
ওরা বাজার করে মূলো।
সকালবেলায় ভীষণ শিশির,
খালি পায়ে লেগে করে শিরশির।

নীলফামারির পর মালদা। সেখানে মফস্বল শহরের পাকা বাড়ির দোতলায় থাকতাম। গ্রীষ্মের রাতে ছাদে শোয়া হতো। সেই সময় থেকে নক্ষত্রলোকের সঙ্গে আমার সংযোগ স্থাপিত হলো। সে সময়ে হীরকরত্ন বা সমুদ্র কোনোটাই আমি দেখিনি, কিন্তু পঠিত কবিতা থেকে তাদের রূপ চিনে নিয়ে তারাগুলিকে আকাশের সমুদ্রে ভাসমান 'হীরাতরী' ব'লে সম্বোধন ক'রে ফেলেছিলাম।

প্রভাতবেলায় ঐ তরীগুলি
চলে যায় কোন সুদূরে,
তখন তাদের নাহি দেখা যায়
নীল আকাশের সাগরে।

এই সময়ে আকাশে উড়ে 'পরীর দেশ'-এ যাবার বাসনাও আমার মধ্যে গজিয়ে-

ছিলো। 'মরা পরীর ডানা' জোগাড় করা দরকার মনে হয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম :

মরা পরীর জীবনহীন ডানা
উড়বে কি না নেইকো আমার জানা।

মোটামুটিভাবে আমার শৈশবের কবিতায় হর্ষ ও বিস্ময়ের অনুভূতিরই প্রাধান্য ; তবে মালদায় থাকার সময় ছেড়ে-আসা পল্লীপরিবেশ সম্পর্কে একটা স্মৃতিবিধুরতার সুর প্রথম শোনা গেলো। তা ছাড়া মায়ের মুখে 'ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখি নি রে' গানটি শুনে বিধ্বস্ত কুঞ্জবন বিষয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলেছিলাম। সেখানে ছিন্ন লতা, বৃন্তচ্যুত ফুল, শুকনো পাতা, পাখি-পরিত্যক্ত পালক, ভাঙা দোলনা, মাটিতে নিক্ষিপ্ত পুতুল ও খেলনা আমার ক্ষতির বোধকে সূচিত করে।

ঐ সময়ে একবার পূর্বপুরুষদের দেশ ঢাকা যাওয়া হয়। সেই যাত্রা থেকে লব্ধ চিত্র এখনও আমার কবিতায় হানা দেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চিহ্ন প্রথম দেখলাম সেখানে,—রাস্তায় ছেঁড়া আধ-পোড়া তোশকবালিশ। আমরা মালদায় থাকাকালীন ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি এবং দেশবিভাগ হলো। তার পর আমরা কলকাতায় এলাম ; আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। প্রথম পরিচয়ে মহানগরকে একটুও ভালো লাগেনি আমার। রাস্তাঘাটে ব্যাপক দুঃখদুর্দশা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কলকাতায় এসে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেলো, হাঁপানি শুরু হলো। স্কুলের কর্মসূচীর দাসত্ব আমাকে গ্রাস ক'রে ফেললো। আমার কবিতাও হয় পল্লীর স্মৃতিচারণায় উৎসুক নয়তো গদ্যগন্ধী হয়ে গেলো। ক্রমশ বুঝতে পারলাম যে বড়রা অভিজ্ঞতার অন্য এক গভীরতা থেকে, দুঃখবোধের এমন এক প্রগাঢ়তা থেকে কবিতা লেখে যা তখনও আমার অনায়ত্ত। কবিতা লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম। এইখানেই আমার কবিতার 'অপাপবিদ্ধ গীতিকা' পর্যায়ের পরিসমাপ্তি।

প্রকৃতির সঙ্গে আমার এবং আমার কবিতার সেই নিবিড় আত্মীয়তাটা এখনও সক্রিয় আছে। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকার কথা ভাবলে গায়ে জ্বর আসে আমার। লণ্ডনে টিঁকতে পারতাম কি না সন্দেহ। অরণ্যের স্বাদ ছাড়া দম বন্ধ লাগে। আমার এখানকার বাড়ির সংলগ্ন বাগানটাকে ইচ্ছে ক'রে খানিকটা জংলী ক'রে রাখি। দিনের বেলা জানলার পাশে না বসলে এক লাইনও লিখতে পারি না।

যখন যে দেশে থাকি তখন সে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ আমার কবিতায় প্রতিফলিত হয়। বাংলার প্রকৃতির খেলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের এবং ক্যানাডার ঋতু-বদলের পালাও আমার কবিতায় প্রতিধ্বনি রেখেছে।

আশৈশব লক্ষ করছি যে কবিতাপাঠ আমাকে কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। এ দুটো নেশা পরস্পরকে পুষ্টি জোগায়। সর্বাগ্রে পড়েছি রবীন্দ্রনাথ; তিনিই আমার কবিতার ভাষার প্রথম মডেল। তার পর পড়লাম কৃত্তিবাস-কাশীদাস, বৈষ্ণব পদাবলী,—যা মানবিক সম্পর্ক বিষয়ে আমার চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে,—সমকালীন ও অন্যান্য বাংলা কবিতা, ইংরেজী কবিতা, স্কুল-কলেজে সংস্কৃত শেখার পর সংস্কৃত কবিতা, বাবার কাছে ফরাসী-জার্মান শেখার পর ফরাসী-জার্মান কবিতা। আমার বাবা বরাবরই সাহিত্যের ভক্ত ও বিদগ্ধ পাঠক; দেশ-বিদেশের বিস্তর কবিতা তাঁর পড়া। এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার; বোদলেয়র, মালার্মে, ভালেরি; গ্যয়টে, হাইনে, রিলকে—এসব নাম আমি ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। ইংরেজী কবিতার সঙ্গে অল্প বয়স থেকেই আমার পরিচয়। যথাসময়ে প্যালগ্রেভের স্বর্ণভাণ্ডারও হাতড়েছি। আমার যখন বারো বছর বয়স তখন পিতৃ-বন্ধু শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে তাঁর কীট্‌সের সমগ্র রচনাবলীটি পড়তে দিলেন এবং আমিও তৎক্ষণাৎ কীট্‌সের প্রেমে প'ড়ে গেলাম। সিনিয়র স্কুলে ইংরেজীর শিক্ষিকা শ্রীমতী বিজলী বিশ্বাসও ইংরেজী কবিতা এবং গ্রীক-রোমান পুরাণের প্রতি আমার অনুরাগ বর্ধিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে হাইন্‌রিখ্‌ জিমার (Heinrich Zimmer)-এর ভারতীয়-পুরাণ-বিষয়ক লেখা আমার কবি-চৈতন্যকে পুষ্ট করেছে। কবিতার সঙ্গে পৌরাণিক চিন্তার নিবিড় সম্পর্ক।

সমকালীন বাঙালী কবিদের অনেককেই আমার বাবা চিনতেন। বিশেষত বুদ্ধদেব বসু ছিলেন তাঁর ঢাকার ছাত্রজীবনের বন্ধু। আমার বালখিল্য পর্যায়ের রচনাবলী তাঁকে দেখানো হতো, এবং আমার প্রতিভাসিত প্রেকসিটির প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করতে পারবো কি না সে নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতেন। আমাদের বাড়িতে 'কবিতা' পত্রিকার অনেক খণ্ড বাঁধানো অবস্থায় ছিলো। সেগুলো পড়ার নির্দেশ পেতাম। আধুনিক কবিতা প্রথম প্রথম বুঝতাম না, বিরক্ত হতাম। বাবা বলতেন, 'পড়তে পড়তেই একদিন বুঝতে পারবে।' হয়েছিলোও তাই। কোনো এক সময়ে আধুনিক বাংলা কবিতার উচ্চারণভঙ্গির প্রেমে প'ড়ে গেলাম। কবিতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা পুরোপুরি বুদ্ধিগত তো নয়, ভালোবাসার সম্পর্ক, হার্দ্য

সম্পর্ক : একটা ইডিয়মের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের ব্যাপার,—মাথার সাহায্যে বুঝে উঠবার আগেই রক্তের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

শৈশব থেকেই পৃথিবীকে কবিতার চোখ দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম ; জীবন আর কবিতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলো। জগৎ আর কবিতা আমার কাছে আলাদা-আলাদা নয়, অন্যোন্যপ্রবিষ্ট। চৈতন্যের এই কানেকৃশনটা এত ছোট বয়স থেকে হয়ে আছে যে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো রিয়ালিটির বোধ নেই আমার। জানলার কাচে বৃষ্টির শব্দ শুনলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে একটা টেপ্ বেজে উঠবে, যেটা হয়তো পাঁচ-ছ' বছর বয়স থেকেই মস্তিষ্কের কোনো কোষে টেপ্ হয়ে আছে :

শার্শিতে জলসারেং বাজে,
পথ আজি নির্জন।
বাদলা পোকার পাখনা নিয়ে
জাপানী লণ্ঠন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : আশা করি ঠিকমত উদ্ধৃত করলাম। বা কোনো 'ভালো চিঠি' এলেই মনের মধ্যে বেজে উঠবে বিষ্ণু দে-র 'টপ্পা-ঠুংরি'-র প্রথম লাইনগুলি—

তোমার পোস্টকার্ড এলো,
যেন ছড়টানা স্রোতে
পিৎসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্ণি,—

বস্তুত কবিতার লাইনদের কলরোলে আমার মাথাটা ভর্তি। ট্র্যাফিক জ্যাম। জীবন যেমন আমাকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেয়, তেমনি কবিতার সাহায্যেও আমি জীবনকে খানিকটা বুঝে নিই, তার জট ছাড়াই।

এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা বাল্যকালীন ফল এই হয়েছিলো যে নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে কোনো ধারণা হবার বহু আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিতার প্রভাবে প্রেমের কবিতার বাচনভঙ্গি আমার কবিতায় এসে গেছে। সে ধরনের কোনো কোনো উচ্চারণ আমার মায়ের প্রতিই উদ্দিষ্ট : 'যখন আকাশে উঠিবে তারা / তখন তোমার কাজটি হবে গো সারা' : মায়ের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় ছাদে বসার উল্লেখ এখানে। কিন্তু 'রমণী, তুমি আমায় দিলে চাঁপায় ভরা থালা, /

আমার ঘরে যে শূন্য ডালা, / কী দিব তোমারে, বালা ?' আমার বালিকা-মনের বিশুদ্ধ ফ্যাণ্টাসি।

আমার উচ্চারণের এ দিকটা আমার বাবা-মাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। তাঁরা এটাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে ক'রে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে, যখন ফ্যাণ্টাসিতে প্রকৃত অনুভবের স্পর্শ লাগলো, তখনও তাঁদের তরফ থেকে কোনো প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়নি। কবিতা লিখতে হলে যেমন খানিকটা শারীরিক নির্জনতা লাগে—ঐ বারান্দা, বা একা একটা ঘরে চ'লে যাবার সুযোগ—তেমন লাগে একটা আধ্যাত্মিক নির্জনতা, চারদিকে একটুখানি 'প্রাইভেট স্পেস্'। বাড়ির লোকেরা এই প্রাইভেসিকে মর্যাদা না দিলে কবিতা লেখাটা একটা লুকিয়ে-চুরিয়ে করার ব্যাপার, একটা লজ্জার ব্যাপার হয়ে যায়। আমি সেই প্রাইভেসিটা পেয়েছিলাম। মনে পড়ে যে আমি কবিতা লেখার জন্য অন্য ঘরে উঠে গেলে আমার ছোট ভাইবোনেরা কখনও কখনও হেসে বলতো, 'বড়দি কবিতা লিখতে যাচ্ছে'। মা ওদের ব'কে দিয়ে বলতেন, 'এতে হাসির কী আছে ? হট্টগোলের মধ্যে ব'সে কবিতা লেখা যায় নাকি ?' ফলে কবিতা লেখা সম্পর্কে আমার মধ্যে কোনো 'ইনহিবিশন' বা বাধার ভাব বেড়ে উঠতে পারেনি। সৌভাগ্যবশত আমার বিবাহিত জীবনেও আমি এই প্রাইভেসিটুকু পেয়েছি।

যতদূর মনে পড়ে, বুদ্ধদেব বসুর কন্যাদ্বয় মীনাক্ষী ও দময়ন্তী দ্বারা সম্পাদিত কোনো হাতে লেখা পত্রিকায় আমার প্রথম প্রকাশ : তখন আমার সাত বছর বয়স হবে। ন' বছর বয়সে স্কুলের পত্রিকায় ছাপা হরফে আত্মপ্রকাশ করলাম। ১৯৫৪ সালে, যখন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে আই. এ. পড়ি, কলেজের কোনো কবিতা-প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জে "পিছুটান" কবিতাটি লিখে ফেললাম। পুরস্কার পেয়েছিলাম, কবিতাটি কলেজের পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিলো। তার পর দু' বছর কিছু লিখলাম না। ১৯৫৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকে আবার কবিতা লেখা শুরু করলাম। এই সময় থেকে আমার প্রাপ্তবয়স্ক কবিতা রচনার শুরু। এই পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমি মুক্ত ছন্দে লিখতাম। উনি আমাকে ছন্দ-মিল দিয়ে লিখতে বললেন। সেই উপদেশ অনুসরণ ক'রে আমি আঁট ফর্মের কবিতা লেখা শুরু করলাম। এ পর্যায়ে দেশ-বিদেশের নানা কবিতা আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত এবং অনুপ্রেরিত করেছিলো।

আমার অনেকগুলি কবিতা বুদ্ধদেব তাঁর 'কবিতা' পত্রিকার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলো। ফলে

'কবিতা'-য় প্রকাশের সুযোগ আমার আর হলো না। যতদূর মনে পড়ে, আমি তখন অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতে এসেছি,—১৯৬০ সালে প্রথম ব্রিটেনে এলাম আমি। তখন আমার মা কবিতাগুলি 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে পেশ করেন। শ্রীসাগরময় ঘোষের পছন্দ হয়ে যায় সেগুলি। তিনি সেগুলি একে একে 'দেশ'-এ বার করলেন। তার পর আমি অক্সফোর্ড থেকে কবিতা পাঠাতাম, সেগুলি 'দেশ'-এ বার হতো। ১৯৬৩ সালে আমি দেশে ফিরে এসে আবিষ্কার করলাম যে আমার কবিতা অনেকেরই পছন্দ হয়ে গেছে। বাঙালী পাঠকদের কাছে 'দেশ' পত্রিকাই আমাকে প্রথম প্রকাশিত করে, এবং আমার কবিতাবলীর একটি বড় অংশ তাতে প্রকাশিত। সুতরাং আমার কবিজীবনে 'দেশ'-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ক্রমশ অন্যান্য পত্রিকাতেও প্রকাশিত হলাম।

ব্যক্তিগত কারণে আমরা কবিতা লিখে ফেলি, অথচ শেষ পর্যন্ত রচয়িতার সঙ্গে রচনার প্রসূতি-প্রসূত সম্পর্কটাকে ছাপিয়ে জরুরী হয়ে পড়ে কবিতার সঙ্গে পাঠকদের সম্পর্কপ্রতিষ্ঠা। সৃষ্ট হয়েই কবিতা চায় অন্যের দোরে কড়া নাড়তে,— 'একাকী গায়কের নহে তো গান'। অন্যকে না শোনানো পর্যন্ত অন্তত আমার তৃপ্তি হয় না,—কে জানে শৈশবে কবিতা লিখেই বাবা-মাকে দেখাতাম ব'লেই কি না। নিজের সৃষ্ট শব্দবন্ধ যে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোনো পাঠকের মনকে ছুঁতে পেরেছে তার কোনো প্রত্যক্ষ, স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক প্রমাণ পেয়ে গেলে এমন আশ্চর্যরকমের ভালো লাগে। মনে পড়ছে, যখন যাদবপুরে পড়াতাম, তখন এন্‌জিনিয়ারিং ক্লাসের ছেলেদেরও পড়াতে হতো। সাহিত্যে তাদের বিশেষ উৎসাহ ছিলো না, দু'-চারজন ছাড়া। এরা সামনে বসতো। একবার কি একটা প্রশ্নের উত্তরে ঐ মুষ্টিমেয়দের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলো: 'আপনার ভাষাতেই বলা চলে, "হায় খেয়ালের নেই কানাকড়ি দাম"।' শুনে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবাক্ হয়ে গেছিলাম। ঐ মুহূর্তগুলোই কবি হওয়ার আসল পুরস্কার।

১৯৬৪ সালে আমার বিয়ের পর ব্রিটেনে থাকতে এলাম। প্রথমে ব্রাইটনে থাকতাম। সেখান থেকে কবিতা পাঠাতাম, 'দেশ'-এ বার হতো। সে পর্যায়ের ব্রাইটনে গ্রীষ্মশেষ বিষয়ে একটি দীর্ঘ কবিতা এবং হেরিং মাছ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ কবিতা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সময়ে শ্রীসাগরময় ঘোষের অনুরোধে 'দেশ'-এর জন্য গদ্য লেখাও শুরু করলাম। ব্রাইটনবাসের পর বছর দেড়েক ক্যানাডার ভ্যানকুভারে ছিলাম; সেখানে রচিত আমার কবিতাও 'দেশ'-এ এবং

আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে আবার ব্রিটেনে ফিরে এলাম। বংলা কবিতা আলোচনা করার সময় দশকের যে বিভাগ অনুসৃত হয়ে থাকে তার বিচারে আমি 'ষাটের কবি', অর্থাৎ ষাটের দশকে যেসব কবিরা স্বীকৃতি পেলেন আমি তাঁদের অন্যতম।

এর পরে আমার বাংলা কবিতা লেখার ইতিবৃত্তে বেশ কয়েক বছরেরর শূন্য স্থান আছে। ঐ সময়ে আমি ছেলেদের মানুষ করা আর ডক্‌টরেটের জন্য গবেষণা করার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ সময়েই আমার ইংরেজীতে কবিতা লেখার সুত্রপাত। ইংরেজীর সঙ্গে আশৈশবই নৈকট্য আমার; তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়েই পড়াশোনা। অথচ একটা সময় ছিলো যখন ইংরেজীতে কবিতা লেখার কোনো তাগিদ অনুভব করিনি। সে সময়ে ইংরেজীতে লিখলে সেটা কৃত্রিম হতো আমার পক্ষে। কিন্তু যখন তাগিদ এলো, তখন কবিতাগুলো স্রোতের মতো বেরিয়ে পড়তে লাগলো,—তখন সে প্রবাহকে বাধা দেওয়াটাই কৃত্রিমতা হতো। এখন আমি দ্বিভাষিক কবি, বাংলা-ইংরেজী দুই ভাষাতেই লিখি। আমার পরিপার্শ্বের এবং জীবনকাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই বিবর্তন এবং সম্প্রসারণ প্রায় অনিবার্য ছিলো। ইংরেজী বহু দিন আগে থেকেই আমার আত্মার গভীরে প্রবেশ করেছে; উপরন্তু তা বর্তমানে আমাব ঘরের ভাষা, রোজকার ভাষা, আমার চারদিকের মানুষের সঙ্গে সংযোগসাধনের ভাষা। সুতরাং সে ভাষাতে যে কবিতার লাইন চ'লে আসবে তা আর বি'চত্র কি। বরং আমি যে প্রায় দু' দশক বাংলার বাইরে থেকেও এখনও বাংলায় গদ্য-পদ্য লিখি, সেটাই অনেককে বিস্মিত করে। যখন যে ভাষায় লাইনগুলো চ'লে আসে, তখন সে ভাষায় লিখে ফেলি। অবশ্য মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত "নালন্দার পথে" কবিতাটি বাংলাতেই লিখতে চেয়েছিলাম, অথচ আমার পুস্তিকা ***Hibiscus in the North***-এ প্রকাশিত **'At the Bus Station, Burdwan'** কবিতাটি কিছুতেই বাংলায় লেখা গেলো না। দু'টিরই মূল ভাববস্তু এক: আর্ত নারী। প্রসঙ্গত বলি যে আমার কবিতাচর্চার জীবনে একটি অর্থবহ কাজ অ্যাংলোস্যাক্‌সন কবিতার বংলায় রূপান্তর ('বিশ্বভারতী পত্রিকা' ও 'হীনযান'-এ প্রকাশিত, পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হবে)। এই অনুবাদক্রিয়া থেকে কবিতা রচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক কিছু শিখে নিতে পেরেছি আমি।

বহুকাল ভারতের বাইরে থাকার দরুন পত্রপত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করা সত্ত্বেও

ঠিক সময়ে বই বার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অনেক আগেই বার করা যেতো। কিন্তু আমার কোনো তাড়াও ছিলো না। বাংলা বই প্রকাশের জগতে একটি অলিখিত নিয়ম আছে যে কবিতার বইকে চার ফর্মা অথাৎ চৌষট্টি পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে হবে, নয়তো তা নাকি 'কমার্শিয়াল প্রপোজিশন' হয় না। এত সব আমি আগে জানতাম না। আমি পঞ্চাশের দশকের কলকাতায় বড় হয়েছি, তখন এত কড়াকড়ি ছিলো না। বর্তমান নিয়মের ফলে কবিতারচনার স্বাভাবিক পর্যায়গুলোকে ঠিকমত গ্রন্থবিন্যস্ত করা যায় না। আমার ইচ্ছা ছিলো আমার বাংলা কবিতার প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়কে একসঙ্গে পরিবেশন করার, কিন্তু এখনকার ব্যবসায়িক অবস্থায় তা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৬ সালে আমার কাছে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিলো তা থেকে প্রথমার্ধ-মতো তুলে নিয়ে অবশেষে প্রকাশিত হলো আমার প্রথম বই 'বল্কল' (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৭)। পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয়ার্ধ 'সবীজ পৃথিবী' নাম নিয়ে আনন্দ থেকেই বেরোবে। ইতিমধ্যে আমার ইংরেজী কবিতার দু'টি বই বার হয়েছে: *Sap-Wood* (রাইটার্স ওয়র্কশপ, কলকাতা, ১৯৭৮) ও *Hibiscus in the North* (মিড্-ডে পাবলিকেশন্‌স্, অক্সফোর্ড, ১৯৭৯)।

'বল্কল'-এর কবিতাগুলি রচনার কালক্রম অনুসারে সাজানো। প্রথম কবিতাটি ১৯৫৪ তে লেখা। তার পর দ্বিতীয় কবিতায় চ'লে যাচ্ছি ১৯৫৭-তে। অতঃপর ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত আমার কবিতার ফসল বইটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম কবিতা থেকে "ঈশ্বরের রাত" পর্যন্ত দেশে লেখা, বাকিগুলি অক্সফোর্ডে লেখা। 'সবীজ পৃথিবী' বার হলে আমার বাংলা কবিতা রচনার একটা অধ্যায় কাভার্ড হবে এবং সত্তরের দশকে আমার নতুন ক'রে বাংলায় লেখার অধ্যায়টাও ছোঁয়া হয়ে থাকবে। এ বইটিতে তিন মহাদেশের স্বাদ পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে বাংলা কবিতার তৃতীয় বই বার করার মতো কবিতাও জ'মে গেছে: আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে সেটাও সম্ভব হবে।

'বল্কল'-এ জনৈক ইন্দুমতীর জন্য লিখিত কবিতাগুলি কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মনে হয় যেন সেগুলি নিজেকেই লেখা।' আসলে কবিতাগুলি আমার এক বান্ধবীকে মনে ক'রে লেখা, তবে শৈল্পিক-মনস্তাত্ত্বিক বিচারে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আমার alter ego বা 'অপর সত্তা' বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমার সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগের সঙ্গে আমার বিদেশবাসের একটা সম্পর্কও বার

করতে চেয়েছেন সুনীল। কিন্তু আসলে রচনার কালক্রম বিচার করলে দেখা যাবে যে এ দুয়ের মধ্যে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। "সাউথ পার্ক গোরস্থান" কবিতাটা, যেটা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সুনীল তাঁর মত সমর্থন করতে চেয়েছেন, সেটা আসলে ১৯৫৭ সালে কলকাতায় ব'সেই লেখা এবং তার প্রথম রূপে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় ১৯৫৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত, বুদ্ধদেব বসু আমাকে ছন্দ-মিলের শৃঙ্খলা আয়ত্ত করতে উপদেশ দেবার পর থেকেই আমি অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গিকে লেখা শুরু ক'রে দিই। আমার ভাববস্তুর প্রয়োজন এবং তৎসঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গিকের প্রয়োজন তৎসম শব্দ ছাড়া মেটানো যেতো না। তৎসম শব্দ প্রয়োগ করলেও আমার মেজাজ বরাবরই আধুনিক। আমার ভাষায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব পড়েছে এ কথা কেউ কেউ ব'লে থাকেন; তা হয়তো খানিকটা ছিলো; তা ছাড়াও ছিলো কীট্সের প্রভাব, শেক্স্পীয়রের সনেট-গুচ্ছের প্রভাব, সংস্কৃত ও ফরাসী কবিতার প্রভাব। কালিদাসের বিশেষ ভক্ত ছিলাম আমি, এবং বোদলেয়রের। ঐ ধরনের ঋদ্ধি, সংহতি, ধ্বনিগৌরব, ভাবনা-দ্যোতনা-চিত্রকল্প-অনুষঙ্গের ক্ষীরতুল্য ঘনত্ব আমার বিশেষ অন্বিষ্ট ছিলো। আমি সৃষ্টি করতে চাইতাম এমন সব স্তবক, যেগুলি ভারতীয় নৃত্যকলার মতো একই সঙ্গে অলংকৃত ও গতিশীল, সাংকেতিক ও সাংগীতিক হবে। এই অভিনিবেশের একটি দৃষ্টান্ত "ভিক্টোরিয়া পার্কে" কবিতাটি। আমার এই প্রবণতার জন্য আমাকে কখনও কখনও 'ধ্রুপদী' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে যে সুধীন্দ্র দত্ত আর আমি ভিন্ন প্রজন্মের, তাঁর আর আমার কবিতার স্বাদ তথা মেজাজ আসলে যথেষ্ট আলাদা। তা ছাড়া তখনও আমি শুধু একরকমের কবিতা লিখতাম না। আমার কবিতায় বরাবরই একটা সহজিয়া ধারাও আছে। "সেদিন মাঝরাতে", "ছড়া", "নববর্ষ", "ঘরের শিশু, বাহিরে মন", "হানিসাক্ল্" প্রভৃতি কবিতার এফেক্ট্ তৎসম শব্দনির্ভর নয়, এবং এগুলির মধ্যে আমার পরবর্তী কোনো কোনো বিবর্তনের বীজও নিহিত রয়েছে।

আমার কবিতার শৈলী এক জায়গায় থেমে থাকেনি। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি এবং এখনও ক'রে যাচ্ছি। মুক্ত ছন্দে লিখেছি, বিশুদ্ধ গদ্য-কবিতাও লিখেছি। তৎসম শব্দ আজকাল আগের চাইতে কম ব্যবহার করি, *কিন্তু প্রয়োজন বোধ করলেই* ব্যবহার করতে দ্বিধা করি না। এসব বিষয়ে আমার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই,—বক্তব্যের তাগিদে ভাষা চ'লে আসে, তাকে প্রাণিত করতে পারলাম কিনা সেটাই বড় কথা। দেশী-বিদেশী কোনো

জাতের শব্দই আমার কাছে অস্পৃশ্য নয়, বরং বর্ণসংকরের এফেক্টই আমার প্রিয়। তৎসম শব্দও তো বাংলাই, তাদের তো আর বাংলাভাষা থেকে একেবারে ছেঁটে ফেলা যাবে না। তাদের বাদ দিয়ে কি সুধীন্দ্রনাথ লিখতে পারতেন এমন সংহত একটি বাক্যাংশ : 'লাক্ষণিক,—নেত্রসার, কপোলপ্রধান / প্রাকৃপ্রচ্ছদ নটী যেন' ? অথবা পারতেন মূর্ত এবং বিমূর্ত চিন্তাকে এমন অনায়াসে গ্রন্থিবদ্ধ করতে, যেমন পেরেছেন মাত্র দু'টি শব্দে,—'আকাশ স্বরাট্'-এ ? দেশী বুলিতে এ কথাগুলো আরও অনেক ছড়িয়ে বলতে হতো। সংস্কৃতের ঐশ্বর্যে আমাদের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার : তার সাহায্য ছাড়া বাংলা কবিতায় মননশীলতার গুণ অনুপ্রবিষ্ট করানো যায় না। আমার একটা মননশীল দিক অবশ্যই আছে, যেটা আমি আমার গদ্য-পদ্যে কখনোই গোপন করিনি, কিন্তু কবিতায় মননের অত্যধিক বাড়াবাড়িও আমার ভালো লাগে না, যে কারণে আধুনিক পশ্চিমের কিছু কবিতা আমাকে আনন্দ দেয় না। মাথা আর হৃদয়ের মিলিত কাজই আমাকে আকর্ষণ করে, এবং বুদ্ধির সঙ্গে আবেগ ও অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়সাধনই আমার প্রার্থিত।

আমার জীবনে যখন যা সামাজিক পরিবেশ তখন তার ছায়া আমার কবিতায় পড়ে। ১৯৭৬-৭৭ সালে দেশে থাকার সময় আর্ত মানুষদের বিষয়ে বেশ কিছু কবিতা লিখেছি, এবং ব্রিটেনে ফিরে এসেও কিছু লিখেছি : সবই আন্তরিক তাগিদ থেকে লেখা। আমি কোনো বিশেষ দলের বা মতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নই ; দলমতনির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের নানা পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেটাকে আমি সৌভাগ্য বিবেচনা করি, কারণ নিজেকে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলা আমার কাম্য নয়, অনেক রকমের মানুষের সঙ্গে সংলাপ চালালে শিল্পে যে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আসে তা-ই আমার প্রার্থিত। মনের জানলা-দরজা যথাসাধ্য খোলা রাখার চেষ্টা করি, যখন যা উত্তেজিত করে তখন তা নিয়ে লিখে ফেলি, তবে কৃত্রিম উত্তেজনা কোনো দিনই সৃষ্টি করতে পারিনি। দেশে থাকলে তার অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে আরও অনেক উত্তেজিত কবিতা লিখে ফেলতাম নিশ্চয়ই। এখানে ফিরে এলে আবার এখানকার জীবনের নানান স্রোতের মধ্যে প'ড়ে যাই : সেগুলোকে উপেক্ষা করাও অসাধুতা হবে। আমার জীবনের এ দুটো দিকের দ্বন্দ্বও আমার অনেক কবিতায় বিম্বিত হয়েছে।

আমার মনে হয় যে সারল্যের গান আর অভিজ্ঞতার গানের দ্বন্দ্বটা এক অর্থে কবিদের পক্ষে অত্যন্ত মৌলিক। আমরা *প্রথমটাই লিখতে চাই। পারি না,* তার বদলে দ্বিতীয়টা লিখতে হয়। আমরা ইউটোপিয়ার আনন্দলোকে পৌঁছতে

চাই, কিন্তু আপাতত আমাদের লেখার একটা বড় অংশ দুঃখবিষয়ক, নিজেদের এবং অন্যদের দুঃখ বিষয়ে। বেদনা হচ্ছে কবিতার একটি বিশিষ্ট জন্মদাত্রী,—সে-জাতের এবং ততখানি বেদনা, যা পোড়ায়, কিন্তু মেরে ফেলে না, পরিমিত ড্রাগের মতো উত্তেজিত করে, ভাষাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই অঙ্গারপথে বারে বারে ধাক্কা খেয়ে আমাদের চলতে হয়, চিত্তশুদ্ধির রেয়াজ ক'রে, ক্রমাগত দ্বন্দ্বের মোকাবিলা ক'রে। যদি কোনো দিন ইউটোপিয়া আসে, তা হলে আমরা আমাদের সৃষ্টির এই দিকটাকে সানন্দে বাতিল ক'রে দিতে প্রস্তুত, কারণ আমাদের মধ্যে আনন্দের জন্য সত্যিই একটা তৃষ্ণা আছে, যেজন্যই দুঃখকেও বৈপরীত্যগুণে আমরা তীব্রভাবে অনুভব করি।

'বল্কল'-প্রসঙ্গে শ্রীদিলীপকুমার চক্রবর্তী 'হীনযান' পত্রিকায় লিখেছিলেন: 'আসলে জীবন ও শিল্প দুই-ই কেতকীর জরুরী'। উনি ঠিক ধরেছেন। ঐ দুয়ের টানাপড়েনেই আমার যা কিছু: স্থিরতা এবং অস্থিরতা, হিসেব এবং বেহিসেবও। কলাকৈবল্যে আমি কোনো দিন বিশ্বাস করিনি। কবিতা ডেকরেটিভ্ আর্ট নয়। জীবনই আমার কবিতার জনক, এবং আমার প্রত্যেক কবিতাতেই আমি জীবন বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। আমি জীবনের সঙ্গে কতগুলো গৌণ ব্যাপারে আপস ক'রে নিতে রাজী, কিন্তু যেগুলো আমার চোখে সত্যিই মূল্যবান্—এবং সেগুলো নিশ্চয়ই 'অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়'—সেগুলোকে আমি বাদ দিতে প্রস্তুত নই, কারণ তা হলে মানুষ এবং শিল্পী উভয় মাত্রাতেই ক্ষতির সম্ভাবনা। মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদের যতটা ছোট ক'রে রাখবো, শিল্পী হিসেবেও ততখানি ছোট হয়ে থাকবো। মানুষটার আয়তনেই শিল্পীর আয়তন।

ক্রমপরিণতি অব্যাহত রাখতে হলে সৃষ্টিশীল লেখককে থেকে থেকে জীবনের নদীতে ভালো ক'রে ডুব দিতে হয়,—নয়তো অভিজ্ঞতা বাড়ে না—আবার নিরালায় স'রে এসে আহৃত অভিজ্ঞতার রোমন্থন ক'রে, আঙ্গিকের প্রতি মনো-নিবেশ ক'রে সৃষ্টির কাজে মগ্ন হতে হয়। দুটোরই সুযোগ চাই। বিশেষত মেয়েদের জীবনে সেসব সুযোগসুবিধা ক'রে নেওয়ার পথে বিস্তর বাধা। পশ্চিমে বাস করি ব'লে হয়তো এসব ব্যাপারে আমি দেশের মেয়েদের চাইতে খানিকটা বেশি সুবিধে পেয়েছি, কারণ এখানকার সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা ভারতের চাইতে নিশ্চয়ই বেশি। সত্তরের দশকের নারী আন্দোলন নারী শিল্পী হিসেবে আমার আত্মবিশ্বাসকে পুষ্ট করেছে, এবং বর্তমানে নারী হিসেবে আমার আইডেন্-টিটি আমার কাছে খুবই মূল্যবান। যেসব মেয়েরা ভালো ক'রে লিখতে চান

তাঁদের সব সমাজেই অনেক সাহস রাখতে হয়,—সৎসাহস তো বটেই, কিছু দুঃসাহসও, কারণ নিষেধের ব্যারিকেড টপকাতে হতে পারে। কবিকে শুধু আঙ্গিক নিয়ে নয়, জীবন নিয়েও পরীক্ষা করতে হয়। ঘরকে বাহির, বাহিরকে ঘর, পরকে আপন, আপনকে পর করতে হতে পারে। কিছু কিছু নিয়ম না ভেঙে উপায় থাকে না। কি ডান, কি বাঁ, দু'দিকের দেশেই সমাজ যেরকম, তাতে খানিকটা অসামাজিক না হয়ে কবি হওয়া যায় না। কিন্তু তার সঙ্গে শুধুমাত্র বাহ্য উড়নচণ্ডীপনার কোনো সম্পর্ক নেই। সাহস লাগে গভীরতর স্তরে।

আসলে সাহস এবং শৃঙ্খলা দুটোই লাগে,—জীবনে এবং শিল্পে,—ফলে চারটে একক হলো। অক্সফোর্ডে কবি অ্যান স্টিভেনসন পরিচালিত কবিতা-ওয়র্কশপে যাতায়াত আমার সাম্প্রতিক কবিজীবনে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। কবিতার কলানৈপুণ্যের প্রতি এখানকার কবিরা যে কতখানি মনোযোগী তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি। প্রতি অধিবেশনে সভ্যদের কবিতা আনুপুঙ্খিকভাবে খুঁটিয়ে দেখা হতো : উচ্ছ্বাসের কোনো আধিক্য, শৈলীগত কোনো অশৈথিল্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বাড়তি শব্দ বরদাস্ত করা হতো না। আঙ্গিকে আমি বরাবরই যত্নশীল ব'লে এঁদের সঙ্গে তাল মেলাতে কোনো অসুবিধে হয়নি। পৃথিবীর সর্বত্র উচ্চাঙ্গ সংগীত, নৃত্যকলা, বা চিত্রশিল্পের ট্রেনিং-এ যে ধরনের বিস্তৃত এবং ঘনীভূত ডিসিপ্লিন মানা হয়ে থাকে, কবিতার ক্ষেত্রেও বস্তুত সে অনুশাসনের ব্যতিক্রম নেই। একজন অপেরার গায়িকা বা ব্যালেরিনা তাঁর শিল্পের পিছনে যতটা অধ্যবসায় ও অনুশীলন দিয়ে থাকেন, কবি হিসেবে কবিতার পিছনেও ততটা দিতে হয়। ফাঁকি দিলে উত্তরসূরিদের কাছে ধরা প'ড়ে যেতে হবে।

অন্যান্য শিল্পকলা থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। এককালে চিত্রশিল্পের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিলো ; নিজে ছবি আঁকতামও। শ্রীমতী রেবা হোড় আমাদের স্কুলে ছবি আঁকা শেখাতেন এবং আমি তাঁর প্রিয় ছাত্রী ছিলাম। আমার আর্ট কলেজে যাওয়াই উচিত কি না সেটাও এককালে আলোচিত হয়েছে। ইদানীং লক্ষ করছি যে কোনো-কোনো সংগীতাংশ শোনার পরে বা নৃত্যের নমুনা দেখার পরে আমার মন ব'লে ওঠে : 'আমি ঐরকম একটা কবিতা লিখতে চাই'। কবিতার সঙ্গে ছড়া এবং গানকে মেলানোর একটা বাঙালী তাগিদ আমার বরাবরই।

বর্তমানে প্রেস সংকটের ফলে বাংলা কবিতার আত্মপ্রকাশের অনেক স্রোতস্বিনী নিরুদ্ধ, এবং আমাকে যেহেতু হাজার হাজার মাইল দূর থেকে যোগাযোগ রাখতে

হয়, সেহেতু আমি এ অবস্থার বিশেষ ভুক্তভোগী। তা ছাড়া 'দেশ' আজকাল দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করা বন্ধ ক'রে দেওয়ায় আমার সাম্প্রতিক বেশ কিছু কবিতা সেখানে পেশ করা যাচ্ছে না। হ্রস্ব-দীর্ঘ দু'-রকমের কবিতা নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে। জীবন সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখতে হলে কখনও কখনও খানিকটা পরিসর লাগে বৈ কি। সনেট চোদ্দ লাইনের কবিতা, কিন্তু W.H.-কে তাঁর মনের কথা বোঝাতে শেক্স্‌পীয়রের ১৫৪টা সনেট লেগেছিলো। কখনও কখনও কোনো শর্টকাট থাকে না, জটিল পথ অনুসন্ধান তথা অতিক্রম করতে হয়। যখন বক্তব্য সংক্ষিপ্ত থাকে তখন ছোট ক'রেই লিখি। কখনও কখনও না ফেনিয়েও অনেক কিছু বলার থাকে,—ফেনিয়ে আমি কোনো দিনই লিখি না। জাপানী স্টাইলের তিন লাইনের হাইকুও আমি লিখেছি,—ইংরেজীতে, কিন্তু মজা এই যে যেদিন দুপুরে হাইকু লিখতে বসলাম, সেদিন একসঙ্গে চৌত্রিশটা হাইকু লিখে ফেললাম। এগুলোকে একটা 'হাইকু-সিকোয়েন্স' হিসেবে প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। সৃষ্টিশীলতার ব্যাপারে কোনো জবরদস্তিও চলে না। যখন যেটুকু আশীর্বাদ জোটে তখন তাকেই সুদে-আসলে খাটিয়ে কবিতা আবাদ ক'রে নিতে হয়। কখন যে জমিন পতিত রাখার সময় এসে পড়বে তার কোনো স্থিরতা নেই।

পরিশেষে বলি যে আমার যেমন কম্যুনিকেট করার একটা তাগিদ আছে, তেমনই শুধু করতালির প্রত্যাশায় আমি কখনও এক লাইনও লিখি না,—না পদ্য, না গদ্য,—যে-সত্য আমাকে উন্মথিত করেছে তাকে প্রকাশ করার তাগিদেই, তাকে ভালো ক'রে বুঝে নেওয়ার তাগিদেও লেখার চেষ্টা। খানিকটা প্রকাশ করতে শুরু না করলে বক্তব্যকে আবিষ্কারও করা যায় না। মৌনী-বাবারা সত্যকে কতখানি বোঝেন কে জানে? যখন বুঝি না বা বলার কিছু থাকে না, তখন আমিও চুপ ক'রেই থাকি। আমরা কেউই চিরকাল বক্‌বক্‌ করবো না। আমরা নীরব হয়ে যাবার পরেও উত্তরসূরিরা যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বই ক'রে রাখতে চান,—এবং জীবদ্দশায় হাজার বাউণ্ডুলে হলেও পরিণামে আমাদের তা-ই গতি, অতএব অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে বেশি চেঁচিয়েও কোনো লাভ নেই,—তা হলে সেটা তাঁদের সিদ্ধান্ত, কিন্তু দার্শনিক সান্ত্বনা এই যে আমাদের সে অমরত্বও বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত নশ্বর।

নৃত্যের তালে তালে

'জীবনের বছরগুলির কাছ থেকে যে একটি জরুরী জিনিস আমি শিখেছি তা হচ্ছে নিজের কাজকে গুরুত্ব দেওয়া আর নিজেকে গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যেকার পার্থক্য। প্রথমটা অত্যাবশ্যক আর দ্বিতীয়টা সর্বনেশে।' আমার বিশেষ প্রিয় এই কথাগুলি যিনি বলেছেন তিনি বর্তমান শতাব্দীর সেরা ব্যালেরিনাদের অন্যতম মার্গো ফণ্টেইন (জন্ম ১৯১৯)। চল্লিশ-বৎসরাধিক-ব্যাপী নিরলস নৃত্যসাধনার পর রঙ্গমঞ্চের নৃত্যচর্চা থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি, কিন্তু বৃহত্তর অর্থে তাঁর কর্মজীবন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তিনি একজন সুলেখিকা, সুবক্তা, ফলে নৃত্যজগতের পক্ষে একজন সুযোগ্য মুখপাত্র হিসেবে নতুন ক'রে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মনোজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সাধারণ দর্শকদের বরাবরই আকর্ষণ ক'রে এসেছে; আন্তর্জাতিক তারকা হয়ে যাবার পরেও তিনি ছিলেন তাদের খুব কাছের মানুষ; এবং বর্তমানে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে নিবেদিত একটি ব্রতে: নৃত্যকলা বিষয়ে জনসাধারণের কৌতূহল, জ্ঞান এবং উৎসাহকে জাগ্রত, বর্ধিত এবং পরিপুষ্ট করতে, শিল্পটির ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু বিবর্তনের জন্য সমাজে একটি উপযুক্ত পরিপার্শ্ব গ'ড়ে তুলতে।

১৯৭৫ সালে বেরোয় তাঁর প্রথম বই 'অটোবায়োগ্রাফি'। এমন একটি চিত্তাকর্ষক আত্মজীবনী অনেক পেশাদার লেখকও লিখতে পারবেন না। ১৯৭৮ সালে বেরোয় নৃত্যজগৎ সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের জন্য তাঁর প্রথম বই 'আ ডান্সার্স ওয়ার্ল্‌ড্‌'। ১৯৭৯ সালে তিনি বি.বি.সি. টেলিভিশনে ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 'দ্য ম্যাজিক অফ্‌ ডান্স্‌' নামে একটি অত্যন্ত মনোহারী সিরিজ পরিবেশন করেন, এবং ১৯৮০ সালে একই নামে তাঁর তৃতীয় বইটি বেরিয়েছে। অজস্র ছবিতে শোভিত সুমুদ্রিত এই বইটির অঙ্গসজ্জা তারিফ করবার মতো। টেলিভিশনে শ্রীমতী ফণ্টেইনের অনুষ্ঠান পরিবেশনের ভঙ্গিটি ভারী মধুর এবং অনাড়ষ্ট, এবং তাঁর তিনটি বই-ই আশ্চর্যরকমের সরস এবং উপভোগ্য। কিছু বলার থাকলে লেখার স্টাইল যে আপনিই এসে যায়, তার জন্যে যে ভাবতে হয় না, বইগুলি তারই প্রমাণ।

মার্গো ফণ্টেইন তাঁর নটি-নাম। গোড়ায় নাম ছিলো মার্গারেট হুকহ্যাম, ডাকনাম পেগি। তাঁর বাবা ইংরেজ, পেশায় এনজিনিয়র ছিলেন। তাঁর মা

লালনে ব্রিটিশ হলেও রক্তের উত্তরাধিকারে আধা-আইরিশ আধা-ব্রাজিলীয় : শ্রীমতী ফন্টেইনের দাদামশায় ব্রাজিল থেকে ব্রিটেনে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন, এবং তাঁরই পারিবারিক পদবী 'ফন্টেস্'-এর আদলে 'ফন্টেইন' পদবীটি গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে নর্তকীর দাদা ফিলিক্স্ও বোনের প্ররোচনায় তাঁর ফোটোগ্রাফিক কর্মজীবনের জন্য 'ফন্টেইন' পদবীটি গ্রহণ করেন। তাঁর মিশ্রিত কুলজি বিষয়ে শ্রীমতী ফন্টেইন গর্ব পোষণ করেন। ইংরেজী শৃঙ্খলা ও অধ্যবসায়, আইরিশ সংগীতপ্রীতি ও রোম্যান্টিকতা, এবং ব্রাজিলীয় নৃত্যপ্রীতি ও প্রণোচ্ছলতার যে শুভ সমন্বয় তাঁর চরিত্রে ঘটেছে তা তাঁর নৃত্যশিল্পী-সত্তাটিকে বিশেষভাবে বিকশিত করেছে। তাঁর মুখশ্রীতে এক-চতুর্থাংশ ব্রাজিলীয় রক্তের যে ছায়াটি পড়েছে,—কালো কেশরাশি, বড় বড় কালো চোখদুটি, খোলামেলা এবং মিষ্টি হাসি,—তা-ও নটী-জীবনে তাঁকে সাহায্য করেছে। তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর বালিকাবয়সের এমন দু'টি ফোটোগ্রাফ আছে যেখানে তাঁকে অনায়াসে বাঙালী মেয়ে ব'লে চালিয়ে দেওয়া যায়।

তাঁর প্রথম শৈশব কাটে লণ্ডনের শহরতলি ঈলিং-এ। তাঁর মা নৃত্যের অনুরাগী ছিলেন এবং ঈলিং-এই একটি নাচের স্কুলে শিশু মার্গারেটের নাচে হাতে-খড়ি হয়। মার্গারেটের যখন আট বছর বয়স তখন মিঃ হুকহ্যাম চীনে চাকরি নিলেন। ফিলিক্স্ ব্রিটেনে বোর্ডিং-স্কুলে রইলো আর মার্গারেট গেলো বাবা-মা-র সাথে চীনে। চীনের তিয়েন্‌ৎসিন এবং শাংহাই শহরে দেশান্তরিত রুশদের তত্ত্বাবধানে মার্গারেটের নৃত্যশিক্ষা চলতে লাগলো। তাঁর যখন চোদ্দ বছর বয়স তখন তাঁর বাবা-মা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন : মিঃ হুকহ্যাম চীনে রইলেন, মিসেস হুকহ্যাম কন্যাকে নিয়ে লণ্ডনে চ'লে এলেন, নৃত্যজগতে ঐ চতুর্দশীর সত্যিই কোনো ভবিষ্যৎ আছে কিনা তা নির্ণয় করতে। লণ্ডনে এসে মার্গারেট প্রথমে রাজকুমারী আস্তাফিয়েভা নামে এক দেশান্তরিতা রুশ মহিলার কাছে নাচ শেখা আরম্ভ করলেন, তার পর ভিক্-ওয়েল্‌স্ ব্যালে স্কুলে ভর্তি হলেন। সেটি তখন একটি শিশু প্রতিষ্ঠান। সেখানে ঢুকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গমঞ্চে চ'লে গেলেন মার্গারেট : ১৯৩৪ সালে একটি গৌণ ভূমিকায় তাঁর প্রথম মঞ্চাবির্ভাব। তার পর থেকে তাঁর নৃত্যজীবন ব্রিটিশ ব্যালের ইতিহাসের অঙ্গ। তাঁকে বড় হতে সাহায্য করেছিলেন নর্তকী-কোরিওগ্রাফার নিনেত্ দ্য ভালোয়া (এটা এঁর মঞ্চ-নাম, ইনি আসলে আইরিশ), নর্তক-কোরিওগ্রাফার ফ্রেডেরিক অ্যাশ্‌টন, নর্তক-অভিনেতা রবার্ট হেল্‌প্‌ম্যান নর্তক মাইকেল সোম্‌স্, ফরাসী নর্তক-কোরিওগ্রাফার রোলাঁ

পেতি এবং আরও অনেকে। ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'ডেইম্' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করে।

স্পষ্টত, কন্যার কেরিয়রের জন্য অবিস্মরণীয় ত্যাগস্বীকার করেছিলেন হুকহ্যাম-দম্পতি, বিশেষত তাঁদের দাম্পত্যজীবনে। কিশোরী কন্যার দেখাশোনার জন্য মিসেস হুকহ্যাম লণ্ডনে থেকে গেলেন ; এদিকে জীবিকার তাগিদে মিঃ হুকহ্যামকে আরও অনেক বছর চীনে চাকরি করতে হয়েছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিঃ হুকহ্যাম একনাগাড়ে দশ বছর তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পারেননি ; তার মধ্যে আড়াই বছর কাটে জাপানীদের হাতে বন্দী দশায়। শ্রীমতী ফণ্টেইন লিখেছেন : 'সুবিবেচক বাবা-মা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এবং ভাগ্যের আশীর্বাদে আমি পেয়েছিলাম এমন বাবা-মা যাঁরা আমাকে সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্যে ত্যাগস্বীকার করেছিলেন এবং একই সঙ্গে আমাকে সর্বদা অনুভব করতে দিয়েছিলেন যে কেরিয়রটা (অর্থাৎ নাচের কেরিয়রটা) আমারই, তাঁদের নয়।'

শ্রীমতী ফণ্টেইনের বিবাহের ইতিহাসে তাঁর রোম্যাণ্টিক মানসতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর যখন ষোলো বছর বয়স তখন তাঁর পরিচয় হয় রবার্তো এমিলিও আরিয়াস, সংক্ষেপে টিটো নামে মধ্য-আমেরিকার পানামা রাষ্ট্রের একটি কিশোরের সাথে। কিশোরটি তখন কেম্ব্রিজের ছাত্র। পনেরো বছর বাদে ১৯৫৫ সালে টিটো আরিয়াসকেই বিয়ে করেন মার্গো ফণ্টেইন। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'ব্যালেরিনার অভ্যন্তরে যে মানবহৃদয়টা আটকা প'ড়ে গেছিলো তাকে উদ্ধার করেছিলো টিটো।' বিয়ের পর কিছুকাল লণ্ডনে পানামার রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছিলেন টিটো আরিয়াস। যিনি স্বাধিকারে ব্যালের আন্তর্জাতিক জগতের বাসিন্দা সেই শ্রীমতী ফণ্টেইন স্বামীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক জগতের স্বাদও পেয়ে গেছিলেন। অবশ্য দু'জনের দুই কর্মজীবনের তাগিদে ভৌগোলিক ব্যবধানকে বারে বারেই মেনে নিতে হয়েছে তাঁদের।

নিজের কর্মজীবনের খাতিরে এবং স্বামীর সঙ্গেও পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরেছেন মার্গো ফণ্টেইন। সব মহাদেশেই পা দিয়েছেন। নৃত্যজগতের খবরাখবরের সঙ্গে এই ভ্রমণকাহিনী এবং অজস্র মজার গল্প তাঁর আত্মজীবনীকে বিশেষ সরস ক'রে তুলেছে। কেনেডি এবং ওনাসিস পরিবার থেকে শুরু ক'রে চিত্রতারকা এলিজাবেথ টেইলর এবং কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা লিখতে পেরেছেন তিনি। তাঁর বিভিন্ন অ্যাড্ভেনচারের মধ্যে রয়েছে ক্যালিফর্নিয়ায় হিপিদের আড্ডায় গিয়ে মার্কিন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার

অভিজ্ঞতা এবং তাঁর স্বামীর দেশ, অস্থির রাজনীতির দেশ পানামাতেও সংক্ষিপ্ত হাজতবাস। কিন্তু তাঁর আন্তর্জাতিক 'গ্ল্যামার'-এর নিচেই আছে একটি ঘরোয়া নারী-হৃদয়, সংবেদনশীলতা, নিসর্গপ্রীতি, মনুষ্যত্ব, কৌতুকবোধ। সমুদ্র ও সূর্যালোক তাঁর বিশেষ প্রিয় :

> আমার জীবনের অখণ্ড স্বাধীনতা ও আনন্দের মুহূর্তগুলিকে আমি সাধারণত অনুভব করেছি সমুদ্রের কোলে অথবা তার কূলে, যখন সূর্য জ্বলেছে আর হাওয়া আমার মুখে আছড়ে পড়েছে।
>
> ছোটবেলা থেকেই কয়েক ধরনের দৃশ্য আমার হৃদয়ে বিচিত্র আলোড়ন তোলে। সূর্যধৌত নিসর্গের সঙ্গে এক হয়ে যাবার একটা তীব্র বাসনা অনুভব করি; একই সঙ্গে একটা বেদনাবিধুরতা আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফ্যালে,—যেন আমি অনেক অনেক শতাব্দী আগে এককালে ঐ জায়গা-গুলোতে বাসিন্দা ছিলাম। কখনও কখনও উপলব্ধির সেই ক্ষণিক ঝিলিক-গুলোকেও ছুঁতে পেরেছি, ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ যাদের বলেছেন অমরত্বের সংকেত। দেখেছি যে অধরার এই অভিজ্ঞতাগুলো সর্বদাই ঘটে সূর্যের অনুষঙ্গে; সূর্যের গুরুত্ব আমার জীবনে অসাধারণ।

নিয়মিত পাঠগ্রহণ এবং রেওয়াজ তাঁকে যেমন দিয়েছে আঙ্গিকের উপরে প্রভুত্ব, তেমনি এই কবি-হৃদয় তাঁর নৃত্যকে দিয়েছে আত্মা।

তাঁর সাধ্যায়ত্ত সমস্ত সহ্যশক্তি এবং সাহসেরই প্রয়োজন হয়েছিলো তাঁর যখন তাঁর ঝলমলে লাতিন-আমেরিকান স্বামী আততায়ীর গুলিতে চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন। তাঁর নৃত্যজীবনের অনুশাসনের সাহায্যে এই ট্র্যাজিক আঘাতকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি। তা ছাড়া আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছে অন্যান্য ব্যালে-শিল্পীদের বিষয়ে তাঁর সশ্রদ্ধ, ঈর্ষাবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গিটি।

২

অন্যান্য কলার উৎসের মতো নৃত্যের উৎসও মানবজাতির প্রাগৈতিহাসিক অতীতে বিলীন। কিংবা তাকানো যেতে পারে আরও পিছনে : ময়ূর বা লায়ারবার্ড পাখির 'কোর্টশিপ ডান্স' বা ফুলের হদিশ দিতে মৌমাছিদের নাচের দিকে (যাকে বলা হয় 'বী ডান্স')। পৃথিবীতে এমন কোনো উপজাতি নেই যাদের আদিম নৃত্যধারা নেই, বা এককালে ছিলো না। প্রাচীনকালে নৃত্য শুধু

প্রমোদের অঙ্গ ছিলো না, বা আধুনিক সংকীর্ণ লোকায়ত অর্থে শুধু 'আর্ট' ছিলো না; ছিলো আনুষ্ঠানিক বা বিস্তৃত অর্থে ধর্মীয়, বেঁচে থাকার কারিগরির অঙ্গ, পুজার অংশ, দেবতাদের খুশী রাখার উপায়, অতিপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পথ। সংগীত, কবিতা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য: সব ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। উপজাতিদের 'ট্রান্স ডান্স' থেকে শুরু ক'রে দেবদাসীর নৃত্য পর্যন্ত প্রাচীন আনুষ্ঠানিক ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার মেলে। ভারতীয় চিন্তায় সব নৃত্যের উৎস নটরাজরূপী ঈশ্বর। ভারতীয় কল্পনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে মহাজাগতিক নৃত্যের ইঙ্গিত পায় আধুনিক বিজ্ঞানও পৌঁছেছে তারই প্রতিবেদনে।

ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশেষ আকর্ষণ করে নৃত্যকলার সেই দিকটি, যেখানে নৃত্য সব আর্টের প্রতীকস্থানীয়: একজন কৃতী নৃত্যশিল্পীর অঙ্গসঞ্চালনে আমরা পাই অনায়াস ছন্দের সৌন্দর্য, কিন্তু তাঁর সেই অনায়াস ভঙ্গি আসলে কঠোর-পরিশ্রম-লব্ধ, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অনুশীলনের ফল। মঞ্চের প্রতিটি সফল অনুষ্ঠানের পিছনে থাকে অজস্র মহড়ার অভ্যাস। 'যে নাচ অনায়াসতম এবং স্বাভাবিকতমরূপে প্রতিভাত হয়', লিখেছেন মার্গো ফন্টেইন, 'যা দেখে মনে হয় যে নাচিয়ে এইমাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে বানালেন, তারও নিজস্ব নিয়মাবলী ও শৈলী আছে।...স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিভাসে বা ছলনায় পৌঁছনো যায় কেবল-মাত্র আঙ্গিকের বৃহত্তম বশীকরণে।' তিনি আরও লিখেছেন: 'একজন দীক্ষিত ব্যালে-শিল্পীর আঙ্গিক হচ্ছে ভঙ্গিমার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ।' পৃথিবীর সব দেশের উচ্চাঙ্গ নৃত্যকলার ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। উচ্চাঙ্গ নৃত্য এমন এক আর্ট,—উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো—যেখানে সাধনার কোনো বিকল্প নেই। ফাঁকি দিলেই সেটা ধরা প'ড়ে যাবে। প্রতিদিন নিয়মিত রেওয়াজ করা আবশ্যক। শ্রীমতী ফন্টেইন তাঁর নৃত্যজীবনে অজস্র গুরুর কাছে পাঠ নিয়েছেন এবং হাজার হাজার ঘণ্টা রেওয়াজ করেছেন। বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা ব্যালেরিনা নাতালিয়া মাকারোভা যেদিন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন সেদিনই, বিছানাতে শোয়া অবস্থাতেই খানিকটা ব্যায়াম অভ্যাস ক'রে নিয়েছিলেন, টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলতে শুনেছি তাঁকে।

আসলে কুঁড়েমি আর বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দিয়ে কোনো আর্টেই বড় হওয়া যায় না। আমার নিজের বিশ্বাস যে এ ব্যাপারে সংগীতশিল্পী এবং নৃত্যশিল্পীদের কাছ থেকে শব্দশিল্পীদের অনেক কিছু শেখার আছে।

৩

পাশ্চাত্য নৃত্যকলায় ব্যালের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এর সুদূর উৎস ইয়োরোপের লোকনৃত্য। মধ্যযুগের কৃষকদের নাচ থেকে রাজসভার নাচ ('পাভান্', 'গালিয়ার্' ইত্যাদি); তা থেকে রেনেসাঁসের আমলে ব্যালের উৎপত্তি। সে আমলের রাজারাজড়ারা নৃত্য, গীত, কাব্য, বাদ্য, অভিনয়, মূকাভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত এবং পোশাকের বাহারে জমজমাট আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করতেন। তাঁরা নিজেরা, রাজপরিবারের লোকেরা এবং সভার সম্ভ্রান্ত নারীপুরুষেরা এতে অংশগ্রহণ করতেন। ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্ররা জানেন যে এলিজাবেথীয় যুগে 'মাস্ক্' নামে এক ধরনের নাট্যকলা প্রচলিত ছিলো। বেন জনসন 'মাস্ক্' লিখেছেন এবং শেক্স্পীয়রের শেষ পর্যায়ের নাটকে 'মাস্ক্'-এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এ সমস্তই রেনেসাঁস আমলের জমকালো রাজকীয় প্রমোদের অন্তর্গত। অপেরা এবং ব্যালে, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির এই বিশিষ্ট প্রতিনিধিদ্বয়ও সেই একই ঐতিহ্যের দুই দুহিতা। ব্যালে-শিল্পের প্রথম চারশো বছর অতিবাহিত হয় ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে রাজপরিবারদের পৃষ্ঠপোষকতায়। একাধিক নৃত্যশাস্ত্রও প্রণীত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইতালীতে ব্যালের উৎপত্তি ; শব্দটিও এসেছে ইতালীয় থেকে। ('রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকের 'মাস্ক্‌ড্ বল্' বা মুখোশ-পরা নাচের কথা মনে করা যেতে পারে)। ইতালী থেকে ব্যালে-রীতি গেলো ফ্রান্সে। সেখানে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো নৃত্যপ্রিয় এবং সুনর্তক রাজা চতুর্দশ লুইর পৃষ্ঠপোষকতায়। ক্রমশ ইয়োরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লো এই নৃত্যরীতি।

ব্যালের বিভিন্ন সাবেকী ঘরানার মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ইতালীয়, ফরাসী, ডেনিশ ও রুশ ঘরানা। ইতালীয় ব্যালে পায়ের ওস্তাদী কাজের জন্য খ্যাতি লাভ করে। শূন্যে উঠে যাওয়া এবং লাফঝাঁপের কাজগুলি ফ্রান্সে উন্নতি লাভ করে। ডেনমার্কের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে যখন ইয়োরোপের অন্যান্য অঞ্চলে প্রধানত নর্তকীরা আসর জমাচ্ছিলেন এবং নর্তকরা তাঁদের শিল্পকে প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন তখন ডেনিশ নর্তকেরা পুরুষদের ব্যালে-চর্চাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীতে এই ঘরানার একজন উল্লেখযোগ্য নর্তক হচ্ছেন এরিক ব্রুন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যালেরিনারা পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে নাচা শুরু করলেন। এভাবে নেচে সব থেকে বেশি নাম করলেন আধা-

ইতালীয় আধা-সুইডিশ মারী তালিয়োনি, বিশিষ্ট নৃত্যস্রষ্টা ফিলিপো তালিয়োনির কন্যা। ফিলিপো ব্যালে সৃষ্টি করতেন, মারী তাতে প্রধানা নর্তকীর ভূমিকায় নাচতেন। তাঁদের সর্বাধিক বিখ্যাত সৃষ্টি 'লা সিল্‌ফিদ্‌'।

নৃত্যজগতে মারীর উল্লেখযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন অস্ট্রিয়ান নর্তকী ফ্যানি এল্‌স্‌লার। তিনি বিশেষ বিখ্যাত 'লা কাচুচা' নামে স্পেনীয়-নৃত্য-ভিত্তিক একটি নাচের জন্য। মারী এবং ফ্যানি দু'জনে দুই রীতিতে নাচতেন। মারীর নাচে ছিলো দেবদূতোচিত লঘিমা, হালকাভাবে শূন্যে উঠে যাওয়ার ভঙ্গি। ফ্যানির নাচ ছিলো মাটির বেশি কাছাকাছি, ঝলমলে, ইন্দ্রিয়মোহন। একদল দর্শক মারীর নাচ বেশি পছন্দ করতেন, অন্য দল ফ্যানির ভক্ত ছিলেন।

ব্যালের ইতিহাসে রুশ ঘরানার স্থানটি গৌরবময়। ফরাসী, ডেনিশ এবং ইতালীয় রীতির আশ্চর্য সংমিশ্রণে জারদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরাতন সেণ্ট পীটার্সবুর্গ (আজকের লেনিনগ্রাদ) শহরে এই সম্ভ্রান্ত ঘরানাটির অভ্যুদয় হয়। উনিশ শতকে চারজন বিশিষ্ট ফরাসী শিল্পী রুশ ঘরানাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেন : দিদেলো, পেরো, স্যাঁ-লেয়ঁ এবং পেতিপা। মারিয়ুস্‌ পেতিপা এবং তাঁর রুশ সহকারী লেভ্‌ ইভানভের কোরিওগ্রাফির গুণে উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় রুশ ঘরানা এক ঈর্ষণীয় ধ্রুপদী শীর্ষে পৌঁছয়। পায়ের কাজের জন্য বিখ্যাত ইতালীয় নর্তকীদের নেমন্তন্ন ক'রে সেণ্ট পীটার্সবুর্গে আনাতেন পেতিপা। ক্রমশ রুশ নাচিয়েরাও এসব কায়দায় সুদক্ষ হয়ে পড়লেন।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে ব্যালের মিলনসংঘটন রুশ ঘরানার একটি বিশিষ্ট অবদান। পেতিপা এবং ইভানভের কোরিওগ্রাফি, চাইকভ্‌স্কির সংগীত : এ দু'য়ের শুভবিবাহ থেকে জাত রুশ ঘরানার সেই ক্ল্যাসিক সৃষ্টিত্রয়, ইংরেজীতে যারা পরিচিত 'সোয়ান লেক', 'দ্য স্লিপিং বিউটি' এবং 'দ্য নাটক্র্যাকার' নামে। ইয়োরোপীয় নাট্যকলায় শেক্‌স্‌পীয়রের বা সংগীতে বেঠোফেনের যে স্থান, ব্যালে-শিল্পে এই সৃষ্টিগুলির সেই স্থান। চাইকভ্‌স্কি ছাড়া ব্যালের জন্য সংগীত রচনা করেছেন গ্লাজুনভ ('রেমণ্ডা', 'দ্য সীজ্‌ন্‌স্‌'); স্ত্রাভিন্‌স্কি ('দ্য ফায়ারবার্ড', 'দ্য রাইট্‌ অফ্‌ স্প্রিং', 'পেত্রুশ্‌কা', 'আপোলো' ইত্যাদি); এবং প্রকফিয়েভ ('রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট', 'সিণ্ডারেলা')।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতীয় দেবদাসীর থীম নিয়ে পেতিপা একটি ব্যালে সৃষ্টি করেছিলেন : 'লা বায়াদেয়র'। অবশ্য ভারতীয় নৃত্যের কোনো প্রভাব এতে নেই, আছে শুধু দেবদাসীর আইডিয়াটা। তারও আগে 'ল দিউ

এ লা বায়াদেয়র' অর্থাৎ 'দেবতা ও দেবদাসী' নামে একটি ব্যালে প্রচলিত ছিলো। ১৮৩৭ সালে আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়াতে অগাস্টা মেউড নামে একটি বারো বছরের মেয়ে এই ব্যালেটিতে আত্মপ্রকাশ করেন। দেবদাসীর ভূমিকায় অগাস্টার একটি ছবি শ্রীমতী ফণ্টেইনের 'দ্য ম্যাজিক অফ্ ডান্স' বইটির অন্তর্গত হয়েছে। এখানে পোশাক, অলংকার এবং প্রসাধনে নর্তকীকে সত্যিই ভারতীয় সাজানো হয়েছে। সেকালে ভারতবিষয়ক যেসব সচিত্র ভ্রমণকাহিনী বেরোচ্ছিলো তাদের প্রভাব প'ড়ে থাকতে পারে। অগাস্টা মেউড পরবর্তীকালে ইয়োরোপে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন : তিনি আমেরিকার প্রথম আন্তর্জাতিক ব্যালেরিনা।

বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে বহু রুশ শিল্পী ইয়োরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়লেন। রুশ শিল্পীদের কাজ প্যারিসে প্রথম প্রদর্শন করেন সার্জ দিয়াগিলেফ। দিয়াগিলেফ নিজে শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন ইম্‌প্রেসারিও, অর্থাৎ শিল্পের পরিবেশক। তিনি গুণী শিল্পীদের সনাক্ত করতে পারতেন। যেসব উঠতি রুশ কোরিওগ্রাফাররা রাজকীয় ঘরানার ধ্রুপদী রক্ষণশীলতার বাইরে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে চাইছিলেন, দিয়াগিলেফ তাঁদের প্রশ্রয় দিলেন। তাঁর পরিবেশনের গুণে রুশ ব্যালে ইয়োরোপে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন তোলে। বর্তমান শতাব্দীতে রুশ দুনিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকাকে যে চারজন বিশিষ্ট নর্তক-নৃত্যস্রষ্টা দান করেছে তাঁরা প্রত্যেকেই এককালে দিয়াগিলেফের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাঁরা হলেন মিশেল ফোকিন, ভাস্‌লাভ্ নিজিন্‌স্কি, লেওনিদ্ মাসিন এবং জর্জ বালান্‌চিন। দশ বছরের ঝলমলে এবং বিতর্কিত কর্মজীবনের পরে পাগল হয়ে যান ব'লে নৃত্যজগতে নিজিন্‌স্কি একটি প্রায়-পৌরাণিক নাম। জর্জ বালান্‌চিন রুশ ব্যালেকে নিউ ইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাকে নানান নতুন দিগন্তে নিয়ে গিয়ে একটি নব্য-ধ্রুপদী অত্যাধুনিক মার্কিন রীতি উদ্‌ভাবিত করেছেন।

রুশ দুনিয়া থেকে পশ্চিমে এসেছেন অজস্র প্রথম শ্রেণীর নট ও নটী। আনা পাভ্‌লোভা, তামারা কার্‌সাভিনা, তামারা তুমানোভা, আলেক্‌সান্দ্রা দানিলোভা, অল্‌গা স্পেসিভ্‌ৎসেভা, অল্‌গা প্রেওবাজেন্‌স্কায়া, মাথিল্‌দ্ কৃশেসিন্‌স্কায়া, নাতালিয়া মাকারোভা, মিখাইল বারিশ্‌নিকভ, রুডল্‌ফ্ নুরেয়েভ কয়েকটি নাম।

আনা পাভ্‌লোভা (১৮৮১-১৯৩১) একটি জগদ্‌বিখ্যাত নাম। ব্যালে-শিল্পকে দুনিয়ার কাছে নিয়ে যাওয়া ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত। হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করেছেন, ছোট-বড় নানান শহরে নেচেছেন, ভারতেও নেচেছেন।

'দ্য ম্যাজিক অফ্ ডান্স' বইটিতে ভারতীয় নটীর বেশে তাঁর একটি ফোটোগ্রাফ রয়েছে : উদয়শঙ্করের সঙ্গে নাচছেন।

৪

ব্যালে-শিল্পটি যেহেতু নিঃসন্দেহে সামন্ততান্ত্রিক সময়ের উত্তরাধিকার, সেহেতু রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত দুনিয়ায় তার প্রত্যাখ্যান ঘটলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকতো না। সৌভাগ্যবশত তা হয়নি। খানিকটা অনিশ্চয়তার পর দেখা গেলো যে সোভিয়েত দুনিয়া তার ব্যালের উত্তরাধিকারকে শুধু যে বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাই নয়, আগেকার আমলের চাইতে বিস্তৃততর পরিধির দর্শকদের কাছে তাকে পৌঁছেও দিচ্ছে। সোভিয়েত শিল্পীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন গালিনা উলানোভা, মায়া প্লিসেৎস্কায়া, ভাখ্‌তাং চাবুকিয়ানি ইত্যাদি।

মার্গো ফন্টেইনের মতে নৃত্যে রুশ দুনিয়ার বিশেষ কৃতিত্বের কারণ এই যে এখানে ইয়োরোপীয় ও প্রাচ্য এই দুই ধারার লোকনৃত্য এসে মিশেছে। কথায় বলে যে রাশিয়াতে ভালুকেরাও নাচে। সোভিয়েত দুনিয়ার মানুষেরা নৃত্য-গীতের পরম ভক্ত। এই বিশাল রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে লোকনৃত্য এবং লোক-গীতিকার এমন এক সম্পদ রয়েছে যা ঠিক উর্বর মাটির মতো। বর্তমান সময়ে সোভিয়েত ব্যালে-শিল্পের জাতীয় প্রধান কেন্দ্র দু'টি : লেনিনগ্রাদের কিরভ্ থিয়েটার (আগেকার আমলের মারিয়িনস্কি থিয়েটার) এবং মস্কোর বলশয় থিয়েটার, কিন্তু প্রতি রাজ্যে আঞ্চলিক কেন্দ্রও রয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে নৃত্য-শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থার ফলে সাধারণ ঘরের গুণী ছেলেমেয়েদের পক্ষে ব্যালে-শিল্পী হওয়ার সুযোগ-সুবিধা আগেকার চাইতে নিঃসন্দেহে বেশি।

সিরিয়াস নৃত্যচর্চার দু'টি দিক আছে, বা থাকা উচিত : একটি ঐতিহ্যগত নৃত্যগুলির সংরক্ষণের দিক, অন্যটি নতুন নাচ সৃষ্টির বা কোরিওগ্রাফির দিক। প্রথম কাজটিতে সোভিয়েত শিল্পীদের কৃতিত্ব তর্কাতীত। তাঁদের ট্রেনিং অতুলনীয়, এবং সেখানে তাঁদের জিত। ১৯৩৪ সালে লেনিনগ্রাদের নৃত্যশিক্ষিকা আগ্রিপিনা ভাগানোভা যে নৃত্যশাস্ত্র রচনা করেন তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েত ব্যালে-শিল্পীদের আঙ্গিকের উৎকর্ষ ও শুদ্ধি মুক্তাপ্রতিম, এবং তাঁদের যৌথ নৃত্যের বাহাদুরি রত্নহারের মতো চমৎকারী। টেলিভিশনের দৌলতে কিছু কিছু নিদর্শন দেখায় সৌভাগ্য হয়েছে আমার। স্বীকার করি, ঐরকম অনুষ্ঠান

দেখার পর দিনকয়েকের জন্য শব্দাশ্রয়ী শিল্পে আমার আস্থা একেবারে লোপ পেয়ে যায় : মনে হতে থাকে যে ব্যালের গরীয়ান ভঙ্গি এবং গীতল বিধুরতার পাশে শব্দের কোনো খেলাই দাঁড়াতে পারে না! ক্ল্যাসিকাল ব্যালে বিষয়ে নৃত্যসমালোচক রিচার্ড অষ্টিন লিখেছেন : 'সংগীতের অভ্যন্তরে তার সঞ্চালন, যেন একটি নৈসর্গিক দৃশ্য বা প্রাসাদের ভিতরে চলাফেরা করার মতো ; হাতে সময় থাকে একটা খিলান বা বাতায়ন বা সন্ধ্যারশ্মির পতনের রেখাকে দেখে নেবার।' সমুচিত বর্ণনা!

অপরপক্ষে সম্পূর্ণ বোধগম্য কারণেই কোরিওগ্রাফিতে সোভিয়েত শিল্পীরা ইয়োরোপ-আমেরিকার শিল্পীদের মতো 'আভাঁ-গার্দ' বা প্রাগ্রসর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অবকাশ বা স্বাধীনতা পাননি ; সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্রোত-প্রতিস্রোত থেকে দূরে থাকতে হয়েছে তাঁদের। তাঁদের সামনে সমস্যাগুলো ছিলো অন্য ধরনের : বিপ্লবের থীম নিয়ে ব্যালে রচনা করা বা ব্যালের মতো একটি ললিতকলার যথোচিত রসগ্রহণে জনসাধারণকে দীক্ষিত ক'রে তোলা (কারণ জারদের আমলে ব্যালে ধ্রুপদী উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছলেও তার রসগ্রহণ অবশ্যই ছিলো অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ)। বিপ্লবোত্তর বীরত্বব্যঞ্জক থীম নিয়ে রচিত কতগুলি নতুন ব্যালে সোভিয়েত দুনিয়ার অভ্যন্তরে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সূক্ষ্মতর কাজে সোভিয়েত দুনিয়ার বাইরে খ্যাতি লাভ করেছে 'দ্য ফাউন্টেন অফ্ বখ্‌চিসরাই' ও 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট'। হাল আভাস এই যে সোভিয়েত দর্শকেরা পরীক্ষামূলক নতুন সৃষ্টির রসগ্রহণের জন্য প্রস্তুত এবং অবশেষে কোরিওগ্রাফিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সমর্থন জানানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই প্রতিশ্রুতির পাকা ফসল দেখতে পাওয়া যাবে এমন আশা করা যায়।

ইতিমধ্যে পশ্চিমের নৃত্যনদীতে অনেক স্রোত ব'য়ে গেছে। স্বনামধন্য অভিনেতা ফ্রেড অ্যাস্টেয়ারের নৃত্যকুশলতা থেকে শুরু ক'রে উত্তর আমেরিকার জ্যাজ, দক্ষিণ আমেরিকার ট্যাংগো, স্পেনের ফ্ল্যামেংকো পর্যন্ত নানান হাওয়া তাতে ঢেউ তুলেছে। ক্ল্যাসিকাল ব্যালের ভাষা একেবারেই বর্জন ক'রে সম্পূর্ণ নতুন নৃত্যভাষা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে : পথিকৃৎ আমেরিকার মার্থা গ্রেহাম। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমে ধ্রুপদী ব্যালে এবং তথাকথিত 'আধুনিক নৃত্য' সহাবস্থিত এবং পরস্পরের পরিপূরক।

সব দেশেই কিছু কিছু শিল্পী থাকেন যাঁরা শুধু ঐতিহ্যগত সম্পদকে নিয়ে থাকতে পারেন না, তা সে বৈভব যত উজ্জ্বলই হোক না কেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা

এবং নূতনের স্বাদ তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য, নয়তো তাঁদের শ্বাসকষ্ট হয়। এটা মেজাজের প্রশ্ন। সোভিয়েত দুনিয়াও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এবং সেখান থেকে প্রথম সারির নৃত্যপ্রতিভারা যখন পশ্চিমে পলাতক হন তখন তাঁরা আসেন এই নূতনত্বেরই অন্বেষণে। তাঁরা নতুন স্টাইলে নাচার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান বা নতুন স্টাইলের নাচ সৃষ্টি করার স্বাধীনতা পেতে চান। এই পলাতকেরা একাধারে সোভিয়েত নৃত্যকলার সুযোগ্য লিপিবাহক এবং পাশ্চাত্য নৃত্যজগতের পক্ষে নীট লাভ।

৫

রুডল্‌ফ্‌ হামেতোভিচ নুরেয়েভ আমাদের প্রজন্মের একটি স্মরণীয় নাম বা বলা চলে, ঘটনাবিশেষ। মার্গো ফন্টেইন লিখেছেন :

> 'ঠিক যে সময়টিতে পশ্চিমে ব্যালে বেশ হাত-পা গুটিয়ে আরামসে এবং আত্ম-প্রসাদের সঙ্গে ব'সে পড়েছিলো, ঠিক সেই সময়ে রুডল্‌ফ্‌ নুরেয়েভ রাশিয়া থেকে এসে পড়লেন, যেন শব্দাতিগ বেগে। ওঁর আসার পরে নাচের দুনিয়ায় কিছুই আর আগেকার মতো রইলো না। তাপমাত্রা গেলো বেড়ে। নারী-মুক্তির যুগটা নাচের জগতে হয়ে গেলো পুরুষমুক্তির যুগ…'

নুরেয়েভ রক্তে আদত রুশ নন, বাশ্‌কির তাতার। পরিবারটি মুসলিম। তাঁর জন্ম হয় ১৯৩৮ সালে এক ধাবমান রেলগাড়ির কামরায়। ট্রেনটি তখন বৈকাল হ্রদের তীর ঘেঁষে ভ্লাদিভস্তকের দিকে ছুটে যাচ্ছিলো। শৈশবেই নর্তক হবার বাসনা তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয় এবং বাশ্‌কির তাতারদের লোকনৃত্যে হয় তাঁর হাতে-খড়ি। ১৯৫৮ সালে লেনিনগ্রাদের ব্যালে স্কুল থেকে পাশ ক'রে সোজা কিরভ্‌ থিয়েটারে প্রধান-প্রধান ভূমিকায় নাচতে আরম্ভ করলেন। ১৯৬১ সালে কিরভ্‌ দলের সঙ্গে প্যারিসে নাচার পর পশ্চিমে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। মার্গো ফন্টেইন তাঁকে ব্রিটেনে আনান।

তাঁর আত্মজীবনীতে রুডল্‌ফ্‌ নুরেয়েভ লিখেছেন, বা বলা উচিত, বলেছেন—কারণ তাঁর কথিত রুশ থেকে ইংরেজী আত্মজীবনীটি সংকলিত এবং সম্পাদিত হয়েছে :

> আমি যে রুশ নই, তাতার, তার অর্থ যে আমার কাছে ঠিক কী, তার সংজ্ঞা কীভাবে দেবো জানি না, তবে তফাতটা শরীরের ভেতরে বুঝতে পারি।

আমাদের তাতার রক্তটা আরেকটু বেগে ছোটে যেন, সর্বদাই ফুটে উঠতে প্রস্তুত। অথচ একই সময়ে আমার মনে হয় যে আমরা রুশদের চাইতে একটু বেশি আয়েসী মেজাজের, বেশি ইন্দ্রিয়সুখবিলাসী; আমাদের মধ্যে একটা এশিয়াটিক নরম ভাব রয়েছে, এবং তার সাথে রয়েছে একটা তেজ, যেটা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে,—সেই সব দৃপ্ত ক্রূশ ঘোড়সওয়ারদের কাছ থেকে পাওয়া। আমরা কোমলতা আর হিংস্রতার এক আজব মিশ্রণ, যেমনটা রুশদের মধ্যে দুর্লভ···তাতারদের প্রাণে সহজেই আগুন ধরে, তারা সহজেই লড়তে রাজী হয়ে যায়। তাদের মধ্যে চালবাজি থাকে না, তারা সংরক্ত প্রকৃতির হয়, কখনও কখনও শিয়ালের মতো ধূর্তও হয়। সত্যি বলতে কি, তাতাররা বেশ জটিল জীব, এবং আমিও তাই।

রঙ্গমঞ্চের নুরেয়েভ একটি সঞ্চারিত অগ্নিশিখা, একটি তেজী, ক্ষিপ্রগতি, নমনীয়, শক্তিশালী বাঘ। তাঁর নাচ দেখলেই আমার অভিজ্ঞানশকুন্তলের সেই শ্লোকটি মনে পড়ে, সেই যেখানে সেনাপতি দুষ্মন্তকে বোঝাচ্ছেন মৃগয়ার মাহাত্ম্য : 'মেদচ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ' ইত্যাদি। তা ছাড়া একটি বুদ্ধিদীপ্ত সংরক্ত শিল্পী-মনের অধিকারী তিনি। গরীব ঘরের ছেলে, অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, এবং বস্তুত বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধার দরুনই ব্যালে-জগতে বড় হবার চান্সটা পেয়েছিলেন, নয়তো প্রাক্-বিপ্লব সেণ্ট পীটার্সবুর্গের অভিজাত আবহে তাতার কিশোরটি পাত্তা পেতো কি? অথচ সাফল্যের একটা চূড়ায় ওঠার পর তাঁর অস্থির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং দিক্‌সন্ধানী নৃত্যপ্রতিভা লেনিনগ্রাদের রক্ষণশীল পরিপার্শ্বে বিচঞ্চল হয়ে পড়লো; নতুন কোরিওগ্রাফিক অভিজ্ঞতার জন্য অধীর হয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর মেজাজ পর্বতারোহীর মতো : একটা শিখর জয় ক'রে খুশী থাকতে পারেন না, একের পর এক শিখর জয় করতে চান। তাঁর পশ্চিমে পলায়ন ছিলো প্রায় অবধারিত।

ইয়োরোপে নুরেয়েভের প্রতিষ্ঠালাভের পর এখানকার পুরুষ নাচিয়েদের নৃত্যমান তথা মর্যাদা তরতর ক'রে বেড়ে গেলো। ব্যালে পুরুষদের পক্ষে একটি মাননীয় বৃত্তি হলো। আগে ব্যালেরিনারাই দর্শকদের কাছ থেকে সব থেকে বেশি সমাদর পেতেন; এখন নর্তকরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এসব আমাদের সময়কার ঘটনা।

বলা বাহুল্য, ইয়োরোপও নুরেয়েভকে বেঁধে রাখতে পারেনি। নব নব নৃত্যের অন্বেষণে অনিবার্যত আমেরিকায় গিয়েছেন তিনি, মার্থা গ্রেহামের আধুনিক নৃত্য-

ধারা এবং জর্জ বালানৃচিনের নব্যধ্রুপদী ব্যালে-শৈলী আয়ত্ত করেছেন। নুরেয়েভ সেই জাতের শিল্পী যিনি অতীত ও বর্তমানকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ ক'রে ভবিষ্যতের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। শুধু নৃত্যপটুতায় নয়, নতুন নৃত্যের উদ্‌ভাবনেও তিনি নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল নাম রেখে যাবেন। এই দুর্ধর্ষ নর্তকের একাধিক ঘরোয়াদিক শ্রীমতী ফণ্টেইনের আত্মজীবনীতে বিধৃত হয়েছে।

নুরেয়েভ ছাড়া সোভিয়েত দুনিয়া থেকে আগত আর যে-দু জন নৃত্যশিল্পী সমকালীন পাশ্চাত্য নৃত্যজগতে বিশেষ সমৃদ্ধি এনেছেন তাঁরা হলেন মিখাইল বারিশ্‌নিকভ এবং নাতালিয়া মাকারোভা। শ্রীমতী ফণ্টেইন লিখেছেন: 'নুরেয়েভের মতো এঁদের শিকড় লেনিনগ্রাদে এবং প্রস্ফুটন ঘটেছে পশ্চিমে। সত্যি বলতে কি, এই ব্যবস্থাটা থেকে একটি বিশেষ সুন্দর জাতের শিল্পীর উদয় হয়।' রাশিয়ার অনুশাসন আর ইয়োরোপ-আমেরিকার অস্থির অনুসন্ধিৎসা, এ দুয়ে মিলে যে ব্যালে-শিল্পীরা তৈরি হন তাঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

৬

শ্রীমতী ফণ্টেইন নিজে রুশ ঘরানার কাছে বিশেষ ঋণী। চীনে এবং ব্রিটেনে তো বটেই, প্যারিসেও তিনি রুশ শিক্ষা নিয়েছেন,—অল্‌গা প্রেওবাজেন্‌স্কায়া এবং মাথিল্‌দ্‌ কৃশেসিন্‌স্কায়ার কাছে। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি স্বকীয় মনোজ্ঞ ব্রিটিশ স্টাইল তৈরি করতে পেরেছিলেন তিনি। শেক্‌স্‌পীয়রের দেশের এই নটীর স্টাইলের নিশানা হচ্ছে নাট্যকলা আব নৃত্যকলার শুভবিবাহ। তিনি বারে বারে বলেছেন যে ব্যালে হচ্ছে থিয়েটারের আর্ট, ব্যালে-শিল্পী থিয়েটার-শিল্পী, তাঁকে রঙ্গমঞ্চের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে হবে। শ্রীমতী ফণ্টেইন যখন যে ভূমিকায় নাচেন তখন তার সাথে অভেদাত্মা হয়ে যান, এবং স্বীকার করেছেন যে বিমূর্ত রীতির নাচের চাইতে (অত্যাধুনিক কোরিওগ্রাফিতে যার প্রাধান্য) কাহিনীসমন্বিত নৃত্যনাট্যে নাচতেই তিনি বেশি ভালোবাসেন।

নাটকীয় নাচ আর বিশুদ্ধ নাচ, মূর্ত-বিমূর্তের এই দ্বন্দ্ব আর্টের আরও অনেক বিতর্কের মতোই পুরোনো। শ্রীমতী ফণ্টেইন নিজে বারে বারে বলেছেন যে আঙ্গিকের ঈশিত্বেই নৃত্যশিল্পীর মুক্তি। আঙ্গিক হলো ভাষা। নতুন আঙ্গিক মানে নতুন শব্দ, নতুন ইডিয়ম। নতুন ইডিয়মের সাহায্যেই নতুন থীমের বেদন সম্ভব হয়, আঙ্গিকের উন্নতির ধাপে ধাপে বেড়ে যায় নৃত্যের প্রকাশক্ষমতা। অথচ নৃত্যকলা সার্কাসের খেল নয়, যেমন কবিতা নিছক শব্দের খেলা নয়;

আঙ্গিকসর্বস্ব প্রাণশূন্যতা যে-কোনো আর্টের পক্ষেই মরুভূমি। আঙ্গিকের ঘোড়ায় মানবিক থীমের লাগামকে বাঁধতে পারলে তবেই না নাচিয়ের অঙ্গভঙ্গি 'অ্যাক্রো-ব্যাটিক্স্'-কে অতিক্রম ক'রে আর্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ শব্দশিল্পীর মতো নৃত্য-শিল্পীকেও 'কিছু বলতে হয়'। শ্রীমতী ফন্টেইন এখানে অসাধারণ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর নৃত্যে ছিলো স্মরণীয়ভাবে সংগীতধর্মী অভিনয়সৌকুমার্য।

নুরেয়েভের অভ্যুদয়ের ফলে শ্রীমতী ফন্টেইনের নৃত্যজীবনে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়, তাঁর কেরিয়রের দ্বিতীয় গ্রীষ্ম, হেমন্তে গ্রীষ্মাভাস, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'ইণ্ডিয়ান সামার'। ব্যালে-সমালোচক রিচার্ড অস্টিনের লেখা প'ড়ে বোঝা যায় যে এ ব্যাপারটা তাঁর মনঃপূত হয়নি। তিনি লিখেছেন :

> আমার বরাবর মনে হয়েছে যে নুরেয়েভ ফন্টেইনকে অন্য এক জাতের ব্যালেরিনাতে পরিবর্তিত করা শুরু ক'রে দিলেন,—যে-ব্যালেরিনা বৃহত্তর, আন্তর্জাতিকতর, আগের চাইতে বেশি বহির্মুখ, কিন্তু তাঁদের এই একত্র কাজ করার সময়টায় ফন্টেইনের শৈলীর দুর্লভ কাব্যগুণ যেন খানিকটা হারিয়ে গেলো। ঝোঁকটা পড়লো বৃহৎ রুশ শৈলীর দিকে, যার সাথে ফন্টেইনের শরীরের গঠন অথবা তাঁর মেজাজ খাপ খায় না। তাঁদের দু'জনারই নাম হলো মেলা, কিন্তু আমার মনে হয় যে ফাঁকতালে ফন্টেইনের অনন্য বৈশিষ্ট্যটি লুপ্ত হয়ে গেলো।

অস্টিনের সাথে এখানে আমি একমত হতে পারি না। নুরেয়েভের সাথে নাচার ঢের আগে থেকেই ফন্টেইন বড় মাপের এবং আন্তর্জাতিক-খ্যাতি-সম্পন্ন শিল্পী ছিলেন। 'বৃহৎ রুশ শৈলী'-র প্রভাবে শ্রীমতী ফন্টেইনের কাব্যগুণ নষ্ট হয়ে গেছিলো এ উক্তি আমার কাছে অসার মনে হয়। বরং এ কথাই সত্য যে নুরেয়েভের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছিলেন, বারে বারে সেই ঋণ স্বীকার করেছেন, এবং নুরেয়েভের সাথে নেচে আনন্দ পেয়েছিলেন। নুরেয়েভের আবির্ভাবের দরুনই ফন্টেইনের নৃত্যজীবন প্রায় এক দশক বেড়ে গেলো, নয়তো অনেক আগেই অবসর নিয়ে নিতেন তিনি।

কোনো কোনো সমালোচক আছেন যাঁরা স্বদেশী শিল্পী কোনো বিদেশী প্রভাবের আওতায় এলেই ঘাবড়ে গিয়ে 'আমাদের শৈলীর শুদ্ধি হারিয়ে গেলো' ব'লে চেঁচামেচি করতে থাকেন। সংগীতের জগতে রবিশঙ্করের মতো শিল্পীকেও ঐ ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেই

ভারতীয় সংগীতের জাত চ'লে যাবে। নতুনের ভয়ে ভীত এ জাতের বাঁধা পথের পথিকদের সম্বন্ধেই অট্টহাস্য ক'রে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, / আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'।

আসলে অস্টিন ব্যালেকে দেখেন নটী-কেন্দ্রিক শিল্প হিসেবে ; নটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর পছন্দ নয়। এ কথা কবুল করেছেন তিনি। অথচ নুরেয়েভের প্রতিষ্ঠালাভের পরে এমন কথা আর মানাও যায় না। ব্যালে থিয়েটার-আর্ট, নৃত্যনাট্য ; এবং নুরেয়েভ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে নারী এবং পুরুষ উভয়ের নৃত্য সমান শক্তিশালী হলে তবেই আর্টটি সব থেকে বেশি খোলে। জোড়ের নাচে দু'জনকেই পরিশ্রম করতে হবে, একজনের কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমে নর্তকরা নর্তকীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছেন ব'লেই জোড়ের নাচ এবং সমবেত নাচ এখন এখানে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করেছে। ছোট ছেলেদের নৃত্যজগতে প্রবেশকে দৃঢ়কণ্ঠে স্বাগত জানিয়েছেন মার্গো ফন্টেইন।

নাচাটা কোনো 'মেয়েলী ব্যাপার' বা নপুংসকবৃত্তি নয়। জীবজগতের কোর্টশিপ ডান্সটা প্রধানত পুরুষ প্রাণীদেরই। লোকনৃত্যে তথা ব্যালের উৎস ইয়োরোপীয় রাজসভার নৃত্যে পুরুষদের ভূমিকাটি গৌরবময়। নৃত্যে আছে পৌরুষের দীপ্ত প্রকাশের সুযোগ। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যও স্ত্রী-পুরুষের কাজ সমান উঁচু মানের হলে তবেই ঠিকমত খোলে। তন্বী কিশোরীরা ঠোঁটের উপরে গোঁফের রেখা এঁকে অর্জুন বা বজ্রসেনের ভূমিকায় নামলে 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'শ্যামা'-র জোর ক'মে যায়। নটরাজের পূজার দেশে এ কথাটা বলার প্রয়োজন থাকাও উচিত নয়, কিন্তু মনে হয় যে প্রয়োজন আছে। অন্তত উত্তর ভারতে নৃত্যকে বহুকাল অসামাজিক, অপৌরুষসূচক, কেবলমাত্র বাইজীদের কারবার ক'রে রাখা হয়েছিলো। সম্ভ্রান্ত হলেও বাইজীদের স্থান ছিলো সমাজের প্রান্তে। এতে লোকসানটা সমাজেরই।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় নৃত্য বিষয়ে শ্রীমতী ফন্টেইনের কয়েকটি কথা অনুধাবন করা যেতে পারে। ভারতীয় নৃত্য বিষয়ে তাঁর মনোভাব অত্যন্ত সশ্রদ্ধ। 'ক্ষোভের বিষয় এই', লিখেছেন তিনি, 'যে এই নৃত্যকলা শেখার আরও সুযোগ পশ্চিমে পাওয়া যায় না ; সে শিক্ষা আমাদের পক্ষে খুব মূল্যবান হতো'। নৃত্যকলার আন্তর্জাতিক ভবিষ্যৎ বিবেচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

> ভারত, যার নৃত্যকলার উত্তরাধিকার প্রাচীন ও সমৃদ্ধ, এবং শাখা-প্রশাখায় নিকট এবং দূরপ্রাচ্যে বিস্তৃত, তার সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে বেগ পাচ্ছে।

> উদয়শঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যালের ঐতিহ্যকে মিশিয়ে একটি আধুনিক থিয়েটার আর্ট তৈরি করবেন। তিনি আনা পাভ্-লোভার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছিলেন এবং ইয়োরোপে ও আমেরিকায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু ১৯৭৮ সালে ভারতে মারা গেলেন নিদারুণ অভাবের মধ্যে; মৃত্যুকালে কয়েকজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছাড়া আর কারও সাথে যোগসূত্র ছিলো না তাঁর। রামগোপাল শঙ্করের চিন্তাকে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু এসব পরিকল্পনাকে উৎসাহ দেবার মতো পর্যাপ্ত অবলম্বন ভারত এখনও জোগাতে পারেনি।

পরিতাপের বিষয়। ঐতিহ্যগত নৃত্যগুলির সংরক্ষণ এবং নতুন নৃত্য সৃষ্টি দুই ক্ষেত্রেই সমস্যার কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে সরকারী সহায়তা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমস্যা জটিলতর, কারণ আর্টের পরীক্ষামূলক কাজগুলো সরকারী সাহায্যের আওতায় করা মুশকিলের ব্যাপার,—সব দেশেই। নৈর্ব্যক্তিক আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল প্রতিভাদের সনাক্তকরণ কঠিন; তা ছাড়া এক্স্-পেরিমেণ্ট মানেই কিছু কিছু ভুলচুক, খানিকটা ঝুঁকি নেওয়া: সাফল্যের পথে খানিকটা অসাফল্যের জন্য প্রস্তুতি থাকা চাই। সরকারী আওতায় সাধারণত তার অবকাশ থাকে না, থাকে না সেই 'প্রাইভেট স্পেস্', যার নির্জনতায় শিল্পী ভুল করলে সেটা আবার শুধরে নিতে পারেন, একটা নুসাবিদা পছন্দ না হলে সেটা ছিঁড়ে ফেলে আবেকটা বানাতে পারেন। শ্রীমতী ফণ্টেইন লিখেছেন: 'কোনো এক নিগূঢ় কারণে সব থেকে মৌলিক সৃষ্টিশীল প্রতিভাদের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাহিত করানো যায় না।' ঠিক; তাঁদের লাগে মুক্ত অঙ্গন।

স্পষ্টত, শিল্পকলার জগতে বিচক্ষণ ইম্‌প্রেসারিওদের প্রয়োজন আছে, যাঁরা মৌলিক প্রতিভাদের চিনতে পারেন। আগেকার দিনের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা আর আজকের দিনের সরকারী সাহায্য এ দু'য়ের মধ্যেকার একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে রাজারা ব্যক্তি, ডিপার্টমেণ্ট নন, ফলে তাঁদের পক্ষে সক্রিয় ইম্‌প্রেসারিও হওয়া ছিলো অপেক্ষাকৃত সহজতর। আর হ্যাঁ, কিছু টাকাকড়িও নিশ্চয়ই চাই। অর্থাৎ কলাচর্চার জন্য অর্থব্যয়ে সমাজের, অন্ততপক্ষে সমাজের কোনো কোনো অংশের, সম্মতি এবং সামর্থ্যও থাকা চাই। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী ফণ্টেইন লিখেছেন:

> ইতিহাস দেখায় যে নৃত্য পুষ্ট হয় চ্যালেন্‌জের আহ্বানে। যেসব নতুন ধারা তার রক্তসঞ্চালনকে অব্যাহত রাখে সেগুলি কোনো নিয়ম না মেনে পৃথিবীর

যন্ত্র-তন্ত্র আবির্ভূত হয়, সেখানে সেখানে, যেখানে যেখানে শিল্পীরা চ'লে যান যে-যার ব্যক্তিগত সাধনার তাড়নায়, সাধারণত নিজেরা বড় রকমের দাম দিয়ে। অবশ্যই খানিকটা ব্যবস্থাপন এবং অর্থসাহায্যের প্রয়োজন আছে : চাই কিছুটা সুব্যবস্থা, যার আওতায় নতুন নাচ সৃষ্টি এবং পরিবেশন করা যেতে পারে ; কিন্তু যতই দেখছি ততই স্পষ্ট বুঝছি যে নতুন নতুন সৌধ আর আদর্শ ক্লাসঘর গড়লেই সেগুলো থেকে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তারকারা বেরিয়ে আসবেন না। উল্‌টোটাই সত্য, অর্থাৎ কল্পনাপ্রবণ স্রষ্টারাই—তাঁরা যেখানেই আবির্ভূত হোন না কেন—থিয়েটার এবং স্টুডিওগুলোকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন। সংক্ষেপে, আপনাদের সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে প্রথমে খুঁজে বার করুন ; বাকিটা হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে আমার নিজের একটি চিন্তা পেশ ক'রে প্রবন্ধটি শেষ করছি। আমার বিশ্বাস, শিল্প-পৃষ্ঠপোষকতায় প্রযুক্তিবিদ্যার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, এবং সেই ভূমিকাকে ভারতে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণ্যে সাহিত্যের বিকিরণে যেমন সাহায্য করে মুদ্রণশিল্প, চিত্রশিল্প ইত্যাদির বিকিরণেও চিত্রাদি মুদ্রণের নৈপুণ্য, সংগীতের বিকিরণে বেতার, রেকর্ড-প্লেয়ার, টেপ্‌-রেকর্ডার ইত্যাদি, তেমনই নৃত্যকলার বিকিরণে সাহায্য করতে পারে, পশ্চিমে ক'রে থাকে, নৃত্যলিপির উদ্‌ভাবন, সিনেমা, টেলিভিশন, ভিডিওটেপ্‌-রেকর্ডার ইত্যাদি। নৃত্যলিপির উল্লেখে হয়তো অবাক হবেন কেউ কেউ, কিন্তু হ্যাঁ, নৃত্যলিপি ব'লে একটা-জিনিস আছে। পাশ্চাত্য মানুষ শুধু ভাষার লিপি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেননি, সংগীতের স্বরলিপি এবং নৃত্যলিপিও উদ্‌ভাবন করেছেন। বর্তমান সময়ে দু' রকমের নৃত্য-লিপি প্রচলিত, 'ল্যাবানোটেশন' ও 'বেনেশ্‌ সিস্টেম', এবং 'কোরিওলজি' একটি উঠতি বিদ্যা। প্রযুক্তিবিদ্যা ইয়োরোপের সংগীত এবং নৃত্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রগুলির পিছনে রয়েছে একাধিক শতকের নিবেদিত ও অক্লান্ত প্রযুক্তিবিদ্যা। আর ইয়োরোপের নটীরা যখন পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে নাচা শুরু করলেন তখন তাঁদের সুবিধার্থে বিশেষ ধরনের জুতোও উদ্‌ভাবিত হলো। ঐ জুতো ছাড়া ক্লাসিকাল ব্যালের যে পায়ের কাজ আমরা আজকাল দেখতে পাই তা আদৌ সম্ভব হতো না। সম্প্রতি টেলিভিশন নৃত্যকলার বিকিরণে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আমি নিজে ব্রিটিশ টেলিভিশন থেকে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য নৃত্যকলা বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছি। শ্রীমতী ফণ্টেইনের 'দ্য ম্যাজিক অফ্‌ ডান্স' ছাড়াও বি.বি.সি.-র

'ডান্স্ মানুথ্', বি.বি.সি.-তেই ডেভিড অ্যাটেনবরো কর্তৃক পরিবেশিত 'দ্য স্পিরিট অফ্ এশিয়া' অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নৃত্যের দৃশ্যগুলি বা চলতি সিরিজ নুরেয়েভের 'ইন্ভিটেশন টু দ্য ডান্স', যেখানে কোরিওগ্রাফির আধুনিকতম পরীক্ষাগুলোও দেখানো হচ্ছে, বিশেষ প্রশংসা দাবি করে।

প্রযুক্তিবিদ্যাকে যদি বিচক্ষণভাবে আর্টের সেবায় লাগানো যায় এবং দরকার হলে সেদিকে নেপথ্যে সরকারী সাহায্য বওয়ানো যায়, তাহলে শিল্পীদের স্বাধীনতা এবং নির্জনতাকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে তাঁদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া যায়, তাঁদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হয়। সৃষ্টিশীল শিল্পীদেব আমবা যদি অবলম্বন জোটাতে না পারি তাহলে ক্ষতিটা যে আমাদেবই এই কথাটাই আমাদের বুঝতে হবে।

দ্রষ্টব্য : ইংরেজীভাষী জগতে রুশ ব্যালেরা যে-যে নামে পরিচিত সেই নামগুলিই অনিবার্য কারণে প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রবন্ধে উল্লিখিত বইয়ের তালিকা :

মার্গো ফন্টেইন, 'অটোবায়োগ্রাফি', ডব্লিউ.এইচ.অ্যালেন, লণ্ডন, ১৯৭৫।

… 'আ ডান্সার্স ওয়ার্ল্ড্', ডব্লিউ.এইচ.অ্যালেন, লণ্ডন, ১৯৭৮।

… 'দ্য ম্যাজিক অফ্ ডান্স', বি.বি.সি. প্রকাশনী, লণ্ডন, ১৯৮০।

রুডল্ফ্ নুরেয়েভ, 'অ্যান অটোবায়োগ্রাফি উইথ পিক্চার্স', আলেক্জাণ্ডার ব্ল্যাণ্ড কর্তৃক সম্পাদিত (হডার অ্যাণ্ড স্টটন, লণ্ডন, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৭৩);

রিচার্ড অস্টিন, 'দ্য ব্যালেরিনা', ভিশন প্রেস লিমিটেড, লণ্ডন, ১৯৭৪।

ফেয়রো দ্বীপপুঞ্জ ও উইলিয়ম হাইনেসেনের কবিতা

আমার জন্ম যদিও কর্কটক্রান্তির দক্ষিণে, এবং উষ্ণতার প্রতি স্বভাবতই নাড়ীর টান, তবুও বিপরীতের আকর্ষণে উত্তরের অক্ষরেখার মেজাজও সূক্ষ্মভাবে আমাকে টানে। ধানখেত এবং আলপথকে রক্তে বহন ক'রেও আমি ট্রেনের জানলায় মাইলের পর মাইল তুষারাবৃত প্রান্তর এবং পাইনবন দেখে সময় কাটিয়ে দিতে পারি। ছাত্র-জীবনে অ্যাংলোস্যাক্সনদের শীতসমুদ্র-আন্দোলিত কাব্য আমার প্রিয় পাঠ্য ছিলো, —পরবর্তী জীবনে যার কিছু কিছু নমুনা বাংলায় অনুবাদ করেছি,—এবং অ্যাংলো-স্যাক্সন কাব্য 'বেওউল্ফ্'-এর পটভূমিকা বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে আইস-ল্যাণ্ডীয় সাগার স্বাদ আমার কাছে ঠেকেছিলো লোভনীয়। একবার আইস-ল্যাণ্ডের হেক্লা নামক বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত আগ্নেয়গিরি বিষয়ে একটি সচিত্র বই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে কয়েকবার ভেবে-ছিলাম: ইস্, ঐ ভয়ংকর গিরির শ্যামল কিনারায় আমার যদি একটা পাথরের কুটির থাকতো! অবশ্য কুটিরটার ভেতরে হীটিং-এর ভালো ব্যবস্থা কল্পনা ক'রে নিয়েছিলাম!

তাই যখন আমার হাতে এলো ইংরেজী অনুবাদে উত্তর অতলান্তিকের ফেয়রো দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী এক জীবিত প্রবীণ কবির কবিতাগুচ্ছ,—কবির নাম উইলিয়ম হাইনেসেন, অনুবাদিকা আমার পরিচিতা অক্সফোর্ড-বাসিনী অ্যান বোর্ন,[১] —তখন অত্যন্ত উৎসুক আনন্দ অনুভব করেছিলাম। জানতাম যে কোনো না কোনো দিন আমার সে-আনন্দের খবর বাঙালীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

আইসল্যাণ্ড ও নরওয়ের মাঝামাঝি জায়গায়, স্কটল্যাণ্ডের উত্তর উপকূল থেকে দু'শ' মাইল উত্তরে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ সুপ্রাচীন অন্তঃসাগরীয় অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বাসাল্টিক লাভার নিঃসরণ দ্বারা গঠিত। অ্যান বোর্ন লিখেছেন: 'উপত্যকা-গুলির গভীরতা, ঢলগুলির লম্বরূপ, বহু শিখর, অদ্ভুত অদ্ভুত আকার এবং খোঁচা-খোঁচা খাড়া শিলাসৈকত সহ পাহাড়গুলির বিপুলতা প্রবলভাবে এবং কখনও কখনও

১. William Heinesen, *Arctis, Selected Poems 1921-1972*, translated from the Danish by Anne Born, the Thule Press, Findhorn, Moray, Scotland, 1980.

ভয়ংকরভাবে প্রকাশ করে তাণ্ডবের সেই বিশালতাকে, যা একদা তাদের রূপ দিয়েছিলো। প্রধানত শীতল সামুদ্রিক জলবায়ু দ্বীপগুলিকে প্রায়ই ঢেকে রাখে কুয়াশা ও বৃষ্টির আচ্ছাদনে, পাহাড়গুলিকে পরায় ধূসর ছদ্মবেশের আলখাল্লা, যেগুলি কখনও কখনও হঠাৎ অন্তর্হিত হয় ঊর্ধ্বে, যখন চোখে পড়ে রোদ আর ছায়ার অসাধারণ সব বিন্যাস।'

দ্বীপপুঞ্জটির বর্তমান অধিবাসীরা নবম শতাব্দীর নর্স বসতিস্থাপকদের বংশধর। একাদশ শতাব্দীতে দ্বীপগুলি নরওয়ের বশ্যতা স্বীকার করে এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে নরওয়ে ও ডেনমার্কের যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে ডেনমার্কের আওতাতেও আসে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মিলিত রাজ্য দু'টি আলাদা হয়ে গেলে ফেয়রো দ্বীপপুঞ্জ পড়ে ডেনমার্কের ভাগে। বর্তমানে দ্বীপপুঞ্জটি ডেনিশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ বহুলাংশে স্বায়ত্তশাসিত এলাকা। দ্বীপবাসীদের নিজস্ব সংসদ আছে, তা ছাড়া তারা কোপেনহেগেনের সংসদেও প্রতিনিধি পাঠায়।

স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ফেয়রোইজরা একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত আত্মসচেতন জাতি। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার দরুন তারা তাদের অনেক প্রাচীন প্রথাকে সংরক্ষণ করতে পেরেছে। ফেয়রোইজ একটি স্বতন্ত্র স্ক্যাণ্ডিনেভীয় ভাষা,—চরিত্রে প্রাচীন আইসল্যাণ্ডীয় ও নর্স ভাষার কাছাকাছি,—যার পরম্পরাগত লোকসাহিত্য বিষয়ে দ্বীপবাসীরা খুবই গর্বিত। হাইনেসেন অবশ্য ব্যক্তিগত কারণে ডেনিশে লেখেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

বইটি হাতে পেয়ে স্বভাবতই কৌতূহল হয়েছিলো, কেমন দেশ এই ফেয়রো দ্বীপপুঞ্জ? এ বিষয়ে অ্যান বোর্নের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, এবং হাইনেসেনকেও তিনি চেনেন। তাই তাঁকেই অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলাম, ধৈর্য ধ'রে বিস্তৃত উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ এইরকম :

'মাছ ধরাই এ জাতির প্রধান জীবিকা। কুড়ি ফিট লম্বা এক জাতের তিমি-মাছ এদের বিশেষ প্রিয় শিকার। ফার্মিং বলতে আছে মেষপালন, পশম উৎপাদন। নিজস্ব স্টাইলে সুন্দর সুন্দর পশমী জামাকাপড় তৈরি করে এরা। কিছু আলু হয়, কিন্তু সব্‌জি বেশি হয় না এ জমিতে। কদাচিৎ চোখে পড়ে একটা বেঁটে আপেলগাছ, কিন্তু ফলের গাছ এ জলবায়ুতে বড় একটা বাড়তে চায় না। কারণ দিনরাত হু-হু ক'রে বয় ঝোড়ো হাওয়া, যার ফলে রুক্ষ হয়ে ওঠে মানুষগুলোর ত্বক্। বরং এদের একটা জরুরী কাজ হচ্ছে ঘাস শুকিয়ে খড় তৈরি করা। রোদ উঠলেই এরা সে কাজে তৎপর হয়ে

পড়ে। সেই খড় খেয়েই তো শীতকালে বেঁচে থাকে ভেড়ার দল। আজকাল দ্বীপবাসীরা বাইরে থেকে বিস্তর খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে: ফল, ফলের রস, ডেনমার্ক থেকে মাখন-পনীর। প্ল্যাস্টিকের কার্টনে ফলের রস ইদানীং খুবই জনপ্রিয়। আগেকার দিনে টাটকা খাবার বিষয়ে এরা যে কী করতো তা ভাববার বিষয়। এ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত যক্ষ্মারোগের যথেষ্ট দাপট ছিলো। সেকালে তারা প্রায় একেবারেই মৎস্যনির্ভর ছিলো। মাছ মানে তিমি, হ্যালিবাট, কড্, হেরিং ইত্যাদি। তিমিমাছের তেলও নানা কাজে লাগতো। অবশ্য ওরা নানারকমের বুনো পাখিও শিকার করে, পাখিদের ডিমও সংগ্রহ করে। এই ডিম অপহরণ একটি বিপজ্জনক কাজ, কারণ পাখিদের বাসাগুলো ঝুলে থাকে খাড়া পাহাড়ের গায়ের উপরে। ডিমগুলো প্রায়ই খাওয়া হয় সংরক্ষিত আকারে, অর্থাৎ ডিমের আচার হিসেবে।

'ফেয়রোইজ জাতির অধিকাংশ শক্তি গেছে জীবিকার পিছনে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই কোনো না কোনো পুরুষমানুষ হয় মাছ ধরতে গিয়ে নয়তো পাখির ডিম চুরি করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। এখানকার জলবায়ুকে অবশ্য ঠিক ভয়ংকর বলা চলে না। গাল্ফ স্ট্রীমের উষ্ণ স্রোত শীতের বাড়াবাড়িকে ঠেকিয়ে রাখে, যদিও ঝড়ের মতো হাওয়া দেয় সারা বছরই। বসন্ত বলতে বোঝায় মে মাসটা। জুন মনোরম মাস। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি গ্রীষ্ম খতম। স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ড অঞ্চলে যেমন, এখানেও তেমন কুয়াশা স'রে গিয়ে রোদ উঠলে আঁধার আর সবুজের পরস্পরবিরোধিতা বড় তীব্র। দেশ তো ছোটই, কিন্তু পার্বত্য পরিপ্রেক্ষিতের গুণে দেখায় যেন বিরাট: পাহাড়ের উপরে পাহাড়, চূড়ার উপরে চূড়া, উচ্চতা ও গভীরতা, কত জলপ্রপাত। নিসর্গ এবং জলবায়ু গ'ড়ে-পিটে তৈরি করেছে জাতটাকে।

'আজকাল তেল পুড়িয়ে আধুনিক কায়দায় সেণ্ট্রাল হীটিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এরা বাড়ির উষ্ণ অভ্যন্তরে ব'সে আড্ডা দিতে আর লোকসংগীত গাইতে খুব ভালোবাসে। জলবায়ুর কারণে ভূমধ্যসাগরীয় স্টাইলের রেস্তোরাঁ-সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠতে পারেনি। সম্প্রতি এসেছে টেলিভিশন। সেটগুলি দেখতে দারুণ দারুণ, যদিও স্থানীয় অনুষ্ঠান কম। অধিকাংশ অনুষ্ঠানই ডেনিশ অনুষ্ঠানের ভিডিও-টেপ্। খবরও আসে ডেনমার্ক থেকেই।

'ইদানীং এরা প্রেমে প'ড়ে গেছে মোটরগাড়িরও। গাড়ির উপযুক্ত ভালো পাকা সড়ক তৈরি করেছে। পায়ে হাঁটতেও ভালোই বাসে এরা, তবে এত

হাওয়া দেয় যে হাঁটাটা খুব একটা আরামপ্রদ নয়। মোটরগাড়িকে তাই এরা স্বাগত জানিয়েছে।

'বর্তমান সময়ে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হয়েছে যেখানে খানিকটা উচ্চশিক্ষা মেলে, তবে যারা উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে চায় তাদের ডেনমার্কে না গেলে চলে না। সাহিত্য ও সংগীত ছাড়া চিত্রশিল্পও এদের প্রিয় শিল্প। এই শিল্পে নিসর্গের নিপুণ ব্যবহার লক্ষণীয়। নিজেদের সাংস্কৃতিক সম্পদের সযত্ন সংরক্ষণে এরা বিশেষ উদ্যোগী। একাধিক সুরক্ষিত আর্ট গ্যালারি আছে।

'অন্যান্য স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জাতিদের মতো এরাও বেশ দেরিতে খ্রীষ্টান হয়। চার্চের দিক দিয়ে এরা লুথেরান, এবং সামাজিক জীবনে তার লক্ষণীয় প্রভাব পড়েছে। অবশ্য হাইনেসেন চার্চ-বিরোধী। পারিবারিক জীবন এদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত প্রৌঢ়দের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি এখনও বেশ দৃঢ়। বলা বাহুল্য, তরুণরা কন্টিনেণ্টাল ইয়োরোপের সংস্কৃতি দ্বারা কম-বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। তাদের টানে পপ্ সংগীত, টানে কোপেনহেগেনের যৌন স্বাধীনতা, যা প্রৌঢ়দের কাছে নামঞ্জুর। যেমন নামঞ্জুর ড্রাগসেবন। এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মদ্যাসক্তি নাকি একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তাই সে-নেশাও অনুমত নয়। এখানে ভ্রমণার্থীরা আসে প্রধানত স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলি থেকে। তা ছাড়া চোখে পড়ে কিছু ব্রিটিশ ও মার্কিন ভ্রমণার্থী, কদাচিৎ ফরাসীও।'

এই যে-দেশটির একটি চলমান চিত্র পাচ্ছি, ১৯০০ সালে সেখানে জন্মগ্রহণ করেন উইলিয়ম হাইনেসেন: এখন তাঁর একাশি বছর বয়স। তিনি এক অর্থে মিশ্র বিবাহের সন্তান: তাঁর বাবা ছিলেন একটি প্রাচীন ফেয়রোইজ বংশের পুত্র, পেশায় সামুদ্রিক ক্যাপ্টেন, পরে জাহাজের মালিক ও বণিক এবং তাঁর মা ছিলেন দ্বীপপুঞ্জে বসতিস্থাপক ডেনিশ বংশের দুহিতা, যে-বংশের অনেকে কোপেনহেগেনের সংগীতজগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন। মায়ের দাবিতে বালক উইলিয়ম বাড়িতে ডেনিশ ভাষায় কথা বলতেন, এবং এখানেই তাঁর ডেনিশে লেখার সূত্রপাত। বারো বছর বয়স থেকেই টাইপরাইটারের সাহায্যে স্বরচিত গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-নাটক এবং পুতুলনাচের জন্য কমেডি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখা আরম্ভ করলেন। তা ছাড়া তাঁর বাল্যকাল ছিলো একেবারেই সংগীতপ্লাবিত: তাঁর বাবা গাইতেন, মা পিয়ানো বাজাতেন, অন্যান্য আত্মীয়রাও গাইতেন, বাড়ির বাইরেও সেকালে গ্রামে গ্রামে ছিলো গানবাজনার নিয়মিত

আসর, এবং অবশেষে কেনা হলো একটি গ্রামোফোন এবং ইয়োরোপীয় মার্গ-সংগীতের অনেক রেকর্ড। অর্থাৎ সুমেরুবৃত্তের কিছুটা দক্ষিণে মানুষ হয়েও এই বালক পরিশীলিত সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত হননি।

ষোলো বছর বয়সে হাইনেসেন কোপেনহেগেনে পড়াশোনা করতে এলেন। উদ্দেশ্য ছিলো ব্যবসায়ী হওয়া, কিন্তু কোপেনহেগেনে এসে উপলব্ধি করলেন যে লেখক ও শিল্পী হওয়াই তাঁর জীবনের প্রকৃত বৃত্তি। বিজনেস স্টাডিজের পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে প্রথমে সাংবাদিকতাকে অবলম্বন করলেন, পরে পুরোপুরি পেশাদার লেখক হলেন। বিশ ও ত্রিশের দশকের কোপেনহেগেনে বামপন্থী লেখকরা ছিলেন বিশেষ প্রভাবশালী। হাইনেসেনও সে-প্রভাবের আওতায় এলেন, যদিও তিনি কোনো পার্টির সদস্য হননি, বা কোনো দিনই কোনো গোঁড়া মতবাদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেননি। ত্রিশের দশকের আদর্শবাদের পরে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের বিবর্তন তাঁকে অনিবার্যত কিছুটা নিরাশ করে, যদিও সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়াগুলি এখনও মৌলিক ও তীব্র, বিশেষত পুঁজিবাদ ও জঙ্গীবাদের মিলিত রূপের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত সোচ্চার। তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি মূলত মানবতন্ত্রী, তা ছাড়া বৃহত্তর অর্থে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, কারণ তাঁর ভাবনা-বেদনা প্রাকৃতিক তথা মহাজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক নিয়তি ও জীবন-মৃত্যুর রহস্য বিষয়ে।

১৯৩২ সালে হাইনেসেন তাঁর জীবনের কোপেনহেগেন পর্ব সমাপ্ত ক'রে ফেয়রো দ্বীপপুঞ্জে ফিরে আসেন। বিয়ে ক'রে সেখানে সংসার পাতেন: দুই ছেলে তাঁদের। মধ্যে মধ্যে ইয়োরোপে ও রাশিয়ায় ভ্রমণ বাদ দিলে তাঁর বাকি জীবন তিনি কাটিয়েছেন স্বদেশেই, এবং ঐ ক্ষুদ্র অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ দুনিয়ার অভ্যন্তরে থেকেই বিশ্বজনীন চিন্তার চর্চা ক'রে গেছেন। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, সংগীতরচয়িতা, চিত্রশিল্পী ও কারুশিল্পী। তিনি দ্বিভাষী, ফেয়রোইজে এবং ডেনিশে, কিন্তু লেখেন ডেনিশে। তাঁর কয়েকটি গদ্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ এর আগেই বেরিয়েছে, কিন্তু ইংরেজীতে তাঁর কবিতার অনুবাদগ্রন্থ এই প্রথম: সাতটি কবিতার বই থেকে কবিতা নিয়ে ভাষান্তরিত ক'রে আলোচ্য সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন অ্যান বোর্ন।

আরও অনেক কবির মতোই হাইনেসেন প্রথম জীবনে দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গিকে কবিতা লিখতেন, পরে পৌঁছেছেন পরীক্ষার স্বাধীনতায়। ডেনিশ ভাষা ইংরেজীর কাছাকাছি ব'লে একজন যোগ্য অনুবাদক মূল কবিতার ধ্বনিগৌরব ও শব্দ-

বিন্যাসের অনন্যতা অনেকটা রক্ষা করতে পারেন। অ্যান বোর্ন ডেনিশ ও নরউইজিয়ান থেকে নিয়মিত অনুবাদ করেন, সে-সূত্রে দু'টি পেশাদার অনুবাদক-সংঘের সভ্য, তা ছাড়া নিজে ইংরেজীতে কবিতা লেখেন : অক্সফোর্ডের কবিতা-ওয়র্কশপের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। তিনি ইংরেজ, বিয়ে করেছেন একজন দিনেমারকে, বিবাহসূত্রে ডেনমার্কে অনেক বছর কাটিয়েছেন, এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন কোপেনহেগেন এবং অক্সফোর্ড উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অ্যানের সুনির্বাচনের গুণে হাইনেসেনের কবিতার স্বাদবৈচিত্র্য সংকলনটিতে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। পাচ্ছি একটি বিশ্বজনীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত, কবির দেশীয় প্রেক্ষাপট ছাড়াও কোপেনহেগেন-লণ্ডন-লেনিনগ্রাদের অভিজ্ঞতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা ধর্ষিত এস্‌কিমো জাতির প্রতি সমবেদনা, পারমানবিক আতঙ্ক বিষয়ে চেতনা, তৃতীয় দুনিয়ার বেদনা, রকমারি ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, একটি পরিণত পরিশীলিত কৌতুকরস। কিন্তু সন্দেহ নেই যে উত্তরসমুদ্রপরিবেষ্টিত শিলাময় ফেয়রো দ্বীপপুঞ্জই সেই প্রকাশিত অথবা নিহিত পরিপ্রেক্ষিত যা কবিকে উত্তীর্ণ করে তাঁর দৃষ্টির ফোকাসে, সেই সক্রিয় শক্তিশালী গাঁজন যা তাঁর কাব্যরসকে দেয় তার অনন্য স্বাদ, তার সুরাসারত্ব।

অ্যান লিখেছেন : 'উইলিয়ম হাইনেসেনের কবিতা ও গদ্য প্রকাশ করে জীবনে তথা নিসর্গে ভয়ংকর ও রমণীয়ের বৈসাদৃশ্যকে। পাহাড়গুলির পাদদেশে ঝড়ের ঝাপ্‌টা থেকে নিরাপদ ছোট ছোট পোতাশ্রয়ের পাশে পাশে ছোট ছোট শহর আর গ্রাম আতিথ্যবিমুখ শিখরদের জবাব দেয়। পোতাশ্রয়গুলিতে জেলে-নৌকাদের সুন্দর সুন্দর আকৃতি তুচ্ছ করে সেই নিষ্ঠুর সমুদ্রকে, যা অনিবার্যত ক্ষত-বিক্ষত করেছে ক্ষুদ্র জাতিটিকে…।' হাইনেসেনের কবিতায় ওতপ্রোত হয়ে আছে ফেয়রোর নিসর্গ : বিস্তীর্ণ হিমেল আকাশের উষর মেদুর আলো, ভাস্কর্যের নমুনার মতো বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড, অনুক্ষণ ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানি, সমুদ্রের অন্তহীন গর্জন, বসন্তবর্ষণসিক্ত ঘাস, সংক্ষিপ্ত অথচ মদির গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মশেষে পাখিদের কাতারে কাতারে দক্ষিণপ্রয়াণ, কুয়াশা ও অন্ধকারের চিরসান্নিধ্য, কখনও কখনও জলজ্বলে তারায় ভরা রাতের বিশাল আকাশ। ফেয়রোর মানুষ পঞ্চভূতের একেবারে মুখোমুখি, প্রকৃতির চ্যালেন্‌জের সঙ্গে অহরহ মোকাবিলা ক'রে, তার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে কোনোমতে পা রাখবার একটুখানি ঠাঁই ক'রে নিয়েছে,—একটু অসতর্ক হলেই পা পিছলে প'ড়ে ঐ পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যাবে। এ অবস্থা দ্বীপবাসীদের পক্ষে নিছক ভৌগোলিক বাস্তবতা, আবার কবিদৃষ্টিতে দার্শনিক

মাত্রা দ্বারা আক্রান্তও বটে, তাই হাইনেসেনের বর্ণনা শুধু বর্ণনা থাকে না, গভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাতেও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে : ফেয়রোর মানুষের লড়াই হয়ে পড়ে বৃহত্তর অর্থে সব মানুষেরই লড়াই, মানবিক মূল্যবোধের প্রতি উদাসীন নৈর্ব্যক্তিক মহাজাগতিক শক্তির সঙ্গে মূল্যারোপপ্রয়াসী মরমানুষের নিত্যদ্বন্দ্ব। এখানে রাতের পথিক মর্মে মর্মে বোঝে নাস্তির মর্যাদা :

Here there is nothing living to be seen,
no expectation can dwell here,
now and then merely, a dark gust of wind
touches the waters' surface.

Rise here my mind
like a castle
whose windows burn with calm blue emptiness,
a dead man's stronghold mirrored pale and silent
in the icy water

('Nightwanderer')

এখানে হ্রস্ব গ্রীষ্মের অবকাশে সমুদ্রের ধারে খড় তৈরি হয়ে ওঠে জীবনের হ্রস্বতারই প্রতীক :

brief is our life by the shore of the sea,
the life of the sea is eternity !
....
Make haste, harvesters, before night streams in !

('Haymaking by the Sea')

যেখানে শীতঋতু মৃত্যুরই প্রতিবিম্ব সেখানে সান্ত্বনা এই যে যারা মৃত্যুর মিত্রপক্ষ জয় অবধারিত তাদেরই :

Those who league themselves with death are always
winners.

We are strong now. *The vast depths*
cannot breathe any fear upon us.

Space is as familiar as a room
full of well-known beloved things.
Sun and moon are the lamps,
the Milky Way its peaceful ceiling,
the Northern Lights are curtains for our couch.
Is it not a light and pleasant place?
No more desire, no more yearning,
nothing to do but sleep.

('Winter Dream')

প্রতিতুলনায় হ্রস্ব অথচ ইন্দ্রিয়মোহন গ্রীষ্মঋতু বৃদ্ধির স্পন্দিতে মন্থর; একটি শিশুর চোখে একটি গ্রীষ্মের দিনের কোনো আদি নেই, অন্ত নেই:

Without beginning and without an ending
are the everlasting summer fields.
The dock has grown its own red roof.
Deep under the moss in a stony hollow
a spring murmurs only to itself.
Young trout with finely quivering fins
live down there in the brown darkness.
Black snails hump as if lost in thought
on the dark leaves of the kingcups.
This spider sits swinging in its web,
heavy, obese.

('The Child and the Summer Day')

স্মরণীয় যে ডক্ একরকমের চারা। আশা করি উদ্ধৃতিগুলির মাধ্যমে অ্যানের অনুবাদের সার্থকতা প্রতিপন্ন হচ্ছে।

'শীতস্বপ্ন' কবিতাটি থেকে একটু আগে যে-উদ্ধৃতিটি দিলাম তা থেকে স্পষ্ট হবে যে ফেয়রোর পরিমণ্ডলে নক্ষত্রেরা গুরুত্বপূর্ণ। তারা কবির রহস্যময় বন্ধু, নিঃশব্দ, নির্লিপ্ত অথচ পথপ্রদর্শক। তারা কবিকে স্নেহের প্রশ্রয় দেয় না, আবার তাঁর উচ্চারিত স্তুতিকে অবজ্ঞা দিয়ে খাটোও করে না:

Am I worthy of your favour, Orion,
of giving me constant escort on my way ?

Stars, my friends, when my joy resounds loudest,
I'm grateful to you for your silence,
because you were mysterious, my strict friends,
and never smiled at me with maternal tenderness
nor ever met my praise with scorn.

('Stars, My Friends in the Deep Spaces')

কিন্তু এখানেও আছে মায়ার খেলা। অন্য একটি কবিতাতে জানলার ফ্রেমে আঁটা যুগলনক্ষত্রের শান্ত-উচ্ছল দীপ্তি যেন মানুষের চোখে অন্তরের ঝিলিক, আনমনা ক'রে তোলে কবিকে, জাগায় মহাজাগতিক স্নেহের অধ্যাসকে। অন্তত এটা তো ঠিক যে আমরা একই মহাবিশ্বের অন্তর্গত :

This quiet ecstatic sparkling
a little like the soul in a human eye
calls forth a longing
for something beyond all cognition—
awakes the illusion of a cosmic tenderness.

We are rocked in the same timeless womb,
for ever unfulfilled
always divided
eternally inseparable.

('Page from a Diary')

'পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি' : লিখেছিলেন আমাদের জীবনানন্দ দাশ। হাইনেসেনও লিখতে পারতেন লাইনটি। নক্ষত্রেরা যেমন তাঁর কাছাকাছি, তেমন কাছাকাছি মৃতেরাও। তিনি শুনতে পান ছায়াদের প্রাণের স্পন্দন :

The shadows no longer have eyes to see with.
The shadows have no voices but are silent.

But the shadows still have life and are not dead yet.
They all still possess a heart of darkness.

If you listen quite quietly with closed eyes
you can hear all the shadow-hearts beating.
They beat faithfully in time with yours.

('Dark Shadows Rise from Earthy Caverns')

'রাত্রি আসছে' নামে এমটি মর্মস্পর্শী কবিতায় তিনি অপরাহ্নঝটিকার ঘূর্ণায়মান বরফকুচিদের মধ্যে প্রথমে দেখতে পান মৃত্যুর দিকে ঘূর্ণায়মান নিজের জীবনের বছরগুলিকে; সেই পতনশীল রাশি রাশি তুষার-নকৃশা জাগ্রত করে এক নিবিড় রহস্যময় সুপ্ত আনন্দকে, পুনরুজ্জীবিত করে জীবনের 'সেই প্রাচীন জোড়া ধাঁধাকে' :

You yourself were only a fleeting whirling flake
on its way to extinction
in a huge and unknown darkness—
and yet : only for your eye
did things take shape and form,
the world rise great and warm from nothingness.

('Night is Coming')

তার পর সেই শুভ্র তুষারঝড়ের মধ্যে কবি সনাক্ত করতে পারেন শুধু নিজেকে নয়, অসংখ্য জীবিত ও মৃত মানুষকে,—নারী, শিশু, বন্ধু, তাদের মুখ, চোখ, প্রসারিত বাহু। বস্তুত, তাঁদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, কোনো ছেদ নেই :

They are yourself
and you are them.

('Night is Coming')

এবং তাঁরা সকলেই চিরতরুণ, কারণ হাইনেসেন চিনতে পারেন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আবর্তিত ছন্দকে, বিশ্বের 'চিরনবীন নির্ভীক অন্তরঙ্গ হাস্যকে', উপলব্ধি করেন যে যেখানে পথের শেষ সেখানেই শাশ্বত শুরু।

ভারতীয় মনকে স্পর্শ করবে 'নৃত্যশীল পপ্লার-বীজগুলি' নামক কবিতাটি।

কবির স্মরণে আসে কোপেনহেগেনের যৌবনোচ্ছল সৌহার্দ্যস্নিগ্ধ সংস্কৃতিসমৃদ্ধ তর্কমুখর দিনগুলি। সে-সময়কার অধিকাংশ সুহৃদই মৃত, শুধু প'ড়ে রয়েছে তাদের লেখা বইগুলি। সেগুলির কাগজকেও আক্রমণ করছে কাল। কবি তিনি, শব্দের আশ্চর্য শক্তির সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত, তবু তাদের অমরত্ব বিষয়ে জীবনসায়াহ্নে আর কোনো মোহ থাকে না : এ সন্দেহ দুর্নিবার হয়ে ওঠে যে শব্দরাও নশ্বর।

Then what *does* remain ?
The dancing poplar seeds ?
Perhaps not even them.
....
Nothing but the dance itself.
The dance never dies.
The dancing movement of things—
if not the corn waving and the leaves fluttering,
then at least the dance of the dust-motes in sunlight,
at least the stars' glittering
when they joyfully dance in the sky
....
He who knows the omnipotence of the dance
dwells in God
for he knows that passion kills.
Allah be praised !

('Dancing Poplar Seeds')

নানান বিচিত্র পরিবেশে সৃষ্ট সুসাহিত্য পড়ার আনন্দকে দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত আছে আমাদের অপরিচিত বিবিধ দুরধিগম্য আবহের সঙ্গে পরিচিত হবার আনন্দ, অর্থাৎ ভ্রমণের আনন্দ, সাহিত্যের মধ্যে তথ্যচিত্রের যে-দিকটা আছে তার আস্বাদনজনিত আনন্দ। একজন বড় লেখক তাঁর পরিপার্শ্বের ঐ বিশেষত্ব থেকে কীভাবে পৌঁছন সামান্যত্বে, তাঁর বাগানের ফল থেকে কীভাবে প্রস্তুত করেন সর্বরসিকজনপেয় সুরা, সেই রাসায়নিক শিল্পপ্রক্রিয়াটি অনুসরণ করতে পারলে উত্তীর্ণ হওয়া যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের আনন্দে। অ্যান বোর্নের মমত্বপূর্ণ অনুবাদগুলি আমাদের পৌঁছে দেয় এক প্রথম শ্রেণীর কবির কাছে, যাঁর রচনা

থেকে আমরা আহরণ করতে পারি এই দ্বিপর্যায়িক আনন্দ। প্রথম পাঠের পর আনচান ক'রে উঠেছিলো মন, ইচ্ছে হয়েছিলো ঝোলা কাঁধে পাড়ি দিই সেই সুদূর দেশে, যেখানে

> The milk tastes of hay and peat-smoke,
> the kettle bubbles smugly on the fire.
> Outside sing
> inconceivable millions of tons of water.
>
> Outside swoop evening flocks of wild winter starlings.
> On the slopes the sheep settle down for the night
> with dew and northern lights in their wool.
>
> ('At Home on Earth')

পৌনঃপুনিক পাঠে এলো সেই চেনার আলো, যে-আলোতে দূর হয়ে ওঠে আত্মীয়। এই দ্বিতীয় দফার আনন্দ থেকে জন্ম নিয়েছে একটি অনুবাদের অনুবাদ। হাইনে-সেনের ডেনিশ থেকে অ্যান বোর্নের ইংরেজী, তা থেকে ফের আমার বাংলা। একেই বলে অনুসৃষ্টির তাড়না, যা সৃষ্টির তাড়নারই প্রকারভেদ। যাঁরা অনুবাদের অনুবাদ বিষয়ে নিরুৎসাহ তাঁদের মনে রাখতে অনুরোধ করি যে অনুবাদের অনুবাদে 'গীতাঞ্জলি' প'ড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাকে চিনতে পেরেছিলেন ভিক্‌তোরিয়া ওকাম্পো।

॥ আমাদের পাহাড়গুলিতে শীত জ্বেলে দেয় তার সংকেতশিখা ॥

আমাদের পাহাড়গুলিতে শীত জ্বেলে দেয় তার সংকেতশিখা।
এখন আসে মৌন মণিধূসর দিনগুলি,
বেলাবেলি এসে যায় রহস্যে ভরা গোধূলি
নতুন চাঁদের লাল চাকুর আগা
দিগন্তে নিয়ে।
এসে পড়ে মেঘে ভরা দিনগুলি
তাদের ভোরের নানারঙ খনিতপ্রস্তরাভ আকাশদের নিয়ে
আর সেই সব ঝঞ্ঝাধূসর দিন, যখন সমুদ্র হয় প্রস্ফুটিত।
এখন ফিরে আসে কেলিপ্রিয় সুমেরুপ্রভা

আর রাজকীয় নক্ষত্রচিত্রাবলী,
পথে পথে উগ্রদ্যুতি তুষারকেলাস।

এখন এসে পড়ো তোমরাও,
আমার মৃত বন্ধুরা,
যাদের অভাব বড় অনুভব করি, সর্বদাই
আমার শীতের আগুনে তোমাদের হাত সেঁকে নিতে।
দ্যাখো, টেবিলে রয়েছে তোমাদের প্রিয় খাবার ও পানীয়,
আর যে-সংগীত তোমরা ভালোবাসতে তা
ভ'রে দিচ্ছে ঘর।
এখানে প্রাণ পায় তোমাদের কণ্ঠস্বরগুলি,
তোমাদের স্নহাস্য,
তোমাদের বিস্ময়েব কলধ্বনি
যখন মহান উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকার
নিযুতবর্ষবয়স্ক আলো
খোলা জানলা দিয়ে এসে পৌঁছয় দূরবীক্ষণে
এবং উজ্জ্বল করে আমাদের নশ্বর চোখগুলিকে
শাশ্বতের দুর্মূল্য ফোঁটায়।

একটি এপিক আয়তনের উপন্যাস

'যুগ যুগ জীয়ে' একটি সুবৃহৎ, এপিক আয়তনের উপন্যাস। এর স্থান বিস্তৃত কলকাতার পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে কলকাতা পর্যন্ত, সময়ের ব্যাপ্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা-কালীন বছরগুলি থেকে গ্রেট ক্যাল্‌কাটা কিলিং পেরিয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী দিন-গুলি পর্যন্ত, এবং এই বিরাট ক্যান্‌ভাসে নৈপুণ্যের সঙ্গে বিধৃত হয়েছে অনেকগুলি জীবনকাহিনী।

উপন্যাসটি পড়ার অভিজ্ঞতাকে আমার তুলিত করতে ইচ্ছা করে একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষে দীপ হাতে ক্রমে ক্রমে একটি বিরাট দেয়ালচিত্রকে দেখে নেওয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে : একে একে ফুটে ওঠে মানুষদের মুখ,—কখনও-বা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠে মিলিয়ে যায়,—কোথাও বা স্তূপীকৃত জনতা, ঐ দলবদ্ধতাই যাদের পরিচয়, আমাদের এগোতে হয়, পেছোতে হয়, হাতের বাতিটা তুলে ধরতে হয়, নামাতে হয়, এবং সব শেষে স্মৃতিতে লেগে থাকে একটা রেশ, একটা জটিল স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতো, বুঝতে পারি যে প্রত্যক্ষ করেছি একটি বিশাল অর্থবহ ছবিকে।

যা আমাকে সব থেকে বেশি স্পর্শ করে তা জীবনের প্রতি লেখকের গভীর মমতা, এই পৃথিবীর ধর্ষিতদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি, যে মমতা ও সহানু-ভূতির সূত্র ধ'রে তিনি আমাদের বারে বারে দাঁড় করান মৌলিক সমস্যাদের মুখোমুখি। এই জীবনজিজ্ঞাসা কম-বেশি পরিস্ফুট মালতী-চন্দ্রনাথ-মধুদি-বৈজু ইত্যাদি একাধিক চরিত্রে, যদিও এর বিশেষ মুখপাত্র নিশ্চয়ই আর্টিস্ট-চরিত্র ত্রিদিবেশ, যার মধ্যে উপন্যাসকার নিঃসন্দেহে চালিত করেছেন তাঁর নিজস্ব শিল্পী-ব্যক্তিত্বের বেশ কয়েক ভোল্‌ট্‌ বিদ্যুৎ। (এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যখন মধুদি 'যেন অনেক দূর থেকে' ত্রিদিবেশকে বলেন : 'ত্রিদিবেশ, আবার বলছি, জীবনটা অনেক বড়—শিল্পের থেকেও। জীবনই যেন তোমার শিল্পের কাজে লাগে'। এ কি সমরেশ বসুরও প্রত্যয় নয়?)

অন্ধ, কপট ও নির্মম সময়ে ও পরিপার্শ্বে ত্রিদিবেশের মধ্যে বিশেষভাবে মূর্ত বিবেক, সংবেদনশীলতা, অনুসন্ধিৎসা, আত্মবিশ্লেষণ, ফলত বিচ্ছিন্নতাবোধ। যেখানেই সে মানুষকে মানুষের শিকার হতে গ্যাখে, সেখানেই তার দৃষ্টি প্রখর ও জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। সে গ্যাখে দিনের বেলায় চলমান ট্রেনের কামরায় একটি

মেয়েকে জনতা কীভাবে 'ধর্ষণ করে' : তার মনে প্রশ্ন জাগে, 'মেয়েটিকে নামিয়ে দেবার কী অধিকার আছে এইসব লোকদের'। হতে পারে যে ঐ মেয়েটি পেশায় গণিকা, এবং সেই কারণেই, বহুরঞ্জন তার বৃত্তি বলেই, জনগণের হাতে তার লাঞ্ছনা আরও নিদারুণ। ধুকড়িবাগানে ত্রিদিবেশ আচমকা আবিষ্কার করে যে বেশ্যালয় বলতে শুধু নগ্নতার মাদকতা বোঝায় না, সেখানে থাকে 'স্বামীর অধিকার, বউয়ের বেশ্যাবৃত্তি, শিশুর লাঞ্ছনা, মায়ের কান্না'। পার্টি-ইডিওলজির হিংস্র প্রতিন্যাসের সম্মুখীন হয়ে সে বুঝতে পারে যে বিপ্লবের চেয়ে মনুষ্যত্বকে সে বড় ক'রে ছাখে।

ত্রিদিবেশ স্কুলের মেয়েদের প্রতি বখাটে ছেলেদের ইতরামি সহ্য করতে পারে না ; চীনা-বাঙালী সংঘর্ষে আহত চীনা মানুষের প্রতি সমবেদনা অনুভব করতে পারে ; সে জানে সম্পর্কের অবক্ষয়কে, সেই মানসিক অবস্থাকে যা 'নিরুত্তর জটিলতা', যেখানে 'বিন্দুমাত্র আবেগ' থাকে না, থাকে না 'ভালবাসার কোনো অনুভূতি', থাকে শুধু 'দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ' ; মন্বন্তর আর দাঙ্গা এ দু'য়ের কবল থেকে আপতিকভাবে বেঁচে গিয়ে সে বুঝতে পারে যে 'এই আকস্মিক বাঁচার মধ্যে, বেঁচে থাকার সান্ত্বনার থেকে, মৃত্যুর অনিবার্যতাই' বিশেষভাবে সূচিত হয়।

মালতী আর চন্দ্রনাথের পরিস্থিতিতে সমরেশ বসু জ্বলন্ত করেছেন বাঙালী 'ভদ্র' জীবনের একটি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিকে। ব্রাহ্মণকন্যা মালতী তার বয়ঃসন্ধির সময়ে হৃত এবং ধর্ষিত হয় আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকেদের দ্বারা। হরণকারীদের কোনো সাজা তো হয়ই না, বরং তারা উলটে কলঙ্ক রটায় বালিকার নামে। কোনোমতে তার খাওয়া-পরার একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্যে বালিকার বাবা তার বিয়ে দেন অপর এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবাড়ির এক পাগলের সঙ্গে। তার বর যে পাগল, মেয়েটিকে সে কথা তার বিয়ের আগে জানতে দেওয়া হয় না,—সে আবিষ্কার করে বিয়ের পরে। ক্রমশ মালতী তার দুঃসহ অবস্থার বিরুদ্ধে মূর্তিমতী প্রতিবাদ-রূপে আত্ম-উন্মোচন করে,—ঐ প্রেক্ষাপটে যতদূর সম্ভব।

মালতীর প্রেমিক চন্দ্রনাথকে আমার খানিকটা শরৎচন্দ্রীয় ধাঁচের মনে হয়েছে। তিনি সদয় ও বিবেকবান কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত, প্রথা ও মনুষ্যত্বের দ্বন্দ্বে কোনটাকে বেছে নেবেন তা ঠাহর করতে পারেন না, কখনও কখনও প্রথাকে অমানুষিক জেনেও তার সঙ্গে আপস করতে চেষ্টা করেন এবং তার কাছে নিজের প্রেমিকাকে বলি দিতে উদ্যত হন। মালতীর মতো প্রতিবাদের দৃপ্ত সৎসাহস তাঁর নেই। তাই বৈজু যেভাবে ফুলবাসিয়াকে বাঁচায় মালতীকে চন্দ্রনাথ সেভাবে তার পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে পারেন না।

একটি বৃহৎ গ্রন্থে কীর্তির কিছুটা অসমানতা নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত নয়। মেয়েদের সঙ্গে ত্রিদিবেশের বিভিন্ন মোলাকাতগুলির মধ্যে ন-মামী (যিনি এক অর্থে বালক ত্রিদিবেশকে ধর্ষণ করেন), হেডমিস্ট্রেস মধুদি (সম্ভাবনাময় হয়েও কিছুটা দ্বিমাত্রিক, কারণ এঁকে ভেতর থেকে বড় একটা দেখানো হয় না, মোটের ওপর বাইরে থেকেই দেখানো হয়), বস্তিবাসিনী মণ্ডলি, বা স্কটিশ মহিলা মিসেস ক্যাকাম্বারের (একটি চমৎকার স্কেচ) সঙ্গে তার এনকাউণ্টারের বিবরণ আমার কাছে বেশ বিশ্বাসযোগ্য ঠেকেছে ; ত্রিদিবেশ ও শিউলীর সম্পর্কের ভাঙনও পাকা হাতে আঁকা ; কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে উপন্যাসের শেষের দিকে ত্রিদিবেশ আর জয়ার সম্পর্কের চিত্রণে লেখক একটু তাড়াহুড়ো ক'রে ফেলেছেন। যে-জয়ার কথাবার্তা শুনে তাকে ত্রিদিবেশের ছেলেমানুষ ব'লেই মনে হয়, যদিও তার সান্নিধ্য ভালো লাগে, সেই জয়া যে কী ক'রে ত্রিদিবেশের পোস্টার আঁকায় ভৃত্যবৎ সাহায্য করার পর থেকে দ্রুতগতিতে চিত্রশিল্পী ত্রিদিবেশের জীবনে 'প্রবাহিনী শক্তি' হয়ে যায়, হয়ে যায় 'সীমাহীন মুক্ত', সে-প্রক্রিয়াটা লেখক খোলসা ক'রে দেখাননি, রাস্তাটা একটু শর্টকাট হয়ে গেছে। অজয় আর কাননের পরিস্থিতিটাও আমার চোখে একটু স্টিরিওটাইপ্‌ড্‌ ঠেকেছে। কখনও কখনও মনে হয়েছে যে মেয়েদের হাবভাব বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক ক্লিশের আশ্রয় নিয়েছেন,—খিলখিল হাসি, শাড়ির আঁচল খ'সে যাওয়া ইত্যাদি,—কিন্তু হয়তো এগুলো এই উপন্যাসের জগতে নিছক বাস্তবতা, এবং ঐ জগৎটা থেকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে স'রে এসেছি ব'লে এগুলো আমার বেশি ক'রে নজরে পড়ে।

একটি ছোট প্রশ্ন : গ্রন্থের প্রথমদিকে মালতীর দাসীর নাম অচলা, পরে চপলা, এটা কি ইচ্ছাকৃত ? এই পরিবর্তন কি একটি প্রতীকী কৌশল, না মালতী দাসী বদলিয়েছে ? মালতী ও চন্দ্রনাথের নিভৃত সাক্ষাৎকারগুলিতে দাসীর দূতী-ভূমিকা যেহেতু দেখানো হয়েছে, সেহেতু প্রশ্নটি ছোট হলেও অবান্তর নয়।

সমরেশ বসুর লেখার একটি বিশেষ আকর্ষণ তাঁর ভাষা।

'অন্ধকার কোনো বাধা না, অজয়ের চোখে সবই স্পষ্ট, রাস্তার জল-কলে স্ত্রী-পুরুষের ভিড়, জটলা, তর্কাতর্কি, স্নান, সাবানের গন্ধ, বালতি কলসীর ঝংকার। আনমনেই তার হাত মাঝে মাঝে বেল বাজায়, পথে মানুষ চলে। পশ্চিমের দিগন্ত থেকে সাদা মেঘের আলো এখন উধাও, আকাশ কালো, নক্ষত্ররা মুক্ত। পৃথিবীর দিকে ফেরানো মুখ ঝিকমিক করে এবং গাঢ়তর ছায়ামূর্তি

গাছপালা এখন বাতাসে টলে। জোনাকিরা জলে। সাইকেলের গতি মন্থর, রাস্তার দু' পাশে সংসারের নানা শব্দ ও স্বর।'

এই বর্ণনা একাধারে লক্ষ্যভেদী ও ব্যঞ্জনাময়, সৃষ্টি করে সেই আবহকে যা প্রতীতির প্রয়োজনীয় পটভূমি।

'যুগ যুগ জীয়ে' একটি স্মরণীয়, মহৎলক্ষণাক্রান্ত, প্যানোরামিক উপন্যাস। আশা করি এ বই অনেক যুগ বেঁচে থাকবে।

সমরেশ বসু, "যুগ যুগ জীয়ে", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮৮, মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

সাংবাদিকদের চলাফেরার স্বাধীনতা :
সাইমন উইন্‌চেস্টারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

খবরের যোগান ও পরিবেশনই যাঁদের পেশা, অবস্থাগতিকে কখনো কখনো তাঁরাই হয়ে যেতে পারেন খবরের কাগজের হেডলাইন। আর্জেন্টিনার কারাগারে সাতাত্তর দিন কাটিয়ে সম্প্রতি ঘরে ফিরে এসেছেন ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন উইন্‌চেস্টার, যিনি বর্তমানে 'সান্‌ডে টাইম্‌স্' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত এবং আগে 'গার্ডিয়ান'-এর জন্য কাজ করেছেন। তিনি থাকেন অক্সফোর্ডের প্রান্তবর্তী ইফ্‌লি-নামক ছোট্ট গ্রামে এবং ফিরে এসে দেখেন যে অক্সফোর্ড অঞ্চলে তিনি স্থানীয় হীরোতে পরিণত হয়েছেন।

গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে 'অবজার্ভার' পত্রিকার ইয়ান ম্যাদার ও টোনি প্রাইমের সঙ্গে উইন্‌চেস্টার গ্রেপ্তার হন আর্জেন্টিনার রিও গ্রান্দে বিমানবন্দরে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তাঁরা ব্রিটেনের তরফে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ সময় তাঁরা আটক ছিলেন তিয়েরা দেল ফুয়েগোর প্রধান শহর উশুআয়া-য়, যা কিনা পৃথিবীর দক্ষিণতম অসামরিক জনপদ। ফকল্যাণ্ডের যুদ্ধের শেষে অবশেষে তাঁরা জামিনে খালাস পেয়েছেন, এবং আশা করা যায় তাঁদের আর ফিরে যেতে হবে না।

সাইমন উইন্‌চেস্টার একজন আন্তর্জাতিক-খ্যাতি-সম্পন্ন সাংবাদিক। দশকাধিক কাল ধ'রে পৃথিবীর বিভিন্ন দ্বন্দ্বচ্ছিন্ন বিক্ষুব্ধ এলাকা থেকে পাঠানো তাঁর নির্ভীক প্রতিবেদনগুলি সাংবাদিক হিসেবে তাঁর নিষ্ঠা ও সততাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফকল্যাণ্ডের যুদ্ধের আগে ব্রিটেনে দাঙ্গা হাঙ্গামার মাধ্যমে গণপ্রতিবাদের ঐতিহ্য বিষয়ে একটি সাহসী অনুষ্ঠান তিনি টেলিভিশনে পেশ করেন। ভারতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ অনেক দিনের। তিনি প্রথম ভারতে যান ১৯৭১ সালে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে কলেরা মহামারী বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠাতে এবং তখনই কলকাতাকে ভালোবেসে ফেলেন। পরবর্তীকালে দিল্লীতে সপরিবারে দেড় বছর কাটিয়েছেন। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ : সর্বত্রই তাঁর বন্ধুবান্ধব রয়েছেন। কলকাতা সারা পৃথিবীর মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রিয় শহর, [illegible] প্রেমে পড়েছেন, বললেন আমাকে। তাঁর ইফ্‌লি গ্রামের

বাড়িতে সম্পূর্ণ ঘরোয়া চায়ের আসরে তাঁর আর্জেন্টাইন অভিজ্ঞতা বিষয়ে তিনি আমার সঙ্গে যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন, তার ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা প্রতিবেদন পাঠাচ্ছি এই ভরসায় যে বাঙালী পাঠকদের কাছে তা কৌতূহলোদ্দীপক হবে।

সাংবাদিকের কর্তব্য দায়িত্বের সঙ্গে পালন করতে গেলে কঠিন ঝুঁকি নেওয়া যে কখনো কখনো অপরিহার্য হয়ে পড়ে এ কথা উইন্‌চেস্টারের মতো সাংবাদিকের কাছে সুপরিচিত হলেও সাধারণ কতগুলি ঘটনা-পরম্পরার মাধ্যমে একজন মানুষ যখন হঠাৎ আবিষ্কার করে যে সে আর স্বাধীন মানুষ নয় তখন সে-আবিষ্কার দৃঢ়চিত্ত মানুষকেও রূঢ়ভাবে ধাক্কা দেয় বৈ কি। উইন্‌চেস্টারের ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি ছিলো এইরকম। ঘনায়মান ফকল্যাণ্ড সংকট বিষয়ে তাঁর কাগজকে খবর সরবরাহ করার জন্যে ২৮শে মার্চ তারিখে তিনি ব্রিটেন থেকে মাদ্রিদ হয়ে বুয়েনোস আইরেসে যাত্রা করেন। সেখান থেকে ৩০শে মার্চ তারিখে যান কোমোদোরো রিভাদাভিয়া বন্দরে, যেখান থেকে সপ্তাহে একটি ক'রে বিমান ছাড়তো পোর্ট স্ট্যানলির লক্ষ্যে। তখন ফকল্যাণ্ডে সাংবাদিকদের যেতে দেওয়া হচ্ছিলো না। উইন্‌চেস্টার এই ব'লে প্লেনে চাপেন যে তিনি এবং তাঁর অপর তিনজন সহকর্মী মেষপালক। তাঁরা পোর্ট স্ট্যানলিতে পৌঁছবার তিন দিন পরে আর্জেন্টিনা ফকল্যাণ্ডে তার বাহিনী পাঠায়। ২রা এপ্রিল সকালে ঘণ্টাতিনেকের চেষ্টার পর আর্জেন্টাইন বাহিনী ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। সেদিনকার বাকি সময়টুকু উইন্‌চেস্টার ও তাঁর সহকর্মীদের দ্বীপে থাকতে দেওয়া হয়, কিন্তু পরের দিন দুপুরে ফকল্যাণ্ড-আক্রমণের তত্ত্বাবধায়ক জেনরল গার্সিয়া মনে করেন যে তাঁদের উপস্থিতি আর বাঞ্ছনীয় নয়, এবং ফলে সেদিন সন্ধ্যায় (৩রা এপ্রিল) তাঁদের বিমানযোগে ফেরত পাঠানো হয় আর্জেন্টিনায়, কোমোদোরো রিভাদাভিয়ায়। এর পর উইন্‌চেস্টার বুয়েনোস আইরেসে এক সপ্তাহ কাটান এবং তাঁর সংবাদপত্রের জন্য সংবাদ সরবরাহ করেন। ১০ই এপ্রিল তারিখে বুয়েনোস আইরেসের কেন্দ্রে একটি জয়সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং একই দিন উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট গাল্‌তিয়েরির সচিব কর্তৃক প্রদত্ত বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য একটি পার্টিতেও, যেখানে নাকি বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয় যে আর্জেন্টিনায় ব্রিটিশ সাংবাদিকদের উপস্থিতি স্বাগত, যে ব্রিটিশ জনগণ বা প্রেসের সঙ্গে তাঁদের কোনো বিবাদ নেই, প্রতিবাদ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। বলা হয় যে আর্জেন্টিনা মুক্ত ও খোলা দেশ, তাঁরা—সাংবাদিকেরা—যেখানে খুশি যেতে পারেন। এই আশ্বাস পেয়ে

'অবজার্ভার'-এর ম্যাদার ও প্রাইমের সঙ্গে উইন্‌চেস্টার ১১ই এপ্রিল তারিখে ফিরে আসেন কোমোদোরো রিভাদাভিয়ায়, আর্জেন্টিনার যুদ্ধপ্রস্তুতি দেখতে। ১২ই এপ্রিলে তাঁরা দক্ষিণ পাতাগোনিয়া ও তিয়েরা দেল ফুয়েগোতে যুদ্ধের তোড়জোড় দেখতে যান। থামেন রিও গাজেগোস্, রিও গ্রান্দে ও উশুআয়ায়। কোমোদোরো রিভাদাভিয়া ও রিও গাজেগোস্-এর অন্তর্বর্তী অঞ্চলে টোনি প্রাইম বিমানের জানলা দিয়ে কিছু ছবি তোলার চেষ্টা করলে তাঁকে সে-কাজ করতে বারণ করা হয়। রিও গাজেগোসে মিলিটারি কর্তৃপক্ষ তাঁদেরকে ডেকে জানিয়ে দেন যে বিমানবন্দরে ছবি তোলা নিষিদ্ধ। উশুআয়াতে পৌঁছে এদিক ওদিক ঘুরে যা দেখবার দেখে এক রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোরে তাঁরা আবার রওনা হন উত্তরের দিকে। সেদিন ভোরে (১৩ই এপ্রিল) তাঁরা যখন প্লেনে চাপছিলেন তখন একজন ফোটোগ্রাফারকে তাঁদের ছবি তুলতে দেখা যায়, কিন্তু সাংবাদিকত্রয় এ নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁরা যখন রিও গ্রান্দেতে পৌঁছন তখন সকাল আটটা কি ন'টা, এবং তখনও বেশ অন্ধকার। সেখান থেকে বুয়েনোস আইরেসগামী জেটের জন্য তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে আড়াই ঘণ্টার মতো, অতএব তাঁরা বিমানবন্দরের দোতলায় ডিপার্চার লাউন্‌জে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেখান থেকে সামরিক বিমানদের টেক্‌-অফ্‌ ও অন্যান্য কসরত তাঁদের নজরে পড়ে। সাইমন উইন্‌চেস্টার তাঁর বাইনোকুলার দিয়ে কতগুলি সামরিক বিমানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। সামরিক পুলিশের কয়েকজন লোক তাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, কিন্তু তখনও সাংবাদিক তিনজন এ নিয়ে ভাবেননি। তাঁদের প্লেনের সময় এগিয়ে এলে তাঁরা নিচে নেমে আসেন। এই সময়ে আর্জেন্টাইন নৌবাহিনীর একজন অফিসার তাঁদেরকে বলেন তাঁর সঙ্গে বাসে চেপে একজন নৌসেনাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে যেতে, কিন্তু তাঁরা স্বভাবতই রাজী হননি, কারণ তাহলে তাঁরা তাঁদের প্লেন ধরতে পারবেন না। পনেরো মিনিট বাদে অফিসারটি ফিরে এসে জানান যে তাঁদের ভি. আই. পি. লাউন্‌জে একবার আসতে হবে, ঐ প্লেনটা তাঁরা ধরতে পারবেন না, সন্ধে সাতটায় আরেকটা প্লেন আছে। গ্রেপ্তার হয়ে তাঁরা যান স্থানীয় থানায় ; সেখান থেকে অনেক রাতে সামরিক বিমানযোগে তাঁদের পাঠানো হয় বুয়েনোস আইরেসে। সেখানে বিমান-বন্দরসংলগ্ন মিলিটারি ব্যারাকে তাঁদের দু' দিন আটক রাখা হয়। রিও গ্রান্দেতে *তাঁদের বলা হয়েছিলো যে সুইস কূটনৈতিক দপ্তরের তত্ত্বাবধানে বুয়েনোস আইরেসে* তাঁদের মুক্তি দেওয়া হবে, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না, এবং বস্তুত

সুইসদের কোনো খবর দেওয়া হয়নি। ১৫ই এপ্রিল তাঁদের আবার ফেরত পাঠানো হয় দু' হাজার মাইল দক্ষিণে তিয়েরা দেল ফুয়েগোতে: প্রথমে রিও গ্রান্দেতে, সেখানে এক রাত কাটানোর পর ফের পৃথিবীর দক্ষিণতম জনপদ উশুআয়ার হাজতে।

সেখানে তাঁদের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন সুরিনাম থেকে আগত একজন সাংবাদিক। তিনি লণ্ডনে টেলিগ্রাম পাঠান। জেলখানাতে ব'সেই সাংবাদিক তিনজন নিজেদের রেডিও-সেট থেকে খবর শোনেন যে 'সান্‌ডে টাইম্‌স্‌' ও 'অবজার্ভার' থেকে কয়েকজন তাঁদের তিনজনের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে আসছেন: তাঁদের রেডিও-সেটগুলি সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের রাখতে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ইতিমধ্যে আর্জেন্টাইন সরকার ঘোষণা ক'রে দেন যে তাঁদের আটকে রাখা হয়েছে গুপ্তচরবৃত্তির গুরুতর অভিযোগে।

সাংবাদিক তিনজন আট ফুট লম্বা আট ফুট চওড়া একটি ঘরে একত্র থাকতেন। তাঁদের কারাবাসের প্রথমদিকটা ছিলো দক্ষিণ গোলার্ধের হেমন্তকাল; শেষের দিকে বেশ শীত প'ড়ে যায়। কয়েদঘরের উত্তাপের ব্যবস্থা সচল ছিলো না, কিন্তু তাঁদের আলাদা হীটার দেওয়া হয়। শৌচাগারের অবস্থা ছিলো বীভৎস। খাবার-দাবার অবশ্যই উপাদেয় ছিলো না, কিন্তু তা খেয়ে তাঁরা প্রাণধারণ করতে পেরেছেন এবং তাঁদের স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভালোই আছে।

তাঁদের প্রতি কারারক্ষীদের ব্যবহার ছিলো সামরিক পরিস্থিতির ওঠা-পড়ার সঙ্গে জড়িত। যুদ্ধের প্রথমদিকে তাঁদের জেলখানার অন্য বন্দীদের থেকে দূরে দূরেই রাখা হয়, পাছে কেউ তাঁদের আক্রমণ করে। 'বেলগ্রানো' জাহাজের বিনাশের পর থেকে তাঁদের প্রতি রক্ষীদের ব্যবহার অনেক বেশি কঠোর হয়ে যায়। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে তাঁদের টেলিফোন-সংযোগের অধিকার, কারও সঙ্গে দেখা করার অধিকার তথা তাঁদের ইংরেজী বইপত্র কেড়ে নেওয়া হয়। সুইস কূটনৈতিক দপ্তরের সুপারিশে ক্রমশ অধিকারগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সাইমন উইন্‌চেস্টার সাধারণভাবে লক্ষ করেছেন যে আর্জেন্টাইনরা বড়াই করতে, চাল মেরে বড় বড় কথা বলতে খুব ভালোবাসে। সেসব কথার পিছনে সার থাকে কম, ফাঁকি থাকে অনেক বেশি। তারা মুখে যেটা বলে, প্রায়ই কাজে করে তার উলটোটা। তারা যদি আশ্বাস দেয় 'নো প্রবলেম' তাহলে সমস্যার উপস্থিতি ধ'রে নেওয়া যায়। তারা পরস্পরকে লক্ষণীয়ভাবে "বুলি করার' চেষ্টা ক'রে থাকে। কিন্তু কেউ যদি তাদের 'বুলিইং'-এর কাছে

নতিস্বীকার না ক'রে দৃঢ়ভাবে নিজের দাবির উপরে জোর দিয়ে যায়, তাহলে তারা সুড়সুড় ক'রে হার মেনে নেয়। রক্ষীদের সঙ্গে বোঝাপড়াতেও উইন্‌চেস্টারকে এই দৃঢ় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে, এবং তা কার্যকর হয়েছে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর্জেন্টিনার লোকেদের মানসিক অবস্থা এখন কিরকম? এই যুদ্ধ, যেখানে একটুকরো মাটির জন্য দু' পক্ষ মিলিয়ে হাজারখানেক মানুষ মরেছে, কি আখেরে সামরিক শাসনের বিপদ বিষয়ে আর্জেন্টিনার নাগরিকদের অবহিত ক'রে দেবে? ঘটনাগুলি কি তাদের রাজনৈতিক বোধকে ধাক্কা দিয়ে চেতিয়ে তুলবে?

উইন্‌চেস্টার বললেন, ঘটনাগুলি সদর্থকভাবে তাদের কতটা চেতিয়ে তুলবে তা বলা মুশকিল, কিন্তু নঞর্থকভাবে চেতিয়ে তো তুলেছে। অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় একটা যুদ্ধের ভিতরে দেশকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য গাল্‌তিয়েরি-সরকারের উপর তারা ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষত এটা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে দেশের ভিতরকার অত্যন্ত খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদি থেকে নাগরিকদের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই গাল্‌তিয়েরি পরিস্থিতিটি তৈরি করেছিলেন। পরাজয়ের গ্লানি, এতজন লোকের মৃত্যু, বিরাট জাতীয় দেনা : সব মিলিয়ে সেখানকার মানুষের মেজাজ এখন হতাশ ও ক্ষিপ্ত। তাদেরকে বোঝানো হয়েছিলো যে এই যুদ্ধে জিততে পারলে জাতি হিসেবে পৃথিবীর কাছ থেকে তারা স্বীকৃতি পাবে। তাদেরকে কেউ বলেনি যে এর মধ্যে একটা ধাপ্পা ছিলো। তারা এখনই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ একটি বিশাল ভূখণ্ডের অধিকারী। কতগুলো দ্বীপকে জবরদখল করতে পারলেই পৃথিবীর চোখে তাদের মর্যাদা কেন বেড়ে যাবে? চিলির সঙ্গেও কতগুলো দ্বীপ নিয়ে তাদের বিবাদ আছে, এবং ফকল্যাণ্ডে পরাজয়ের গ্লানিকে মুছে ফেলার জন্য তারা যে ইচ্ছে ক'রে চিলির সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে পারে চিলির লোকেরা সে-আশঙ্কায় আশঙ্কিত। প্রতিটি আর্জেণ্টাইন বালক ও বালিকাকে স্কুলে শেখানো হয় যে মাল্‌ভিনা দ্বীপপুঞ্জ তাদেরই সম্পত্তি, কারণ দেড়শো বছর আগে ব্রিটিশরা ঐ দ্বীপপুঞ্জকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলো, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে সে-সময়ে ঔপনিবেশিক ক্ষমতারা সকলেই একে অন্যের কাছ থেকে জমি কাড়াকাড়ি করছিলো, এবং তার পরে ঐ দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ বসতিস্থাপকরা দেড়শো বছর ধ'রে চাষবাস আর মেষপালন করেছে, তাদের এখন কী হবে। এই দেড়শো বছরকে আর্জেণ্টাইনরা পাত্তা দিতে চায়

না, কিন্তু সত্যি কথাটা এই, যে মাল্‌ভিনা দ্বীপপুঞ্জকে যদি আর্জেন্টিনার হাতে ফেরত দিতে হয়, তাহলে আর্জেন্টিনাকেও স্পেনের হাতে ফেরত দিতে হয়, এবং স্পেনের পক্ষে উচিত হয় দেশটাকে আমেরিকার আদিবাসীদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। স্প্যানিয়ার্ডরা আমেরিকার আদিবাসীদের যেরকম নির্মমভাবে উৎসাদিত করেছিলো সেটা যে পৃথিবীর বৃহত্তম জাতিধ্বংসক্রিয়া সে-কথা তারা এখন সুযোগ বুঝে ভুলে গেছে।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, এ ব্যাপারে আর্জেন্টিনার বুদ্ধিজীবীদের মতামত যাচাই করার কোনো সুযোগ তাঁর হয়েছে কিনা। তিনি বললেন, না, হয়নি, কিন্তু তিনি শুনেছেন যে তাঁরা অনেকেই চুপ ক'রে আছেন, কেননা একমাত্র নীরবতার দ্বারাই তাঁরা প্রতিবাদ জানাতে পারেন। অবস্থাটা করুণ ও ট্র্যাজিক। ফকল্যাণ্ডে পরাজয়ের আগে থেকেই আর্জেন্টিনার মূল্যস্ফীতির হার পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ হয়ে আছে; তা থেকে কোনো জাতির আত্মসম্মান বাড়ে না। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে পারেননি বটে, কিন্তু জেলখানার অন্য বন্দীদের কাছ থেকে স্প্যানিশে—বস্তুত জেলখানার স্প্যানিশে—তালিম নিয়েছেন, এবং তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বন্দীরা অবশ্যই মিলিটারি শাসকদের বিরুদ্ধে, কিন্তু তারা সাধারণভাবে কর্তাব্যক্তিদেরই বিরুদ্ধে। আর্জেণ্টাইনদের মধ্যে গণতন্ত্রের জন্য কোনো সাধারণ প্রস্তুতি লক্ষণীয় নয়।

'ব্রিটেনের বৈদেশিক দপ্তর মনে করে', বললেন সাইমন উইন্‌চেস্টার, 'যে পৃথিবীর যেখানে-যেখানে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট রয়েছে, সে-সমস্ত জায়গা থেকেই আমাদের একে-একে স'রে আসা উচিত। আমি এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। গণ্ডগোল বাধে যখন ফকল্যাণ্ডের লোকেরা বলে যে তারা বুয়েনোস আইরেসের কর্তৃত্ব মানবে না, যখন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রটেস্টাণ্টরা ডাবলিনের শাসন মানতে রাজী হয় না, যখন হংকঙের লোকেরা বলে যে তারা রক্তে চীনে হলেও পিকিঙের ছাতার নিচে যেতে অসম্মত। তাদের কাছে জরুরী কতগুলো কারণে এইসব বৃহত্তর প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে তারা নারাজ। এদের জন্য কী করা হবে। হয়তো এদের শেষ পর্যন্ত ছোট-ছোট স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়ে যেতে হবে, জাতিপুঞ্জে নিজেদের আসন নিতে হবে। ব্রিটেনের পক্ষে এদের জরুরী অবস্থায় সাহায্য করা সম্ভব, কিন্তু বিরাট কোনো বাহিনীর সাহায্যে বছরের পর বছর এদের রক্ষা ক'রে যাওয়া তো সম্ভব নয়।'

একজন সাংবাদিকের পক্ষে নিজেই সংবাদের বিষয়বস্তু হয়ে যাওয়া কিরকম

বোধের সৃষ্টি করে তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমার একটু অস্বস্তিই হচ্ছে। আমি চাই যে আমাকে নিয়ে স্থানীয় কাগজদের হৈ-চৈ ক'মে যায়, যত শিগগির সম্ভব স্বাভাবিকভাবে কাজ আরম্ভ করতে চাই। আমার ছেলেগুলো পর্যন্ত স্কুলে হীরো ব'নে গেছে। তবে মানতেই হয় যে অক্সফোর্ড আমাকে যে-সমাদরের সঙ্গে স্বাগত করেছে তা আমাকে স্পর্শ করেছে। অক্সফোর্ডের মজাটা এই যে এটা একাধারে একটা বড় শহর, যেখানে প্রাপ্য আন্তর্জাতিকতার স্বাদ. আবার এটা একটা ছোট গ্রামের মতো ঘরোয়াও বটে। ইফ্‌লি গ্রামের লোকেরাও এ ক' মাস আমার স্ত্রীকে মানসিক এবং অন্যান্য নির্ভর যুগিয়েছে।'

সাইমনের স্ত্রী জুডি বলেন যে তাঁর স্বামীর মুক্তির জন্য ভারতীয় সাংবাদিকদের তৎপরতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আরও বলেন যে ভবিষ্যতে আবার কখনো যদি কোনো সাংবাদিক এরকম বিপদে পড়েন, তাহলে সাইমন ও তাঁর সঙ্গীদের কেসটি থেকে প্রাপ্ত কিছু শিক্ষা কাজে লাগতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এই সাংবাদিকদের কারারোধের জন্যে মূলত দায়ী ছিলো আর্জেন্টিনার অভ্যন্তরীণ দপ্তর, বৈদেশিক দপ্তর নয়। প্রথমদিকে ঠিক দপ্তরের উপরে চাপসৃষ্টি করা হয়নি। তাতে সময় নষ্ট হয়েছে। প্রতিবাদগুলি ঠিক কোন্‌দিকে চালিত করা উচিত তা তিনি গোড়ার দিকে বুঝে উঠতে পারেননি। কিছুটা দিশাহারা বোধ করেছেন। এরকম ক্ষেত্রে ঠিক কোন দপ্তরটি গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী তা সর্বপ্রথমে বার ক'রে নেওয়া দরকার।

সাইমন কারাবাসকালে একটি ৬০,০০০ শব্দের ডায়েরি লিখেছেন। তার ভিত্তিতে একটি বই তৈরি করা যায় কি না সে-কথা ভাবছেন। হাজতে থাকাকালীন পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে পাওয়া শুভার্থীদের চিঠি তাঁকে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। সন্দেহ নেই, এই সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতার কাহিনী যত কানে পৌঁছয় ততই মঙ্গলের। কারণ সাংবাদিকদের চলাফেরার ও মুখ খোলার স্বাচ্ছন্দ্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাভূতি। পারমাণবিক যুগে অন্ধ জাতীয়তাবাদের মতো সর্বনেশে বিপদ আর কিছু নেই। তা হচ্ছে খাল কেটে কুমীরকে ডেকে আনা। এক দেশের মানুষের কাছ থেকে আরেক দেশের মানুষকে প্রায়শ আলাদা ক'রে রাখে দেশ দু'টির সরকারী প্রচার। এইসব বেড়া ভাঙতে হলে চাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে খবরাখবরের, মতামতের, সংক্ষেপে 'কম্যুনিকেশন'-এর অব্যাহত প্রবাহ। আমার মনে হয়, বিভিন্ন দেশের মধ্যে কম্যুনিকেশনের স্রোতকে অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সাংবাদিকদের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীর নানা জায়গায় যুদ্ধের নরনিধনযজ্ঞ যদিও অপ্রতিহত, তবুও কয়েকটি আশাজনক আলোকরেখাও দিগন্ত থেকে একেবারে অনুপস্থিত নয়। মনে রাখা ভালো যে সাতাত্তর দিন কষ্টে কাটালেও সাইমন উইন্‌চেস্টার আর তাঁর সঙ্গীরা শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে আসতে পেরেছেন, তাঁদের কোনো বর্বর শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। আরও মনে রাখা দরকার যে ফকল্যাণ্ডের যুদ্ধ চলাকালে আর্জেন্টিনানিবাসী হাজার হাজার ব্রিটিশ নাগরিকদের উপর আর্জেন্টাইনরা হামলা করেনি, এবং তিনজন সাংবাদিক বিপদে পড়লেও অন্যান্য ব্রিটিশ সাংবাদিকেরা নিয়মিতভাবে বুয়েনোস আইরেস থেকে খবর পাঠিয়ে গেছেন। এ সমস্তই আশাব্যঞ্জক, কারণ পৃথিবীতে এমন দিন ছিলো, যখন অসামরিক মানুষদের যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার কোনোই প্রত্যাভূতি ছিলো না। দেখা যাচ্ছে যে আজকাল যেসব দেশ সভ্য ব'লে পরিচিত হতে চায় তারা এই প্রত্যাভূতি দিতে চায়, যুদ্ধে আহত ও বন্দী মানুষদের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহার করা হবে সে-প্রত্যাভূতিও দিতে চায়। এসব ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জেনিভায় যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলি কিছুটা কার্যকর হয়েছে মনে হয়। এভাবে একটু একটু ক'রে তিলে তিলে সভ্যতার পৃথিবী গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব থেকে কোনো নিষ্কৃতি আছে ব'লে জানা নেই আমার। সাইমন ও জুডি দু'জনেই ভারী চমৎকার, মিশুক, সভ্য মানুষ। ভাবতে ইচ্ছে করে তাঁদের ক্লেশস্বীকারের ফলে পৃথিবীর কোনো-না-কোনো কোণে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা আরেকটু বাড়বে, দুনিয়াটা আরেকটু বাসযোগ্য হবে।

আফ্রিকা থেকে দিনেমার নারীর চিঠিপত্র

> এখন দূরতম, গভীরতম উপত্যকাটিও সবুজ হয়ে যাচ্ছে,—এখানে বর্ষা কী তাড়াতাড়িই না রূপান্তরিত ক'রে দেয় সব কিছুকে,—প্রায় একটা অলৌকিক ঘটনার মতো ;···পর্যাপ্ত বৃষ্টি পেলে এ জায়গাটা এত সুন্দর হয়ে ওঠে, মর্তে স্বর্গ যেন। আর সত্যি বলতে কি, ক্লেশের সময়ে এই দুঃশাসন দেশটাকে মানুষ আরও বেশি ক'রে ভালোবাসে ; আমার ধারণা, ভবিষ্যতে আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার মনের মধ্যে থাকবে একটা জিজ্ঞাসা : নৃগঙে বৃষ্টি পড়ছে কি ?
>
> ···আমার বিশ্বাস, আমি আফ্রিকার প্রিয় সন্তানদের অন্যতম। কবিতার এক মহান জগৎ এখানে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে, আমাকে তার কোলে টেনে নিয়েছে, আর আমি তাকে ভালোবেসেছি। আমি চোখ রেখেছি সিংহদের চোখে, ঘুমিয়েছি দক্ষিণ ক্রুশের তারাদের নিচে, দেখেছি বিশাল প্রান্তরের ঘাসকে জ্বলতে এবং বৃষ্টির পরে কোমল শ্যামলে ছেয়ে যেতে, আমি বন্ধু হয়েছি সোমালি, কিকুয়ু আর মাসাইদের, আমি উড়ে গেছি নৃগং পাহাড়ের উপর দিয়ে,—"ফ্রেয়াকে ধন্যবাদ, আমি আহরণ করেছি জীবনের শ্রেষ্ঠ গোলাপকে",—আমার বিশ্বাস, আমার এখানকার বাড়ি পথিকদের আর রুগ্ন মানুষদের পক্ষে হয়েছে একটি আশ্রয়ের মতন, এবং কালো মানুষদের পক্ষে হয়েছে সৌহার্দ্যের একটি কেন্দ্রস্বরূপ।

কথাগুলি লিখেছিলেন পূর্ব আফ্রিকা থেকে ডেনমার্কে তাঁর মায়ের কাছে এ শতাব্দীর একজন অসাধারণ মহিলা : কারন ব্লিক্সন (১৮৮৫-১৯৬২), যিনি লিখতেন ইজাক ডিনসন ছদ্মনামে।

একটি সম্ভ্রান্ত দিনেমার জমিদার-পরিবারে জাত এই মহিলা ১৯১৪ থেকে ১৯৩১ সালের অন্তর্বর্তীকালের অধিকাংশ সময় কাটান কেনিয়াতে একটি কফি-বাগানের তত্ত্বাবধানে। নাইরোবির অনতিদূরবর্তী কফি-বাগানটির তদারক তিনি শুরু করেন তাঁর নববিবাহিত সুইডিশ স্বামী (যিনি ছিলেন তাঁর দূর সম্পর্কের ভাইও, তাঁর মাসতুতো পিসীর ছেলে) ব্যারন ব্রর ব্লিক্সনের সঙ্গে। ব্রর ব্লিক্সন তাঁর নবোঢ়া পত্নীকে সংক্রামিত করেন সিফিলিস রোগে। বছরখানেক বাদেই কারনকে দেশে ফিরে যেতে হয় চিকিৎসার জন্যে। সুচিকিৎসার দ্বারা রোগটি বশীভূত হয় এবং

অনতিকালের মধ্যে অসংক্রামক অবস্থায় পৌঁছয়, যদিও তার ফলস্বরূপ অন্যান্য ক্লেশকর উপসর্গ তাঁকে কষ্ট দেয় আজীবন। অপিচ ব্রর ব্লিক্‌সন আবাদের কাজে এবং টাকাকড়ির হিসেব রাখার ব্যাপারে পটু ছিলেন না। তিনি দ্রুতগতিতে অপ্রিয় হয়ে পড়েন কারনের মামাবাড়ির লোকেদের কাছে, যাঁরা ছিলেন কফি-কোম্পানিটির আর্থিক পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা ব্ররকে পরিচালকের পদ থেকে চ্যুত করেন তো বটেই, তাঁর কাছ থেকে ডিভোর্স্‌ড্‌ হয়ে যাবার জন্যে কারনের উপর চাপও সৃষ্টি করতে থাকেন। গভীরভাবে ক্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কারন ডিভোর্স চাননি। অবশেষে ব্ররই ডিভোর্স দাবি করেন। ইনি আফ্রিকাতেই থেকে যান এবং পরে আবার বিয়ে করেন।

তাঁর কফি-বাগান আর সেখানকার কর্মীদের কারন অসম্ভব ভালোবাসতেন। ১৯২১ সাল থেকে তিনি নিজেই বাগানটির দেখাশোনা চালিয়ে যান,—ক্রমাগত অর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও, এবং জলবায়ুর অসহযোগিতা থেকে শুরু ক'রে আরও নানাবিধ প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই ক'রে।

আফ্রিকায় থাকাকালীন কারন গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন একজন অভিজাতবংশীয় ইংরেজকে। সেনাবাহিনীর বিমানচালক ডেনিস ফিন্‌চ্‌ হ্যাটন আর কারনের মধ্যে একটি সুন্দর সখ্য গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু ফিন্‌চ্‌ হ্যাটন কারনের কাছে মধ্যে মধ্যে এসে থাকলেও তাঁকে কোনো দীর্ঘমেয়াদী কমিটমেণ্ট দিতে পারেননি। ক্রমশ সম্পর্কটা তার উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে, যদিও বাড়িতে লেখা চিঠিপত্রে কারন সে-কথা কখনো স্বীকার করেননি। ইতিমধ্যে তাঁর কফি-বাগানটিও একেবারে দেউলে হয়ে যায়। সব কিছু বেচে দিতে হয় তাঁকে। তাঁদের সম্পর্কটা আগের মতো তীব্র না হলেও ডেনিস ফিন্‌চ্‌ হ্যাটন কারনের দুঃসময়ে তাঁকে নির্ভর ও সাহস যুগিয়ে যান। অবশেষে কারন যখন আফ্রিকার পাট চুকিয়ে দিয়ে ডেনমার্কে ফিরে যাবার জন্য বাক্স-প্যাঁটরা গুছাচ্ছেন, এমন সময় বিমানচালক ডেনিস মারা পড়লেন বিমান-দুর্ঘটনায়। অবিরাম অসুস্থতার উপসর্গ, বিয়ের ভাঙন, তাঁর প্রিয় কফি-বাগানটির হস্তান্তর, প্রেমিকের মৃত্যু : একের পর এক আঘাতে প্রবলভাবে বিপর্যস্ত হলেও এবং মধ্যে মধ্যে তীব্র নৈরাশ্যের তীরে পৌঁছলেও কারন ব্লিক্‌সন পুরোপুরি হার মানেননি। তিনি অল্প বয়সে কিছু-কিছু কবিতা, গল্প এবং পুতুলনাচের জন্য নাটিকা (এটি ডেনমার্কের একটি বিশেষ ঐতিহ্য) লিখেছিলেন। কেনিয়ায় থাকাকালীন —যেখানে তাঁকে মুখ্যত ব্যবহার করতে হতো ইংরেজী ভাষাই—ডেনিশে লেখার অভ্যাসটা তিনি অব্যাহত রাখেন বাড়িতে লম্বা-লম্বা চিঠি লিখে। তা ছাড়া তিনি

ছবিও আঁকতেন। আফ্রিকাবাসের শেষের দিকে তিনি সিরিয়াসভাবে ভাবতে শুরু করেন লেখাকে জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করার কথা,—টিঁকে থাকার নির্ভরের জন্য তো বটেই, অর্থোপার্জনের জন্যও বটে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুবিধার জন্য ইংরেজীতে লেখা আরম্ভ করেন। ৪৬ বছর বয়সে সর্বস্বান্ত হয়ে স্বদেশে মায়ের কাছে ফিরে এসে এই অপরাজেয় মহিলা দৃঢ়চিত্তে নিজেকে নিযুক্ত করেন তাঁর প্রথম পরিকল্পিত বই, একটি গল্পসংগ্রহকে রূপ দেবার কাজে। সে-বই ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজীতে, এবং পরের বছর ডেনিশে, লেখিকারই নিজস্ব অনুবাদে। এবং তৎক্ষণাৎ সমাদরও লাভ করে। ১৯৩৭ সালে ইংরেজী ও ডেনিশ দুই ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করে আফ্রিকা-সম্পর্কে তাঁর সাহিত্যিক স্মৃতিকথা। ইংরেজীতে 'অউট অফ্ আফ্রিকা' নামে পরিচিত এই বইটি আধুনিক সময়ের একটি স্মরণীয় গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর পর থেকে লেখিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। ১৯৬২ সালে সাতাত্তর বছর বয়সে ডেনমার্কের পৈতৃক বাড়িতে তাঁর যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা অবিসংবাদিত স্বীকৃতি পেয়েছে।

কারন ব্লিক্সন আফ্রিকা থেকে তাঁর মা-মাসী-ভাই-বোনেদের কাছে ডেনিশে যেসব চিঠিপত্র লেখেন সেগুলি থেকে একটি বৃহদংশ নিয়ে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় একটি পত্রসংগ্রহ। সেইটিরই ইংরেজী অনুবাদ সম্প্রতি আমার হাতে পৌঁছেছে।*

অনুবাদিকা অ্যান বোর্ন অক্সফোর্ডে থাকেন: অক্সফোর্ডের কবিতা-কর্মশালার মাধ্যমে এঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। ইনি ইংরেজ, বিয়ে করেছেন একজন দিনেমারকে, বিবাহসূত্রে ডেনমার্কে অনেক বছর থেকেছেন, উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন কোপেনহেগেন ও অক্সফোর্ডে। কবিতা লেখেন, এবং ডেনিশ সাহিত্য থেকে ইংরেজীতে নিয়মিত অনুবাদ ক'রে থাকেন। এঁর অনূদিত ফেয়রো-দ্বীপপুঞ্জ-নিবাসী বিশিষ্ট প্রবীণ কবি উইলিয়ম হাইনেসেনের কবিতাগুচ্ছ-সম্পর্কে আমি গত বছর একটি আলোচনা লিখেছিলাম 'তথ্যকেন্দ্র' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার জন্যে।

এখন মনে পড়ছে, আমি যখন 'নোটন নোটন পায়রাগুলি' লেখার মধ্যে ডুবে ছিলাম, সে-সময়ে অ্যান বোর্ন কয়েকবার বলেছিলেন, 'আমি একগুচ্ছ অত্যন্ত

---

* Isak Dinesen (Karen Blixen), *Letters from Africa 1914-1931*, edited for the Rungstedlund Foundation by Frans Lasson, translated by Anne Born, University of Chicago Press, Chicago, *1981.*

ঔৎসুক্যকর ডেনিশ চিঠিপত্রের তর্জমা করছি', কিন্তু সে-পত্রগুচ্ছ যে কতটা ঔৎসুক্যকর তা তখন অবশ্যই বুঝিনি। আরও মনে পড়ছে, তার পরে উনি বইটির প্রুফ দেখা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রুফ আসতো শিকাগো থেকে। তার পর আমি কলকাতায় গেলাম।

সম্প্রতি বইটি আমাকে পড়তে দিয়ে অ্যান বললেন, 'আমার বিশ্বাস, এটি আপনার ভালো লাগবে।' (বলা বাহুল্য, চিঠি-ডায়েরি-জাতীয় রচনার প্রতি আমার টান-বিষয়ে ইনি অবহিত, এবং জানেন যে আমার প্রথম উপন্যাসও ঐ আকারে লেখা।)

বেশ বুঝতে পারছি, ব্যারনেস্ ব্লিক্সন যদি আর কোনো-কিছু না লিখতেন, তাহলেও কেবলমাত্র তাঁর এই পত্রগুচ্ছের জোরেই তিনি সাহিত্যিকের পদমর্যাদা দাবি করতে পারতেন। এই সংগ্রহে বিধৃত আছে তৎকালীন কেনিয়ার জীবনের একটি কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র এবং 'আউট অফ্ আফ্রিকা' বইটির প্রকৃত পটভূমি; এবং শুধু তা-ই নয়, এখানে প্রাপ্তব্য একটি আশ্চর্য মানুষের চরিত্রের সপ্তদশবৎসর-ব্যাপী ক্লান্তিহীন বিবর্তনের দলিল, আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নে ভরা তরুণী থেকে পোড়-খাওয়া মধ্যবয়সিনী মহিলায় পরিণত হবার মর্মস্পর্শী কাহিনী। বইটি আমাকে অভিভূত করেছে।

কারণ ব্লিক্সন আফ্রিকাকে এবং সেখানকার বিভিন্ন জাতির মানুষদের প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন। তাদের সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবেই জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং চিঠির পর চিঠি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই সন্তানহীনা নারী পরকে আপন ক'রে নিয়ে প্রবাসে নিজের চারদিকে গ'ড়ে তুলেছিলেন একটি বৃহৎ নতুন পরিবার। বিদেশকে ভালোবেসে আপন ক'রে নিতে, সেখানে শিকড় গাড়তে সবাই তো পারে না, কেউ কেউ পারে। এর জন্যে যে বিশেষ ধরনের মন এবং গুণ লাগে কারন ব্লিক্সনের তা ছিলো। তিনি ছিলেন সেই জাতের মানুষ, যাঁরা ঈশ্বর-নামক কোনো পুরুষের অস্তিত্বে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাসী না হয়েও 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'-এর মনোভাব দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আপ্লুত এবং সমগ্র পৃথিবী-কেই ক'রে নিতে পারেন স্বকীয় চারণক্ষেত্র। কারন ব্লিক্সনের মধ্যে ছিলো একটা অস্থির, অন্বেষী, নব-নব-আবিষ্কার-পিয়াসী আত্মা, অনুসন্ধানের তাড়না ও উন্মাদনা। কোনো সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে বুর্জোয়া জীবনযাপন তাঁর কাছে ছিলো একেবারে অসহ্য, বিষবৎ; 'বুর্জোয়া অস্তিত্বের চেয়ে মরণ শ্রেয়' লিখেছেন তিনি। এমনকি তিনি মনে করতেন যে অধিকাংশ লোকও বুর্জোয়া সুখ চায় না, চায় না বীমা-

সুরক্ষিত বাড়িতে নিশ্চিত আয় নিয়ে ব'সে থেকে তেমন জীবনযাপন, যেখানে একটা দিন আরেকটা দিনেরই মতন, বরং পারলে একটা বাঁদর নিয়ে মেলা থেকে মেলায় ঘুরে বেড়ায়। সন্দেহ নেই, তিনি নিজে খুঁজে বেড়াতেন নতুন ভাবনার উদ্দীপনকে, নতুন অভিজ্ঞতার অনুপ্রেরণাকে। কৈশোরকাল থেকেই এই তাগিদের বশবর্তী, মামাবাড়ির বুর্জোয়া মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, শৈশবে পিতৃবঞ্চিতা কারন মূলত এইজন্যেই নতুন জীবন খুঁজেছিলেন আফ্রিকার অ্যাডভেন্‌চারে।

কেনিয়ায় ঘরের বাইরেকার যে-জীবন,—কফির চাষ, সফর, শিকার, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা,—সেসবে তাঁর উৎসাহ ছিলো অদম্য। জীবনকে এবং বাঁচবার আনন্দকে তিনি বড় ভালোবাসতেন।

> আমি বিশ্বাস করি যে জীবন আমাদের কাছ থেকে দাবি করে ভালোবাসা, শুধু তার কতগুলো দিকের প্রতি ভালোবাসা নয়, শুধু আমাদের নিজেদের ভাব ও আদর্শগুলির প্রতিও নয়, তার যাবতীয় রূপে সাক্ষাৎ জীবনের প্রতিই ভালোবাসা ; নয়তো জীবন বিনিময়ে আমাদের কিছু দেয় না···
>
> ···আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জীবন বড় সুন্দর আর সমৃদ্ধ আর বিরাট ; সত্যি বলতে কি, আমি যদি প্লেগে মারা পড়ি, একটা আস্তাকুঁড়ের উপরে, তাহলেও আমার এ বিশ্বাস অটুট থাকবে।

সাহিত্যে বুদ্ধির আলো আর সংবেদনশীলতার নরম ছায়ার যে-মিশ্রণ ব্যক্তিগত-ভাবে আমাকে টানে, আমার চোখে ব্যারনেস্ ব্লিক্‌সনের পারিবারিক চিঠিপত্রের সাহিত্যিক উৎকর্ষ নিহিত সেই আলোছায়াতেই। তাঁর লেখায় প্রায়ই লভ্য বিশুদ্ধ কবিতার স্বাদ :

> আর এখন সব কিছু এত আশ্চর্যভাবে সবুজ আর তাজা, উপরে ওখানে যেখানে ওরা ঘাস পুড়িয়ে দিয়েছিলো পাহাড়ের সেই ঢল আর দরিগুলি ছেয়ে গেছে সুকুমারতম ছোট কচি ঘাসে, আর তুমি তো জানোই এ জায়গাটা কিরকম সবুজ, যেন স্বচ্ছ, যেন স্রোতের মতো আলো বেরিয়ে আসছে ঘাস থেকেই, অথবা যেন আকাশবাতাস প্রতিবিম্বিত সবুজে, সমতলভূমিগুলিতে, ঢলগুলিতে, —আর তার উপর দিয়ে বড় বড় মেঘগুলোর ছুটন্ত ছায়া, কোথাও-বা শিকারের জন্তুরা ঘাস খাচ্ছে বা বিশ্রাম করছে,—গোটা দৃশ্যটা একটা "আদর্শ ভূচিত্র", স্বপ্নের মতন।

নিজের মাকে কে না ভালোবাসেন, কিন্তু মা আর সন্তানের সম্পর্ক-সম্বন্ধে এমনভাবে ক'জন লিখতে পারবেন ?—

নিজের মায়ের কাছে ফিরে আসা আর তাঁর দু' বাহুর বেষ্টনকে অনুভব করা হচ্ছে সেই চিরন্তন প্রাকৃত মিরাক্‌ল্‌, যার বশবর্তী হয়ে প্রত্যেক বছর গাছেরা ফেটে পড়ে নতুন পাতায়; দুনিয়ার সব ঝড়-ঝাপটারা আমাদের যেখানে আহত করে সেইসব খোলা মরুপ্রান্তরে হঠাৎ যেন গজিয়ে ওঠে শাখার খিলান, একটা আশ্রয়, একটা লুকোনোর জায়গা, যা একই সঙ্গে এত মুক্ত আর জীবন্ত আর তাজা, যে সব কিছু নুয়ে পড়ে, যেন আশীর্বাদ রাখছে, আর যখন সেখান থেকে চ'লে যেতে হয় তখনও সে-আশীর্বাদ সর্বদাই নিজের কাছে অটুট থাকে···

কারনের প্রেমময় নারীহৃদয়ের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় ব্রর আর ডেনিস-সম্পর্কে তাঁর নানান উক্তিতে। ব্ররের জন্য তাঁকে কম ঝামেলা সহ্য করতে হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সংকটের চরম লগ্নে তিনি তাঁর মাকে লিখেছেন :

এই ছ' মাসে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি ব্ররের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে খুব খুব অনিচ্ছুক। এখানে আমাদের মধ্যে এত বাঁধন রয়েছে ; ওর মধ্যে যা-কিছু ভালো আছে তাতে আমি আস্থা হারাতে পারি না ; ওর রকমারি চিন্তাহীন নির্মম হৈচৈগুলো, যেগুলোর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না, সেগুলো যে একরকমের মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়, যা নিশ্চয়ই ক'মে যাবে, এ কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। হয়তো সহজ কথাটা এই যে আমি ওকে বড্ড বেশি স্নেহ করি ; এখন, যখন ওর পক্ষে সব কিছু এত কঠিন হয়ে প'ড়েছে, আমি ওকে পরিত্যাগ করতে পারবো না···

আর ডেনিস, যাঁর সঙ্গে তাঁর মিল ছিলো বেদিস্থের আর বৌদ্ধিক তাগিদের অনেক ব্যাপারেই, তাঁর সঙ্গে সান্নিধ্যকে তিনি বহুবার বর্ণনা করেছেন তাঁর জীবনের পরম আনন্দরূপে, যে-অভিজ্ঞতার পর, জনৈক ডেনিশ কবি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলতে ভালোবাসতেন, "মৃত্যু কিছু না, শীত কিছু না—"। (মনে রাখতে হবে যে শীত মানে উত্তর ইয়োরোপের তুষারাবৃত শীতঋতু।)

অথচ তিনি এ কথাও জানতেন যে ভালোবাসার শুধুমাত্র সংরক্ত উন্মাদনার দিকটাকে সম্বল ক'রে বাঁচা যায় না।

যদি এমন হয় যে এই সম্পর্কটাই হয়ে দাঁড়ায় আমার একমাত্র সম্পত্তি, যদি আমি সেখানে পৌঁছই একেবারেই শূন্য হাতে, অন্য কোনো কৌতূহল-অভিজ্ঞতা-ভাবনা-ধারণা কিছুই সঙ্গে না এনে, তাহলে তা আর থাকবে না নন্দিততম সৌহার্দ্যের পর্যায়ে, আমাদের কল্পনায়ত্ত মনোজ্ঞতম সহানুভূতি ও বোঝাবুঝির পর্যায়ে, রূপান্তরিত হয়ে যাবে শুধুই একটা শারীরিক ক্ষুধা আর তার নিরসনে, এবং আমি তা হতে দেবো না ; তা ছাড়া ওটা কেবল ওভাবে স্থায়ীও হবে না, খুব তাড়াতাড়িই জ'লে শেষ হয়ে যাবে।

তিনি বুঝে উঠেছিলেন যে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরে খুব বেশি বাজি রাখাটা বিবেচনার কাজ নয়, যে একটা প্রেমসম্পর্ককে যদি টিঁকতে হয় তাহলে প্রেমিক-প্রেমিকাকে স্বাধিকারে দু'টি ব্যক্তি হয়ে উঠতে হবে, নিজের-নিজের কাজ সাধন করতে হবে ; কেবলমাত্র সম্পর্কটা থেকে পুষ্টি আহরণ করার চেষ্টা করলে এবং কেবলমাত্র পরস্পরের জন্যেই বাঁচলে তাদের চলবে না,—সে-সীমাবদ্ধতা মারাত্মক। তাই তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে সর্বশেষ বিচারে বন্ধুত্বই, নির্বাচিত আত্মীয়তাই মানবিক সম্পর্কের উচ্চতম পর্যায় : ধোপে টিঁকতে হলে নারী আর পুরুষের ভালোবাসাকেও পৌঁছতে হবে ঐখানেই।

একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে নিম্নোধৃত পত্রাংশগুলির জোর সংবেদনের সঙ্গে সম্মিলিত একটি দ্যুতিময় বিচারবুদ্ধিতে, যা মন্তব্যগুলিকে দেয় সমৃদ্ধ স্মরণীয়তা :

ঠিক যেমন কফি বৃদ্ধি পায়, এবং অনুমান করা চলে, স্বচ্ছন্দ ও সুখী বোধ করে, ৭০০০ ফুটের নিচে, আর সীডার ৭০০০ ফুটের উপরে, তেমনি, আমার ধারণা, প্রত্যেক মানুষের লাগে একটা বিশেষ ধরনের মাটি, তাপমাত্রা আর ভূমির উচ্চতা, যেগুলোর সংজ্ঞা কারও কারও পক্ষে খুবই সংকীর্ণ, আবার কারও কারও পক্ষে প্রায় বিশ্বজনীন,—যাতে সে স্বচ্ছন্দ ও সুখী বোধ করতে পারে, অর্থাৎ তার আপন প্রকৃতিকে ততটা সমুন্নত ক'রে তুলতে পারে, সে-প্রকৃতির পক্ষে যতটা সম্ভব।

একটা মনোজ্ঞ সংগীতের আসরে গেলে সেটা যখন শেষ হয়ে যায় আর চ'লে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতে হয়, তখন তো আমরা চূড়ান্ত নৈরাশ্য বোধ করি না ; একটা উপাদেয় ভোজের অবসানে যখন দেখা যায় যে কফি আসছে তখন তো সেটার দিকে তাকানো যায় ব্যথা অনুভব না ক'রেও ; অথচ জীবনে এমন কতগুলো জিনিস আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত সত্তা

> বিদ্রোহ করে সমাপ্তির আইডিয়াটার বিরুদ্ধে ; একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে যা দাবি করে অশেষকে, কোনো আপসকে মেনে নিতে চায় না।

লেখিকার চরিত্রে সংবেদনের সঙ্গে বুদ্ধির এই মিলনের ফলে তাঁর চিঠিপত্রে যেমন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রবাসী জীবনের রকমারি আনন্দ তথা তাৎক্ষণিক যন্ত্রণাগুলি, তেমনি ফুটে উঠেছে ব্যাপ্ত-অভিজ্ঞতা-জাত একটা বিরাট পরিপ্রেক্ষিত, যা তাঁর লেখাকে আক্রান্ত করে দার্শনিকতার মাত্রায়। আমরা দেখতে পাই, তিনিও ক্রমাগতভাবে নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ল'ড়ে আপনার প্রকৃতিকে যথাসাধ্য সমুন্নত ক'রে চলেছেন। তাঁর থেকে সাত বছরের ছোট ভাই টমাস ডিনসনকে তিনি লিখেছেন :

> কিন্তু তুমি মোটেও ভাববে না যে আমি সাংঘাতিকভাবে বিষণ্ন হয়ে পড়েছি এবং সব কিছুকে ট্র্যাজিক চোখে দেখছি। তা মোটেও সত্যি নয়। বরং আমার ধারণা এই দুঃসময় আমাকে আগের চাইতে আরও ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে যে জীবন সবদিক দিয়েই কত অনন্তভাবে সমৃদ্ধ ও সুন্দর, যে যেসব জিনিস নিয়ে আমরা অনবরত দুশ্চিন্তা ক'রে যাই সেসবের কোনোই গুরুত্ব নেই। জীবনের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিটাকে যত বিস্তৃত ক'রে তুলতে পারা যায়,—এবং এটা জীবনের প্রায় সব থেকে জরুরী লক্ষ্য হওয়া উচিত,—অস্তিত্বের ঐশ্বর্য ও বহুপলত্বকেও ততই প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়। কিন্তু এর জন্যে চাই একটা প্রকৃত, সত্যিকারের সংস্কারমুক্তিও, যাতে আমরা একই সঙ্গে এই মত পোষণ করার চেষ্টা না চালিয়ে যাই যে এটা-ওটার গুরুত্ব বিরাট, কেননা তা তো যথার্থ নয়।

দৃষ্টির এই প্রাজ্ঞ ব্যাপ্তিতে পৌঁছতে তাঁকে দিশি সমাজের গণ্ডীর বাইরে আসতে হয়েছিলো তো বটেই, দুঃখের মুদ্রায় দামও কম দিতে হয়নি।

প্রজ্ঞার অভিমুখে তাঁর বিবর্তনের একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ ইংরেজদের প্রতি তাঁর প্রতিন্যাস। তৎকালীন কেনিয়ার ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত ইংরেজ সমাজকে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাদের বলা যায় 'ছোট ইংরেজ'—তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না। সে-সমাজের অন্তঃসারশূন্যতাকে অনেক-বারই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ডেনিস ও অন্যান্য কয়েক-জনের সান্নিধ্যে তিনি যখন ক্রমশ ইংরেজ চরিত্রের বড় দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত

হয়ে ওঠেন, তখন সে-সম্পর্কেও পেশ করেন কতগুলি অন্তর্ভেদী, সূক্ষ্মদর্শী প্রতিবেদন। এইটি একটি দৃষ্টান্ত :

> ইংরেজদের মধ্যে দশ বছর হলো বাস করছি, এবং মনে হয় তাদেরকে বুঝতে শিখেছি, তাদের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডকেও। আমার তো মনে হয় না অন্য কোনো জাতি তাদের সমকক্ষ। আমার মতে, তাদের প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান এমন বিশাল প্রশান্ত কতগুলো বৈশিষ্ট্য, যে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর মনে হয় অন্যান্য জাতিরা বড় অনাবশ্যক হৈচৈ ক'রে থাকে। তাদের মধ্যে যারা সব থেকে ভালো তাদের সঙ্গে বাস করাটা হচ্ছে শুদ্ধতর বায়ুমণ্ডলে উত্থিত হবার মতো অভিজ্ঞতা ; তারা "পরিষ্কার", যেমন আমরা ব'লে থাকি পরিষ্কার বাতাসের কথা ; এবং কোনো অসাধারণ "প্রকৃতিদত্ত গুণের অধিকারী" না হয়েও তারা এমন এক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী এবং প্রকৃত অর্থে এমন সংস্কারমুক্ত, যার জুড়ি আমি অন্য কোনো জাতের মধ্যে দেখিনি। এবং তাদের মধ্যে দ্রষ্টব্য একটা চিত্তগ্রাহী স্বাভাবিক নিঃস্বার্থপরতা। যেটা তাদের বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনা সেটাও ভারী চমৎকার ; তারা অযথা "হৈচৈ" না ক'রে সব কিছুকে মনোজ্ঞ ও সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে জানে। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তাদের সম্পর্কেই এ কথা সত্য, কিন্তু একটা জাতকে তো সত্যিই বিচার করতে হবে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনদের দিয়েই, কেননা আমার মতে ইংরেজ "মধ্যবিত্ত"-দের মধ্যে কেউ কেউ ভয়ংকরভাবে মারাত্মক।—

এটা নিশ্চয়ই কাউকে অবাক করবে না যে এই স্বাধীনচেতা বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন নারীমুক্তিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং একজন সুতীক্ষ্ণ ফেমিনিস্ট চিন্তক।

> আমার তো মনে হয় না ক্রমপরিণতির বর্তমান পর্যায়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যের—নৈতিক সাম্যসুদ্ধ—কোনো বিকল্প আছে।

> প্রসঙ্গত বলি যে আমার মতে মেয়েদের সামনে রয়েছে একটা সত্যিকারের সুসময়, এবং আগামী একশো বছরের মধ্যে তাদের সামনে খুলে যাবে অনেক গৌরবান্বিত সম্ভাবনার দুয়ার। ভয়ংকরতম ধরনের অন্ধতা ও কুসংস্কারকে মেয়েদের ক্ষেত্রে যত দীর্ঘ সময় ধ'রে জীইয়ে রাখা হয়েছে, প্রায় আর কোনো ক্ষেত্রেই তা করা হয়নি ; এবং ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কারের বোঝাকে ঝেড়ে

ফেলে দিতে পারাটা মনুষ্যসমাজের পক্ষে অবশ্যই যেমন অবর্ণনীয়ভাবে স্বস্তিদায়ক হয়েছিলো, তেমনি, আমার মনে হয়, মেয়েরা যখন সত্যিকারের ব্যক্তি হয়ে উঠবে আর গোটা দুনিয়াটাকে তাদের সামনে খোলা পাবে তখন সেটা হবে প্রকৃতপক্ষেই গৌরবের ব্যাপার !

সোমালি জাতির মুসলমানদের দ্বারা বহুলাংশে পরিবেষ্টিত ছিলেন ব'লে তাদের আচার-বিচার পর্যবেক্ষণ করার পর্যাপ্ত সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। মুসলমান সমাজে মেয়েদের যে কয়েক ধরনের সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে তা তিনি অস্বীকার করেননি, এবং তাঁর মনে হয়েছে যে মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের শিভালরির আদর্শ কতকাংশে মুসলমানপ্রভাবিত হতেও পারে, কিন্তু এ-জাতীয় প্রতিন্যাসের যে-ত্রুটিটা তাঁর কাছে মারাত্মক ঠেকেছে তা এই :

এটা মেয়েদের পর্যবসিত করে কেবলমাত্র যৌন সত্তায়, এবং এই অবস্থাটার মধ্যে তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে একেবারে বন্দী ক'রে ফ্যালে, বাইরের পৃথিবীটাকে দেখবার কোনো সুযোগ না দিয়েই। আমার মনে হয়, পুরুষদের এই রক্ষাকর্তার ভূমিকাটার মধ্যে কিছুটা কৃত্রিমতা বা ভারসাম্যহীনতা বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ, যদি গোড়া থেকেই এমন ভাবা যায়, এবং জাতিকে এমন শিক্ষা দেওয়া যায়, যে কোনো মেয়ের মাথার একটা চুলও অবিন্যস্ত হওয়া একটা বিষম ভয়ানক ব্যাপার, তাহলে তো স্বভাবতই জীবনভর তার ব্যস্ততার আর অভাব হবে না, সর্বপ্রকারের ছাতা আর আচ্ছাদন নিয়ে ছোটাছুটি ক'রে মরবে ; কিন্তু আমার মতে কেশকে আরেকটু কম গুরুত্ব দেওয়াই হবে বেশি শিভাল্‌রাস, তা ছাড়া এলো চুল বা বাত্যাহত কেশ-বিন্যাসের চাইতে পুরোপুরি নিখুঁত কবরীই যে নিজের জোরে সুন্দরতর, সে-বিষয়ে আমি মোটেও নিশ্চিত নই।

ফলত তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে যে-মনোবৃত্তি নারীকে বসনে-ভূষণে সন্তানে-গুণ্ঠনে আবৃত ক'রে সযত্নে রক্ষা করে, জীবনের মুকুট বা পুরুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ নামে অভিহিত ক'রে মাননা করে, তার মধ্যে খানিকটা কাব্যিকতা থাকলেও তা আখেরে সারবান ও গ্রহণযোগ্য নয়, ঠিক যেমন ষাঁড়ের লড়াইকে শ্রেষ্ঠ স্পোর্ট হিসেবে, সাহস ও কৌশল দেখাবার পক্ষে উপযুক্ত প্রকৃষ্ট ক্রীড়ারূপে মেনে নেওয়া যায় না।

আমি যদি দুনিয়ার চোখে স্বয়ং কুমারী মেরীর মতো শ্রীমণ্ডিতা হয়ে উঠতে পারতাম, তাহলেও তার খাতিরে আমি পারতাম না প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিতে, চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে, এবং জীবনের সমস্তটাকে একজন পুরুষের মধ্যস্থতায় পরোক্ষভাবে পেতে।

পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী তা তিনি জানতেন, এবং বড় রকমেরই পরিবর্তনই,—'ডিম না ভেঙে তো আর ওমলেট ভাজা যায় না'—বিশেষত তিনি জানতেন যে প্রকৃত স্বাধীনতায় পৌঁছতে হলে মেয়েদেরকে দৃঢ়ভাবে ত্যাগ করতে শিখতে হবে একটা জিনিস ; সেটা হচ্ছে পুরুষদের কাছ থেকে পুরোনো স্টাইলের তোষামোদ। ঐ চাটুবৃত্তির লোভ ত্যাগ করতে না পারলে কোনো মুক্তি সম্ভব নয়—

অনেক মেয়েরই জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকে এক ধরনের অসাধুতা, যেমন, তারা মনে করে যে কোনো দোকানের সব থেকে শৌখিন টুপিটা সব থেকে সস্তা দরে কেনা যেতে পারে, আর যখন দোকানদারকে মেরে নাকাল করতে পারে না তখন তারা সত্যি সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে যায়···

স্বাধীনতাও সস্তা দরে কেনা যায় না।

জীবনের নানাবিধ সমস্যার মৌলিক বিশ্লেষণে, সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলা-বিজ্ঞান-নীতিবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সুবেদী ও দূরদর্শী মন্তব্যের সম্ভারে এই পত্রসংগ্রহ এমন ঋদ্ধ যে এর চিন্তার ঐশ্বর্য আমাকে পাতায় পাতায় বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। এ সংকলন মানস দৃষ্টির সামনে যে-প্যানোরামাকে উপস্থাপিত করে, ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে তার আকর্ষণ কোনো নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত কাহিনীর ক্রমোদ্‌ঘাটনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আর এমনও নয় যে কারন ব্লিক্‌সনের মধ্যে সার আছে ব'লে তাঁর চালটাও ভারিক্কি। মোটেও তা নয়, বরং ভারী মনোরম তাঁর কৌতুকস্নিগ্ধ কথনভঙ্গিটি, তাঁর সুস্পষ্ট প্রাণোচ্ছলতা এবং ঘোষিত নন্দনপ্রীতি। তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি অনুসারে, তিনি জীবনের অনেক জিনিস বাদ দিয়ে, কেবল জল দিয়ে রুটি খেয়েও জীবনধারণ করতে রাজী, কিন্তু জীবনে খানিকটা "মজা" তাঁর চাই-ই চাই। এই নির্ভীক নারী শেক্‌স্‌পীয়র উদ্ধৃত ক'রে তাঁর মাকে বোঝান যে কেউ কেউ পুণ্যি করতে চায় ব'লে অন্যদের মিষ্টান্ন ও সুরা থেকে বঞ্চিত করা যায় না। আর ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁর নিষ্ঠাশীলা মাসীকে লেখেন :

তুমি তো ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, যদি অনুমতি দাও তো বলি, যখন দলে দলে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা একমাত্র সুনীতিকেই আমাদের ঠাকুরের বিশেষজ্ঞতার

বিষয়বস্তু ক'রে ফ্যালেন, এবং মানুষের অস্তিত্বের ও চেতনার বিরাট বিরাট এলাকাকে—যেমন ধরো, প্রকৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান,—একরকমের নো-ম্যান্‌স্‌-ল্যাণ্ডে ফেলে রেখে দেন, তখন আমার মতো লোকেদের পক্ষে তাঁদের ঈশ্বরের আইডিয়াটাকে ভালোবাসা অথবা সে-বিষয়ে আদৌ কোনো কৌতূহল বজায় রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বস্তুত, এই চিঠিপত্রের একটি সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্যও কম চমৎকারী নয়, যেটি আশা করি তর্জমার তর্জমায় আমি যে-উদ্ধৃতিগুলি দিলাম সেগুলি থেকে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে : আপনারা, যাঁরা আমার এ আলোচনাটা পড়ছেন, তাঁরা এক মুহূর্ত ভেবে দেখুন,—একটা পরিবারের মধ্যে কী-আন্দাজ পরিশীলিত কৃষ্টি ও মার্জিত রুচি, জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন থাকলে, তার সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা, সহনশীলতা ও খোলসা মনোভাব কী-পরিমাণে সুলভ হলে, পরস্পরের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদানে তারা কতখানি অভ্যস্ত হলে তবেই কিনা মা-মাসী-ভাই-বোনেদের কাছে লেখা একটি মেয়ের চিঠিপত্র কম্যু-নিকেশনের এ হেন স্তরে পৌঁছতে পারে। যুক্তির বিস্তারে ও বিন্যাসে, তর্ক-বিতর্কের স্থাপত্যে কোনো কোনো চিঠি সৌধপ্রতিম, আলোচনাচক্রে পঠিত নিবন্ধের চাইতে কোনো অর্থে হীন নয়। এইসব চিঠি যেমন কারন ব্লিক্‌সনের প্রতিভার পরিচয় বহন করে, তেমনি প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর চিঠিপত্রের প্রাপকদের মর্যাদাকে, তাঁর গোষ্ঠীর বৈদগ্ধ্যকে,—যদিও তিনি নিজে তাঁর গোষ্ঠীর সংকীর্ণতাকে বারে বারে কঠিনভাবে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। কারন ব্লিক্‌সনের চিঠিপত্র ডেনমার্কের গৌরব। এবং এই সংকলনটি সম্পর্কে প্রয়োগ করতে ইচ্ছে করে তাঁরই কতগুলি কথা :

…প্রত্যেকের পক্ষে বয়োবৃদ্ধিই হচ্ছে সব থেকে বড় পরীক্ষা,—যেমন মদিরার ক্ষেত্রে ; বেশি দিন টি'কতে হলে জিনিসটার গুণ সত্যিই উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। এবং এ কথা শুধু মানুষদের বেলাতেই নয়, শিল্পের বেলাতেও খাটে। যে-নির্যাস ততটা উঁচু দরের নয় সেটা তাড়াতাড়িই পান ক'রে ফেলা ভালো, মনের মধ্যে কোনো মোহ না রেখে,—এবং ভালোভাবেই গলা ভেজানো যায় তা দিয়ে। কিন্তু যেটা সত্যিকারের উৎকৃষ্ট জিনিস,—পরিণতি পেলে কেমন তার রমণীয়তা খোলে, দাম বাড়ে। যতক্ষণ সেটা একেবারে টাটকা

থাকে ততক্ষণ কেউ বলতে পারে না তার দাম কেমন হবে,—কিন্তু পঞ্চাশ কিংবা মাত্র বিশ বছর পরে!

১৯১৪ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে লেখা এই লিপিগুলিও এই ১৯৮২-তে আমার ঘ্রাণ-শক্তির কাছে একটি অত্যন্ত অভিজাত সৌরভ উছলে দিয়ে গেছে, এবং অনুমান করি এ সংগ্রহ পৃথিবীর পত্রসাহিত্যে একটি ক্লাসিকের মর্যাদা পাবে।

কবিতায় 'ভায়োলেন্স' ও উপন্যাসে 'অথেনটিসিটি'

বাংলাদেশের কবি হুমায়ুন আজাদের কবিতার বইটি আমাকে রিভিউ করতে অনুরোধ করেছিলেন শ্রীমতী সন্‌জীদা খাতুন, শান্তিনিকেতনে যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এই কবির অন্য কোনো বই আমি দেখিনি। এঁর মধ্যে এক ধরনের প্রাণশক্তি যে অত্যন্ত প্রবল, তা এঁর চিত্রকল্প-প্রতীকের বিস্ফোরক 'ভায়োলেন্স' থেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। রক্তাক্ত চীৎকারকে আর্টে উত্তীর্ণ করতে হলে সে-আর্তিকে অনেক পরিমাণে শোধিত ক'রে নিতে হয়, স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয় কিছু আনুষ্ঠানিক খেলাকে। সে এক সাধনাসাধ্য নৃত্যশিল্প, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আগুন নিয়ে নাচ 'লিম্‌বো ডান্স'-এর মতো, কিন্তু অন্য কোনো বিকল্প আছে ব'লে জানি না। 'জলো চিতাবাঘ'-এর কতগুলি কবিতায় হিসেব-করা ভায়োলেন্স চমৎকারভাবেই উতরে গেছে : 'পোশাকপরিচ্ছদ', 'ধর্ষণ', 'ঠিক সময়ে আগুন নেভানো হয়েছিলো', 'অন্ধ রেলগাড়ি', 'বন্যা', কয়েকটি নিদর্শন।

দক্ষ বিদ্যুৎ-মিস্ত্রি ঠিক সময়ে মূল স্যুইচ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো ব'লে
টাওয়ারের চল্লিশ তলায় হঠাৎ বিকল-পাগল-অধোগামী
সদ্য আমদানি-করা চকচকে লিফটটি রক্ষা পেয়েছে।
তিনজন লাফিয়ে পড়েছে নিচে, পাঁচজনের হলদে মগজ
পাত্র-ভাঙা ঘিয়ের মতোন ছিটকে পড়েছে কার্পেটে।
ঝকঝকে কার্পেটটি নোংরা হওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয় নাই।
('ঠিক সময়ে আগুন নেভানো হয়েছিলো')

গোটা বইটিতেই একটা ক্রনিক অসুস্থতাবোধ, সভ্যতার অসুস্থতার সঙ্গে একটা পুনরাবৃত্ত সাযুজ্যবোধ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ব্যাধি, দুরারোগ্য ক্ষত, রক্তপাত, অপমৃত্যু : এই ইমেজগুলি বারে বারেই ফিরে আসে।

সুস্থ যদি এখন শরীর, ভয়াবহ ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে থাকি আমি,
ও আমার আত্মা, সমগ্র ভূভাগ। সুস্থতা নেই দিবসের
সূর্যতলে, রাত্রির চাঁদের নিচে জলেস্থলে। স্বপ্নে আসে না পরীরা।
স্বপ্নও ভাসে না অন্ধ চোখে। প্রকাশ্য রাস্তায় দিবালোকে, যত্রতত্র

সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করি কিশোরীকুমারী, যেনো আমি কফিনের থেকে
তুলে আনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক-একটি শরীর। এখন সর্বদা
রুগ্ন বোধ হয় সব কিছু : ছাত্র, গ্রন্থ, দর্শনার্থী, সেবিকা, ফলফুল,
ঐতিহ্য, সভ্যতা। এক অসুস্থ সভ্যতা, দুরারোগ্য, প'ড়ে আছি,
নর্দমার তটদেশে, পাশের বস্তিতে নাচে আধন্যাংটো বিকৃত রুগ্ন পরীরা।

('ব্যাধি')

যদি পুষ্প সুস্থ হয় পত্রপুঞ্জে জড়ো হয় ব্যাধির প্রকোপ
সারারাত সৌরলোক ভ'রে। যদি রাতে জ্বলে মাধবীর রূপ
দিনে তার ভস্ম ওড়ে শুধু। যখন চুম্বন ওষ্ঠে ঢালে সুখ
সঙ্গম রটিয়ে দেয় আমি এক উপদংশী ধর্ষণকামুক।
অর্ধাংশ অসুস্থ থাকে, যদি সুস্থ থাকে রক্তমাংসের শরীর
আত্মার অসুস্থ রক্তে ভেসে যায় সভ্যতা, ও মাটি পৃথিবীর।

('অর্ধাংশ')

এই গ্লানিবোধ ও যন্ত্রণাবোধের সমস্তটাই কি অভিজ্ঞতা এবং পরিপার্শ্ব থেকে জাত, 'সবুজ দাবাগ্নিদগ্ধ পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের নষ্টভ্রষ্ট দেশ'-এর রক্তাক্ত ইতিহাসের উত্তরাধিকার, নাকি খানিকটা এসে গেছে ভায়োলেণ্ট উচ্চারণভঙ্গিটা সম্পর্কে অবসেশন থেকেই? বাংলাদেশের কোনো শিল্পীর বিষয়ে এই প্রশ্নটা তোলাও সংবেদনশূন্য ধৃষ্টতা হয়ে গেলো কিনা জানি না।

'জলো চিতাবাঘ'-কে বলা যায় এক ধরনের মরু-অতিক্রমণের প্রতিবেদন। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে : কবির চোখে মরুদ্যানের চেহারাটা কিরকম, কিংবা তিনি কি কখনো মরীচিকা দ্যাখেননি? হয়তো কোথাও কোথাও সামান্য আভাস পাচ্ছি, যেমন 'পাড়াপ্রতিবেশী'-তে, বা 'শালগাছ'-এ ; পাচ্ছি শৈশবের কিছু বিক্ষিপ্ত ছবিতে, যখন কবির শরীর রুগ্ন ছিলো, কিন্তু সারা বিশ্বে ছিলো স্বাস্থ্য,—কিন্তু তা তো কেবলই বিশ্ব-সম্পর্কে শিশুর অনভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান?—যখন শিরিনের দেহখানি আপেলের মতন সুস্বাদু ছিলো, যখন মা পৌষ-চাঁদ-কুয়াশা-জড়ানো সন্ধ্যা-রাত্রে শাদা দুধ আর সোনা-চাল মিশিয়ে দু'মুখো চুলোয় পায়েস রাঁধতেন,—যদিও তখনই, চুলোর ভেতরকার জ্বলন্ত আমকাঠের টুকরোটাকে দেখেই হয় বালক-বয়সের 'প্রথম রঙিন ক্ষুধার উদ্‌গম' এবং মায়ের পাশে ব'সেই সে-বালক সারা সন্ধ্যা ধর্ষণ করে 'একটা লাল আগুনের টুকরোকে'। কিছু কিছু সদর্থক প্রতীক অবশ্যই

পাচ্ছি, যেমন গাছ, নদী, পলিমাটি, পদ্ম, আকাশের নীলিমা, মাছ, ফুল, তালতমাল, লাল ট্রেন ইত্যাদি, কিন্তু যা খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না তা বোধ করি মানুষের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদানের বিশ্ব থেকে আহৃত সেইসব চিত্র বা প্রতীক, যেগুলিকে আমরা সনাক্ত করতে পারি অস্তিত্বের সেইসব হিরণ্যদ্যুতি হর্ষ হিসেবে, যাদের জন্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যেও মানুষ ল'ড়ে যায়। বরং নজরে পড়ে বন্ধুত্ব অথবা ভালোবাসার অনুষঙ্গের বদলে জ্বালাময় যৌনতার পৌনঃপুনিক বিস্ফোরণ :

মাতাল মনীষী ব্যাপক বক্ষে ক্ষুধা, শরীর তার
ব্রোনজের মতো বস্ত্রহীন,
অজর কবিতা তোমার মাংসে ঢোকে তুষার ঠেলে
সবুজ রঙের সাবমেরিন!

('সবুজ সাবমেরিন')

তোমার মাংস কয়লার মতো জ্বলে
আমার অস্থি পুড়েপুড়ে ঝরে ছাই,
তোমাকে ফাড়ছে হিংস্র করাত কলে
আমার রক্তে এক ফোঁটা লাল নাই
বইছি দুজনে স্বপ্নেমাংসে অশ্লীল অভিশাপ—
আর কিছু নয় ব্যর্থতাভরা মানুষ হওয়ার পাপ।

('পাপ')

কুকুর যেমন সব-ক'টি দাঁতে গেঁথে রাখে প্রিয় মাংস,
গেঁথে রাখি দাঁতে
তোমার শরীর এবং রূপের অধো-আর-ঊর্ধ্বাংশ।

('প্রেম')

এমনকি প্রেমিকার মৃত্যুতেও কবি সান্ত্বনা পান এই ভেবে যে

অন্য কেউ ঢেলে নিচ্ছে ঠোঁট থেকে লাল
মাংস খুঁড়ে তুলে নিচ্ছে হীরেসোনামণি;

সেই ভয়টা আর নেই ('প্রেমিকার মৃত্যুতে')।

এটা ঠিকই যে এইসব ইমেজ কম-বেশি আয়রনি-মিশ্রিত, কিন্তু মনে রাখা যেতে পারে যে এ ধরনের চিত্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের সমকালীন কবিতাতেও প্রায়

'এনুডেমিক', এবং আমার ধারণা বঙ্গীয় মনোজগতের মধ্যেই এর দৃঢ় বনিয়াদ। অর্থাৎ জীবনে এই জাতের প্রতিন্যাস যথেষ্টই আছে, তাই কবিতাতেও প্রতিফলিত হয়। যৌন প্রসঙ্গে হিংস্র চিত্রকল্পের মধ্যে একটা বিপজ্জনক উভয়বলতা আছে। বলা হয়ে থাকে যে তা সভ্যতার অসুস্থতার প্রতীক হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এই যুক্তিকে পুরোপুরি গ্রহণীয় ব'লে মনে হয় না। নারী আর পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ যে দাঁতহাড়মাংসের ক্ষিপ্ত জলুনি পেরিয়ে রসজ্ঞ প্রাপ্তবয়স্ক ভালোবাসায় পরিণতি লাভ করতে পারে, শিল্পী যে সে-খবর রাখেন, তার সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান তাঁর শিল্পে থাকা জরুরী। নয়তো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে ঐ হিংস্রতা, যা মূলত অপ্রেম, তাঁর নিজের মানসতারও অঙ্গ নয়। অপ্রেম থেকেই প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সভ্যতার অস্তিত্বহানি হয়, মানুষ মানুষের সর্বনাশ করে, তাই শিল্পীরা যদি বিশেষভাবে সভ্যতার অসুস্থতা নিয়েই লিখতে বসেন তা হলে তাঁদের পরিষ্কার ক'রে জানান দিতে হবে যে তাঁরা নিজেরা ভালোবাসতে জানেন, নয়তো চিঁড়ে ভিজবে না।

নিজেকে খানিকটা ঠাট্টা ক'রে কবি লিখেছেন বটে :

'হুমায়ুন আজাদ, হতাশ ব্যর্থ শ্রান্ত অন্ধকারমুখি ;
উৎফুল্ল হয় না কিছুতে, প্রেমে, পুষ্পে, সঙ্গমেও সুখী
হয় না কখনো ; আপন রক্তের গন্ধে অসুস্থ, তন্দ্রায়
ধ্বংসের চলচ্চিত্র দেখে, ভ্রাণ শুঁকে সময় কাটায় ;
ওকে বাদ দেয়া হোক, নষ্ট বদমাশ হতাশা-সংবাদী।'
এ-আঁধারে উন্মাদ ও অন্ধরাই শুধু আশাবাদী।

('উন্মাদ ও অন্ধরা')

('অন্ধকারমুখি' শব্দটিতে হ্রস্ব ই-কারই ব্যবহৃত হয়েছে,—ইচ্ছাকৃত না মুদ্রণপ্রমাদ তা বলা শক্ত।) কিন্তু আশার কথা এই যে হুমায়ুন আজাদও আসলে আশাবাদী! 'একাকী কোরাস' বা 'সবুজ জলোচ্ছ্বাস'-এর মতন কবিতায় কি আশার কথা নেই, অথবা 'মুখ তুলে ধরি'-র অন্তিম স্তবকে ?

প্রেম তুমি কৃষিকাজ জানোনা ব'লেই সমগ্র ভূভাগব্যাপী
মাথা তোলে দারুণ ছত্রক, বাড়ে পুলকিত আগাছার ঝাড়,
একটি বিশাল নদী সৌরমরুভূমে নিরর্থক ব'য়ে আনে
জল, আমি হই আদিকর্মী, দিব্য কৃষকের আদিম লাঙল ;

পরম মেধায় আমি সভ্যতার মাঠে মুখ তুলে ধরি।
পুষ্পপ্রেমকৃষিশিল্পমেধা, সভ্যতার সকল প্রদীপ
স্বচ্ছতা হারায় কোনোকোনো ভয়াবহ নিষ্ঠুর সন্ধ্যায় ;
প্রদীপআগ্রাসী সেই কালো সাঁঝে আমি এ-জীবনমুখি মুখ
সারাক্ষণ নিদ্রাহীন ধ'রে রাখি জীবনের দিকে।

('মুখ তুলে ধরি')

('জীবনমুখি'-ই আছে।) আশা রাখছি যে ভবিষ্যতে শ্রীযুক্ত আজাদের কবিতায় প্রেমের কৃষিকাজ সম্পর্কে আরও অনেক অনুপুঙ্খ থাকবে ! এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, সমকালীন বাংলা লেখায় 'জঙ্ঘা' শব্দটিব ভুল ব্যবহার খুবই পীড়াদায়ক ; শ্রীযুক্ত আজাদের কবিতায় একাধিক যৌন প্রসঙ্গে শব্দটির ব্যবহাব দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তিনিও সেটির ঠিক মানে জানেন না :

যখন ঢুকলো সে তোমাব ব্যাপক দীর্ঘ
সোনার খনিতে, তোমার মুখেব
শিহরন জংঘার আন্দোলন
দেখে মনে হলো
এতো সৌন্দর্য
আমি কখনো
দেখি
নি।

('তোমার সৌন্দর্য')

একাত্তরে পাকিস্তান নামী এক নষ্ট তরুণী আমাকে দেখালো তার
বাইশ বছরের তাজা দেহ, পাকা ফল, মারাত্মক জংঘা—
চৌরাস্তায় রিকশা থেকে টেনে প্রকাশ্যেই ধর্ষণ করলাম ;
বিকট চিৎকারে তার দেহ রক্তাক্ত ও দুই টুকরো হ'য়ে গেলো।

('ধর্ষণ')

সেবাময়ীদের উদ্ধত বক্ষ ও জংঘার নিপুণ আর
তীক্ষ্ণ আন্দোলন।

('বন্যা')

শব্দটির মানে হচ্ছে হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দেহাংশ, জঘন নয় নয় নয়। শ্রীযুক্ত আজাদ, আপনারও দুটি জঙ্ঘা আছে, যাদের সাহায্যে আপনি হেঁটে-চ'লে বেড়ান!

অশোক রুদ্র পেশায় অর্থনীতি এবং সংখ্যাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ, বিশ্বভারতীতে পড়ান। তাঁর প্রবন্ধধর্মী চিন্তাশীল বাংলা লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছে, 'জিজ্ঞাসা'-তেও। 'আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক' (আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮০, ১৯৮২) এবং 'ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন' (পিপল্স্ বুক সোসাইটি, ১৯৮৩) তাঁর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ, সমকালীন সমাজের পক্ষে প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধসংকলন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তাঁর নভেলেট্ 'জাস্‌মিন্' প'ড়ে আমার মনে হয়েছে যে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিজীবীর উদ্যমকে আমাদের স্বাগত জানানো উচিত।

'জাস্‌মিন্'-ই কথাসাহিত্যে তাঁর প্রথম সৃষ্টি নয়। অনেক বছর আগে তিনি ইংরেজীতে একটি বড় গল্প লেখেন, ফিল্ম স্ক্রিপ্‌টের আকারে। সেটির বাংলা রূপ 'সময়েরে দিতে ফাঁকি' বেরিয়েছে 'মহানগর' পত্রিকায়। 'সময়েরে দিতে ফাঁকি' এবং 'জাস্‌মিন্'-এর মধ্যে ভাববস্তুতে এবং ভাষাব্যবহারে নানা সাদৃশ্য আছে, এবং প্রথম-পরিকল্পিত কাহিনীটিও প্রশংসা দাবি করে, তবে 'জাস্‌মিন্'-এ কথাসাহিত্যিকের আর্ট যে আরও পরিণত হয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঘটনাবলীর সেটিং বোম্বাই শহরে। নায়ক ডাঃ অসীম পাল একটি গবেষণাগারের কম্‌পিউটার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ; তাঁর জবানিতেই সমস্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। নায়িকা জাস্‌মিন্ জর্জ ডাঃ পালের গবেষণার সহায়িকা, গণিতের ভালো ছাত্রী, দক্ষিণ ভারতীয় তরুণী। জাস্‌মিন্ অসীম পালকে কাজে সাহায্য করে, নিজেও তাঁর তত্ত্বাবধানে স্নাতকোত্তর গবেষণা করে; সে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রীও বটে। এই দু'টি মানুষের জটিল সম্পর্কের সূক্ষ্ম টানাপড়েনই উপন্যাসটির মুখ্য উপজীব্য। তারা কিছু দূর পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ক্রমাগত গভীর ভুল বোঝাবুঝি হয়। জাস্‌মিন্ তার নিজস্ব খ্রীষ্টান সমাজের ছেলে আয়কর অফিসের গ্রেড টু কেরানী টম্‌সন্‌কে বিয়ে করে। অসীম পাল ভগ্নহৃদয় হয়ে দিল্লীতে কাজ নিয়ে চ'লে যান এবং তাঁর জাস্‌মিন্-সংক্রান্ত অবসেশনের জন্য তাঁর বহুকালের প্রেমিকা এবং বাগ্‌দত্তা মহারাষ্ট্রীয় ডাক্তার ঊর্মিলাকেও হারান। ঊর্মিলা কাজ নিয়ে চ'লে যান ক্যানাডায়। অসীমকে তাঁর মানসিক কষ্টের সময়ে সান্ত্বনা দেন দু'জন মহিলা, বোম্বাইয়ে ভগিনী-প্রতিমা বাঙালী শিপ্রা

এবং দিল্লীতে নবলব্ধ আশাবরী। অনেক বছর পরে জাস্‌মিনের সঙ্গে অসীমের আবার দেখা হয়। অসীমের ব্যক্তিগত জীবন তখনও নিঃসঙ্গ। জাস্‌মিন্ তখন চারটি সন্তানের জননী, তার মুখে বয়সের রেখা, চুলে শাদা ছাপ। তার ছেলেমেয়েরা কে কোন্ স্কুলে পড়ে তা বলতে গিয়ে তার প্রকাশভঙ্গিতে উৎসাহ ও আনন্দের ছোঁয়া লাগে, কিন্তু অসীম যখন তার বাড়িতে গিয়ে তার ছেলে-মেয়েদের একবার দেখে আসতে চান, তখন জাস্‌মিন্ সে-প্রস্তাবে রাজী হয় না। বিবৃতির শেষে অসীম বলেন যে জাস্‌মিনকে তিনি এখনও বুঝতে পারেননি, কিন্তু স্বপ্নে তাকে কয়েকবার দেখেছেন,—মনে হয়েছে সে-ও অনেক কষ্ট পেয়েছে। ঊর্মিলার সঙ্গেও তাঁর বিদেশে কয়েকবার দেখা হয়েছে। ঊর্মিলা আদর-আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি রাখেননি, কিন্তু দেশে ফেরার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেছেন। একটা বিষাদমিশ্রিত শান্তির মেজাজে উপন্যাসটির সমাপ্তি।

'জাস্‌মিন্' আমার ভালো লেগেছে একাধিক কারণে। প্রথমত, এর অথেন্‌-টিসিটি বা খাঁটিত্বের জন্যে। কাহিনীর মধ্যে সেরকম কোনো কৃত্রিম মারপ্যাঁচ নেই, যা থেকে মনে হতে পারে : দূর, জীবনে তো ওরকম হয় না। বরং ধরা যায় জীবনেরই আদলকে। বারবারই মনে হয়েছে : হ্যাঁ, জীবনে তো এইরকমই হয়,—এইসব কম্যুনিকেশনের ত্রুটি, ভুল বোঝাবুঝি, হারানো সুযোগ, কষ্ট পাওয়া এবং দেওয়া, চরম গ্রন্থিমোচনের বদলে বিষণ্ণ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স। একবার আমার মনে হয়েছিলো : জাস্‌মিনের নিষ্ঠাসহকারে রোববার দু'বেলা গির্জায় যাওয়ার সঙ্গে তার ভাবী স্বামীর কোনো সম্পর্ক থাকবে নাকি, টম্‌সন্ কি গির্জায় গানটান গায় বা অর্গ্যান বাজায়? কিন্তু নাঃ, তেমন কোনো রঙিন কানেক্‌শন লেখকের নকশার অন্তর্গত নয়। জাস্‌মিন্ আর টম্‌সন্ হয়তো বা একই গির্জায় যেতো, হয়তো যেতো না,—খবরটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আয়রনি আর মমতা মিশিয়ে আঁকা হয়েছে অসীম পাল চরিত্রটি। সাংঘাতিক-ভাবে মাস্টারী তাঁর ব্যবহারের কোনো কোনো দিক। যেসব মেয়েরা তাঁর বোনের মতো বা ছাত্রীর মতো তাদের বেশ ব'কে দিতে পারেন। কিন্তু সেইসব ধমক-ধামকের নিচে ধরা পড়ে একটা নরম, স্নেহশীল মন। গভীর দরদ আর বোধ দিয়ে গঠিত জাস্‌মিন্ চরিত্রটি। সাদামাঠা, কাঠখোট্টা, ধর্মভীরু, মেধাবী অথচ দুনিয়া সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে কৌতূহলশূন্য মেয়েটি অসীম পালের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে ক্রমশ ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা পায়, পায় নারীত্বের বিভা। তার পরং ঘোষণা করে তার স্বাধীনতা এবং সেজন্য আঘাত দিতেও, নির্মম হতেও প্রস্তুত থাকে। অসীম পালের

তদারক সে কোনো কোনো ব্যাপারে হাসিমুখেই মেনে নেয়, কিন্তু মেনে নেয় না তার বিবাহসংক্রান্ত জীবনে কোনো রকমের হস্তক্ষেপকে। প্রশংসনীয় তার স্বাধীনতার জেদ, কিন্তু তার মধ্যে কৌতুকবোধের এবং মাত্রাজ্ঞানের একটা অভাব, একটা পিউরিটানসুলভ নিষ্ঠুরতাও আছে। একদিকে অসীম তাঁর মাস্টারী খবরদারি দিয়ে জাস্‌মিন্‌কে আঘাত দেন, অন্যদিকে জাস্‌মিন্‌ তার ঐ কৌতুকবোধবর্জিত মাত্রাজ্ঞানশূন্য পিউরিট্যানিকাল নিষ্ঠুরতা দিয়ে অসীমকে ছিন্নভিন্ন করে।

একই সময়ে উর্মিলা, শিপ্রা আর জাস্‌মিনের সঙ্গে অসীমের তিন স্তরের সাহচর্যের এবং সম্পর্কগুলির বুনটের বিশ্বাসযোগ্য রূপদানে যে-বৌদ্ধিকতা প্রকাশ পেয়েছে তা অভিনন্দনীয়। 'জাস্‌মিন্‌'-এ নিছক গল্পটাই প্রধান নয়। মানবিক সম্পর্কগুলির সূক্ষ্ম আলোছায়া, তাদের মিথষ্ক্রিয়া, ঘাতপ্রতিঘাতের কেন্দ্রে অসীমের বেদনা এবং বিহ্বলতা : এইগুলির উপরেই পড়েছে শৈল্পিক ফোকাস।

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে জাস্‌মিনের যেমন একটা মারাত্মক সীমাবদ্ধতা আছে, তেমনি অসীমের মনের মধ্যেও কতগুলি 'কন্‌ফিউশন' আছে। আহত বিস্ময়ের সঙ্গে যখন তিনি নিজেকে শুধান : 'জাস্‌মিন্‌ আমার কাছে নারী, একথা কে বিশ্বাস করিবে?' তখন তিনি ভুলে গেছেন যে তাঁর সহকর্মী ডাঃ পারেখ অনেক আগেই 'এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া' বলেছিলেন : 'না ডাঃ পাল, আপনার flameকে আপনিই রাখুন'। ভুলে গেছেন যে তিনি পার্শ্ববর্তিনী উর্মিলার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছুমাত্র না ভেবে একই দিনে তিনবার জাস্‌মিনের ব্যর্থ খোঁজ করতে গেছেন তার হস্টেলে, উর্মিলাকেই তিন-তিনবার পাঠিয়েছেন হস্টেলের ভিতরে জাস্‌মিনের তালা-ঝোলা ঘরের সামনে, যেন জাস্‌মিন্‌ সত্যিই তাঁর কাছে 'cet obscur objet du desir', 'কামনার সেই রহস্যময় লক্ষ্য', লুইস্‌ বুন্যুয়েলের সর্বশেষ ছায়াছবিতে প্রৌঢ় নায়ক মাথিউ-র কাছে তরুণী কন্‌চিতা যেমন। জাস্‌মিন্‌কে কিছুটা আধুনিক হয়ে উঠতে সত্যিই সাহায্য করেছেন অসীম, কিন্তু জাস্‌মিন্‌ তার অন্তঃস্থ কোমল অনুভূতিকে যৎসামান্য প্রকাশ ক'রে ফেললে তিনিই আবার প্রাচীনপন্থী অধ্যাপকের মতো শিহরিত হয়ে যান : 'জাস্‌মিন্‌! জাস্‌মিন্‌! তোমারও এইরূপ দুর্বলতা হয়? আমি আমার ব্যবহার দ্বারা তাহাকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম : আমি দেখি নাই, তুমি নিজেকে সামলাইয়া লও, আমি ভুলিয়া যাইব'। জাসমিনের অনুভূতির সে-ব্যঞ্জনা—বস্তুত আভাসমাত্র—'দুর্বলতা' হবে কেন? সে মেয়ে ব'লে কি তার সে-অনুভূতি প্রকাশ করার কোনো অধিকার নেই? তা ছাড়া অসীম কি নিজেই

সেই কোমলতার ছোঁয়াটুকু চাইছিলেন না ? চাইছিলেন, কিন্তু পেলে সেটাকে নিয়ে কী করবেন তা জানতেন না। এমনই হয় মানুষের মনের কন্‌ফিউশন।

বোম্বাই শহর এবং গবেষণাগারের পরিপার্শ্ব কয়েকটি নিপুণ আঁচড়ে আঁকা। তবে আরও ডিটেল ব্যবহার করলে উপন্যাসটি আরও পূর্ণাঙ্গ, আরও জমজমাট হতে পারতো। এখানে দু'টি ছোট প্রশ্ন তুলে রাখি। মালাবার হিলের উপরে রেস্তোরাঁতে ব'সে উর্মিলার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে খেতে নিজের অন্যমনস্কতা এবং বোম্বাই শহরের উপকূলের প্রতি তাঁর দৃষ্টির অভাব সম্পর্কে অসীম বলেন : 'রানীর গলার হার দেখিয়াও দেখিতেছিলাম না'। কিন্তু দুপুরবেলাতেও কি কুইন্‌স্ নেকলেসের এফেক্ট্ দৃষ্টিগোচর হবার কথা ? দ্বিতীয়ত, গিরিগুহায় পিকনিকের সময়ে জাস্‌মিনের ছবি তোলা হয়েছিলো ঠিক কী অবস্থায়, বসা অবস্থায় না দাঁড়ানো অবস্থায় ? একবার বলা হয়েছে যে সে ব'সে ছিলো, আরেকবার বলা হয়েছে যে সে দাঁড়িয়ে ছিলো। এই ধরনের গৌণ অন্তর্বিরোধ, যা গল্প লেখায় নবাগত কারও রচনায় থাকতেই পারে, সম্পাদকীয় উদ্যমের দ্বারা শুধরে নেওয়া উচিত ছিলো প্রকাশকের।

'জাস্‌মিন্'-এর আরেক আকর্ষণ তার ভাষা। উপন্যাসটির আখ্যানভাগ সাধুভাষায় লেখা। চরিত্রদের মধ্যে যে-সংলাপগুলি অনিবার্যত ইংরেজীতে হয়ে থাকবে সেগুলিও সাধুভাষায় ; যেগুলি বাংলায় হয়ে থাকবে, যেমন শিপ্রার সঙ্গে বা শিপ্রার স্বামী অনিমেষবাবুর সঙ্গে অসীমের কথাবার্তা, সেগুলি চলতি বাংলায়। (এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য : তৃতীয় পৃষ্ঠায় অসীমের সহকর্মীদের বক্তব্য এবং সপ্তদশ পৃষ্ঠায় জাস্‌মিনের প্রতি শিপ্রার উক্তি কি সাধুভাষায় হওয়া উচিত ছিলো না ? এ ব্যাপারেও সম্পাদকীয় দৃষ্টির প্রয়োজন ছিলো।)

ভাষার কারুকার্য এই উপন্যাসের জগৎটাকে একটা মনোজ্ঞ গাম্ভীর্য দিয়েছে, দিয়েছে একটা 'চার্ম', একটা মৃদু সৌরভ, দার্জিলিঙের চায়ের গন্ধের মতো। 'আমি অনুভব করিলাম আমাদের মধ্যে যে বার্তার বিনিময় হইল তাহা সোজা পথে ঘটিল না। আমার বার্তা যেন সমস্ত মহাকাশ চংক্রমণ করিয়া নীহারিকাসমূহের পশ্চাৎ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া জাস্‌মিনের অন্তরে প্রবেশ করিল, আবার জাস্‌মিনের প্রতিধ্বনিও একই সুদীর্ঘ বঙ্কিম পথ বিপরীতদিকে অতিক্রম করিয়া আমার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছাইল।'

উপন্যাসটির অঙ্গসজ্জা আরও মর্যাদাবান হতে পারতো। প্রুফ আরও যত্ন নিয়ে দেখা উচিত ছিলো এবং কিছু সম্পাদনার কাজ ক'রে নেওয়া উচিত ছিলো।

অনেক শ্রীহানিকর মুদ্রণপ্রমাদ চোখে পড়েছে, অনেক সমাসবদ্ধ শব্দ টুকরো টুকরো হয়ে ছাপা হয়েছে।

আশা রাখছি শ্রীযুক্ত রুদ্র আধুনিক নারীপুরুষদের জীবন সম্পর্কে আরও উপন্যাস আমাদের উপহার দেবেন।

হুমায়ুন আজাদ, 'জলো চিতাবাঘ', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮০ দাম আট টাকা। অশোক রুদ্র, 'জাস্‌মিন্‌', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮২, দাম বারো টাকা।

ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা

> যদিও গ্রন্থটির অধিকাংশ অধ্যায়ে যা আলোচিত হয়েছে তার বিষয় ধর্ম-সংক্রান্ত কিন্তু তার পিছনে যে অনুপ্রেরণা কাজ করেছে তা রাজনৈতিক। আমার ধারণা এই যে সমাজকে পরিবর্তিত করতে হলে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা শুধু রাষ্ট্রের কাঠামোকে পরিবর্তন করাটাই যথেষ্ট নয়, মানুষের মনকে পরিবর্তন করা অত্যন্ত প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মনকে পরিবর্তন করতে হলে সেই মনকে বুঝতে হয়। আমার ধারণা যে আধুনিক ভারতবাসীর মনকে কখনই বোঝা সম্ভব নয় যদি এই মনের উপর ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার প্রভাবকে ভাল করে না বোঝা হয়।

এই ভূমিকা দিয়ে অশোক রুদ্র আরম্ভ করেছেন তাঁর বইটি, যেটিকে আমি চিন্তাশীল পাঠকদের পক্ষে বিশেষভাবে অনুধাবনীয় ব'লে মনে করি। লেখকের অবস্থান, তাঁর নিজস্ব স্বীকৃতি অনুসারেই, মূলত একটা মার্কস্‌বাদী চিন্তা-কাঠামোর অভ্যন্তরে, কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মার্কস্‌বাদী সমাজবিজ্ঞানীদের থেকে তাঁর ঝোঁকপ্রদান লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন। তিনি বিশ্বাস করেন যে সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে চতুর্বিধ বিপ্লবের উদ্যোগ করা প্রয়োজন: অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক। ভারতীয় মার্কস্‌বাদীরা প্রথম দু'টির উপরেই অত্যধিক জোর দিয়েছেন, এবং মারাত্মকভাবে উপেক্ষা করেছেন শেষ দু'টিকে, যে-ঔদাসীন্য, শ্রীযুক্ত রুদ্রের মতে, ভারতের মার্কস্‌বাদী আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম প্রধান কারণ। আমরা জানি, মার্কস্‌বাদী সমাজবিশ্লেষণে সমাজের ইনফ্রা-স্ট্রাক্‌চার বা ভিত্তি-কাঠামো এবং সুপার-স্ট্রাক্‌চার বা উপরিস্থিত কাঠামো এই দু'টি ধারণা অনবরত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেহেতু অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন যে ঐ যুগলের প্রথমটিই সবদা দ্বিতীয়টিকে নির্দিষ্ট ক'রে দেয়, তাই তাঁরা প্রথমটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং সেটির বিশ্লেষণেই অধিকতর মনোযোগ ব্যয় ক'রে থাকেন। শ্রীযুক্ত রুদ্রের মতে

> উপরিস্থিত-কাঠামো ভিত্তি-কাঠামোর দ্বারা একতরফাভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় এই তাত্ত্বিক ধারণাটা ভ্রান্তিপূর্ণভাবে কার্ল মার্কসের উপর আরোপ করা হয়েছে। উপরিস্থিত-কাঠামো ও ভিত্তি-কাঠামো একে অপরকে প্রভাবান্বিত

> করে এই ধারণাটাই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ইতিহাসসম্মত বলে মনে করি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই দু'ই কাঠামোর একটি অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করতেই পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে উপরিস্থিত-কাঠামো হয়ে উঠতে পারে ভিত্তিকাঠামোর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। বর্তমান লেখকের মতে এই ঘটনাই ঘটেছে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসে। উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশ উপরিস্থিত-কাঠামোর অন্তর্গত জাতিপ্রথা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ধর্মের অন্তর্গত রীতিনীতি আচারবিচার ধ্যানধারণা ইত্যাদিকে পরিবর্তিত করতে পেরেছে অনেক কম, পরন্তু ঐ জাতিভিত্তিক কাঠামো এবং ঐ ধর্মই উৎপাদিকা শক্তিদের কণ্ঠনালীকে চেপে ধরে রেখে তাদের শ্বাসরোধ করে তাদের বিকাশ করেছে অবরুদ্ধ। ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে যদি এই তত্ত্ব ঠিক হয়ে থাকে যে উপরিস্থিত-কাঠামোর মধ্যে গুণগত পরিবর্তন এসেছে ভিত্তি-কাঠামোর মধ্যে উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশের প্রতিঘাতের ফল হিসাবে তো আমার বক্তব্য অনুসারে ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস তার থেকে এক মৌলিক ভিন্নতা প্রদর্শন করে।

যাকে বলা হয় একটা সমাজের ইডিওলজি তা ঐ সুপার-স্ট্রাকচারেরই অন্তর্গত। শ্রীযুক্ত রুদ্রের বিচারে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারাই অনেক শতাব্দী ধ'রে ভারতীয় সমাজের সব থেকে শক্তিশালী ইডিওলজি, এখনও চলছে যার দাপট। আধুনিক ভারতের সমস্ত দুরবস্থার জন্য মূলত দায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এইরকম একটা ধারণা যদিও আজকাল বহুপ্রচলিত, শ্রীযুক্ত রুদ্র কিন্তু সেই সূত্রটিকে একেবারেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁর মতে ভারতের ক্ষিতিজ ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রভাবের তুলনায় পশ্চিম থেকে আগত যে-কোনো প্রভাবই আজ পর্যন্ত নিতান্ত গৌণ থেকে গিয়েছে, এবং আধুনিক হিন্দু মনকে বুঝতে হলে, আধুনিক ভারতের সমস্যাবলীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে সর্বাগ্রে বুঝতে হবে ব্রাহ্মণ্য ইডিওলজিকে, লড়তে হবে তার প্রতিক্রিয়াশীল দিকগুলির বিরুদ্ধে। লেখকের প্রয়াস নিবেদিত সেই উদ্দেশ্যেই।

বইটি সুগঠিত। প্রথম অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার কাঠামো স্থির ক'রে নিয়ে, পরবর্তী দশটি অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার নানাদিকের ঔৎসুক্যকর বিশ্লেষণ ক'রে লেখক পৌঁছেছেন তাঁর সর্বশেষ, দ্বাদশ অধ্যায়ে, যেখানে তিনি পেশ করেছেন তাঁর এই অভিমত যে ভারতের ইতিহাসকে ঠিকমত বুঝতে মার্কস্‌বাদী মহলে বহুব্যবহৃত সামন্ততন্ত্র বা আধা-সামন্ততন্ত্রের ধারণা একেবারেই

সাহায্য করে না, ইয়োরোপ থেকে আমদানি-করা ফিউডালিজ্‌মের মডেল ভারতের নিজস্ব রিয়ালিটির সঙ্গে মিলতে চায় না ; সামন্ততন্ত্র নয়, বরং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধারণাই ভারতীয় ইতিহাসকে বুঝতে সাহায্য করে।

বইটির গঠনপ্রসঙ্গে এখানে একটি কথা উল্লেখ করি। 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত রুদ্রের উপন্যাস 'জাস্‌মিন্‌'-এর আলোচনা করেছি। সেখানে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলাম যে 'আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক' এবং 'ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন' তাঁর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ, সমকালীন সমাজের পক্ষে প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধসংকলন। বর্তমান আলোচনাটি লিখতে ব'সে আলোচ্য বইটির দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে আবিষ্কার করছি যে এটিকে প্রবন্ধসংকলন ব'লে অভিহিত করার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত রুদ্রের ঘোরতর আপত্তি আছে। বইটির মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে এটি কোনোক্রমেই একটি প্রবন্ধসংকলন নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, যার বারোটি অধ্যায়ের প্রথমটি ছাড়া বাকি এগারোটির আদিরূপ বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের আকারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছিলো। (শেষ দু'টি অধ্যায়ের আদিরূপ প্রবন্ধাকারে বেরিয়েছিলো 'জিজ্ঞাসা'-তেই।) লেখক যদি মনে করেন যে ভুল বর্ণনার দ্বারা আমি তাঁর প্রতি অবিচার করেছি এবং সম্ভাব্য পাঠকদের পথভ্রান্ত করেছি, তা হলে আমি সত্যিই দুঃখিত, কিন্তু আমার নিজের দৃষ্টিতে 'প্রবন্ধসংকলন' এবং 'পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ' এই দুই গোত্রের মধ্যে কোনো আবশ্যিক বিরোধ নেই,—একটি বই একই সঙ্গে একটি প্রবন্ধসংকলন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হতে পারে। শ্রীযুক্ত রুদ্র নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন যে তাঁর বইয়ের অধ্যায়গুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরসংলগ্ন, এবং তারা মিলিতভাবে একটি থীমকে, একটি থিসিসকে প্রতিষ্ঠিত করছে। এ কথা অবশ্যই ঠিক, কিন্তু যেখানে সচেতনভাবে কোনো থীমকে বা থিসিসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়নি তেমন প্রবন্ধসংকলনকেও আমি পূর্ণাঙ্গ বই বলি যখন তাতে পাই একটি বুদ্ধিমান মনের ক্রমপ্রকাশ, একটি ঔৎসুক্যকর ব্যক্তিত্বের কতগুলি চিত্তাকর্ষক ছবি,—উজ্জ্বল টুকরোগুলোকে পেলেই খুশী থাকি, আর কোনো আরোপিত ঐক্য খুঁজি না। যখন আমরা নিজেরাই সংজ্ঞা অনুসারে অসম্পূর্ণ, আমাদের জীবনগুলি অসম্পূর্ণ, তখন আমাদের লেখা বইয়েরা আর কতটা পূর্ণাঙ্গ হবে? শত চেষ্টা সত্ত্বেও ত্রুটি থেকে যায়। আলোচ্য বইয়েও সেলাইয়ের ত্রুটি আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়টির আদিরূপ কবে কোথায় কী নামে বেরিয়েছিলো সে-খবরটা বাদ প'ড়ে গেছে (অন্য সব অধ্যায়ে সে-খবরগুলি দেওয়া হয়েছে), কিন্তু খবরটা আমরা

পেয়ে যাচ্ছি ১৩৩ পৃষ্ঠায়, নবম অধ্যায়ের ৪৪ নং টীকা থেকে, এবং ভুল থেকে গেছে ১২৮ পৃষ্ঠার ক্রস্-রেফারেন্সে, যেখানে ষষ্ঠ অধ্যায়টির উল্লেখ করা হয়েছে সেটির আদিরূপের নাম দিয়ে। অবশ্য এ ত্রুটি লেখকের ততটা নয় যতটা প্রকাশকের। একটা বইকে প্রকাশ করতে হলে যে কিছুটা সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে হয়, পাণ্ডুলিপিকে যথাসম্ভব অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি থেকে মুক্ত ক'রে নিতে হয়, সে-বিষয়ে অধিকাংশ বঙ্গীয় প্রকাশসংস্থার কোনো চেতনাই নেই।

যাই হোক, পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এসে বলি, পাণ্ডিত্যের আনুপুঙ্খিকতাকে আমি খুবই মূল্য দিই, মূলত সেই গুণই আমার চোখে গবেষণাগ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গতা দেয়, এবং শ্রীযুক্ত রুদ্রর বইটি যে সেই গুণে সমৃদ্ধ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বিশ্লেষণে শ্রীযুক্ত রুদ্র ব্যবহার করেছেন রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক সাহিত্য থেকে সংগৃহীত উপাদানকে। তাঁর মতে এই সাহিত্য সাধারণ ভারতবাসীর জীবনধারাকে যতটা প্রভাবিত করেছে উচ্চতর মার্গের চিন্তা-ধারা ততটা করেনি। তা ছাড়া এই সাহিত্যের সঙ্গে ভারতীয় জনমানসের সম্পর্ক দু-তরফা : দীর্ঘকাল ধ'রে অজ্ঞাতনামা লেখকদের অবদানের সাহায্যে যে-সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে তা জনমানসকে যেমন প্রভাবিত করেছে, জনমানসের মূল্যবোধকেও তেমন প্রতিফলিত করেছে। তাই আজকের সাধারণ হিন্দু মানুষের মনকে বোঝার জন্য এই সাহিত্যকেই লেখক সব থেকে প্রাসঙ্গিক মনে করেছেন।

বইটি নানান মূল্যবান বিশ্লেষণে ও মন্তব্যে ঠাসা। হয়তো লেখক সর্বদাই সাংঘাতিক নতুন কিছু আবিষ্কার করছেন না,—একটা সুপরিচিত প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে অনেক জিনিস 'নতুন ক'রে আবিষ্কার করা' সম্ভবও নয়,—কিন্তু তাঁর বহু-গোত্র উপাদানকে তিনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন, যেভাবে সাজিয়েছেন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়েছেন, যেভাবে একেকটি সামগ্রীর উপরে আলোকসম্পাত করেছেন, সেই আঙ্গিকটা দীপ্র। তিনি চমৎকারভাবে ফোকাস করতে পেরেছেন হিন্দু চিন্তাধারার যে বৈশিষ্ট্যটির উপরে তা হলো অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে তার সীমাহীন সহনশীলতা।

লেখক দেখিয়েছেন পাপপুণ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, ধর্মাধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এই ঐতিহ্যের শাস্ত্রকারদের কাছে কী-আন্দাজ প্রিয় ছিলো। একদিকে কাজের নৈতিকতাকে নির্ভরশীল করা হয়েছিলো কর্তার সামাজিক ভূমিকার উপরে। প্রত্যেক জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিলো তার নিজস্ব ধর্ম, নারীর জন্য ছিলো স্বতন্ত্র নারীধর্ম। কিন্তু এই বিভিন্ন ধর্মগুলিও অন্তর্বিরোধশূন্য ছিলো না। ক্ষত্রিয়ের

ক্ষত্রধর্ম ঠিক কী, সত্যরক্ষা কাকে বলে, সত্য কথা কখন বলতে হবে, কখন হবে না : এ সব বিষয়েও কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সূত্র ছিলো না। অন্যদিকে বর্ণলিঙ্গনির্বিশেষে সব মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য কোনো উচ্চতর ধর্ম আছে এমন একটা চিন্তাও বারে বারে শাস্ত্রকারদের চৈতন্যে হানা দিতো। রামের বনে যাওয়া উচিত কিনা সে-প্রসঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে নানান সূক্ষ্ম পরস্পরবিরোধী যুক্তিকে উপস্থাপিত ক'রে রামায়ণে যে নাটকীয় ধর্মসংকটের সৃষ্টি করা হয়েছে তার দিকে লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং ক্ষত্রধর্মের ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব তথা পরমধর্মের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বকে তিনি চিহ্নিত করেছেন মহাভারতের মূল থীম-রূপে। এই সংঘাতগুলি মহাকাব্য দু'টিকে দিয়েছে সাহিত্যগুণ, নৈতিক আপেক্ষিকতার পরিপ্রেক্ষিতজনিত একটা 'অস্তিত্ববাদী' স্বাদ, কিন্তু তাদের সম্যক্ মীমাংসা করা হয়নি ব'লে ব্যতিক্রমপ্রীতি এবং অন্তর্বিরোধ হিন্দু ধর্মচিন্তার একটা স্থায়ী লক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে।

ক্রোধ ও শাপদানের বিভিন্ন উপাখ্যান বিশ্লেষণ ক'রে লেখক দেখিয়েছেন যে নীতির প্রচার এবং প্রয়োগের মধ্যে প্রাচীনকালে ছিলো প্রচণ্ড অসঙ্গতি। আজকের দিনে আমরা যাকে বলি ন্যায়বিচার সেই নৈতিক ধারণাটির খুব সামান্যই ঘটেছিলো ; যেটুকু উন্মেষ বা ঘটেছিলো তার মধ্যে ছিলো অনেক ত্রুটি, অন্যায়কে ন্যায় ব'লে চালানোর প্রয়াস।

মানুষের যৌনতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য কোনো সন্ধি স্থাপন করতে পারেনি, তাকে দেখেছে একই সঙ্গে একটি বর্জনীয় রিপু এবং একটি অলঙ্ঘ্য শক্তি হিসেবে। বামমার্গীরা তার মধ্যে পেয়ে গেছে মোক্ষের শর্টকাটকে। যৌনতার ব্যাপারে ভারতীয় মনের বিভ্রান্তি এতই গভীর যে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার মধ্যেও সে-মন যেমন দার্শনিক অর্থ খুঁজে বেড়িয়েছে, তেমনি মন্দিরভাস্কর্যের কামকলার ইমেজগুলি যে বামমার্গীদের যৌন আচার থেকে গৃহীত তা-ও পণ্ডিতদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই মনোভাবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারীর প্রতি ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রতিন্যাসও ভয়ংকর উভয়বলতা দ্বারা আক্রান্ত, যার কুপ্রভাবে আজকের দিনের কোনো কোনো শীর্ষস্থানীয় কবিও যুক্তিবর্জিতভাবে নারীবিদ্বেষী। হিন্দু ধর্মচিন্তা যে কী পরিমাণে অন্তর্দ্বন্দ্বে জীর্ণ তা বোঝানোর জন্য লেখক আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেছেন রাম আর কৃষ্ণ এই দুই পরস্পরবিরোধী চরিত্রের দিকে। একই দেবতার অবতার-রূপে কল্পিত এই দুই ব্যক্তি যেন পুরুষচরিত্রের দুই মেরু। রামের চরিত্রচিত্রণে, রাবণের রতিসংযমের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশে, মহাভারতের

প্রাণকেন্দ্রে স্থিত কৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর সূক্ষ্ম পারস্পরিক আকর্ষণের বিশ্লেষণে লেখক যে মনস্তাত্ত্বিক-সাহিত্যিক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের তীক্ষ্ণ সমালোচনা অবশ্যই নতুন নয়। দেড়শো-দু'শো বছর আগেও ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকরা তাঁদের প্রটেস্টাণ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ঐ ঐতিহ্যকে বিচার ক'রে অনেক কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। জাতিভেদপ্রথা ও অন্যান্য ধর্মীয় আচার দ্বারা ভারতের উৎপাদিকা শক্তিদের শ্বাসরোধ, ব্রাহ্মণদের সুবিধাবাদিতা ও স্বার্থপরতা, তাদের দ্বারা শূদ্রদের, অস্পৃশ্যদের এবং নারীদের নিপীড়ন তথা সম্পূর্ণ মগজ-ধোলাই, যাতে নিপীড়িত মানুষগুলি তাদের অবস্থাকে ন্যায্য ব'লে মেনে নেয় এবং কোনো প্রতিবাদ না করে, হিন্দু দেবতাদের লাম্পট্য : এ সমস্তই ঐ পর্যবেক্ষকদের প্রতিবেদনগুলিতে বহুনিন্দিত। শ্রীযুক্ত রুদ্রের পুরোহিত-তন্ত্রবিরোধিতার মেজাজ এবং ভাষাব্যবহার প্রায়ই আমাকে ঐসব পুরোনো প্রতিবেদনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

> উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা যেন চিরকাল নিম্নবর্ণের ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত উৎপাদনের উত্তমাংশকে আত্মসাৎ ক'রে তাদের উপর কর্তৃত্ব ক'রে যেতে পারে, নারীরা যাতে চিরকাল পুরুষদের পদানত থেকে যায়, তাই ছিল এই পরিকল্পনাকারদের কুণ্ঠাবিহীন সচেতন উদ্দেশ্য।

> কাউকে জোর করে পায়ের তলায় চেপে রাখাতেই তার সব চেয়ে বড় পরাজয় হয় না। সেই পরাজয় হয় যখন সে মেনে নেয় সেই পায়ের তলাই তার যোগ্য স্থান। আমাদের সভ্যতার এই এক বৈশিষ্ট্য যে আমাদের সমাজে যাদের পায়ের নীচে চেপে রাখা হয়েছিল যেমন নারীরা বা অস্পৃশ্যরা তারা ঐ পায়ের নীচে পড়ে থাকাকেই তাদের ধর্ম বলে মেনে নিয়েছিল।

> অত্যন্ত সুচতুর, আশ্চর্য রকমে দূরদর্শী, নির্লজ্জভাবে স্বার্থান্বেষী এবং তুলনাতীত-ভাবে সামাজিক বৈষম্যের সমর্থনকারী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের দ্বারা আদিতে গঠিত আমাদের সমাজব্যবস্থাকে ধারণ করতে পারবে যে তাত্ত্বিক আধার তাকে নাম দিতে হলে দেওয়া যেতে পারে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী।

তুলনীয় সতীদাহের ব্রাহ্মণ্য অনুমোদন প্রসঙ্গে মার্কোয়েস অফ্ হেস্টিংসের দু'টি উক্তি :

> **The interest of the Brahmins in this, is, that it is a triumph over reason. The scene is an additional perplexity to that**

common sense, the growth of which they sedulously watch and endeavour to stunt in the lower classes. Subjugation of the intellect, that they may reign over the bodies of the multitude, is the unremitting object of that worthless and successful caste.

It has been a consequence well understood by priestcraft in all nations from the earliest time, that if they could subjugate men to the admission of some signal violation of innate feelings as an act of piety, all minor prostration of sense would follow of course. An unqualified triumph over reason and sentiment in one instance rendered contest on subordinate questions idle.

ভারতীয় মানবতন্ত্রী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তার সঙ্গেও শ্রীযুক্ত রুদ্রের চিন্তার সাদৃশ্য স্পষ্ট। বিশেষত তুলনা করা যেতে পারে হিন্দু ঐতিহ্যের নারীনিগ্রহের বিরুদ্ধে তাঁদের সোচ্চার প্রতিবাদকে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জেলের ডায়েরির দ্বিতীয় খণ্ড 'দ্য আইডিয়াল অফ্ ইণ্ডিয়ান উমানহুড' দ্রষ্টব্য।

তবে শ্রীযুক্ত রুদ্রের কৃতিত্ব এই যে ছোট পরিসরের মধ্যে হলেও তিনি হিন্দু শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী অংশের সদ্ব্যবহার ক'রে, সেই পেটিকা থেকে রীতিবদ্ধ প্রণালীতে উপাদান সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ ক'রে প্রাসঙ্গিক ভাবধারার একটা মোটামুটি সামগ্রিক রূপ পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। বিভিন্ন পণ্ডিত তাঁদের নিজ নিজ বিদ্যাসংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ থিসিস উপস্থাপন করার জন্য সেই সেই বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিত থেকে শাস্ত্রীয় উপাদান ব্যবহার ক'রে বই লিখেছেন, যেমন শ্রীমতী ওয়েণ্ডি ডনিগার ওফ্ল্যাহার্টি করেছেন তাঁর 'অ্যাসেটিসিজম অ্যাণ্ড এরটিসিজম ইন দ্য মিথলজি অফ্ শিব' গ্রন্থে, অথবা শ্রীযুক্ত সুধীর কক্কড় তাঁর 'দ্য ইনার ওয়ার্ল্ড্, আ সাইকো-অ্যানালিটিক স্টাডি অফ্ চাইল্ডহুড অ্যাণ্ড সোসাইটি ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে। শ্রীযুক্ত রুদ্রর উদ্দেশ্য ও পরিপ্রেক্ষিত বিস্তৃততর: তাঁর অনুপ্রেরণা, তিনি নিজেই বলেছেন, রাজনৈতিক, এবং তিনি চাইছেন ব্রাহ্মণ্য ইডিওলজির একটা সামগ্রিক ছবির সাহায্যে পাঠকের মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে। আমি আনন্দিত যে শ্রীযুক্ত রুদ্র বইটি বাংলায় লিখেছেন। বিদেশী পণ্ডিতদের কথা বাদই দিলাম, ভারতীয় পণ্ডিতরাও তাঁদের ভারতচর্চা

সাধারণত ইংরেজীর আশ্রয়েই ক'রে থাকেন। কোশাম্বী থেকে কক্কড় পর্যন্ত সুধীদের চিন্তা ইংরেজীর মাধ্যমেই প্রকাশিত। অথচ যাঁরা ইংরেজীতে লেখা অ্যাকাডেমিক বই পড়েন না তাঁদের মধ্যেও এইসব চিন্তার স্রোত ঢুকিয়ে দেওয়া খুবই জরুরী। বাঙালী হিন্দু সমাজে এরকম বাংলা বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং বাঙালী মুসলমানরাও এ ধরনের বই থেকে নিজেদের ঐতিহ্যকে পরীক্ষা এবং পুনঃপরীক্ষা করার নানান আঙ্গিক শিখতে পারবেন। তবে আমি আশা করি যে শ্রীযুক্ত রুদ্র তাঁর অনুসন্ধানের কিছু কিছু ফসল ইংরেজীতেও প্রকাশ করবেন, যাতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পণ্ডিতরা তাঁর কাজ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

শ্রীযুক্ত রুদ্রর বইটির একটি বিশেষ আকর্ষণ মানবতন্ত্রী প্রতিন্যাসের সঙ্গে তাঁর প্রতিন্যাসের পর্যাপ্ত ওভারল্যাপ। তাঁর লেখায় মার্কস্‌বাদীদের বহুব্যবহৃত ক্লিশে-গুলির প্রতি আনুগত্য নেই, বরং তাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা আছে। আমার ধারণা তাঁর মতো বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মানবতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের সংলাপ ফলপ্রসূ হতে পারে, এবং বাংলার বৌদ্ধিক জীবনের পক্ষে সে-জাতীয় সংলাপ জরুরী।

এবারে আমার কিছু ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার কথা বলি। ভারতীয় ঐতিহ্যের যে শক্তিক্ষয়কারী অন্তর্বিরোধের কথা লেখক মর্মবেদনার সঙ্গে লিখেছেন তা যদিও খুবই সত্য, খুবই বাস্তব, তবুও তার কম-বেশি উপস্থিতি কি ঐতিহ্যিক অথবা আধুনিক অন্যান্য সভ্যতাতেও লক্ষণীয় নয়? আমি জানি, যৌনতার প্রতি এবং নারীর প্রতি ব্রাহ্মণ্য প্রতিন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে লেখক সংক্ষেপে এ কথা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি যদি তাঁর সমগ্র অনুসন্ধানটাকে আরেকটু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে স্থাপন ক'রে নিতেন তা হলে বইটি দার্শনিক গুণে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারতো, যদিও এ কথা আমি কোনো সমালোচনার মনোভাব থেকে বলছি না, বলছি তিনি যে-আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তাকে আরও বিস্তৃত করার জন্য। দূর থেকে এই গ্রহের মানুষগুলির দিকে যদি তাকানো যায়, তা হলে কি মনে হবে না যে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে অমিলের চাইতে মিলই বেশি, এবং অন্তর্বিরোধে দীর্ণ হওয়া যেন মানবিক অবস্থারই অন্যতম লক্ষণ?

ভারতের মেয়েরা মেয়েদের নিগ্রহকে যেভাবে মেনে নিয়েছে সেটাকে লেখকের 'তুলনাহীন' মনে হয়েছে, কিন্তু তিনি যদি মিশর-লিবিয়া-সুদান ইত্যাদি দেশে বাচ্চা মেয়েদের যৌন অঙ্গ কাটা-ছেঁড়ার মর্মান্তিক ইতিহাস অনুধাবন করতেন তা হলে দেখতেন যে সেই নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপের পিছনেও আছে মা-ঠাকুমাদের পূর্ণ সহযোগিতা। সভ্যতার নানা ক্ষেত্রে চীনের অবদান তর্কাতীত, কিন্তু জনসংখ্যা-

বৃদ্ধি দ্বারা বিশেষভাবে বিপন্ন সেই সভ্যতা স্থির করেছে যে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, অতএব সে-সভ্যতা ছ'-সাত মাসের পরিণত গর্ভের নাশকেও অনুমোদন ক'রে দিচ্ছে,—যা পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশেই শিশুহত্যা ব'লে গণ্য হবে,—এ নিয়ে কোনো নৈতিক তর্ককে প্রশ্রয় দিচ্ছে না এবং ঐসব গর্ভিণীদের অনুভূতিকেও গ্রাহ্য করছে না। পাড়ায় পাড়ায় মহিলা সমাজসেবিকারাই দ্বিতীয়গর্ভধারিণীদের গর্ভনাশে রাজী করাচ্ছেন, সবরকমের চাপ সৃষ্টি ক'রে, সবরকমের ব্ল্যাকমেল ব্যবহার ক'রে,—জাতীয় স্বার্থের কথা তুলে।

আর ক্ষত্রধর্ম-পরমধর্মের বিরোধটা তো সার্বিক, দেশে দেশে চলছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যাঁরা মারণাস্ত্রের পাহাড় বানিয়ে চলেন তাঁরা কি বিভিন্ন ইডিয়মে ক্ষত্রধর্মেরই দোহাই দেন না? পাশ্চাত্য সভ্যতাও কি 'আগ্নেয়গিরির শিখরে পিকনিক' নয়, স্কিৎসোফ্রেনিয়া দ্বারা স্পৃষ্ট নয়? তবে হ্যাঁ, অস্তিত্বের কেন্দ্রে একটা দ্বান্দ্বিকতাকে মেনে নেবার পর হয়তো বলা চলে যে অন্তর্বিরোধগুলিকে গোঁজামিল দিয়ে জীইয়ে রাখা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের স্বভাব, আর সেগুলির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই ক'রে একের পর এক দ্বন্দ্ব-উত্তরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা পাশ্চাত্য সভ্যতার ধর্ম, তার প্রাণশক্তি। শ্রীযুক্ত রুদ্রের কী মনে হয়? পাশ্চাত্য মানুষ যে গান্ধীর শিক্ষার মধ্যে অনুপ্রেরণা খোঁজে তা কি এই তাগিদেই নয়?

পশ্চিম-প্রসঙ্গে দু'টি ছোট পয়েন্ট। খ্রীষ্টীয় চিন্তায় ক্রোধ সাতটি মারাত্মক পাপের অন্তর্গত নয় (পৃঃ ৬৭) এমন ধারণা লেখকের হলো কী ক'রে? আমি যতদূর জানি ক্রোধ অবশ্যই সপ্তমহাপাতকের অন্তর্গত: মধ্যযুগীয় ক্লাসিক উইলিয়ম ল্যাংল্যাণ্ডের 'পিয়ের্স দ্য প্লাওমান'-এ তার সাক্ষ্য পাচ্ছি,—অন্য ছয়টি পাপ হচ্ছে দর্প, কাম, ঈর্ষা, লোভ, ঔদরিকতা এবং আলস্য। দান্তের নরকেও রাগী মানুষদের জন্য একটা বৃত্ত নির্দিষ্ট আছে। অপর পয়েন্ট জননী মেরীর বিষয়ে। শ্রীযুক্ত রুদ্র লিখেছেন, মেরীর স্থান হিন্দুদের চোখে দুর্গা-কালী-সরস্বতীদের মতো চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয় (পৃঃ ১০২)। এ কথা তাত্ত্বিকভাবে, থিওলজির দিক দিয়ে, পাদ্রীদের পক্ষে সত্য হলেও কার্যত ক্যাথলিক জনমানসে মেরী মাতৃকাদেবীর সিংহাসনেই অধিষ্ঠিতা এবং সমস্ত বিপদে-আপদে ভক্তরা সেই সর্বদুর্গতিনাশিনীর কাছেই আবেদন-নিবেদন দাখিল করে। পুরো ব্যাপারটা চার্চের অনুমোদিত। মাতৃকাদেবীর পূজার সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক খ্রীষ্টধর্মের এই আপস ক্যাথলিক ঐতিহ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং অবশ্যই তার সুপার-স্ট্রাকচারের অন্তর্গত।

ভারত-প্রসঙ্গে দু'টি পয়েন্ট। প্রথমত, হিন্দু ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে ভক্তির ধারা-

টির ভূমিকা নিয়ে লেখক কোনো আলোচনার সূত্রপাত করেননি। ঐ ধারাটি ব্রাহ্মণ্য কঠোরতার সঙ্গে অন্তত কিছুটা লড়াই করেনি কি? কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা নিয়ে ভাষ্যকারদের ভণ্ডামি অনস্বীকার্য, কিন্তু সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যেই রাধাকৃষ্ণের লীলার ব্যাপারটা কি 'নির্জলা কাম'-এর ব্যাপার (পৃঃ ১২৮), তাতে কোথাও কি মানুষের প্রেমানুভূতির স্বর ধ্বনিত হয়নি? শ্রীযুক্ত রুদ্র কি মীরার গান বা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কথা ভুলে যাচ্ছেন? আমার কিন্তু মনে হয় ভক্তির ঘোরানো পথে হলেও বৈষ্ণব সাহিত্য লৌকিক প্রেমচেতনাকে বেশ খানিকটা পুষ্টি জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের কতগুলি মূল থীম, যেমন সখ্যের ভাব, বিরহের ভাব, মিলনের জন্য উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা, তা ছাড়া আনুষঙ্গিক নানান ইমেজরি সরাসরি লাইনে বৈষ্ণব ঐতিহ্য থেকে এসেছে।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত সাহিত্য প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে থেকে উদ্ধৃতি দু'টি বা বুদ্ধদেব বসুর মেঘদূতের ভূমিকায় ব্যক্ত মতামত (পৃঃ ৭৮) সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি ঠিক সুবিচার করে কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সুশীল দে সংস্কৃত সাহিত্যে লরা-বিয়াত্রিচের মতো বিশেষ নারীর অনুপস্থিতির কথা তুলেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কিন্তু শকুন্তলা, যক্ষবধূ, কাদম্বরী, মহাশ্বেতার মতো ঝিকিমিকি আভার নারীরা আছেন, এবং এইসব চরিত্রের কল্পনায় ব্যক্তিগত আবেগের কোনোই ভূমিকা ছিলো না এমন কথা বিশ্বাস করতে আমার বেশ অসুবিধা হয়। মেঘদূতের অনুবাদের ভূমিকায় ব্যক্ত বুদ্ধদেব বসুর মতামত ছাত্রজীবনে আমাদের প্রজন্মকে আলোড়িত করেছিলো, কিন্তু এখন মনে হয় সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দদের তুলনায় কালিদাসের প্রেমের ধারণা যদি সংকীর্ণ হয়ে থাকে তা হলে এ-ও মানতে হয় যে সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-বুদ্ধদেবদের প্রজন্মের প্রেমের ধারণাও এখনই কেমন যেন সাবেকী হয়ে গেছে।

আমি বলতে বাধ্য যে বইটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মানিয়ে এর অঙ্গসজ্জা আরও মর্যাদাবান হওয়া উচিত ছিলো। সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তার কথা আগেই বলেছি। বহু পীড়াদায়ক মুদ্রণপ্রমাদ আছে; সর্বাপেক্ষা পীড়াদায়ক অজস্র সমাসবদ্ধ পদের টুকরো টুকরো অবস্থা। যেখানে বিষয়বস্তুর কারণেই অনেক তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এই ত্রুটি বিশেষভাবে সৌন্দর্যহানিকর। সপ্তম অধ্যায়ের নাম আগাগোড়া "নারী ধর্ম" ছাপা হয়েছে। কিন্তু "নারী ধর্ম" বাংলা নয়,—হবে হয় "নারীধর্ম" নয় "নারীর ধর্ম"। এদিকে 'হিন্দু মন' নামপত্রে আলাদা আলাদা, কিন্তু প্রচ্ছদে 'হিন্দুমন'।

পরিশেষে একটি জরুরী প্রশ্ন,—লেখককে নয়, অন্য দু'জন ব্যক্তিকে। এই বইটির সপ্তম অধ্যায়ে একেবারে গোড়াতে নাম অনুক্ত রেখে যে দু'জন শীর্ষস্থানীয় আধুনিক বাঙালী কবির কথা বলা হয়েছে,—যাঁরা মনে করেন যে কোনো মেয়েই কবিতা লিখতে পারে না, কোনো রকমের সৃষ্টিশীল প্রতিভাই মেয়েদের মধ্যে কখনো থাকে না, শয্যায় ছাড়া অন্য যে-কোনো অবস্থাতেই নারীর অবদান অকিঞ্চিৎকর,—তাঁরা কাঁরা? সাহস ক'রে আত্মপরিচয় কবুল করবেন কি? তাঁদের আমি নিশ্চয়ই চিনি? তাঁদের আমি ঐসব পয়েণ্টে প্রকাশ্যভাবে আমার সঙ্গে তর্ক করতে আহ্বান জানাচ্ছি, কারণ শ্রীযুক্ত রুদ্রর মতো আমিও বিশ্বাস করি যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবগুলিকে একটুকুও আশকারা দেওয়া উচিত নয়।

অশোক রুদ্র, 'ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন', পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৮৩, ১৮০ পৃষ্ঠা, দাম কুড়ি টাকা।

'বিনুর বই' প্রসঙ্গে

অনেক বছর আগেকার কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজে সবে ভর্তি হয়েছি। দু'জন খ্যাতনামা অধ্যাপকের টিউটোরিয়াল তত্ত্বাবধানের অধীনস্থ হয়েছিলাম। তাঁরা দু'জনেই আর বেঁচে নেই। তারকনাথ সেন প্রথম টিউটোরিয়াল প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছিলেন টেনিসনের লিরিক কবিতার উপরে। সাবধানী ভঙ্গিতে তাঁর জন্য সে-লেখা লিখেছিলাম। অমল ভট্টাচার্য প্রথম প্রবন্ধ লিখতে বলেছিলেন কবিতার সঙ্গে অন্যান্য আর্টফর্মের সম্পর্ক নিয়ে। সেই প্রবন্ধে নিজের প্রকৃত মর্জিকে এবং দৃষ্টিকোণকে সানন্দে ব্যক্ত করেছিলাম একেবারে সর্বপ্রথম বাক্যটিতেই একজন মান্য সমকালীন বাঙালী লেখক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। 'সমকালীন বাঙালী লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন…' ইত্যাদি। অন্নদাশঙ্কর তাঁর কোনো প্রবন্ধে বলেছিলেন, যে জীবন যেন একটা বহতা নদী আর শিল্পীরা তাতে ডুব দিয়ে গাগরি ভ'রে ভ'রে জল তুলে আনেন। ইমেজটা আমার মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিলো। আমি অনুভব করেছিলাম যে সেটা আমাকে যে ক'রে হোক ব্যবহার করতেই হবে। সেকালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রদের পক্ষে নামজাদা পাশ্চাত্য সমালোচকদের বাণী দিয়ে নিজেদের রচনা অলংকৃত করাই রীতিসম্মত ছিলো; এখনকার কথা জানি না। প্রবন্ধের গোড়াতেই একজন সমকালীন বাঙালী লেখকের নাম করাটা ছিলো নিঃসন্দেহে নিয়মের ব্যতিক্রম। অমলবাবুও সামান্য অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু প্রবন্ধটা, যেখানে অন্নদাশঙ্করের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'পয়েন্ট অফ্ রেফারেন্স'-এর ভূমিকা পালন করেছিলো, তাঁর ভালো লেগেছিলো খুবই। তাঁর প্রশংসাসমেত সেই বিশেষ খাতাটাও—খাতাটার প্রথম প্রবন্ধই ছিলো ঐটে, এবং ঐ অধ্যাপকের কাছ থেকে প্রশংসা পাবার দরুন আমার মনে যথেষ্ট সন্তোষও ছিলো,—হ্যাঁ, সেই খাতাটাও বেশ কিছু দিন আমার কাছে-কাছেই ছিলো, কিন্তু এখন আর সেটার কোনো অস্তিত্ব নেই,—স্মৃতিতে ছাড়া।

আমার কাছে অন্নদাশঙ্কর বলতে সর্বাগ্রে বোঝায় জীবনচর্যা আর শিল্পসৃষ্টিতে মিলিয়ে একটা অখণ্ডতার বোধ, সাহিত্যিকের বৃত্তি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা ও চেতনা, সেই বৃত্তির প্রতি একটা অটল নিষ্ঠা, সেই পথ চলায় একটা নমস্য সাহস। তিনি কীভাবে লেখক হয়ে উঠেছিলেন 'বিনুর বই' তারই দলিল।

'বিনু কিন্তু সব সময় আমি নই', আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছেন তিনি, 'আমারি মতো একজন লেখক'।[১] এ কথা মেনে নেবার পরও স্বীকার্য যে তাঁর অন্যান্য আত্মজৈবনিক রচনায় যেমন 'বিনু' (১৯৪০-৪১), 'নিজের কথা' (১৯৪৭), 'জবানবন্দী' (১৯৪৭), 'আত্মস্মৃতি' (১৯৫১) ইত্যাদিতে যে ভাবুক ব্যক্তিত্বের দেখা মেলে 'বিনুর বই'ও মোটের উপর ধরিয়ে দেয় সেই মানুষটিকেই। ছোট্ট বইটি তাঁর সাহিত্যিক হয়ে ওঠার একটি টিপছাপ, এমন বললে ভুল হবে না।

অধিকন্তু, নিজেদের বৃত্তি সম্পর্কে যেসব লেখক গভীরভাবে ভেবেছেন, লেখক হয়ে উঠতে গিয়ে যাঁদের অন্তরে আর বাইরে নানারকমের বোঝাপড়া তথা সংগ্রাম করতে হয়েছে, তাঁরা নিশ্চয়ই এই বইয়ের পাতায় পাতায় নিজেদের অনেক ভাবনাকে, জিজ্ঞাসাকে, দ্বন্দ্বকে, দ্বন্দ্ব-উত্তরণকে সনাক্ত করতে পারবেন। বিনুর অনেক ইশু আমাদেরও ইশু, বিনুর আয়না অনেকাংশে আমাদেরও আয়না। কোথাও-বা বিনুর কোনো সূত্র আজকের দিনে আমাদের 'পয়েণ্ট অফ্ ডিপার্চার'। 'বিনুর বই' যেমন তার লেখককে চিনিয়ে দেবার পক্ষে একটি অপরিহার্য অভিজ্ঞান, তেমনি অন্যান্য বৃত্তিসচেতন লেখকদের পক্ষেও একটি বীজধর্মী দস্তাবেজ। বইটি নামাঙ্কিত কয়েকটি ছোট-ছোট অংশে বিভক্ত। একেকটি নামই লেখকদের জীবনের একেকটি থীম যেন। 'অমরত্ব', 'খাঁচার পাখি', 'স্টাইল', 'কস্মৈ দেবায়', 'শ্রেণীসাহিত্য', 'দায়', 'বাঁশি', 'নেশা ও পেশা', 'জীবিকা', 'লিখব না বাঁচব', 'আপনাকে চেনা', 'ডায়ালেকটিক', 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক', 'প্রেরণা', 'প্রতীক্ষা', 'প্রজ্ঞা', 'রিয়ালিজম', 'সাহিত্যের সত্য', 'প্রেম বনাম সমাজ', 'দায়িত্ব', 'সংকট', 'ভাঙন', 'যাত্রা' ইত্যাদি। কতগুলি চাবি-শব্দ, কতগুলি সংকেত।

বিনু সেই মানুষ, যে বুঝেছে যে লেখক হয়ে উঠতে হলে শুধু 'লিপিচতুর' হলে চলবে না, 'জীবনচতুর'ও হতে হবে,—যেমন রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরী, যাঁদের 'চোখ চতুর, কান চতুর, রুচি চতুর', যাঁদের 'মন চতুর'। 'এক প্রকার মন আছে, বিদগ্ধ মন। যার সে মন নেই সে যদি লিপিচতুর হতে যায় তবে রসের বদলে দেয় রসাভাস। তাতে প্রাণ জুড়ায় না। একটু চমক লাগে এই যা।'

বিনু সেই মানুষ, যে বিরাট মূল্য দেয় স্বাধীনতাকে। 'যে নারী তার একমাত্র বাস দান করেছিল প্রভু বুদ্ধের জন্যে তার কাছে তার একমাত্র বাসের যা মূল্য

১. এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত অন্নদাশঙ্কর থেকে সব উদ্ধৃতি গৃহীত হয়েছে ডি. এম. লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ (১৯৬৪) থেকে।

বিনুর কাছে তার স্বাধীনতারও তাই।' 'তার অন্তিম লক্ষ্য স্বাধীন জীবন, স্বাধীন যৌবন। নরনারী উভয়ের। আপাত লক্ষ্য সংস্কারমুক্তি। দোরোখা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।' সে লক্ষ করে যে নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে 'সমাজের বিচারে যা দুর্নীতি তা নিরপেক্ষ বিচারে সুনীতি হতে পারে'। তার ফেমিনিজম কেবল কলেজে বা অফিসে নরনারীর সমানাধিকার-দাবিতে সীমাবদ্ধ থাকে না: সে চায় উভয় পক্ষের জন্য পথের সমানাধিকার, অ্যাডভেন্চারের সমানাধিকার,—পুরুষ আর নারী যাতে সমান স্বাধীনতার আকাশে ডানা মেলতে পারে। এ কথা সে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে বোঝাতেও যায়। কিন্তু প্রতিবাদ আসে মহিলাদেরই তরফ থেকে। বিনু বোঝে যে 'মেয়েরা সত্যিকার স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত নয়। পুরুষরাও নয়। সত্যিকার স্বাধীনতা আসবে সমাজের আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে।'

অনিবার্যত যুবক বিনু নিজের মধ্যে লালন করে একজন বিদ্রোহীকে। 'অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্যে বর্তমান ভারতের এ দশা, এ কথা সে উচ্চকণ্ঠে জানায়। নির্মমভাবে সমালোচনা করে।' মানুষের কতগুলো বদ্ধমূল সংস্কারকে সে চুরমার করতে চায়, যেসব প্রথাকে বিশ্বাসকে আচারকে মানুষ এতকাল মূল্য দিয়ে এসেছে সেসব যে মূল্যহীন তা হাতে-কলমে প্রমাণ করতে চায়। 'এর জন্যে যদি উপন্যাস লিখতে হয় তাও সই।' কিন্তু বিনুর কালাপাহাড়বৃত্তি 'বিশুদ্ধ ভাঙন'-এর নয়। গড়তেও যে হবে সে-কথা সে ভালোভাবেই জানে। সে স্বপ্ন দ্যাখে নতুন সমাজের। স্বদেশের বিপুল ধারাবাহিক ঐতিহ্য ও তার সুপ্রাচীন শিকড় থেকে সে নিজেকে 'বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত' করতে চায় না, ভেবে আনন্দ পায় যে 'ভারতের কবি-পরম্পরায় বিনুও একটি মুক্তা', 'এক সূত্রে গাঁথা'। ক্রমশ চিন্তাশীল মানুষের স্বাভাবিক বিবর্তন-বিবর্ধনে একটু একটু ক'রে শিথিল হয়ে আসে তার ঐতিহ্যপ্রীতি। নিজেকে হিন্দু বলতে দ্বিধা বোধ করে সে, ভারতীয় বলতেও কুণ্ঠিত হয়। 'কী তবে সে? যার কোনো লেবেল নেই। নিশ্চিহ্নিত মানুষ।'

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধ বিনুর চরিত্রের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। তার এই মমত্ববোধের অঙ্কুরোদ্‌গম হয় ছেলেবেলায় ভারতীয় পল্লীজীবনের পাতানো সম্পর্কগুলির মাধ্যমে। পরে বড় হয়ে সে বুঝেছে যে ওগুলো ছিলো মূলত মৌখিক সম্বন্ধ, যাদের নিচে ছিলো বিরাট বিরাট ব্যবধান। তা সত্ত্বেও 'মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই সম্প্রীতির স্মৃতি' বিনুর মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একধরনের বিশ্বাস জোগায়। 'যাদের সঙ্গে তার স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না, তার পিতামাতার স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না, তারা মুখের সম্বন্ধকেও সত্য

সম্বন্ধ বলে তাকে একদিন বিশ্বাস করতে দিয়েছিল।…একজনের জীবনে এককালে যা বাস্তব হয়েছে তা সর্বজনের জীবনে সর্বকালে বাস্তব হবে না কেন, যদি তার মধ্যে সত্য থাকে?'

ফলে বিনু 'বারবার চেয়েছে সাহিত্যে মানবজীবনের সমগ্র রূপ দেখা দিক', 'সমগ্র সুর বেজে উঠুক'। সে প্রবলভাবে অনুভব করেছে সাধারণ কর্মী মানুষের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার, মিলিয়ে নেবার তাগিদ।

> বিনুর সাধ যেত পথে বেরিয়ে পড়তে, সকলের সঙ্গে সব কিছু হতে। চাষীর সঙ্গে চাষী, মাঝির সঙ্গে মাঝি, কাঠুরের সঙ্গে কাঠুরে, বাউলের সঙ্গে বাউল। এদের মধ্যে চাষীর উপরেই ছিল তার পক্ষপাত টলস্টয়ের প্রভাবে। চাষী কিনা অক্ষয় বট, মাটিতে তার শিকড়। সকলের উচ্ছেদ হলেও চাষীর হবে না। চাষীর সঙ্গে চাষী হলে, চাষানী বিয়ে করলে, মাটির প্রাণরহস্য আয়ত্ত করতে পারবে বিনু। যে সব উপলব্ধি এলিমেণ্টাল, অর্থাৎ আদিতন, মৌল, সেসব যদি কোথাও সম্ভব তো কৃষকের জীবনে।

অবশ্য আরও অনেক শিল্পীর মতোই বিনুও শেষ পর্যন্ত কৃষকের জীবনকে বেছে নিতে পারেনি।

তার নিজের প্রথম সচেতন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো সাংবাদিক হবার। সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশে তার হাতে খড়ি হলো নবযৌবনের প্রথম প্রবল প্রেমের দায়ে। রুটি রোজগারের জন্য তাকে নিতে হলো সরকারী চাকরি।

এমন কোনো শিল্পী বোধ করি নেই, জীবিকা আর শিল্পসাধনার দ্বন্দ্ব যাঁর সম্পূর্ণ অচেনা। এই সমস্যার কোনো সুষ্ঠু সমাধান আমরা অনেকেই করতে পারিনি। বিনুকেও এই মৌলিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জীবিকার জন্য কিছুটা সময় দিতেই হবে: 'মর্তের শর্ত' থেকে কারও নিস্তার নেই। 'সমাজের ব্যবস্থা যে রকমই হোক না কেন মানুষকে তার অন্ন বস্ত্র ও বাসগৃহের জন্যে জীবনের খানিকটে ত্যাগ করতে হবে।' কিন্তু বিনু স্বপ্ন দ্যাখে এমন এক পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার, যেখানে 'জীবিকার ভাগ কমবে, জীবনের ভাগ বাড়বে', যেখানে 'মর্তের শর্ত এত কঠোর মালুম হবে না'। এবং শুধু তাই নয়, জীবিকার জন্যে যে-সময় দেওয়া হয় সেটা যত অল্পই হোক না কেন, সেটা যেহেতু জীবনেরই অংশ, আমাদের বহুমূল্য আয়ুষ্কালেরই অন্তর্গত, সেহেতু রুটি রোজগার করার কাজটাকেও আনন্দপ্রদ হতে হবে। 'যখন পেটের দায়ে কাজ করছি তখনো যেন মনে করতে পারি যে

প্রাণের আনন্দে বাঁচছি। নইলে জীবনের অখণ্ডতার স্বাদ পাব না।' বিন্নুর সঙ্গে এখানে আমি মনে-প্রাণে একমত, এবং মানুষের ভবিষ্যৎমুখী শুভবুদ্ধি তো ঐ দিকেই আঙুল দেখায়।

বিন্নুর লেখা-আর-বাঁচার দোটানাটাও আমার খুব পরিচিত। 'দু পৃষ্ঠা লিখতে না লিখতে তার মনে পড়ে যায়, ঐ যা! বাঁচতে ভুলে গেছি। আজকের দিনটা ঠিকমতো বাঁচা হলো না। আবার, দু দিন লেখা বন্ধ থাকলে তার মন কেমন করে! কই, কিছুই তো লিখে যেতে পারলুম না।' সাহিত্যকে জীবিকা করা? এ ব্যাপারেও বিন্নু যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছয় তা আমারও অভিমত: '...জীবিকার জন্যে সাহিত্য লিখতে বসলে এত বেশী লিখতে হয় যে বিন্নু কোনো কালে এত বেশী লিখতে চায়নি, এত বেশী লিখলে বেশীরভাগ লেখা হবে অনিচ্ছায় লেখা। অনিচ্ছায় লেখা কদাচ ভালো হয়। বাজে লেখায় হাত খারাপ করলে সে হাত দিয়ে পরে ভালো লেখা বেরোয় না। প্রকৃতির পরিশোধ।' এই কথাগুলো সব আত্মসম্মানযুক্ত লেখকের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা উচিত। হ্যাঁ, আর এইটেও: 'যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন যে বাঁচে সে ঠকে না। যে বাঁচে না সে হাজার লিখলেও ঠকে!' আসলে এই উপলব্ধিগুলো একটা বৃত্তকেই সম্পূর্ণ করে। জীবনশিল্পী না হলে লিখনশিল্পী হওয়া তো সত্যিই সম্ভব নয়। আর লেখা 'একটা ডিসিপ্লিন': 'সৈনিকের ডিসিপ্লিন এর চেয়ে কঠোর হতে পারে না'।

> প্রথম জীবনে না হলেও পরবর্তী কালে বিন্নুর দৃষ্টিগোচর হয়েছে সাহিত্যের বাণিজ্যায়ন: বিয়ের বাজারের মতো লেখার বাজার বলে একটা বেচাকেনার হাট বসেছে। সেখানে লেখক ও পাঠকের ভিড়। ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে সেখানে যদি কোনো প্রতিভাবান আসেন তবে তিনি লাভবান হতে ইচ্ছা করেন। তখন তিনি যা লেখেন তা দান নয়, ইনভেস্টমেণ্ট। একজন ভাগ্যবান পুরুষকে মন্তব্য করতে শোনা গেছে, আমার এক একখানা বই হচ্ছে এক একখানা জমিদারি। আমার জমিদারি মারে কে!

বইয়ের শেষে লেখক নিজেরই জবানিতে ক্ষোভ ক'রে বলেছেন: 'যাঁদের লেখনীর মুখে ভাষা আছে তাঁরাও যদি নীরব হতে জানতেন তবে সাহিত্য আজ মেছোহাটা হয়ে উঠত না।' 'বিন্নুর বই'-এর তারিখ ১৯৪৪। তখনই এই অবস্থা। আর এখন?

আমরা বুঝতে পারি, বিনুর প্রথম বান্ধবী বিনুর লেখকত্বকে একটা প্রাথমিক মুক্তি দিয়ে থাকলেও লেখক বিনুর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন ঘটে ঐ বান্ধবীর সহযোগিতায় নয়, বরং তার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতেই। বস্তুত, ঐ মেয়েটি তো চায়ইনি যে বিনু লেখক হয়, চেয়েছিলো যে বিনু হয় সৈনিক, বা ডাক্তার, বা রাজনৈতিক কর্মী। (বিনু থেকে অন্নদাশঙ্করে দ্রুত প্রসঙ্গবদল যদি অনুমোদিত হয়, তবে বলি : ডাক্তার বা রাজনৈতিক কর্মী না হয় মানা গেলো, কিন্তু অন্নদাশঙ্কর স্যাণ্ডহার্স্ট-শিক্ষিত সৈনিক ? ভাবা যায় না !)

> তাঁর চোখে দ্বন্দ্বের আদর্শই বড়ো ছিল। এত বড়ো যে ওর তুলনায় ছন্দের আদর্শ অকিঞ্চিৎকর। বিনু তাঁকে যত বার বোঝাতে যেত তত বার ব্যর্থ হতো। তিনি মনে করতেন বিনু দ্বন্দ্বকাতর বলেই ছন্দের আড়ালে মুখ ঢাকছে। তার হাতে তলোয়ার নেই, আছে শুধু ঢাল।

ক্রমশ বিনু বুঝে ওঠে যে সে 'বিদ্রোহী বটে, কিন্তু সেই তার একমাত্র পরিচয় বা শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়'। দ্বন্দ্ব না হয় করা যাবে, 'কিন্তু চোখ খোলা রেখে। জয়ের জন্য সর্বস্ব না দিয়ে। সে বরং একশো বার হারবে, তবু আপনাকে হারাবে না। দ্বন্দ্ব বড়ো নয়, ছন্দই বড়ো।' অপিচ :

> দ্বন্দ্ব যে অপরিহার্য বিনু তা মানত। না মেনে উপায় ছিল না। কিন্তু দ্বন্দ্বের জন্য যে সব দিতে হবে, সব দিতে দিতে আত্মাকেও, কিছুতেই এটা তার সইত না। যা সইতে পারে না তারই বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ যখন তার সহনের অতীত হয় তখন বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহী হয়।

ফলে বিনু 'দল গড়তে পারে না, দলের একজন হতে পারে না, দলে টিকতে পারে না' ; তার বন্ধুরা যখন খোঁচা দিয়ে বলে যে সে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী' তখন সে তা স্বীকার ক'রে নেয়। 'আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী বললে বোধ হয় আরো যথার্থ হতো। কী করে যে কেউ তার আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে পারে বিনুর তা বোধগম্য হতো না, এখনো হয় না।'

মজার ব্যাপার এই, বিনু এক সময়ে আর্টকে 'পুরুষের কাজ' ব'লে মানতেই প্রস্তুত ছিলো না, যদি না তার দ্বারা 'সামাজিক কার্যসিদ্ধি' হয়। যে-আর্ট দ্বারা সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না তাকে তার মনে হতো 'মহিলাযোগ্য' কাজ !

জগতে যেমন ফুলের মালা আছে, মালিনীরা গাঁথে, তেমনি রসের কবিতাও

> থাকবে, যারা লিখবে তারা একটু যেন মেয়েলি। রবীন্দ্রনাথকেও লোকে তাই বলত। বিনুর একমাত্র পাঠিকা বিনুকেও বলতেন মেয়েলি। বিনুর তাতে শরম লাগত না। কারণ মেয়েরা যে দেবী।

আর্টিস্ট হিসেবে বিনুর আত্মবিশ্বাসকে গ'ড়ে তুলতে বিনুর এই তৎকালীন বান্ধবীটির প্রতিন্যাস যে কতটা সাহায্য ক'রে থাকবে তা বোঝাই যাচ্ছে! বান্ধবীর দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি গ্রাহণযোগ্য মনে না করলেও বিনুরও একটা সাময়িক ঝোঁক চেপেছিলো 'ঘোড়ায় চাপতে, ঘোড়ায় চড়ে লিখতে'। **machismo** একেই বলে! (স্প্যানিশ **macho** অর্থাৎ মরদ থেকে **machismo** অর্থাৎ মর্দানি।)

> পুরুষের কাজ, হয় না-লেখা, নয় ঘোড়ায় চড়ে লেখা। বাকিটা মেয়েদের ও মেয়েলি মেজাজের পুরুষদের। তাঁরা বসে বসে আর্ট সৃষ্টি করুন, আমরা গিয়ে সমাজ ভাঙি গড়ি। আমাদের অন্য কাজ আছে। আমরা পুরুষ।
>
> আর্ট যে যুদ্ধবিগ্রহের মতো পুরুষেরই কাজ, গৃহযুদ্ধের মতো মেয়েদেরও, এ জ্ঞান এল অভিজ্ঞতার থেকে। এটা পড়ে পাওয়া নয়, ঠেকে শেখা। সেই দারুণ ডিসিপ্লিন তিন বছরে বিনুকে ত্রিশ বছর বয়স্ক করেছিল। পরিণত মন নিয়ে সে অন্যান্য সত্যের সঙ্গে এ সত্যও শিখল যে সামাজিক কার্যসিদ্ধি আর্টের উদ্দেশ্য নয়, আর্ট ফর আর্টস্ সেক।

আর্ট ফর আর্ট্স্ সেক বলতে বিনু কী বোঝায় তা আমাদের জেনে নেওয়া জরুরী। কখনো কখনো আঙ্গিকসর্বস্ব বা অলংকারসর্বস্ব বা ফ্যাশনসর্বস্ব বা ফ্যাণ্টাসিসর্বস্ব আর্টের জবাবদিহিস্বরূপ ফরমুলাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বিনুর কাছে সূত্রটার অর্থ হচ্ছে ফলের আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন ক'রে আর্টের সাধনা করা, উদ্দেশ্যকে উপায় করা, উপায়কে উদ্দেশ্য :

> সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উপায়। সেইজন্যে বিনু বলে, আর্টের খাতিরে আর্ট। আর্টই আর্টের উদ্দেশ্য, আর্টই আর্টের উপায়। আর্ট যখন লক্ষ্য ভেদ করে তখন আর্টেরই লক্ষ্য ভেদ করে, আর্ট হয়েই তার উত্তীর্ণতা বা উদ্ধার। তখন তাকে সামাজিক মাপকাটিতে মাপতে পারো, হয়তো তাতেও সে ওতরাবে। কিন্তু কেবলমাত্র তাতেই নয়। আর্টের মানদণ্ড আর্টের ভিতরে। তাই তার সার্থকতা আর্ট হওয়াতে। আর যা-কিছু তা অধিকন্তু। অধিকন্তু ন দোষায়। তাকে দিয়ে যদি সমাজের মঙ্গল বা দেবত্বের বিকাশ

> হয়, যদি চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়, তবে সেটা অধিকন্তু। তাতে দোষ নেই। কিন্তু আর্টের উদ্দেশ্য সেটা নয়, উপায় তো নয়ই।

এর সঙ্গে আমার অন্তত কোনো ঝগড়া নেই।

এবং এরই সঙ্গে তাল রেখে আঙ্গিকের প্রতি বিনুর দৃষ্টিভঙ্গি। 'বিনু আঙ্গিকের জন্যে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু অনঙ্গকে অঙ্গ দেবার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে। আঙ্গিক যদি এর থেকে স্বতন্ত্র হয় তো বিনু তার মহিমা বোঝে না। যদি এর অন্তর্গত হয় তো আঙ্গিকের প্রতি উদাসীন নয় সে।'

'বিনুর বই' থেকে এমন কয়েকটি সূত্র তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যেগুলি দায়িত্বশীল লেখকমাত্রের জীবনেই কম-বেশি প্রাসঙ্গিক। এবারে বিনুর এমন দু'-একটি বক্তব্যের উল্লেখ করি, যেগুলি অন্তত আমার কাছে 'পয়েণ্ট অফ্ ডিপার্চার' এবং সে-কারণেই মূল্যবান। সহজ রসের মর্ম বোঝাতে গিয়ে বিনু ব্যাখ্যা করে:

> যেসব কবিতা বুকের রক্তে লেখা, মন তাদের উপর খবরদারি করে একটু আধটু বদলে দেয়, নতুবা মনের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সুদূর। সেসব ক্ষেত্রে মনের চাতুরী একটা উপসর্গ, সাধক তাকে ভয় করে। সাধক চায় সম্পূর্ণ সহজ সরল নিরলঙ্কার হতে, সব অভিমান ভুলতে। ঐশ্বর্যের লেশ রাখতে চায় না, বিভূতির পরিচয় গোপন করতে চায়। এও এক প্রকার বৈদগ্ধ্য। কিন্তু মনের নয়, হৃদয়ের। সংসারের পোড় খেয়ে নয়, প্রেমের দহনে।

কিন্তু মন আর হৃদয়ের এই পৃথকীকরণ কতটা ন্যায্য বা কতটা কার্যকর? বুকের রক্তে লেখা হলেও সাধকের কবিতাও যখন ভাষাতেই লেখা, তখন মনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অন্তরঙ্গ না হয়ে যাবে কোথায়? ভাষা তো মনেরই দখলে; হাজার নিরাভরণ হলেও ভাষা তো ভাষাই, অর্থাৎ একটি মানসিক প্রক্রিয়া।

'রিয়ালিজম'-নামাঙ্কিত অংশটিতে বিনু বলে, রিয়ালিটিকে তার দরকার ব'লেই রিয়ালিজমে তার অনাস্থা, কিন্তু ও দুটোর মধ্যে ঠিক কী তফাত সে করতে চায় তা আমার কাছে স্পষ্ট হয় না। তার ব্যবহৃত মধু আর গুড়ের উপমাটা খুব একটা সাহায্য করে না, বরং জল আরো ঘোলা করে, এবং সে নিজেও তা বোঝে মনে হয়।

> তবে পৃথিবীতে গুড়ও থাকবে, গুড়ের চাহিদাও থাকবে, এমন মানুষও থাকবে যারা গুড় পেলে মধু চাইবে না। এও বড়ো মজার কথা যে, যারা মধু ভালো-

> বাসে তারা গুড়ও ভালোবেসে এবং মাঝে মাঝে মুখ বদলায়। রিয়ালিজমে অনাস্থা আছে বলে বিনু যে রিয়ালিস্টদের রচনা দূরে সরিয়ে রাখে তা নয়। পড়ে তারিফ করে।

তবে? বিনু বলে, রিয়ালিস্টদের লেখা প'ড়ে তার জিজ্ঞাসার নিরসন হয় না, সেজন্যে তাকে যেতে হয় মিস্টিকদের কাছে। কিন্তু রিয়ালিস্ট আর মিস্টিকের তফাত বোঝাতে গিয়ে বিনুকে নামতে হয় গভীরতম জলে। কেননা: 'একই মানুষ দুই হতে পারে। হয়ে থাকে।' অপিচ: 'মিস্টিকরা প্রায়শ সাহিত্যিক গুণে বঞ্চিত।...পক্ষান্তরে রিয়ালিস্টরা সাহিত্যনিপুণ।' অতএব? আমার ধারণা, বিনু এখানে এমন একটা গোলমালে পড়েছে যা থেকে বেরোতে হলে প্রয়োজন রিয়ালিটি-বনাম রিয়ালিজম, মধু-বনাম-গুড়, রিয়ালিস্ট-বনাম-মিস্টিক, এইসব দ্বান্দ্বিকতা থেকে বেরিয়ে আসা।

'সাহিত্যের সত্য'-নামক অংশে সাহিত্যের সত্য আর দর্শনবিজ্ঞানের সত্যের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বিনু দাবি করে যে সাহিত্যের সত্য 'কল্পনামিশ্রিত' কিন্তু দর্শনবিজ্ঞানের সত্য 'কল্পনাবর্জিত'। সে আরও বলে:

> সাহিত্যে কেউ কিছু আবিষ্কার করেছেন বলে শোনা যায় না। যেসব সত্য নিয়ে সাহিত্যের কারবার সেসব কোন মান্ধাতার আমলের। কবিরা চির-পুরাতনকে নিত্য নূতন অনুভব করেন, আর অপরের অনুভূতি উদ্রেক করেন। যাঁরা পড়েন তাঁদেরও সেটা একটা পুরাতন অথচ নূতন অনুভূতি।

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সত্যের তুলনা হয় না প্রধানত এই কারণে। সাহিত্য মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দেয় না, সে কাজ দর্শন-বিজ্ঞানের। 'ছন্দ-জিজ্ঞাসা'-নামক অংশটি থেকে বোঝা যায় যে দর্শনবিজ্ঞান বিনুর কাছে ইন্‌টেলেক্‌ট্‌-মার্গী আর আর্ট তথা ধর্ম ইন্‌টুইশন-মার্গী।

বিনুর প্রতি আমার বিনীত নিবেদন: এই দ্বান্দ্বিকতাগুলিকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে এবং বেশি মাত্রায় প্রশ্রয় দিলে সে-ক্রিয়া আমাদের চিন্তাকে, জীবনদর্শনকে কর্মপদ্ধতিকে অনাবশ্যকভাবে খর্ব করে। একদিকে শিল্পীরা, অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা, এই দুই দলই যেমন তাঁদের নিজেদের মতন ক'রে সত্যকে অন্বেষণ করেন, তেমন দুই দলই কিন্তু ব্যবহার করেন কল্পনাকে, বুদ্ধিকে, স্বজ্ঞাকে। কবিদের পক্ষে যেমন ইন্‌টেলেক্‌টের সংক্রামণ বাঁচিয়ে চলা অসম্ভব, কেননা ভাষাব্যবহার একটা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল প্রক্রিয়া, তেমনি দর্শনবিজ্ঞানে কল্পনা বা ইন্‌টুইশন লাগে না এটা

একটা ভ্রান্ত ধারণা, দর্শনবিজ্ঞানের সঙ্গে অস্পষ্ট পরিচয়ের ফল। ইন্‌টুইশন আর ইনটেলেক্‌ট্, কল্পনা আর বিশ্লেষণ,—এ সবই আমাদের মস্তিষ্কেরই প্রক্রিয়া। মানুষ হওয়া মানেই এ সমস্তরই ব্যবহার করা। আমরা সর্বদাই আমাদের ইন্‌টুইটিভ বুদ্ধির মাধ্যমে এটা বা সেটা আঁচ করছি, এবং আমাদের বিশ্লেষক বুদ্ধিও সমানে আমাদের ইন্‌টুইশনগুলিকে যাচাই করছে, খতিয়ে দেখছে।

তা ছাড়া, সাহিত্যের সব সত্যই মান্ধাতার আমলের, চিরপুরাতন, কিছুই নতুন নয় বা আবিষ্কার নয়, সাহিত্য কখনোই মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দেয় না : এই ধারণাগুলিও আমাদের অকারণে একটা সংকীর্ণ খাঁচার মধ্যে বন্দী ক'রে রাখে। বিন্নু, কে বলেছে আজকের সব সত্য মান্ধাতার আমলেও সত্য ছিলো! দেশে-দেশে কালে-কালে মানবসমাজ কতভাবে বদলাচ্ছে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ভূমিকা এবং বিশ্ব-সম্বন্ধে মানুষের ধারণা উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে, কত ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে মানুষের জ্ঞানের তথা অনুভবের পৃথিবীতে : সেসব কি সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নব নব দিগন্তকে উন্মোচিত করছে না, নতুন বাণী আর নতুন সুর শোনাচ্ছে না, আমাদের জ্ঞানের সীমাকেও (আমরা চাই বা না চাই) বাড়িয়ে দিচ্ছে না? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আজকের মেয়েরা তাঁদের স্বকীয় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার যে-সম্ভার বিশ্বসাহিত্যে ব'য়ে আনছেন তা কি অনেকাংশেই নতুন নয়? যেসব কথা তাঁরা আমাদের শোনাচ্ছেন তার সবই কি আমরা আগে পেয়েছিলাম, পুরুষ লেখকদের লেখায়, ব্যাসে বাল্মীকিতে হোমারে? এবং তাঁদের সেইসব প্রতিবেদন কি এক ধরনের নতুন-ক'রে-মানচিত্র-আঁকা নয়? নতুন ক'রে মানচিত্র আঁকা কি জ্ঞানের সীমাও নতুন ক'রে আঁকা নয়?

সমাজকে বদলে দেওয়া যেমন সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তেমনি আমাদের জ্ঞানের সীমাকে বাড়িয়ে দেওয়াও নিশ্চয়ই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় : সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য সৃষ্টিই। কিন্তু সেই মুখ্য উদ্দেশ্যকে সফল ক'রেও সাহিত্যিক বিচারে সার্থক সাহিত্য হয়েও মহৎ সাহিত্য যেমন সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে (যা বিন্নুও জানে), তেমনি পাঠকদের জ্ঞানের সীমাকেও নানাদিকে প্রসারিত, দূর-বিস্তৃত ক'রে দিতে পারে। এগুলো আমাদের বাড়তি লাভ, এবং বিন্নু তো নিজেই স্বীকার করেছে যে অধিকন্তু ন দোষায়! আমি অকপটে স্বীকার করি যে বিশ্বসাহিত্যের নানা নমুনা প'ড়ে বিশ্ব-সম্পর্কে আমার নিজের সীমিত জ্ঞান নানাভাবেই বর্ধিত হয়েছে, এবং জ্ঞানের এই বর্ধনকে আমি বিশ্বসাহিত্যপাঠের

একটা মূল্যবান বোনাস ব'লেই মনে করি। ইয়োরোপের মাটিতে যখন পা-ও দিইনি তখনও তার সম্পর্কে অনেক কথা জেনেছিলাম তার সাহিত্যের নানা নিদর্শন প'ড়ে। দক্ষিণ আমেরিকাকে এখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু সে-মহাদেশ-সম্পর্কে মনের দৃষ্টির জানলা নানাদিকে খুলে গেছে ভিকৃতোরিয়া ওকাম্পো, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস্ এবং মারিও ভার্গাস্ য়সা-র লেখা প'ড়ে। কোনো লেখক যখন এমন কোনো বিষয়কে তাঁর লেখার অঙ্গীভূত করেন যা আগে সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়নি বা যার সম্বন্ধে আমি ততটা খবর রাখি না, যখন তিনি এমন কোনো পরিপার্শ্বকে চিত্রিত করেন যাকে আমি চিনি না বা কম চিনি, সমাজের সেইসব স্তরের লোকেদের নিয়ে লেখেন যাদের বিষয়ে বেশি লেখা হয়নি, এমন সব মানবিক সম্পর্ককে রূপ দেন যেগুলিকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আমি প্রত্যক্ষভাবে জানিনি, তখন তিনি অনিবার্যভাবেই আমার জ্ঞানের সীমাকে বাড়িয়ে দেন। সাহিত্যে যেমন চিরপুরাতনকে নতুন ক'রে চিনিয়ে দেবার একটা দিক তর্কাতীতভাবে আছে, তেমনি যে-রাজ্যের মানচিত্র আঁকা হয়নি তার মানচিত্র আঁকা, যে-সমুদ্রে জাহাজ চালানো হয়নি সে-সমুদ্রে জাহাজ চালিয়ে নতুন দ্বীপ আবিষ্কার ক'রে তার খবর দেবার একটা দিকও আছে বৈকি। তা নইলে অমুক লেখক তাঁর অমুক বইয়ে একটি নতুন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বা একটি নতুন ধরনের সিচুয়েশন দেখিয়েছেন এমন ধরনের কথা আমরা সাহিত্য-সমালোচনায় কখনোই বলতাম না।

বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে বিনুর সঙ্গে তার স্রষ্টাকে অভেদ ক'রে দেখা মোটেও ঠিক হবে না। আগেই বলেছি, বিনু যে সব সময় তিনি নন, সে-বিষয়ে আমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। আধুনিক মানুষ যে ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে এ বিষয়ে অন্নদাশঙ্কর যৌবনেও খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর 'প্রচ্ছন্ন জড়বাদ'-নামক প্রবন্ধটিতে (১৯২৮) তিনি লিখেছেন :

> সবাই আপন আপন সীমা জানবার জন্যে সীমা ছাড়াতে চায়, অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী, জটিলতা অনিবার্য। সামনে আরো লক্ষ লক্ষ বৎসর, দিন দিন দুঃখ আরো দুঃসহ হতে থাকবে, জটিলতার অঙ্ক চক্রবৃদ্ধি হারে এমন দুর্বোধ্য হতে থাকবে যে কোনো-একজন মানুষকে বোঝবার ক্ষমতা বা অবসর কোনো-একজন মানুষের থাকবে না। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ভবিষ্যৎ ভাবতে বসলে কূলকিনারা মেলে না। প্রতি মানুষের গণপ্রকৃতিকে খর্ব করতে করতে প্রতি মানুষের ব্যক্তিপ্রকৃতি যতই বৃহৎ হতে থাকবে মানুষ মাত্রেরই

> দুঃখ ততই সূক্ষ্ম হতে থাকবে এবং একের সূক্ষ্ম দুঃখের সঙ্গে অপরের সূক্ষ্ম দুঃখের সহানুভূতি ততই দুঃসাধ্য হতে থাকবে। যেসব যুগকে আমরা পিছনে ফেলে এলুম সেসব যুগের দুঃখগুলো এর তুলনায় শিশুসুলভ।

প্রশংসনীয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি! তবে কি তিনি এ কথাও মানবেন না যে ঐ সীমা খোঁজা, সীমা ছাড়ানো, ব্যক্তিপ্রকৃতির জটিলতার উত্তরোত্তর বিবর্ধন, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দুঃখের সমুদ্রে ভ্রমণ : ঐসব সাহিত্যেও প্রতিফলিত হবে, এখনই হচ্ছে, অনবরতই আমাদের মান্ধাতার আমল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরে বহুদূরে? 'বিনুর বই'-এর বিনু কি সাহিত্যের চিরপুরাতনের মধ্যে সেরকম একটা আশ্রয়, সেরকম একটা নিত্য মূল্য খুঁজছে না, যেরকমটা ভক্ত খোঁজে ভগবানের মধ্যে, এবং পেয়েও যায়? সেই অনুসন্ধান কি নয় তার দ্বন্দ্ব-উত্তরণের, ছন্দ-সাধনার একটা আঙ্গিক, বিদ্রোহিতার বিপরীত মেরুতে?

> সাহিত্যের সত্য হাজার হাজার বছর আগে যা ছিল আজও তাই। জীবন-মরণ সুখ-দুঃখ নিয়তি-প্রকৃতি বিরহ-মিলন প্রেম-অপ্রেম—এদের নিয়ে অন্তহীন আদিহীন বিশ্বপ্রবাহ। সতত সে পূর্ণ, সার্থক, শিব, সুন্দর, সত্য।

এই যে প্রতিন্যাস, যাকে বলা চলে সাহিত্যের অ্যাপোথিওসিস, সাহিত্যের মধ্যে দেবত্বারোপণ, এটা কি নয় একটা যুগধর্ম, একটা বিশেষ প্রজন্মের চিহ্ন, ঐতিহ্যক ঈশ্বরে বিশ্বাস শিথিল হয়ে যাবার পর আর্টকে দিয়ে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করার যে-ভিক্টোরীয় প্রচেষ্টা চলেছিলো তারই উত্তরাধিকার?

অন্নদাশঙ্করের আশি বছর পূর্ণ হতে চলেছে, এটা যেমন আমাদের পক্ষে গভীর আনন্দের বিষয়, তেমনি এর একটা মজার দিকও আছে! তাঁর যুবক-বয়সের প্রবন্ধগুলি নানাভাবেই মূর্তিমান বিদ্রোহ। 'তারুণ্য ধর্ম' প্রবন্ধটিতে তিনি বেশ গরমভাবেই লিখেছিলেন :

> বৃদ্ধ হচ্ছে ভূতের চেয়ে ভয়াবহ। ভূত তবু আপন জীবনটুকুর ভূত, পরের জীবনটুকুর উপরে তার লোভ। বৃদ্ধ কিন্তু আপন যৌবনটার ভূত, পরের যৌবনটার সঙ্গে তার বাদ। জীবনের চেয়ে যৌবনের মূল্য বেশী। জীবনকে যে হরণ করে, সে সামান্যই হরণ করে, যৌবনকে যে হরণ করে সে সর্বস্ব হরণ করে। কাঁচা চুলকে উপ্‌ড়ে দিলে বাজে কিন্তু বাধে না, কাঁচা চুলকে পাকিয়ে দিলে সর্বনাশ। মরার বাড়া গাল নেই, কিন্তু মরার বাড়া দুর্গতি আছে, সে দুর্গতি জরা। এ দুর্গতির অনেক ছদ্মবেশ, অনেক ছদ্মনাম, অনেক ছদ্ম-লক্ষণ।

'প্রচ্ছন্ন জড়বাদ'-এর মতো এই প্রবন্ধটিও ১৯২৮ সালে লেখা। তখন তাঁর শিরায় চব্বিশ বছরের রক্ত টগবগ ক'রে ফুটছে! তখন কি তিনি মনে রেখেছিলেন যে তাঁরও একদিন আশি বছর পূর্ণ হবে? কিন্তু যুবকের এই বুড়ো-পিটুনির মধ্যে যে-প্রতিশ্রুতিটুকু উক্ত না হলেও প্রচ্ছন্ন ছিলো সেটা তিনি রক্ষা করেছেন। বৃদ্ধ হলেও 'ভূতের চেয়ে ভয়াবহ' হয়ে ওঠেননি! কেশে তাঁর পাক ধরেছে বটে, কিন্তু এখনও সজীব তাঁর মন, এখনও সচল তাঁর টাইপরাইটার!

এই লেখাটি শুরু করেছিলাম একটি ব্যক্তিগত ঘটনার কথা দিয়ে,—অনেক বছর আগে অন্নদাশঙ্কর কীভাবে তাঁর অজান্তে ছাত্রজীবনে একটি 'পয়েণ্ট অফ্ রেফারেন্স' হয়েছিলেন তার উল্লেখে। শেষ করছি ১৯৮১ সালের একটি বিশেষ-ভাবে আদরণীয় স্মৃতি দিয়ে। কলকাতার এক উজ্জ্বল সকালে অন্নদাশঙ্কর আর তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, লেকটাউনে আমার পিত্রালয় থেকে বালিগঞ্জে তাঁদের বাড়িতে। দীর্ঘ এক যাত্রা। মনে মনে ঠিক ক'রে রেখে-ছিলাম তাঁদের ওখান থেকে কর্নফীল্ড রোডে এক বান্ধবীর বাড়িতে ঢুঁ মারবো। তার বাড়িটা অবশ্য চিনতাম না, কিন্তু ঠিকানাটা সঙ্গে ছিলো,—জানতাম খুঁজে বার করা যাবে। আমার মতলব ছিলো, বান্ধবীটিকে যদি বাড়িতে পাই, তা হলে তার ওখানেই যা হয় কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে। আর যদি তাকে না পাই তা হলে একটা দিন মধ্যাহ্নভোজন বাদ গেলেও কিছু আসবে যাবে না। এদিকে প্রথম বাড়িতেই আড্ডা গড়ালো সকাল থেকে দুপুরে, এবং লাঞ্চ সম্পর্কে আমার বিচিত্র পরিকল্পনাটা লীলা দেবীর কাছ থেকে কিছুতেই গোপন রাখা গেলো না। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ তাঁদের সঙ্গে খেতে বসালেন তো বটেই, বিকেলে আমাকে আমার বান্ধবীর বাড়িতে স্বয়ং পৌঁছে দিলেন, রিকশায় চেপে,—কেননা যারা অনেক দিন কলকাতার বাইরে আছে তাদের পক্ষে কর্নফীল্ড রোডের বাড়ির নম্বর খুঁজে বার করা নাকি অত সহজ নয়। যাই হোক, সেই সুন্দর সকালটিতে অন্নদাশঙ্কর আমাকে একটি বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন: বাংলায় লেখা আমি যেন কখনো ছেড়ে না দিই, যেন কখনো ছেড়ে না দিই। কথাগুলি বলতে গিয়ে তাঁর চোখে এসে গিয়েছিলো অশ্রুর আভাস। তাঁকে জানাই: হ্যাঁ, আমার মনে আছে, আমি ভুলিনি, তাঁর ঐ অনুরোধ রক্ষা করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। সে-অনুরোধের মাধ্যমে তিনি আমার উপরে যে-আস্থা স্থাপন করেছেন, যে-আশীর্বাদ ন্যস্ত করেছেন, তার মর্যাদা যেন রক্ষা করতে পারি।

মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা, এডিট্‌ স্যোডারগ্রান : দুই অদম্য শিল্পী-সত্তা

> কোনো কোনো বই এমনই জীবন্ত হয় যে সর্বদাই ভয় হয় যে-সময়ে বইটাকে পড়া হচ্ছে না সেই ফাঁকে সেটা বদলে গেছে, স'রে গেছে নদীর মতন ; যখন পাঠক তার জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলো তখন বইটাও তার নিজের জীবন চালিয়ে যাচ্ছিলো, নদীর মতন এগিয়ে যাচ্ছিলো, চ'লে যাচ্ছিলো দূরে। একই নদীতে কেউ দুবার পা ফ্যালে নি বটে। কিন্তু একই বইয়ের মধ্যেই কি দুবার পা ফেলেছে কেউ ?

এই কথাগুলি যে-বইটিতে পেলাম সেটি হচ্ছে ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে রুশ কবি মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভার কতগুলি গদ্যরচনার একটি সংকলনগ্রন্থ[১], এবং যে-বইটিতে পেলাম সেই বইটি সম্বন্ধেই চমৎকারভাবে প্রযোজ্য।

মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভার নাম প্রথমে শুনি অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায়, অধুনা মৃত শ্রদ্ধেয় ডঃ নিকোলাস জার্নভের মুখে। 'আনা আখ্‌মাতোভা, মারিনা ৎস্‌ভে-তায়েভা : আমাদের ভাষার দু'জন বড় কবি যাঁদের নিয়ে অনেক গর্ব আমাদের', —বলতেন তিনি। রুশভাষা জানি না ; এককালে শেখার সংকল্প ছিলো, কিন্তু সুযোগ ঘটেনি, অবকাশ আসেনি ; ৎস্‌ভেতায়েভাকে বহুকাল চিনতাম কেবলই 'পেংগুইন বুক অফ্‌ রাশ্যান ভার্স'-এর অন্তর্গত তাঁর কয়েকটি কবিতার গদ্যানুবাদের মাধ্যমে। একদা দৈবাৎ শুনতে পাই একজন কবি একটি স্বরচিত ইংরেজী কবিতা রেডিওতে আবৃত্তি করছেন :

> Where shall we meet, Marina
> Tsvetayeva ? Have you any
> suggestions for our rendezvous ?......

কবির নাম ভুলে যাই, কবিতাটি মনে লেগে থাকে। তারও পরে অক্সফোর্ডে

১. Marina Tsvetaeva, *A Captive Spirit : Selected Prose*, Edited and translated by J. Marin King, with a New Introduction by Susan Sontag, Virago Press, London 1983, £5.95.

একটি কবিতার আসরে যাই ডি. এম. টমাস নামে একজন কবির স্বরচিত কবিতার পাঠ শুনতে। ইনি তখনও 'দ্য হোয়াইট হোটেল' উপন্যাসটি লিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেননি। হঠাৎ চমকে উঠি, শুনতে পাই তিনি পড়ছেন :

Where shall we meet, Marina
Tsvetayeva ? Have you any
suggestions for our rendezvous ?......

সেই দিনই তাঁর কাছ থেকে কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করার অনুমতি আদায় করি। পরে এঁরই কাছ থেকে ধার নিয়ে পড়ি ৎস্‌ভেতায়েভার কবিতার একটি সংকলন, কবি ইলেইন ফাইনস্টাইনের ইংরেজী অনুবাদে ; বইটি তখন নিঃশেষিতমুদ্রণ, বাজারে পাওয়া যেতো না। এরও পরে মারিয়া ৎস্‌ভেতায়েভার বিষয়ে লেখা আমার নিজের একটি ইংরেজী কবিতা উৎসর্গ করেছি পরিচয়ঘটক ডি. এম. টমাসকে।[১]

'আমরা চারজন আছি' : আনা আখ্‌মাতোভার একটি কবিতার নাম। রুশ দুনিয়ার আমূল উলট-পালটের কঠিনতম বছরগুলিতে রুশ জীবন ও চেতনার গভীরতম মূল্যবোধগুলিকে যাঁরা কবিতায় ধ'রে রেখেছিলেন মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা ছিলেন তাঁদের একজন। অন্য তিনজন হলেন আনা আখ্‌মাতোভা, অসিপ মাণ্ডেলস্টাম, বরিস পাস্তেরনাক।

মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯২ সালে, মস্কোর একটি উচ্চশিক্ষিত, বিদগ্ধ পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার ইতিহাসের অধ্যাপক এবং পরবর্তীকালে যার নাম হয় পুশকিন মিউজিয়ম সেই সংগ্রহশালাটির প্রতিষ্ঠাতা। মারিনার মা ছিলেন তাঁর স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী,

১. ডি. এম. টমাসের কবিতাটি তাঁর *Love and Other Deaths* (Paul Elek, London, 1975)-এর অন্তর্গত, কিন্তু এই বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য ; অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁর *Selected Poems* (Penguin Paperback, 1983, £4.95)-এও কবিতাটি পাবেন। কবিতাটির নাম "Poem of the Midway" ; আমার অনুবাদ "মাঝ পথের কবিতা" প্রকাশিত হয় 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় (বর্ষ ২, সংখ্যা ১)। আমার ইংরেজী কবিতাটির নাম "Suggestions for a Difficult Assignation", আমার নতুন কবিতাসংকলন *Spaces I Inhabit* (নাভানা, কলকাতা, ১৯৮৩)-এর অন্তর্গত হয়েছে।

স্বামীর থেকে বয়সে একুশ-বাইশ বছরের ছোট, বহুভাষাবিদ্, গুণী পিয়ানোশিল্পী। তিনি তাঁর স্বামীকে সংগ্রহশালার কাজে অক্লান্তভাবে সাহায্য করতেন। অধ্যাপক ৎস্ভেতায়েভের প্রথম বিবাহ থেকে দু'টি সন্তান ছিলো। দ্বিতীয় বিবাহের প্রথম সন্তান মারিনা, দ্বিতীয় সন্তান আরেকটি কন্যা : আনাস্তাসিয়া।

মারিনা লেখাপড়া শেখেন বাড়িতে গভর্নেসদের কাছে এবং মস্কো শহরের একাধিক বিদ্যালয়ে। তা ছাড়া তাঁর মা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে নানান জায়গায় হাওয়াবদলের জন্য গেলে মারিনাকে এবং তাঁর বোনকে কিছু সময় রাখা হয় সুইটজারল্যাণ্ডে এবং জার্মানিতে বোর্ডিং-স্কুলে। মারিনা ছেলেবেলায় জার্মানে কবিতাও লিখেছেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মাকে হারান তিনি। প্যারিসে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু লেক্চার শুনলেও মারিনা আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেননি। ফরাসী-জার্মান তিনি ভালোভাবেই জানতেন এবং জার্মান সাহিত্যের রীতিমত বোদ্ধা ছিলেন।

অল্প বয়সেই কবিতা লিখতে শুরু করেন মারিনা। তাঁর মা অবশ্য চেয়েছিলেন যে মারিনা হন পিয়ানোশিল্পী। মা বেঁচে থাকলে হয়তো সেদিকে যেতেই বাধ্য হতেন মারিনা। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তিনি নিজেকে চালিত করেন তাঁর বিশেষ ভালোবাসা কবিতা লেখার দিকে। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম কবিতাসংকলন। বন্ধুমহলে বিতরণের জন্য ছাপা হলেও সে-বই তখনকার খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রশংসা পায়। এ ঘটনা তৎকালীন রুশ শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-সমাজের বিশেষ প্রাণচাঞ্চল্যের, উন্মুক্ত মানসতার, ঔদার্যেরই পরিচায়ক। বর্তমান পৃথিবীর দীর্ণ জীর্ণ সংকুচিতচিত্ত ঈর্ষাক্লিষ্ট স্বার্থপরতাশাসিত সমাজগুলিতে প্রায় ভাবাই যায় না যে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরা কোনো আঠারো বছরের মেয়ের প্রাইভেটভাবে ছাপা প্রথম কবিতার বইকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসবেন। এই না-ধর্মী মনোভাব অনেক প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণবয়স্ক শিল্পী-প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে।

অষ্টাদশী কবিকে রুশ সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত করান কবি-চিত্রকর মাক্স্ ভোলোশিন। সে-সময়ে রুশভাষার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত তথা যশঃপ্রার্থী লেখক ভোলোশিনের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এঁরই সূত্রে মারিনার আলাপ হয় তাঁর চাইতে এক বছরের ছোট ক্যাডেট সার্জেই য়েফ্রনের সঙ্গে। এই পরিচয় মারিনার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এঁকেই তিনি বিয়ে করেন, এবং এঁরই ভাগ্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁর জীবনে আসে নানা ট্র্যাজেডি। মারিনা তাঁর

স্বামীকে আজীবনই ভালোবেসেছেন, কিন্তু তা ছাড়া আরও কয়েকটি দুর্দান্ত এবং ট্র্যাজিক প্রেমও তাঁর জীবনে এসেছে।

অসিপ মাণ্ডেলস্টামের পত্নী নাদেঝ্‌দা লিখেছেন যে মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা ছিলেন একেবারে অকৃত্রিম এবং অসাধারণভাবে স্বাধীনচেতা। তাঁর চুল ছিলো ছোট ক'রে ছাঁটা, গতি ছিলো বালকের মতো স্বচ্ছন্দ, কথাবার্তা ছিলো তাঁর কবিতারই প্রতিবিম্ব। তাঁর স্বচ্ছন্দতা কেবল তাঁর মর্জির ব্যাপার ছিলো না, ছিলো জীবনযাত্রারই পথ। আনা আখ্‌মাতোভার মতো তিনি নিজেকে বল্‌গায়িত, সংযত ক'রে নিতে পারতেন না। ৎস্‌ভেতায়েভা জীবনের সব আবেগকে চূড়ান্তভাবে অনুভব করতেন। শুধু প্রেমেই তীব্র আনন্দ খুঁজতেন না, অমৃত নিংড়ে নিতেন ত্যক্ত হবার বেদনা, একাকিত্ব, সর্বনাশ থেকেও।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে তছনছ করে রুশ বিপ্লবের ডামাডোল। গৃহযুদ্ধে তাঁর স্বামী বিভিন্ন ব্যক্তিগত আনুগত্যের তাগিদে যোগ দেন 'শাদা' দলে। ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২২ সাল : এই পাঁচটি বছর মারিনাকে কাটাতে হয় স্বামীর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, তাঁদের মধ্যে কোনো দেখাসাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। বিচ্ছেদের প্রারম্ভে তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখেন : 'যদি ভগবান তোমাকে জীবিতদের মধ্যে রাখেন, তা হলে তোমার সেবা করবো কুকুরের মতন'।

মস্কো শহরে যখন প্রায়-দুর্ভিক্ষ চলছে, তখন দু'টি শিশুকন্যাকে নিয়ে ৎস্‌ভেতায়েভা সেখানে একা। ১৯১৯-২০-র শীতকালে নিরুপায় হয়ে ছোট মেয়েটিকে সমর্পণ করেন অনাথ-আশ্রমে। সেখানে অপুষ্টিতে মেয়েটি মারা যায়।

অবশেষে ১৯২২ সালে দেশান্তরিত স্বামীর সঙ্গে ৎস্‌ভেতায়েভার আবার সংযোগ স্থাপিত হয়। মারিনা দেশ ছাড়েন, বার্লিন হয়ে প্রাগে পৌঁছন। প্রাগ শহরে ১৯২৫ সালে তাঁর ছেলের জন্ম। এর পর দীর্ঘকাল কাটান প্যারিসে। প্রবাসী জীবনের প্রথমদিকে মারিনা এমিগ্রে রুশ সমাজের সাহিত্যিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং স্বাগত হন। তাঁর প্যারিসের জীবন সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শিনী লিখেছেন :

> ও কাজ করতো, লিখতো, জ্বালানী কাঠ কুড়োতো, এবং পরিবারকে দু' মুঠো খেতে দিতো। ধোয়াধুয়ি করতো, জামাকাপড় কাচতো, সেলাই করতো তার সেই আঙুলগুলো দিয়ে, যেগুলো এককালে পেলব ছিলো, কিন্তু তখন ঘরের কাজ ক'রে ক'রে রুক্ষ হয়ে গেছে। ধূমপান থেকে হলদে-হয়ে-যাওয়া ওর সেই আঙুলগুলোকে বেশ মনে আছে আমার,—যাদের দিয়ে ও ধরতো

চায়ের পটকে, ডেকচিকে, ফ্রাইংপ্যানকে, কেটলিকে, ইস্ত্রিকে, স্থতো ভরতো ছুঁচে আর চুল্লীতে দিতো আঁচ। আবার সেই আঙুলগুলোই রান্নাঘরের টেবিল থেকে তাড়াতাড়ি সব কিছু সরিয়ে ফেলে কাগজের ওপরে চালাতো কলম বা পেন্‌সিল।

দূরস্থিত বন্ধুদের সঙ্গে পত্রবিনিময় প্রবাসজীবনে মারিনাকে আত্মিক নির্ভর সরবরাহ করতো। ক্রমশ, অনিবার্যভাবে এমিগ্রে রুশ সমাজে তিনি একঘরে হয়ে পড়েন। তাঁর কবিতার স্বকীয় শৈলীর বিশিষ্ট বিবর্তন সকলের রুচিসম্মত হয়নি, অনেকেই তাঁকে বোঝেননি। প্রকাশের স্থযোগস্থবিধা ক্রমাগত ক'মে যায়। দেশান্তরিত রুশদের সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দলাদলি বাড়ে। মারিনা সে-সবের বাইরে থাকতেন। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সব কিছুর নিন্দা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। উদাহরণস্বরূপ, মায়াকভ্‌স্কির নিন্দা করতে রাজী হননি। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা, তাঁর স্বামী রাজনৈতিক আনুগত্য পরিবর্তন করেন।

বস্তুত সার্জেই য়েফ্রন সোভিয়েত গুপ্ত পুলিশের সঙ্গে কাজ করা আরম্ভ করেন। সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তিনি ট্রট্স্কির পুত্রের হত্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। মারিনা এসব কথা পরিষ্কার ক'রে জানতেন না, বা জানলেও বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না। য়েফ্রন স্পেনে গা ঢাকা দিয়ে সেখান থেকে রাশিয়াতে ফেরত চ'লে যান ১৯৩৭ সালে। তাঁদের কন্যাটিও সেখানে চ'লে যান। ছেলেকে নিয়ে একলা প'ড়ে থাকেন মারিনা, অবশেষে রাশিয়াতে ফিরে যান ১৯৩৯ সালে।

তখন সেখানকার অবস্থা যে কিরকম তা তিনি সঠিক জানতেন না। জানায়নি কেউ। পাস্তেরনাকের মতন বন্ধুও জানাতে সাহস পাননি। ফিরেই মারিনা আবিষ্কার করলেন যে স্বদেশে তাঁর কোনো জায়গা নেই। আবারও একলা হয়ে যান তিনি। তাঁর মেয়ে শ্রমশিবিরে আটক হন, তাঁর বোনকে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়। য়েফ্রন গ্রেপ্তার হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁকে গুলি ক'রে মারা হয়। মারিনা চালান হন য়েলাবুগা শহরে। সেখানে নিঃসহায়, নিঃসম্বল, সর্বতোভাবে আশারিক্ত অবস্থায়,—যখন তাঁর হাতে আর মাত্র দু'খানি পাঁউরুটি কেনার মতো পয়সা বাকি,—কড়িকাঠ থেকে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দেন। আত্মহত্যার তারিখ ৩১ শে অগাস্ট, ১৯৪১, অর্থাৎ সময়ের বঙ্গীয় পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই এই মৃত্যু।

'বন্দী সত্তা' নামক আলোচ্য সংকলনটিতে—কবির জীবনের প্রধান তথ্যগুলিও এই বইটি থেকেই পরিবেশন করলাম—স্থান পেয়েছে ৎসৃভেতায়েভার গদ্যরচনার এক-তৃতীয়াংশ-মতো। অনুবাদ নিছক অনুবাদ হিসেবে কতখানি মূলানুগ তা যাচাই করার সামর্থ্য আমার নেই। অনুবাদের মাধ্যমে কী পেয়েছি শুধু সেই কথাই বলতে পারি।

বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, এই বই পাতায় পাতায় চিনিয়ে দেয় দ্রষ্টা, স্মরণ-পটু, বাণীবিহ্বল একটি কবিমনকে, যে-মন কখনও একটি বেলাভূমি, ঢেউয়ের পর ঢেউ প্রাজ্ঞ স্মৃতির ফেনিল জল দ্বারা ধৌত, স্নাত, আবার কখনও স্বয়ং সমুদ্র,—উদ্‌বেল, মন্দ্রিত। মারিনা : তাঁর নামের মধ্যেই ধৃত সমুদ্র, তাঁর লেখাতেও সমুদ্রের স্বাদ। অনুবাদক চেষ্টা করেছেন যাতে লেখিকার মূল গদ্যের ছন্দঃস্পন্দন, ঝোঁক-প্রদান, ইমেজ থেকে ইমেজে নৃত্যগতি, একান্তভাবে নিজস্ব যতিব্যবহার, বিশেষত তাঁর পূর্ণচ্ছেদ ও ড্যাশের ব্যবহার ইংরেজীতে যথাসম্ভব রক্ষিত হয়। ইংরেজী রূপগুলি সুপাঠ্য হয়েছে এ কথা স্বীকার করতে হবে। মূল রচনাগুলির স্রষ্টা যে একজন উল্লেখযোগ্য স্টাইলিস্ট তা বোঝা যায়। এবং তর্জমার মাধ্যমে পাঠকের এই উপলব্ধি হওয়াটা নিশ্চয়ই অন্তত কিয়দংশে অনুবাদকের কুশলতার ফলশ্রুতি।

এখানে শুনতে পাই একটি কণ্ঠস্বরকে, যে-স্বর বিচিত্র, জটিল, অভিজ্ঞ, আনন্দ-দায়ক। বক্তার অবেগগুলি ওঠে-নামে, আকাশ ছোঁয়, সমুদ্রতলে অবগাহন করে। তিনি প্রশ্ন দিয়ে আচমকা আমাদের ভাবনাদের গতিরোধ করেন, ভাবলোকে আমাদের ডিগবাজি খাওয়ান, আবার ছুটিয়ে নিয়ে চলেন তেজী ঘোড়ার মতন। তাঁর স্মৃতিরোমন্থনকারী রচনাগুলি সংলাপপ্রধান, নাট্যধর্মী। তাঁর শ্রোতৃবর্গকে অবলীলাক্রমে ঘটনার একেবারে মধ্যস্থলে নিক্ষেপ ক'রে তিনি অতীতকে মূর্তি দেন নাটকীয় দৃশ্যাবলীতে, জীবন্ত বাক্যালাপে। তাঁর নিজস্ব ভাষ্যটি অগ্রসর হয় ইমেজের উর্মিমালার অপ্রতিরোধ্য লজিকে। যেমন তাঁর কবিতায়, তেমনি তাঁর গদ্যেও, তাঁর বাল্যকালের প্রবলভাবে সাংগীতিক আবহ সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে। কবিতায় তথা গদ্যে মারিনার লিরিক প্রতিভা যেন রুশ শিল্পের গীতিধর্মিতার বিশেষ ঐতিহ্যটিরই সন্তান,—সংগীত ও নৃত্যের সার্থক সমন্বয়ে ব্যালে-শিল্প যার সাধারণপরিচিত প্রতিভূ।

রচনাগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে সাহিত্যিক বন্ধুদের প্রতিকৃতি। দ্বিতীয়ভাগে আত্মজীবনীমূলক রচনাবলী। তৃতীয়ভাগে কিছু সাহিত্যসমালোচনা। প্রথমভাগে পাই মাক্‌স্ ভোলোশিন, আন্দ্রেই বেলি, মিখাইল কুজমিন প্রভৃতি

সাহিত্যরথীদের এবং আরও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্রের ছবি, অথবা বলা উচিত, ছায়াছবি। পাতাগুলি যেন চলমান সিনেমা, শব্দের মাধ্যমে ডকুমেণ্টারি ছবি। চলচ্চিত্র-সমালোচনার ভাষা ধার ক'রে বলতে হয়: প্রশংসনীয় ক্যামেরার কাজ, নিপুণ মন্তাজ, নিখুঁত সাউণ্ড-ট্র্যাক। একটা গোটা দুনিয়া জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আবহসংগীতের সুরের মতো এখানে ওখানে উপচে পড়েছে তাঁর কবি-সত্তার নিজস্ব মর্মবাণী :

> যদি ঈর্ষা, ক্ষয়ক্ষতি, তুলনা এসব না চাও, তা হলে ধস্তাধস্তি কোরো না, নিজেকে সঁপে দাও, তোমার মধ্যে যা-কিছু দ্রবণীয় তাকে গ'লে যেতে দাও, আর যা বাকি থাকে তা থেকে সৃষ্টি করো একটি স্বপ্নোপম প্রত্যক্ষ, একটি অমর স্বপ্নোপম প্রত্যক্ষ। এই হলো আমার ইচ্ছাপত্র, আমার কোনো বহুদূরবর্তিনী উত্তরাধিকারিণীর জন্যে, সেই কবির উদ্দেশে যে উঠে আসবে 'নারীর' আকারে।

> আমি নোটবই থেকে আমার কবিতা পড়া আরম্ভ করলাম কেবল তখনই যখন সেগুলি আর আমার মুখস্থ রইলো না, এবং তারা আর মুখস্থ রইলো না তখনই যখন তাদের আবৃত্তি করা বন্ধ করতে হলো, এবং তাদের আবৃত্তি করা বন্ধ হলো তখনই যখন লোকে আর আমায় আবৃত্তি করতে অনুরোধ করতো না, এবং তারা অনুরোধ করা বন্ধ করলো ১৯২২-এ, যে-বছর রাশিয়া ছাড়লাম। যে-দুনিয়াতে আমার কবিতারা ছিলো রুটির মতোই প্রয়োজনীয় সেখান থেকে আমি এসে পড়লাম এমন এক দুনিয়ায় যেখানে কারও প্রয়োজন নেই কবিতার, না আমার কবিতার না অন্য কোনো কবিতার, যেখানে কবিতার প্রয়োজন—খাওয়ার শেষে মিষ্টি পদের মতন : যদি কারও—লাগে—মিষ্টি পদ···

এই আলোচনা যে উদ্ধৃতিটি দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটি পাওয়া যাবে তৃতীয়-ভাগে। এই অংশে গ্যয়টের বিখ্যাত কবিতা "এর্ল্‌ক্যোনিগ"-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে যে-প্রবন্ধটি আছে সেটি—জানলে দুঃখ পেতে হয়—মারিনা প্যারিস থেকে প্রকাশিত যে-কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন সেখান থেকে ফেরত এসেছিলো এই কারণে যে সেটি বড়ই বিদগ্ধ, সংবাদপত্রের পাঠকদের উপযুক্ত নয়, অতএব সংবাদপত্রের পক্ষে বিলাসিতা। এই ধরনের বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মারিনা ৎসে্ভেতায়েভা তাঁর লেখা বন্ধ করেননি, অদম্যভাবে লিখে গেছেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই ছিলো তাঁর প্রবাসজীবনের নিত্যসহচর, এবং এ কাগজে ও কাগজে লিখে

যেটুকু পয়সাকড়ি পেতেন সবই খরচ হয়ে যেতো সাংসারিক অভাবের গর্ত ভরাতে।

সংকলনটির সব থেকে চিত্তাকর্ষক, উপভোগ্য এবং মর্মস্পর্শী অংশ হচ্ছে দ্বিতীয়-ভাগের আত্মজৈবনিক লেখাগুলি। পারিবারিক স্মৃতিচারণার মাধ্যমে তিনি একটি লুপ্ত জগৎ ও তার আবহকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে এই লেখাগুলি ইতি-হাসের মূল্যবান দলিল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে বাধ্য। অধিকন্তু তাঁর চরিত্র-চিত্রণ শক্তিশালী, চরিত্রদের মানসজীবনেব বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম, তাঁর আর্ট কথাসাহিত্য-ঘেঁষা। সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছেন কবিপিতা অধ্যাপক ৎস্‌ভেতায়েভ, অধ্যাপকের প্রথমপক্ষের শ্বশুর 'ইলোভাইস্কি দাদু', এবং উক্ত ইলোভাইস্কি মহাশয়ের নিয়তি-আক্রান্ত দুঃখহত পরিবারটির প্রত্যেকটি মানুষ। মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা তাঁর বাবার প্রথমপক্ষের অকালমৃতা স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকেদের যে-স্কেচটি এঁকেছেন ('বুড়ো পিমেনের বাড়ি') সেটি একটি কাব্যগুণান্বিত ট্র্যাজিক বড় গল্পের মতো। জার্মানির ফ্রাইবুর্গ শহরের একটি বোর্ডিং-স্কুলে তার আর তাঁর বোনের কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত 'আইভির বুরুজ' নামক রচনাটিতে লভ্য একটি ক্ষীর-ঘন ছোট গল্পের স্বাদ।

আত্মজৈবনিক রচনাগুলির মধ্যমণিস্বরূপ হচ্ছে তাঁর মায়ের বিষয়ে লেখা 'মা এবং সংগীত'। কবিমাতা মারিয়া আলেক্‌সান্দ্রোভ্‌না মাইন-ৎস্‌ভেতায়েভা অবশ্য যে-সে মা ছিলেন না। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ, পিয়ানো-শিল্পী, এবং অধ্যাপক স্বামীর মিউজিয়ম গঠনের কাজে অক্লান্ত সহকারিণী। ছবিও আঁকতেন তিনি। জার্মান, সার্বিয়ান এবং পোলিশ রক্তের উত্তরাধিকারিণী এই মহিলাটি যে-পুরুষকে প্রথমে ভালোবেসেছিলেন তাঁকে বিয়ে করতে পারেননি। তাঁর চেয়ে বয়সে দ্বিগুণ বড় স্বামীর প্রথমপক্ষের মাতৃহীন সন্তান দু'টিকে নিজের সন্তানদের সঙ্গে সস্নেহে লালনপালন করেছিলেন। অনেক যন্ত্রণা পেয়ে যক্ষ্মারোগ থেকে মারা যান ভরা যৌবনেই।

সংগীত ছিলো এই মহিলাটির প্রাণ, তাঁর নেশা। নেশাটাকে পেশায় পরিণত করতে হয়তো-বা পারতেন যদি পরবর্তী কোনো প্রজন্মের মেয়ে হতেন, কিন্তু সেকালে পারেননি,—তাঁর বাবার মত পাননি। অন্তরের হতাশা ও ক্ষোভকে প্রকাশ করতেন তাঁর বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো যে তাঁর মেয়েরা পিয়ানোশিল্পী হবে। কঠোর ওস্তাদের মতন তালিম দিতেন প্রথমা

কন্যাকে। মারিনার শৈশব কাটে যে-আবহাওয়ার মধ্যে তাকে সংগীতের হট-হাউস বললে বেমানান হবে না। তিনি লিখেছেন :

> মা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন বন্যার মতন। তাঁর সন্তানেরা ছিলো জন্মমুহূর্ত থেকেই প্লাবনের শিকার, যেমন হয় বড় বড় নদীর তীরবর্তী গরীবদের চালাঘর। মা আমাদের প্লাবিত করতেন তাঁর অপূর্ণ জীবনকর্মের সমস্ত তিক্ততা দিয়ে, তাঁর অপূর্ণ জীবনটা দিয়ে; তিনি আমাদের সংগীত দিয়ে প্লাবিত করতেন, যেন রক্ত দিয়ে,—দ্বিতীয় জন্মের রক্ত। এ কথা বলতে পারি যে আমি জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিনি, জন্ম নিয়েছিলাম সংগীতেরই মধ্যে।

মা বেঁচে থাকলে মারিনা ৎস্ভেতায়েভা হয়তো সত্যিই পেশাদার পিয়ানোশিল্পী হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাঁর নিজের প্রবল আকর্ষণ ছিলো কবিতার দিকে। মা মারা গেলে পর পিয়ানোর ব্যাপারে তাঁর উপরে চাপসৃষ্টি করার জন্য আর কেউ রইলো না। চাপমুক্ত কিশোরী নিজের তাগিদে এগিয়ে গেলেন নিজের বিশেষ ভালোবাসারই দিকে, কিন্তু তাঁর মর্মে এবং ভাষায় রয়ে গেলো সংগীতের প্রবল প্রভাব। 'এইভাবে'—লিখেছেন তিনি—'সমুদ্র যখন স'রে যায়, তখন তা রেখে যায় গর্ত, প্রথমে গভীর, তার পর অগভীর থেকে অগভীরতর, অবশেষে শুধুই একটু ভিজে। সেইসব সাংগীতিক গর্ত—মায়ের সমুদ্রের চিহ্নগুলি—আমার মধ্যে চিরস্থায়ী হয়েছে।'

বালিকা মারিনার কাছে বাড়ির গ্র্যাণ্ড পিয়ানোটি ছিলো একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, প্রায়-অলৌকিক, বলা চলে 'মিস্টিকাল' সামগ্রী। পিয়ানোর কী-বোর্ডকে তিনি বর্ণনা করেছেন 'হাতের সিঁড়ি' ব'লে। লক্ষ করেছেন, শাদা চাবিগুলোকে চাপলে বেরোয় আনন্দময় স্বর, কালোগুলোকে চাপলে বেরোয় দুঃখময়, করুণ স্বর,—'নির্ভরযোগ্যভাবে করুণ', যেন তিনি চাপ দিচ্ছেন নিজেরই চোখের উপরে, চাপ দিয়ে বার করছেন নিজেরই চোখের জল। তিনি ভালোবাসতেন পিয়ানোর নিচে ব'সে খেলা করতে বা মায়ের বাজানো শুনতে। যন্ত্রটির পালিশ-করা ঝকঝকে কালো কাঠের গায়ে দেখতেন নিজের প্রতিবিম্বিত শিশুমুখ। বৃহৎ সামগ্রীটিকে দেখতে জানতেন নৈকট্যের তথা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। শৈশবের অব্যক্ত অনুভূতিগুলি পরিণত কবির স্মৃতিধৌত কল্পনা-উদ্ভাসিত ভাষায় নিঃসন্দেহে জন্মান্তর লাভ করেছে। তিনটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, অনুবাদের

অনুবাদেও প্রতীয়মান হবে যে এরকম বর্ণনা কেবল তিনিই লিখতে পারেন যাঁর হৃদয়ে মর্মরিত সংগীতকলা এবং যাঁর মুখের ভাষা আবশ্যিকভাবে কবিতা, অথবা পুরোনো আধ্যাত্মিকতার ভাষা ধার ক'রে বলা যায়, যাঁর আত্মা সংগীত এবং দেহ কবিতা।

পিয়ানোর বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন :

> যেটা তৃতীয় এবং সম্ভবত দীর্ঘতম পিয়ানো—সেটা হচ্ছে যেটার নিচে বসা হয় : পিয়ানো, নিচের থেকে, জলনিম্নবর্তী, পিয়ানো-নিম্নবর্তী সমস্ত জগৎটা। জলনিম্নবর্তী কেবল মাথার ওপরে ঝ'রে পড়া সংগীতের অভিষেকের কারণে নয় : আমাদের পিয়ানোটার পিছনে, সেটার আর জানলাগুলোর অন্তর্বর্তী জায়গায়, যে-জানলাগুলোকে অবরোধ করতো তার কালো মেটে বিপুলত্ব, পিয়ানোটার দ্বারা পৃথকীকৃত এবং প্রতিবিম্বিত হয়ে, যেন একটি কালো হ্রদের দ্বারা, দাঁড়িয়ে থাকতো টবের চারারা, পাম এবং ফিলোডেনড্রনেরা, যারা পিয়ানো-নিম্নবর্তী নকশী কাঠের মেঝেটাকে রূপান্তরিত করতো একটি প্রকৃত জলতলদেশে, যেখানে সবুজ আলো এসে পড়তো মুখে আর আঙুলে, আর যেখানে ছিলো সত্যিকারের শিকড়বাকড়, যাদের হাত দিয়ে ছোঁয়া যেতো, এবং যেখানে, অত্যাশ্চর্যের মতন, মায়ের পা-দু'টি আর পিয়ানোর পেডাল দু'টি নিঃশব্দে নড়াচড়া করতো।

পিয়ানোর গায়ে নিজের মুখের ছায়া দেখার স্মৃতি বিধৃত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে :

> আর ঐখানে, কৃষ্ণতম গভীরত্ব থেকে, একটি গোলগাল, পাঁচ-বছর-বয়স্ক, জিজ্ঞাসু মুখ আমার দিকে এগিয়ে আসে, হাসি নেই, কৃষ্ণত্বের মাধ্যমেও গোলাপী,—যেন উষায় নিমজ্জিত কোনো নিগ্রো, কিংবা কালির পুকুরে একটি গোলাপ। পিয়ানোটা ছিলো আমার প্রথম আয়না, এবং আমার নিজের মুখ সম্পর্কে আমার প্রথম চেতনা হয় কৃষ্ণত্বের মাধ্যমে, কৃষ্ণত্বে তার অনুবাদের মাধ্যমে, যেন কোনো কালো অথচ বোধগম্য ভাষায়। আমার সারা জীবনই ওভাবে কেটেছে : সহজতম জিনিসকে বুঝতে হলেও আমার তাকে ডোবাতে হয়েছে কবিতায়, সেখান থেকে দেখতে হয়েছে।

নিচের অংশটিতে পাওয়া যাবে পিয়ানোর বিশালত্বকে ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখার ফরমুলা :

কিন্তু চ'লে যাও একেবারে পশ্চাদ্‌ভূমিতে, তোমার আর তার মধ্যে যে শূন্য স্থান সেটা যাতে অনুরণিত হয়ে উঠতে পারে তার জন্য যতটা ফাঁক রাখা দরকার তা রাখো, তাকে ছেড়ে দাও যথেষ্ট জায়গা, যেমন দিতে হয় প্রত্যেকটি বৃহৎ বস্তুকেই, যাতে সে আসলে যা তা-ই হয়ে উঠতে পারে, এবং তখন দেখবে যে পিয়ানোটা কোনো উড়ন্ত জলফড়িঙের চাইতে কম সূক্ষ্মনির্মিত নয়। পাহাড় ভারী হয়ে বসে কেবল যখন সে তোমার ওপরে। ভারমুক্ত হবার একমাত্র উপায় হলো হয় দূরে স'রে যাওয়া নয়তো ওপরে ওঠা। পিয়ানোর ওপরে ওঠো। ওপরে ওঠো হাত দিয়ে। যেভাবে মা উঠতেন।

এই সংকলনগ্রন্থটিতে 'কবির গদ্য' নামে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন মার্কিন লেখিকা সুজান সন্‌টাগ। তাঁর সব কথার সঙ্গে একমত হতে পারি না,— তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতটা যেন মাত্রাতিরিক্তভাবেই মার্কিন এবং পশ্চিম-ইওরোপীয়, ফলে বিষয়বস্তুটিকে সমগ্রত, ত্রিমাত্রায় ধারণ-গ্রহণ-বিশ্লেষণ করার পক্ষে অনুপযুক্ত, এমন মনে হয়েছে আমার,—কিন্তু তাঁর একটি পয়েণ্ট গুরুত্বপূর্ণ : মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভার এই গদ্য লেখাগুলির একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে নিজেকে খোঁজা, তাঁর নিজের কবিবৃত্তির বৃদ্ধি-বিকাশেরই বিবৃতিদান, আপন কবিসত্তারই আলেখ্যাঙ্কন, পরিচয়জ্ঞাপন। সন্‌টাগ বলেন : 'অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ নিজের বিবরণ দেওয়াকে পূর্ণ করে। কবি তাঁর বিভিন্ন শ্রদ্ধার প্রাবল্য এবং শুদ্ধির দ্বারা তুচ্ছ অহংকেন্দ্রিকতা থেকে পরিত্রাত হন। জীবনে তথা সাহিত্যে, লেখক যখন গুরুত্বপূর্ণ মডেলগুলির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন এবং বিনিশ্চায়ক মোলাকাতগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করেন, তখন তিনি স্পষ্ট করেন সেই মানদণ্ড-গুলিকেই, যেগুলির দ্বারা তাঁর নিজের বিচার করতে হবে।'

এ কথা ৎস্‌ভেতায়েভার সাহিত্যিক বন্ধুদের বিষয়ে লেখাগুলি সম্পর্কে যেমন সত্য, মায়ের বিষয়ে লেখাটি সম্পর্কেও তেমন সত্য। তাঁর মায়ের অনেকাংশে অবরুদ্ধ অবদমিত শিল্পপ্রতিভার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধানিবেদনের মাধ্যমে মারিনা নিজেকেও চিহ্নিত করেছেন শিল্পী হিসেবে, মায়ের উত্তরাধিকারিণী হিসেবে, একই সঙ্গে নিজেকে পৃথকীকৃত করেছেনও বটে, কেননা তাঁর মাধ্যমটা ভিন্ন,—শব্দ। শব্দশিল্পী না হলে আবার সংগীতের বিষয়ে শব্দের মাধ্যমে অমন পারদর্শিতার সঙ্গে লিখতে পারতেন না। (পাশ্চাত্য জগতে দেখি যে যাঁরা মূলত সংগীতস্রষ্টা, লেখালেখি করেন না, তাঁরা যখন অন্য শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করতে চান, তখন সংগীতরচনার মাধ্যমেই তা ক'রে থাকেন। অর্থাৎ শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কাজটি যে-

যাঁর নিজস্ব মাধ্যমেই ক'রে থাকেন, এবং এর দ্বারা আত্মসংজ্ঞানিরূপণও সম্পন্ন হয়ে যায়।)

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করতে হয় ৎস্‌ভেতায়েভার 'আমার পুশকিন' নামক রচনাটির। এটিও আত্মজৈবনিক। রুশ মহাকবি পুশকিনকে (১৭৯৯-১৮৩৭) ৎস্‌ভেতায়েভা কখনো মর্ত্য চোখে দ্যাখেননি, বড় হয়ে উঠেছেন তাঁর মূর্তির ছায়াতলে,—আক্ষরিক তথা প্রতীকী অর্থে। ছেলেবেলায় আয়াদের সঙ্গে মস্কোর বীথিকায় কবির মূর্তির কাছে হেঁটে যেতেন। কীভাবে ক্রমশ তাঁর কবিতাকে আবিষ্কার করেন, কীভাবে নিজের বালিকা-বোধির কাছে একাকার হয়ে যায় পুশকিন, কবিতা, ভালোবাসা, সমুদ্র: তার এক অসাধারণ কবিত্বময় প্রতিবেদন এই 'আমার পুশকিন' রচনাটি। পুশকিনের প্রতি ৎস্‌ভেতায়েভার শ্রদ্ধাঞ্জলির সঙ্গে তুলনীয় গদ্যে তথা কবিতায় কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের তর্পণ।

অন্যদের সঙ্গে চিন্তাবিনিময় থেকে আমার কখনও কখনও মনে হয়েছে যে শিল্পীর পক্ষে নিজের আইডেন্টিটি এবং বৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট চেতনা এবং প্রত্যয় থাকাটা যে শুভ এবং দরকারী, এই কথাটা বাঙালীদের মধ্যে তেমন স্বীকৃত নয়। কারও কারও ধারণা, শিল্পীর সেরকম চেতনা এবং প্রত্যয় থাকার মানেই এই যে তিনি অহমিকা-দোষে দুষ্ট। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সদর্থক ভাবনাসমষ্টি বাঙালী সমাজে এখনও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি,—অর্থাৎ বৌদ্ধিক স্তরে। অথচ ব্যক্তিত্ববিলাসিতা যে আমাদের সহজাত প্রবণতার মধ্যে নেই তা তো নয়, বরং সে-ব্যাপারে মাত্রাজ্ঞানের চেয়ে বাড়াবাড়িই আমাদের ধাতে। ফলে প্রায়ই দেখা যাবে যে আমাদের শিল্পীরা, গুরুরা, পথপ্রদর্শকরা ব্যক্তিত্বের বদলে উৎকেন্দ্রিকতার চর্চা করছেন, আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের কাজ ক'রে যাওয়ার বদলে আত্মরতির লীলা দেখাচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে সমাজে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হয়। তখন ব্যক্তিত্বের বিকাশ, যা ঐতিহ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিতে এমনিতেই অনুমোদিত নয়, তা আবারও সন্দেহের ছায়ায় আবৃত হয়ে যায়, এবং যাঁরা তার যথার্থ চর্চা করতে চান তাঁদের পথে ব্যারিকেড প'ড়ে যায়। এটা একটা দুষ্টচক্র, যা সৃষ্টিশীল উদ্যমের পক্ষে অনুকূল নয়। পাশ্চাত্য সমাজেও অহংসর্বস্ব শিল্পীরা আছেন বৈ কি, কিন্তু অহমিকাকে বাদ দিয়ে অস্মিতার বিকাশ কাকে বলে সে-সম্বন্ধে ধারণা এখানে স্পষ্ট ব'লে, তার দৃষ্টান্ত এখানে সমাজের সর্বস্তরে সুলভ ব'লে, শিল্পীদের আত্মপ্রত্যয় সম্পর্কে পাবলিকের কোনো তীব্র অ্যালার্জি নেই। এই আবহাওয়া সিরিয়াস শিল্পীদের পক্ষে অনুকূলতর। তাঁরা হাততালি পান কি না পান, সাংবাদিকদের

ক্যামেরার ক্ষণপ্রভা তাঁদের মুখে এসে পড়ুক কি না পড়ুক, তাঁরা অন্তত আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে, আত্মমর্যাদা বজায় রেখে, আপন মনে নিজেদের কাজ ক'রে যেতে পারেন। বাঙালীদের এটা বুঝে নেওয়া দরকার যে আত্মপ্রত্যয় মানেই আত্ম-কেন্দ্রিকতা নয়, সার্থকভাবে সৃষ্টি করতে গেলে আত্মপ্রত্যয়—সদর্থক আত্মপ্রত্যয়—লাগবেই। যে-সমাজে এই গুণ মর্যাদা পাবে না, বরং সন্দেহভাজন হবে, সেখানে নতুন সৃষ্টির স্রোত ক্ষীণ হয়ে আসবে।

'কবির গদ্য হচ্ছে মুখ্যত কবি হওয়া বিষয়েই' : সন্‌টাগের এই উক্তিটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলতে চাই যে কবির গদ্য যেখানে এবং যে-পরিমাণে দর্পণধর্মী, সেখানে এবং সে-পরিমাণে তা নিজের দর্পণও বটে, দৃষ্ট বিশ্বের দর্পণও বটে। এই দু'টি দিকের মধ্যে কোনো আবশ্যিক বিরোধ নেই, বরং যখন এদের মধ্যে সার্থক মিথস্ক্রিয়া ঘটে তখনই কবির গদ্যের আয়নাটি ঝলমল ক'রে ওঠে।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ আমেরিকায়। সেই সংস্করণটি আমি দেখিনি। যে-সংস্করণটি আমার আলোচ্য সেই ব্রিটিশ সংস্করণটিতে প্রকাশভবনের সম্পাদনাগত একটি প্রমাদ আছে। মার্কিন সংস্করণটিতে একটি ভূমিকা ছিলো, যেটি এখানে বর্জিত হয়েছে,—অনুমান করি তার বদলেই সন্‌টাগের ভূমিকাটি আনা হয়েছে,—কিন্তু বর্জিত ভূমিকাটির পাদটীকাগুলিকে বর্জন করার কথা কারও মনে হয়নি, সেগুলি বইয়ের শেষে বহাল আছে। অবশ্য সেগুলি থেকে প্রাসঙ্গিক নানা ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান বর্ধিতই হয়, মূল সূত্রগুলিকে না পাওয়া গেলেও! অনুবাদক সম্পর্কে কোনো পরিচিতিও পাচ্ছি না। এত পরিশ্রম ক'রে, এত সুন্দরভাবে একজন কবির গদ্যকে যিনি ভাষান্তরিত করলেন, সেই মানুষটিরও নিশ্চয়ই একটি শিল্পী-সত্তা আছে, থাকতেই হবে, এবং পাণ্ডিত্যও যথেষ্টই আছে, যা প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর টীকাগুলি থেকে, কিন্তু তাঁর কোনো পরিচয় পেলাম না। এমনকি, তাঁর সম্পূর্ণ নামটাও কোথাও দেওয়া নেই। শুধু বোঝা যাচ্ছে যে তিনি, 'জে. ম্যারিন কিং', মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়জগতের বাসিন্দা,—অথবা তা ছিলেন, বইটির প্রস্তুতিকালে।

ৎস্‌ভেতায়েভার কবিতা ১৯৭১ সাল থেকেই ইংরেজী অনুবাদে পাওয়া যায়, তাই সে-বিষয়ে এখানে নতুন ক'রে আলোচনা করতে চাই না। যাঁরা এ বিষয়ে আগ্রহী তাঁদের জানাই যে সেই অনুবাদগ্রন্থটির একটি নতুন, বর্ধিতকলেবর সংস্করণ

বেরিয়েছে। সেখানে ফাইনস্টাইনের করা আরও কতগুলি নতুন অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে।[১]

আমার জীবনটা ছিলো একটা জ্বরবিকার।
কিন্তু একটা জিনিস আমি পেয়েছি এবং একটা জিনিস আমি সত্যিই লাভ করেছি—
যে-দেশ নেই সেখানে যাবার পথ।

—মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে লিখেছিলেন ইয়োরোপের আরেক নারী কবি, এডিট্ স্যোডারগ্রান, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভার মতোই ১৮৯২ সালে, এবং শিক্ষায়, বড় হয়ে ওঠার সাংস্কৃতিক পরিপার্শ্বে, জীবনের কোনো কোনো অভিজ্ঞতায় ৎস্‌ভেতায়েভার সঙ্গে যাঁর কিছু কিছু মিল আছে। নিঃসংকোচে বলতে পারি যে এই ১৯৮৪ সালের বসন্তকালে 'একটি জিনিস আমি পেয়েছি এবং একটি জিনিস আমি সত্যিই লাভ করেছি': সেটি হলো এডিট্ স্যোডারগ্রানের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ। অনেক দিন এমন উৎকৃষ্ট, গভীর-অনুভূতিসঞ্জাত, হৃদয়বিদারক কবিতা পড়িনি। জীবনে একটা বড়রকমের দাম না দিয়ে এই বিশেষ ধরনের কবিতা লেখা যায় না। সে-দাম কেউ স্বেচ্ছায় দেয় না, জীবন কাউকে কাউকে দিতে বাধ্য করে। স্যোডারগ্রানকে দাম দিতে হয়েছিলো,—রক্ত দিয়ে।

তিনি জন্মেছিলেন একটি ফিনল্যাণ্ডীয়-সুইডিশ পরিবারে (সুইডিশভাষীরা ফিনল্যাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়); তাঁর বাবা ছিলেন পেশায় এন্‌জিনিয়র, তাঁর মায়ের ছিলো সাহিত্যে অনুরাগ। জন্ম রাশিয়ার তৎকালীন সেণ্ট পিটার্সবুর্গ (আধুনিক লেনিনগ্রাদ) শহরে, যেখানে তাঁর বাবা সে-সময়ে কর্মরত ছিলেন। (ফিনল্যাণ্ড তখন কিয়দংশে রুশ সম্রাটের কর্তৃত্বাধীন, কিয়দংশে স্বশাসিত অর্ধস্বাধীন রাজ্য; ঐ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি লাভ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লবের সুযোগে।) তাঁর জন্মের কয়েক মাস পরে তাঁর মা-বাবা থাকতে যান সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ষাট কিলোমিটার মতন দূরে রুশ বর্ডারের গা-ঘেঁষা

১. Marina Tsvetayeva, *Selected Poems*, Translated by Elaine Feinstein, Oxford University Press, 1981, £4.95.

রাইভোলা নামে একটি ছোট ফিনিশ গ্রামে। হ্রদতীরবর্তী এই গ্রামটিতে ছুটি কাটাতে আসতেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বুদ্ধিজীবীরা। ভিলাগুলি ছিলো রুশ 'দাচা'-র স্টাইলে, গির্জেটিও রুশ স্টাইলে।

তাঁর দশ থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত এডিট্ শিক্ষালাভ করেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের একটি অভিজাত জার্মান বোর্ডিং-স্কুলে; ছুটিতে ছুটিতে রাইভোলায় ফেরত যেতেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি জার্মান ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষাতেও তালিম পান। তাঁর মানসিক বিকাশে বিশেষ সহায়ক হন একজন ফরাসী শিক্ষক, যাঁর প্রতি নিবেদিত হয় এডিটের বালিকা-হৃদয়ের আকর্ষণমিশ্রিত শ্রদ্ধা। জানা যাচ্ছে যে কিশোরী এডিটের চোদ্দ থেকে ষোলো বছর বয়সের মধ্যে লেখা দুশো-পঁচিশটি কবিতার মধ্যে গোটা-বিশেক সুইডিশে লেখা, পাঁচটি ফরাসীতে, একটি রুশে, বাদ-বাকি জার্মানে। জার্মানই ছিলো তাঁর হৃদয়ের সব থেকে কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সের কবিতার জন্যে তিনি শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিলেন সুইডিশ ভাষাকেই। সুইডিশে রচিত তাঁর পরিণত বয়সের সমগ্র কবিতাবলীর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন ডেভিড ম্যাক্‌ডাফ্।[১] ইনি রুশ, সুইডিশ, নরওয়েজীয় এবং আইসল্যাণ্ডীয় ভাষা থেকে নানা সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করেছেন, এবং নিজেও কবিতা লেখেন। বর্তমানে ৎস্‌ভেতায়েভার কবিতার একটি নতুন অনুবাদগ্রন্থ প্রস্তুত করছেন।

এডিট্ স্যোডারগ্রানের পরিণত কবিতাবলীর চালিকা শক্তি হচ্ছে তাঁর জীবনের কেন্দ্রিক সংগ্রাম: যক্ষ্মারোগের সঙ্গে। মৃত্যু অনিবার্যত তাঁর নিত্য-অবসেশন, জীবন আর মৃত্যুর দ্বন্দ্বযুদ্ধের মূল সুরে বাঁধা তাঁর সমস্ত কবিতা।

১৯০৪ সালে তাঁর বাবা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। এডিট্ তাঁকে দেখতে যান ফিনল্যাণ্ডের অন্তর্গত নুমেলা-র স্যানাটোরিয়ামে। সে-অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। ১৯০৭ সালে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সালের শেষে ধরা পড়ে যে এডিটের শরীরেও সে-ব্যাধি প্রবেশ করেছে। তিনি কিছু সময় কাটান নুমেলা-র স্যানাটোরিয়ামে, কিছু সময় সুইটজারল্যাণ্ডের ডাভস্-এ, যেখানে ছিলো অনেকগুলি স্যানাটোরিয়াম। (টোমাস মানের বিখ্যাত উপন্যাস

১. Edith Södergran, *Complete Poems*, Translated by David McDuff, Bloodaxe Books, Newcastle upon Tyne, 1984. Paperback : £4.50 ; Hardback : £7.95.

'জাদু-পাহাড়' এই ডাভস্-এরই পটভূমিকায় রচিত।) ডাভসে এডিট্ একজন ডাক্তারের প্রতি আকৃষ্ট হন, যিনি নিজেও ছিলেন যক্ষ্মারোগাক্রান্ত। এখানে তিনি আবিষ্কার করেন ইংরেজী সাহিত্যকে, এবং আরম্ভ করেন ইতালীয় ভাষা শেখা। কিন্তু স্যানাটোরিয়ামের জীবন তাঁর একেবারে পছন্দ ছিলো না : তার উপমা তিনি খুঁজে পান দান্তের 'নরক'-এ।

১৯১৪ সাল থেকে এডিটের জীবন কাটে প্রধানত রাইভোলায়, পৈতৃক 'দাচা'-য়, মায়ের সাহচর্যে, ভালো থাকা আর খারাপ থাকার ওঠা-নামায়। মা এবং মেয়ের মধ্যে একটা নিকট আত্মিক সম্পর্ক অনিবার্যতই প্রতিষ্ঠিত হয়। একত্র তাঁরা দিনযাপন করেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের, রুশ বিপ্লবের, গৃহযুদ্ধের এবং দুর্ভিক্ষের ছায়ায়। নিদারুণ অন্নকষ্টে কাটে তাঁদের বহু দিন। সেইসব সংকটের মধ্যেই এডিট্ কবিতা লিখে যান, বিভিন্ন বই প্রকাশ করেন, সমালোচকদের সমালোচনার জবাব দেন, বন্ধুত্বের অন্বেষণ করেন, চিঠিপত্র লেখেন, রাজনৈতিক-দার্শনিক উত্তেজনা দ্বারা প্লাবিত হন, ব্যক্তিগত জীবনের প্রবল সংক্ষোভের সঙ্গে সেই বৈপ্লবিক উত্তেজনাকে মিশিয়ে দিয়ে, হৃদয়ের অনুভূতিগুলিকে বৈশ্বিক আয়তনে উন্নীত ক'রে সঞ্চারিত করেন তাঁর রচনায়। তাঁর কবিতায় সক্রিয় নানা প্রভাব : রূপকথা, নিউ টেস্টামেণ্ট, হাইনে, গ্যয়টে ইত্যাদি থেকে শুরু ক'রে র‍্যাঁবো, হুইটম্যান, বালমণ্ট, মায়াকভস্কি, সেভেরিয়ানিন, নীট্‌শে, রুডল্‌ফ্ স্টাইনার ইত্যাদি পর্যন্ত। কতগুলি আমিও চিনতে পারছি ; অন্যগুলি সম্পর্কে কিছু বলা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা হবে। ১৯২৩ সালে একত্রিশ বছর বয়সে এডিট্ স্যোডারগ্রানের মৃত্যু হয়। তাঁকে যেখানে কবর দেওয়া হয় সেই সমাধিক্ষেত্র এখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভিতরে।

স্যোডারগ্রান তাঁর জীবিতাবস্থায় কিছু সহৃদয় পাঠক পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে নিন্দা জুটেছিলো আরও বেশি। কেন, তা সময়ের এই দূরত্ব থেকে বুঝে নিতে বেগ পেতে হয়। ফিনল্যাণ্ডের সুইডিশভাষী সমাজের সাহিত্যিক আবহ ছিলো প্রাদেশিক। স্যোডারগ্রানের কবিতার মানসিক তথা আঙ্গিকগত আধুনিকতার মর্মগ্রহণ করতে সমর্থ পাঠক নাকি সেই সমাজে বেশি ছিলেন না। কবির আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শ্রোতাদের সংকীর্ণতার ধাক্কাধাক্কির ফলে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। তাঁর দ্বিতীয় বইয়ের সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে কবি ঘোষণা করেন : 'আমি আত্মপ্রত্যয়ী কেননা আমি আমার মাত্রাদের আবিষ্কার করেছি। আমি যা, তা থেকে নিজেকে ছোট করা আমার শোভা পায় না।' এ কথা বলার জন্য তাঁকে

আরও বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়। তাঁর শ্রোতাদের কানে তাঁর কথাবার্তা ঠেকে একটি অভিজাত ঘরের মেয়ের মেগালোমেনিয়ার মতন। কিন্তু স্যোডারগ্রান বাজে কথা বলেননি। জাতশিল্পীর প্রবল আত্মপ্রত্যয় না থাকলে তাঁর দাহকে কবিতার অগ্নিধারায় রূপান্তরিত করতে পারতেন না তিনি। বর্তমানে তিনি ফিনল্যাণ্ডের সর্বাগ্রগণ্য আধুনিক কবি হিসেবে স্বীকৃত। ফিনল্যাণ্ডে এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে তিনি আজ বহুপঠিত, সম্মানিত এবং গভীরভাবে প্রভাবশালী।

ডেভিড ম্যাক্‌ডাফ্‌ও তাঁর ভূমিকাটিতে কিছুটা অ্যাপলজির সুরে লিখেছেন: 'তাঁর কবিতা, যদিও প্রকাশরীতিতে ইমেজিস্টিক, মুখ্যত আইডিয়াদের নিয়ে কবিতা। ফলত, তা অধিকাংশ ইংরেজীভাষী পাঠকের কাছে বিজাতীয় রয়ে যেতে পারে। বর্তমান সংকলনে চেষ্টা করেছি তাকে ঐ পাঠকের কাছে আনতে, যাতে তাঁরা নিজেরা বিবেচনা ক'রে দেখতে পারেন।' এই অ্যাপলজি নিঃসন্দেহে এক শ্রেণীর ইংরেজীভাষী কবিতাপাঠকদের ও সমালোচকদের স্নবারির বিরুদ্ধে অগ্রিম প্রতিক্রিয়া, কিন্তু একে তিনি ভূমিকার ভিতরে না ঢোকালেই পারতেন। সাম্প্রতিককালে ইংরেজীভাষী কাব্য-এস্টাব্লিশমেণ্টের রুচি যদিও সীমাবদ্ধ, তার ঝোঁক যদিও শাব্দিক চাতুরীর দিকে, তবুও এঁরাই রুচির একমাত্র নিয়ন্তা নন, এঁদের গজদন্তমিনারের বাইরেও—যে-মিনার কার্যত একধরনের নব্য প্রাদেশিকত্ব—অন্যান্য ধারা বর্তমান এবং বহমান। যে-কবিতা মুখ্যত আইডিয়াদের নিয়ে সেই কবিতাই ভাষান্তরে সহজে উতরে যায়, এবং স্যোডারগ্রানের কবিতা মানবচিত্তের এমন একটা জায়গা থেকে উৎসারিত যে এর আবেদন দেশকালের ইহাত্ব ছাড়িয়ে সর্বজনীনতার ও সর্বকালীনতার মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম। অনুবাদকের কাছে আমরা এইজন্যে কৃতজ্ঞ থাকবো যে অ্যাপলজি সত্ত্বেও অনুবাদকর্মটি তিনি করেছেন, এবং ইংরেজীভাষীরা এই কবিতাকে তার যোগ্য মর্যাদা দিন বা না দিন, ইংরেজীর মাধ্যমে এর পরিচয় পেয়ে বৃহত্তর দুনিয়া লাভবান হবে। ম্যাক্‌ডাফের সহজ, সাবলীল রূপগুলির ভিতর দিয়ে একজন বড় কবিকে চিনে নিতে কোনো অসুবিধা তো হয় না। জানা যাচ্ছে যে মূল কবিতাগুলির ভাষায় ব্যাকরণগত এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রচলিত রীতির বাইরে, সুইডিশে তিনি যে পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ ছিলেন না তারই ইঙ্গিতবহ। ভাষান্তরে অবশ্য সেসব ভাঁজ বেমালুম ইস্ত্রি হয়ে গেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কবিতাগুলি এমন খাঁটি যে অনুবাদের অনুবাদেও তাদের গুণ নষ্ট হবে না।

ফুল খুঁজেছিলে,
ফল পেলে।
কুয়ো খুঁজেছিলে,
সমুদ্র পেলে।
নারী খুঁজেছিলে,
আত্মা পেলে—
ভাবছো ঠ'কে গেলে।

কিংবা

যখন রাত্রি আসে
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শুনি।
বাগানে ভিড করে তাবারা
আর আমি দাঁডিয়ে থাকি অন্ধকাবে।
ঐ শোনো, টুং ক'বে একটা তাবা খ'সে পডলো!
খালি পায়ে ঘাসেব ওপবে যেও না;
আমার বাগান ভাঙা টুকরোয় ভর্তি।

যে-কোনো ভাষায় হোক, এ জাতীয় কবিতার উত্তবণ অবোধ্য।

ফিনল্যাণ্ডেব নিসর্গ: তারায় ভরা আকাশ, বড় বড় গাছ, হ্রদ, হ্রদের দর্পণে প্রতিবিম্বিত আকাশ-তাবকা-বৃক্ষ ববফের দর্পণে প্রতিবিম্বিত আনন্দের বনফায়ার, নরম বসন্তের আত্মপ্রত্যয়ী ফুল, হ্রস্ব গ্রীষ্মের রোদ, হেমন্তের অনিবার্য ক্ষয়, সমুদ্র, শিলাময় বেলাভূমি: এইসব তার উপমা-চিত্রকল্পেব একটি বড উৎস। তিনি গাছেদের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলতে জানেন, জানেন তাদের সান্ত্বনা দিতে, জানেন কী মন্থর গতিতে সময় ক্ষয় করে সমস্ত কিছুর শাঁসকে, কী নিঃশব্দে নামে ভাগ্যের ভারী গোড়ালি; জানেন যে পুরোনো বাড়িটাতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে নম্র মৃত্যুর জন্যে, যা মুক্তি দেবে তাঁর আত্মাকে। কখনও তাঁর একমাত্র কামনা একটি বাগানবর্তী সোফা, যেখানে একটা বিড়াল রোদ পোহাচ্ছে (বিড়ালদের বড়ই ভালোবাসতেন তিনি); সেখানে বসতে চান বুকের কাছে একটা ছোট্ট চিঠি নিয়ে; ঐ তাঁর স্বপ্নের আদল। তিনি হেমন্তের শেষ ফুল, মৃত বসন্তের সর্বকনিষ্ঠ বীজ; শুনেছেন মৃত গ্রীষ্মের হৃৎস্পন্দনকে; তাঁর পাত্রে মৃত্যুর বীজ ছাড়া আর কোনো বীজ নেই। হেমন্তের ম্লান হ্রদ প্রতিবিম্বিত করে সেই দিনগুলিকে, যারা মারা যায়;

হালকাভাবে এবং নীরবে বহন করে উঁচু আকাশকে, যেমন জীবন আর মৃত্যু এক মুহূর্তের জন্য একটি তন্দ্রালু তরঙ্গে পরস্পরকে চুমো খায়। হেমন্তের শেষের দিকে রাত্রিবেলায় চাঁদের কাস্তে ফুলেদের নিড়িয়ে ফ্যালে, এবং সব ফুল অনন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে চাঁদের চুমোর জন্যে। যখন বৃষ্টি পড়ে এবং সমুদ্র ধূসর, তখন রোগে ধরে তাঁকে; তিনি সূর্যের সঙ্গে হাসেন, বাতাসের সঙ্গে গাড়িতে চ'ড়ে বেড়ান, সমুদ্রের সঙ্গে ঠাট্টা করেন; উত্তাল সমুদ্রই একমাত্র জিনিস যা ভালোবাসেন; বাস করেন বাদুড়ে ভর্তি গুহায়; কিন্তু তিনি রমণীয় ও গৌর, এবং ঠকাতে জানে তাঁর দু' চোখ। কখনও তিনি অভগ্ন, একটি হায়াসিন্থ্, যা মরতে পারে না, একটি বসন্তের ফুল, যা থেকে ঝুলে থাকে শুদ্ধ ঘণ্টা-আকৃতি পাপড়ি-গুচ্ছগুলি, যা জেগে ওঠে প্রান্তরের তোয়াক্কা-না-করা জয়গৌরবে, অপরাজেয়ভাবে, নিশ্চিতভাবে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় বাঁচবার জন্যে। কখনও সূর্য মিষ্টি মধুতে তাঁর বুক ভ'রে দেয় কানায় কানায়, এবং বলে : সব তারাই অবশেষে ম্লান হয়ে যায়, কিন্তু ঝিকমিক করে সর্বদাই নির্ভয়ে।

এক তারার চিত্রকল্পই তাঁর কবিতায় যে কতরকমভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা খেয়াল ক'রে দেখবার মতো। কখনও তিনি তারাদের রাজকীয় রাত্রির সঙ্গে অভিন্ন; যেন সন্তর্পণে বসেন তারাদের দড়িতে,…দড়িটা ছিঁড়ে যেতে পারে; প্রতিটি তারা তাঁকে মিটমিট ক'রে বলে : আমি হচ্ছি তুমি; তাঁকে চুমো দিয়ে বলে : থাকো আমার সঙ্গে! কখনও বিশ্বের উপকূলগুলি ঝিকমিক ক'রে জ্বলে-নেভে, প্রশ্নের মতন। কখনও প্রতিটি তারা পৃথিবীতে একটা পয়সা ছুঁড়ে দেয় : ঠন্ঠন্ শব্দ হয়; কখনও প্রতিটি তারা থেকে সৃষ্টিতে আসে এক মারী : নতুন ব্যাধি, মহৎ আনন্দ। কখনও তারারা শত্রুভাবাপন্ন, নিত্যবিদেশী, নিত্যদূরস্থিত; প্রত্যেকটি তারা তুষারকঠিনদৃষ্টিসম্পন্ন, অহংকারী, নিজের শক্তি নিয়ে একলা, সমবেত দীপ্তিতে আস্থাহীন; প্রত্যেকটিই যেন দর্শককে বলতে চায় যে একমাত্র সে-ই সব, পৃথিবীতে আগুন দিতে চায়, চায় ধ্বংস করতে, গিলে ফেলতে, পোড়াতে, তার শক্তিকে খাটাতে।

স্যোডারগ্রানের কবিতায় আরেকদল ইমেজ এসেছে রূপকথার জগৎ থেকে : ভাগ্যের সুতো কাটতে পারে এমন সৌভাগ্য-এনে-দেওয়া বিড়াল, মুখ দেখার আয়না, বনকন্যা, দুই দেবী, তিন বোন, রাজ্যের দরিদ্রতম রাজকন্যা, বর্ণহীন বিদেশী, ড্র্যাগন ও কুমারী, তাস-হাতে বিদেশিনী জিপ্‌সি নারী ইত্যাদি। এই চিত্রকল্প কখনও ক্রীড়াপরায়ণ, কখনও সংযতভাবে হিংস্র, কখনও ফোকাস করে

দুঃখের যে-দিকটা ভাগ্যের লটারির দিক সে-দিকটার উপরে, কখনও জোর দেয় অভিজ্ঞতার মৌল দ্বৈততার উপরে, রূপ দেয় আপাতপ্রতীয়মানের সঙ্গে নিহিত বাস্তবতার দ্বন্দ্বকে।

এবং আমি নারী হয়ে বসেছিলাম তোমার টেবিলে,
পান করেছিলাম একপাত্র সুরা, নিয়েছিলাম কতগুলি গোলাপের ঘ্রাণ।
আমাকে তোমার রমণীয় লেগেছিলো, যেন আমি তোমার স্বপ্নে দেখা আর
কারও মতন,
আমি সব ভুলে গেছিলাম, আমার শৈশব, আমার স্বদেশ,
শুধু জেনেছিলাম যে আমি তোমার আদরের বন্দী।
এবং তুমি হেসে হাতে নিয়েছিলে একটা আয়না,
আমাকে বলেছিলে সেখানে আমার নিজের দিকে তাকাতে।
আমি দেখলাম, আমার কাঁধদুটো ধুলোয় তৈরি, তারা খ'সে পড়লো,
দেখলাম আমার সৌন্দর্য ব্যাধিগ্রস্ত, তার আর কোনো সাধ নেই,—
মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া,—
ওঃ, আমাকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখো তোমার দু' বাহুতে,
যাতে আর কিছুই না লাগে আমার।

"ভালোবাসা" নামাঙ্কিত এই কবিতাটিতে স্বাভাবিক যৌবনবেদনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে গভীরতর হাহাকার।

তারার প্রাচুর্যের মতোই তাঁর কবিতায় বিকীর্ণ হয়ে আছে এমন সব ইমেজ, যেগুলি উদ্‌ভাসিত করে তাঁর সত্তার যন্ত্রণাকে, এবং তাকে দেয় বৈশ্বিকতার মাত্রা। তাঁর আক্ষেপ, কবিতার মাখা আটার তাল ফুলে ওঠে, তবু কেন ক্যাথিড্রাল বেক করা যায় না, মরবার আগে তিনি একটা ক্যাথিড্রাল বেক ক'রে যাবেন। তাঁকে পায়ে হেঁটে পার হতে হয়েছে সৌর জগৎ, তবেই তিনি পেয়েছেন তাঁর লাল পোশাকের প্রথম সুতোটাকে। ভগবানের করুণা ছাড়া তাঁর আর কিছু লাগবে না; জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁর চলা নেশাগ্রস্তের মতো; তাঁর কয়েক ফোঁটা আতর ধারণের জন্য একটি পাত্র মিলবে কি? তাঁর প্রত্যেকটা কবিতা হবে একটা কবিতাকে ছিঁড়ে ফেলা, কবিতা নয়,—ঈগলের নখের আঁচড়। অন্ধকার এক স্বপ্নে একটা ছোট কেঁচো দ্যাখে যে চাঁদের কাস্তের ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত তার সত্তা: একটা টুকরো কিছুই না, অন্যটা সব কিছু,—স্বয়ং ঈশ্বর। স্তোডারগ্রানের যে-

যন্ত্রণাবোধ তা কোনো অভিনয় বা পোজ নয়, কোনো মানসিক বৈকল্যের লক্ষণ নয়, কোনো কেতাদুরস্ত অমঙ্গলবোধের জাতক নয়, তা তাঁর তরুণ, ভাগ্যহত সত্তারই ক্রন্দন : অকৃত্রিম, আত্মকরুণাবর্জিত।

ঠিক ক'রে ভেবে দেখতে গেলে
আমার কালো চুল ছাড়া আর কিছুই তো বাকি নেই আমার,
সাপের মতন আমার বেণীদুটো ছাড়া।
আমার ঠোঁটদুটো জ্বলন্ত কয়লা হয়ে গেছে,
আর মনে পড়ে না ওরা কবে জ্বলতে শুরু করেছিলো···
ভয়ংকর সেই দাবানল, যা আমার বালিকাত্বকে করেছিলো ছাই।
ওঃ, যা হবার তা তো হবেই, অসিঘাতের মতো—
আমি যাচ্ছি বিদায় বিনা, অলক্ষিত,
একেবারেই চ'লে যাচ্ছি, আর ফিরবো না।

"হ্যামলেট" নামে একটি কবিতাতে তিনি ব'লে ওঠেন :

আমার সামনে কোনো বিকল্প নেই,
সত্য, তুমি যদি কুয়াশার দেশে যাও আমি যাবো তোমার অনুসরণে।
সত্য, সত্য, তুমি কি মর্গে থাকো, কীট আর ধুলোর সঙ্গে ?
সত্য, তুমি কি সেখানে থাকো, যেখানে যা-কিছু আমি ঘৃণা করি সে-সমস্তই থাকে ?
সত্য, বিষণ্ণ লণ্ঠনেরা কি তোমার পথ দেখায় ?

একটি কবিতাতে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন ভারতীয় চিত্রকল্প :

হিমালয়ের সিঁড়িতে ব'সে
মহান বিষ্ণু
স্বপ্ন ছাখেন।

অনন্ত সন্ধ্যা হিমালয়ের চারদিকে।

শ্বেতাম্বর
তীর্থযাত্রী দাঁড়ায়, ক্ষুদ্র, বেগনি আভায়।
সর্বশক্তিমান,

আমার জীবনটাকে নাও
তোমার স্বপ্নদের একটি মুহূর্ত ক'রে…
দেখে নিতে চাই কী তোমার ইচ্ছা—তার পরে মরবো…

সাহিত্যের একটি পুরাতন থীম, অনিত্যতা, স্যোডারগ্রানের কবিতায় পেয়েছে নতুন বেগ, তীব্রতা, জরুরী মাত্রা ; মৃত্যুর প্রত্যাশায় যুবতীহৃদয়ের অগ্রিম শোক অনিবার্য লজিকে পৌঁছেছে মহাবিশ্বের চরম রহস্যে, অস্তিত্ব সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নে। বাঙালী পাঠকের রবীন্দ্রনাথের কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে। কবিতাগুলির ইমেজ-ধর্মিতা, একের পর এক ছবির মাধ্যমে বেদনার জন্মদান, চীনা এবং জাপানী কবিতাকেও মনে করিয়ে দেয়।

পৃথিবী ও পার্থিব সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা তাঁর বিলাপকে গভীরতা দেয়, যেমন কীট্‌সের কবিতায়। কখনও প্রবল তাঁর ইচ্ছাশক্তি, যে শক্ত জমিতে তিনি গ'ড়ে তুলতে চান তাঁর ভবিষ্যৎ। কখনও অনুভব করেন যে জীবন আর মৃত্যু সূর্য আর চাঁদ, যে প্রকৃতি যেহেতু মৃত্যুর অন্তরঙ্গ, তাই মৃত্যুর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর কিছু থাকতে পারে না। জানেন যে জীবনের অসুখের দীর্ঘ প্রহরগুলিকে এবং বাসনার সংক্ষিপ্ত বছরগুলিকে আমাদের ঠিক এমনভাবে ভালোবাসতে হবে, যেন তারা সেইসব হ্রস্ব মুহূর্ত, যখন মরুভূমিতে ফুল ফোটে।

তাই তাঁর কবিতায় আহত প্রাণীর ছটফটানি যেমন আছে, তেমন এক পরিণত প্রশান্তি, শুদ্ধীকৃত সমর্পণও আছে :

বোন, আমার বোন, ছোট্ট তুমি,
কিন্তু তুমি ঈশ্বরকে দেখেছো,
আশীর্বাদ তোমার কপালে ; কেমন ঝলমল করছে !
তাঁকে দেখার পর থেকে তুমি বিবিক্ত।
তুমি একলা ব'সে ছিলে তরুতলে,
কিন্তু তোমার কাছে নীরব হয়ে গেছিলো গিরিনদী,
আর গায় নি পাখিরা।
ঈশ্বরকে যে দেখেছে সে ধরণীতে আর কিছু ছাখে না,
স্বর্গে তার ঘর।

উদ্ধৃত করতে ইচ্ছা করে তাঁর সর্বশেষ কবিতার কয়েকটি লাইন :

মৃত্যু, তুমি কেন নীরব ছিলে ?
আমরা অনেক দূর এসেছি,
শ্রবণে অধীর।
তোমার মতন গাইতে পারে
এমন ধাই আমরা কখনো পাই নি।

যে-মালা আমার ললাটে কখনো শোভা পায় নি
তা আমি নীরবে রাখবো তোমার পায়ে।
তুমি আমাকে দেখাবে এক আশ্চর্য দেশ
যেখানে পামগাছেরা দাঁড়িয়ে থাকে, লম্বা,
আর যেখানে সারি সারি থামের ফাঁকে ফাঁকে
যায় বাসনার ঢেউয়েরা।

মনে রাখতে ইচ্ছা করে সৌন্দর্যের একঝাঁক সংজ্ঞাকে :

সৌন্দর্য হচ্ছে গ্রীষ্মের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া এবং হেমন্ত পর্যন্ত নগ্ন থাকা ;
সৌন্দর্য হচ্ছে টিয়ার পালক কিংবা ঝড়ের সংকেতবাহী সূর্যাস্ত ;
সৌন্দর্য হচ্ছে চেহারার কোনো প্রখরতা, নিজস্ব বাচনভঙ্গি : সে হচ্ছে আমি,
সৌন্দর্য হচ্ছে একটা বিরাট ক্ষতি এবং একটা নিঃশব্দ শোকযাত্রা,
সৌন্দর্য সেই পাখার হালকা ঝাপটা, যা জাগায় নিয়তির বাতাসকে :
সৌন্দর্য হচ্ছে গোলাপের মতো মোহন হওয়া
অথবা সব ক্ষমা করা, কেননা রোদ উঠেছে ;
সৌন্দর্য সেই ক্রুশ যা সন্ন্যাসী বেছে নিয়েছে, বা সেই হার যা নায়িকা পেয়েছে
তার প্রেমিকের কাছ থেকে,'
সৌন্দর্য নয় সেই পাতলা ঝোল যার মধ্যে কবিরা নিজেদের পরিবেশন করে,
সৌন্দর্য হচ্ছে সংগ্রাম করা, আনন্দ খোঁজা,
সৌন্দর্য হচ্ছে উচ্চতর শক্তিদের সেবা করা।

যাঁরা টি. এস. এলিয়টের কবিতার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানবেন যে তাঁর ১৯০৯-১৯৩৫-এর কবিতাবলীর মধ্যে "মারিনা" নামে একটি কবিতা আছে। মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভার সঙ্গে সেটির কোনো সম্পর্ক আছে ব'লে আমি কখনো শুনিনি : তবে আমি এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই,—সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।

সে যা-ই হোক, এলিয়টের লাইনগুলি প্রয়োগ করতে ইচ্ছে করে মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা আর এডিট্‌ স্যোডারগ্রান উভয়ের সম্পর্কেই :

What seas what shores what grey rocks and what islands
What water lapping the bow
And scent of pine and the woodthrush singing through the fog
What images return
O my daughter...

মারিনা ৎস্‌ভেতায়েভা, এডিট্‌ স্যোডারগ্রান : দুই নারী, দুই অদম্য শিল্পী-সত্তা। উপযুক্ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে মেয়েদের শিল্পপ্রতিভা কীভাবে জ্বলে উঠতে পারে তার সাক্ষী দু'জনেই। এঁদের রচনা বিশ্বসাহিত্যের রত্নাবলীর অংশ, এবং অনুবাদের মাধ্যমে এঁদেরকে পড়তে পারা আমাদের সৌভাগ্যবিশেষ। আশা রাখি কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও, এই আলোচনা থেকে উদ্দীপনা পেয়ে এঁদের বই সংগ্রহ ক'রে পড়তে আগ্রহী হবেন।

নারীমুক্তি প্রসঙ্গে

Mary Midgley and Judith Hughes, *Women's Choices, Philosophical problems facing feminism,* Weidenfeld and Nicholson, London, 1983, pp. 242, paperback (£6.95) and hardback.

মনে পড়েছে, আমার ক্যানাডাবাসের কোনো-এক সময়ে আমি আমার সদ্যোজাত প্রথম সন্তানটিকে মানুষ করা আর অন্যান্য গার্হস্থ দায়িত্ব পালন করা ছাড়া 'আপাতত আর কিছুই করছি না' জেনে একটি বাঙালী যুবক অকপট বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের ধারে-কাছে কোনো দাসদাসীর উপস্থিতি যে ছিলো না তা তো বলাই বাহুল্য, উল্লেখ করা যেতে পারে যে সে-দেশে আমার অথবা আমার সন্তানের পিতার কোনো আত্মীয়-স্বজনও ছিলেন না। ফলে ঘরের কাজ আর নবজাতকের দেখাশোনা নিয়ে আমরা দু'জনেই বেশ ব্যস্ত ছিলাম। তার আগে আমি বিলেতে সপ্তাহে তিনবার দৈনিক চার ঘণ্টা ট্রেনে যাতায়াত ক'রে চাকরি করতাম; আমার ধারণা ছিলো বিয়োবার জন্যে মেয়েরা কিছুটা অবকাশ নিতে পারে; হাজার হোক, প্রসূতির প্রসবোত্তর দুর্বলতা থেকে সেরে ওঠার ব্যাপারটা তো আছে, এবং আমার প্রথম প্রসব যথেষ্ট কঠিনই হয়েছিলো, কিন্তু সেসব বোধ করি ছিলো যুবকটির ধারণার বাইরে। আমি তাঁকে তখনই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন, সংসার সামলানো আর ছেলে মানুষ করা বুঝি কোনো কাজের কাজ নয়? তিনি লজ্জা পেয়ে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করেছিলেন যে হ্যাঁ, ওগুলোও মর্যাদাসম্পন্ন মনুষ্যকর্ম বটে। অবশ্য ক্যানাডায় থাকাকালীন আমি যে 'আর কিছুই' করিনি তা-ও ঠিক কথা নয়। কিছু কবিতা এবং গ্রন্থসমালোচনা লিখেছিলাম (আমার ধারণা আর্জেন্টাইন লেখক বর্হেস সম্পর্কে বাংলায় দু'-চার কথা হয়তো-বা আমিই প্রথম লিখি, এবং সেটা লিখেছিলাম ক্যানাডা থেকে); তা ছাড়া স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের জন্য কিছু খাতা দেখেছিলাম এবং সাহিত্যের ব্যাপারে একেবারেই সংবেদনশূন্য একটি ছাত্রীকে কয়েকটি টিউটোরিয়ালও দিয়েছিলাম। বসন্তসমাগমে পুষ্পোদ্‌গম দেখে কবিদের চিত্ত যে পুলকিত হয়ে ওঠে এই সাধারণ তথ্যটাও মেয়েটির জানা ছিলো না, এবং বেশ

মনে আছে তাকে বাগানে নিয়ে গিয়ে ফুলটুল দেখিয়ে ব্যাপারটা বোঝানোর একটা চেষ্টা করেছিলাম।

বাঙালী যুবকটির সঙ্গে কথাবার্তার এই অভিজ্ঞতাটির বিপরীত কোণে অবস্থিত স্বল্পকাল পরবর্তী আরেকটি অভিজ্ঞতা। তখন আমি জাতে উঠেছি: দু'টি বাচ্চা মানুষ করছি, একই সঙ্গে অক্সফোর্ডে একটি বৃহদায়তন স্নাতকোত্তর গবেষণাও আরম্ভ করেছি। (আমার বিয়ের পরে আমার জননী এবং শ্বশ্রূঠাকুরাণী দু'জনে দুই ভিন্ন দেশের, দু'টি ভিন্ন সমাজের মহিলা হওয়া সত্ত্বেও দিয়েছিলেন একই সদুপদেশ: পতিদেবতার স্নাতকোত্তর গবেষণার কালে সন্তান উৎপাদন ক'রে আমি যেন তার সাধনার বিঘ্ন না করি। সুবোধ বালিকার ন্যায় সে-উপদেশ আমি গ্রহণ করেছিলাম ব'লে শেষ পর্যন্ত কোলে-কাঁখে দুটি বাচ্চা নিয়ে নাকানি-চোবানি খেতে খেতে স্নাতকোত্তর গবেষণা করতে হয়েছিলো আমাকেই।) ঐ অবস্থায় আমার অক্সফোর্ডের কলেজের একটি সান্ধ্য ভোজে আমার আসন নির্দিষ্ট হয় ইংরেজী সাহিত্যের জাঁদরেল অধ্যাপিকা ডেইম্ হেলেন গার্ডনারের পাশে। তিনি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন না এবং আমার অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেনও না। যখন কথাক্রমে কিছুটা অবগত হলেন তখন বেশ বকুনি দিয়েই যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই: 'তোমরা আজকালকার মেয়েরা দুটো আলাদা দুনিয়ার সুযোগসুবিধাগুলো পেতে চাও, এ তোমাদের বড় দুঃসাহস। আমাদের সময়ে এত আদেখলেপনার অবকাশ ছিলো না। হয় বিবাহ ও সংসারধর্ম, নয় বহির্জগতের কর্মজীবন: এ দুটোর মধ্যে একটাকে আমাদের বেছে নিতে হতো। ও দুটো একসঙ্গে হয় না। যে-কোনো একটাকে বেছে নিতে হয়।' সারা জীবন অবিবাহিতা থেকে হেলেন গার্ডনার অবলম্বন করেছিলেন দ্বিতীয় বিকল্পটিকেই, এবং তাঁর কর্মজীবনে এমনই দীপ্তির পরিচয় দিয়েছিলেন যে অবশেষে উপনীত হয়েছিলেন সরকার-প্রদত্ত 'ডেইম্' খেতাবটিতে।

পরে ঐ কলেজের তৎকালীন আরেক রত্নবিশেষ,—ইতিহাস বিভাগের রিসার্চ ফেলো, আমার চাইতে বয়সে খানিকটা বড়, তিন সন্তানের জননী, যিনি কিনা সংসারধর্ম এবং কেরিয়র দুই নৌকাতে পা রেখেই স্রোত অতিক্রম করছিলেন,—এ বিষয়ে আমাকে যা বলেছিলেন তার সারাংশ এইরকম: 'আসলে এই দুরূহ সমন্বয় যে কোনো নারীর একেবারে অসাধ্য তা নয়, কিন্তু এ কাজে সফল হতে হলে আরও কাণ্ডজ্ঞান থাকা চাই। আপনি বিয়ে করেছেন আপনার এক

সমবয়সীকে, যিনি নিজে এখনও তাঁর কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত নন। আমি বিয়ে করেছি আমার চাইতে দশ বছরের বড় চাকুরিজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন অধ্যাপককে। ফলে কতগুলো সুবিধা পাই। যেমন বিবিধ গার্হস্থ্য গ্যাজেট, বাচ্চা ধরার জন্যে একজন সহায়িকা। আপনার উচিত ছিলো অর্থের বনিয়াদে সুদৃঢ় বয়োজ্যেষ্ঠ একজন পুরুষমানুষকে পাকড়াও করা।' শুনে কিছুটা ঘাবড়ে গেছিলাম,—গোড়াতেই গলদ হয়ে গেছে?—কিন্তু যা-ই হোক, বেচারা সমবয়স্ক জীবনসঙ্গীকে তালাক দিইনি। স্বীকার করতে আপত্তি নেই, সে-বেচারা আমার জন্যে জীবনে অনেক স্বার্থত্যাগ করেছে।

এই যে পুস্তকসমালোচনার নাম ক'রে কেবল ব্যক্তিগত কথা ব'লে যাচ্ছি, তার কারণ বর্তমান প্রসঙ্গে কথাগুলোর একটিও অবান্তর নয়। উপরে যে-বইটির নাম দিয়েছি সেটি মেয়েদের জীবনের এই জাতীয় এবং সম্পৃক্ত নানান সমস্যা নিয়ে লেখা একটি সুচিন্তিত দার্শনিক বই। ফেমিনিজমের বিভিন্ন ইস্যুগুলি আজকের দিনে আমাদের প্রত্যেকের জীবনকেই কম-বেশি স্পর্শ করে, এবং আরও অনেক কথাই আমাদের স্পষ্ট ক'রে আলোচনা করা উচিত। লক্ষণীয়, উপরে উল্লিখিত অক্সফোর্ডের দুই মহিলাই (ডেইম হেলেন এবং ম্যারিলিন বাটলার) প্রধানত তাঁদের নিজেদের কেরিয়রের মতো অ্যাকাডেমিক কর্মজীবনের কথাই ভাবছিলেন। শ্রমজীবী শ্রেণীর মেয়েরা কিন্তু বরাবরই ঘরে-বাইরে খেটেছে, তাদের জন্যে মধ্যবিত্তদের তেমন কোনো মাথা-ব্যথা হয়নি। এবং এই সুযোগে বলি, আমি অনেকবারই ভেবেছি, আমি যে ঠিক কীভাবে স্নাতকোত্তর গবেষণা করেছিলাম তার খুঁটিনাটি দিয়েই একটি স্বতন্ত্র বই লেখা যায়। সে-সময়ে আমি আমার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়ে এমনই ব্যস্ত থাকতাম যে কোনো-কোনো দিন রাত্রে শুতে যাবার আগে খেয়াল করতাম, সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রিবাসের উপরে ড্রেসিং-গাউন জড়িয়ে নিয়ে যে-অবস্থায় দিনের কাজ আরম্ভ করেছি দিনশেষেও সেই অবস্থাতেই আছি, সারা দিনেও বেশ বদলে শাড়ি প'রে নেবার সময় হয়নি। সত্যি বলতে কি, সে-সময়ে আমার সমস্ত দায়িত্বের মধ্যে গবেষণার কাজটাই ছিলো সব থেকে সহজ, কেননা যার রিসার্চে মন আছে তার কাছে রিসার্চ তো স্রেফ আনন্দ, প্রেমের শ্রম, অপরপক্ষে সন্তানপালন ও গৃহস্থালির খুঁটিনাটি আরও বিবিধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ গুণাবলী দাবি করে: তাতে কেবল কায়িক পরিশ্রম লাগে না, লাগে অনেক মানসিক গুণ, স্থৈর্য এবং ধৈর্য থেকে নিমেষের মধ্যে জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে পারার মতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, জীবননৈপুণ্য, সামগ্রিক 'ম্যানেজমেন্ট'।

নারীমুক্তির সপক্ষে নানান ধারণাই আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কম-বেশি চালু হয়েছে,—সম্প্রতি এই প্রবণতার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশে, বিশেষত মোল্লাতান্ত্রিক ইরানে,—কিন্তু সর্বত্রই এইসব ভাবনা-চিন্তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও ভুলভ্রান্তিও প্রচুর।

একটি সুপ্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা এই যে সাম্য মানে জ্যামিতিক সাম্য : পুরুষ যেমন, নারীকেও অবিকল তেমনি হতে হবে। যেন তারা সম্পূর্ণরূপে সমানধর্মা দু'টি ত্রিভুজ। নারী যেখানে পুরুষের থেকে আলাদা, সেই এলাকাটাকে একেবারে ভাঁজ ক'রে মুড়ে গোপন ক'রে ফেলতে হবে। কোনো মেয়ে যদি প্রসবের পরের দিন সকালেই ক্ষেতে হাজিরা দিয়ে ট্র্যাক্টর চালাতে পারেন তবেই তিনি আধুনিকা।

এই ধারণার জের টেনে কারও কারও চোখে ঘরের বাইরে চাকরি করা এবং তার জন্যে মাইনে পাওয়াটাই হচ্ছে মুক্তির লক্ষণ। মেয়েদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ন'টা-পাঁচটার চাকরি করতে হবে, নয়তো তারা মুক্ত নারী হতে পারবে না। চাকুরিজীবী মানসতার সঙ্গে অর্থনীতিশাসিত বিভিন্ন শৈলীর মার্কস্‌বাদী জীবন-ভাষ্যের মিলিত বিচিত্র ককটেলের প্রভাবে 'আধুনিক' বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের চোখে নারীমুক্তির প্রধান তাৎপর্য এইখানেই : চাকরি করায় এবং মাইনে পাওয়ায়। যে-মেয়ে চাকরি করে না এবং মাইনে পায় না তার জীবন অন্য নানা-দিকে কর্মব্যস্ত, সমৃদ্ধ, পূর্ণ, সার্থক হলেও এই নব্য দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সে ফেল্‌ ফেল্‌ ফেল্‌।

এই প্রতিন্যাসের আরেকটি রকমফেরে মা হওয়াই এখনও নারীজীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা বটে, কিন্তু তার একটি আধুনিক রূপ আছে। যেমন ধরা যাক, কোনো বাঙালী মেয়ে বাচ্চা নিয়ে বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না হয়েছে। সে যদি ঘরের বাইরে রোজগার ক'রে এবং ঘরের ভিতরে ঝি-চাকর রেখে তার বাচ্চাদের ভরণপোষণ করতে পারে, তা হলে আজকের দিনে তার কপালে বিস্তর প্রশংসা অবশ্যই জুটবে,—'এমন লক্ষ্মী মেয়ে বড় চোখে পড়ে না'—কিন্তু যেই সে বলবে, 'এবারে আরেকটা বিয়ে করা যাক, কেননা কেবল বাচ্চাদের মানুষ ক'রে আর চাকরি ক'রে আমার চরিতার্থতা হচ্ছে না, আমার একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সঙ্গী লাগবে', অমনি আধুনিক মা-মাসীরা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসবেন, কেননা ১. ঐতিহ্যিক রীতিতে বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে ধ'রে এবং ২. আধুনিক রীতিতে

চাকরি ক'রে তার তো ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণভাবে মোক্ষলাভ হয়ে আছে, তার বাইরে অন্য কিছু আবার লক্ষ্মী মেয়েদের লাগে নাকি, ছিঃ?

কোনো নারী যেই অন্যদের কথামতন নৌকো না বেয়ে নিজের জীবনের কোনো ক্ষেত্রে স্বকীয় নির্বাচনকে, স্ব-তন্ত্রতাকে, আত্মবশতাকে খাটাতে যাবেন, তখনই তাঁকে নানাবিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সাঁতরাতে হবে। নারীর মুক্তি কীভাবে সম্ভব সেই বিষয়টিতেও সংকীর্ণ একদেশদর্শী গৃহীত মত এবং রক্তচক্ষু অনুশাসনের অভাব নেই।

জ্যামিতিক সাম্যের আদর্শ মেয়েদের কিছু-কিছু ক্ষতি করেছে। সন্তানপালন ও সংসারধর্মের গুরুদায়িত্বগুলি অনেকাংশে তাদের প্রাক্তন মর্যাদা হারিয়েছে। যেন প্রত্যেকটি মেয়েকে কোনো-না-কোনো প্রতিষ্ঠানে বেতনভুক্ কর্মী ক'রে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের পাশে একটি ক'রে সরকারী ক্রেশ গ'ড়ে দিলেই মেয়েদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের মেয়েরা দেখেছেন, তা হয় না। কয়েক দশক ধ'রে মেয়েদের প্রতিবাদের পর সোভিয়েত রাষ্ট্রেও এ ব্যাপারে নীতি পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে. নীড়রচনার এবং গার্হস্থ জীবনের, মাতৃত্বের এবং শৈশবের দাবিদাওয়াকে মেনে নেবার একটা চেষ্টা চলেছে। যাঁরা পুঁজিবাদী-বাণিজ্যিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ফরিয়াদী তাঁদের এটাও বুঝতে হবে যে তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের স্বার্থে নাগরিকদের প্রোডাক্শন লাইনের বলিতে পর্যবসিত করতে পারে।

তর্কের ডামাডোলে আজকাল প্রায়ই একটি কেন্দ্রিক প্রশ্ন চাপা প'ড়ে যাচ্ছে: পরবর্তী প্রজন্মকে কারা গঠন করবে? কেবল দুধভাত খাওয়ানোর কথা ভাবছি না, কিংবা কেবল বর্ণমালা শেখানোর কথাও ভাবছি না, ভাবছি মানসিক গঠনের, চরিত্রগঠনের কথা। কারা শিশুদের ভালো-মন্দের ভেদ শেখাবে, তাদের মধ্যে জিজ্ঞাসা-শুভবুদ্ধি-নীতিবোধকে জাগ্রত করবে, আধুনিক পৃথিবীর সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাদের অবহিত করবে? এ সমস্তর পুরো দায়িত্বই কি অর্পিত হবে ক্রেশ-কিণ্ডারগার্টেন-বিদ্যালয় ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে? বাপ-মায়েরাও কি অংশগ্রহণ করবে না? না করাটা কি কাম্য? যদি করে, তো করবে কখন? রোববার বিকেলে? অথচ এই দায়িত্ব কি আজকের পৃথিবীতে আগেকার দিনের চাইতে সূক্ষ্মতর, জটিলতর, ক্রমাগত আরও বেশি দাবিদার হয়ে উঠছে না? এ কাজে আমরা যে-পরিমাণে ফাঁকি দেবো সেই পরিমাণেই প্রজাতির ভবিষ্যৎকেও কি সংকটাপন্ন ক'রে তুলবো না?

এ কাজ কেবল মেয়েরাই করবে এমন কথা বলা হচ্ছে না, পুরুষদেরও যে যোগ দিতে হবে সেই ইঙ্গিতই দেওয়া হচ্ছে ; কিন্তু কর্মের একটা ক্ষেত্র, একটা মঞ্চ তো চাই। পারিবারিক নীড় নতুন ধরনের পিতাকে লালন করতে পারে, ক্রেশ-কিণ্ডারগার্টেন পারে না। তাই ফেমিনিজম কেবল মেয়েদের ইশু নয়, সকলের ইশু। এবং এর খুঁটিনাটি সকলেরই তলিয়ে দেখা উচিত, পর্যালোচনা করা উচিত। ঘড়ির কাঁটাকে প্রাক্-ফেমিনিস্ট সময়ে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

ফেমিনিজম আজকের আন্দোলন নয়। জন স্টুয়ার্ট মিল পৃথিবীর একজন উল্লেখযোগ্য ফেমিনিস্ট। এই চিন্তাধারা বর্তমান সময়ে কোন্ উপত্যকায় পৌঁছেছে, এই পৌঁছনোর তাৎপর্য কী, এখান থেকে পৃথিবীটাকে কেমন দেখাচ্ছে, এখন থেকে তাকে কী ধরনের জমি অতিক্রম করতে হবে, কী-কী সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে : এইসব বিষয়ে ভারসাম্যযুক্ত আলোচনা যাঁরা পড়তে চান তাঁদের মেরি মিজলি ও জুডিথ হিউজের বইটি প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। এটি আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে লেখা একটি স্মিত, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল, বিশ্লেষণধর্মী বই। এটি পড়লে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন তাঁরা যাঁরা উনিশ আর বিশ শতকের ফেমিনিস্ট চিন্তার বিভিন্ন শাখা-উপশাখাগুলিকে কিছুটা অনুধাবন করেছেন, তার এ-যাবৎ বিবর্তনের সঙ্গে কিয়দংশে পরিচিত। ফেমিনিস্ট চিন্তায় মার্ক্স্‌বাদী বিশ্লেষণপদ্ধতি কতটা সার্থক হয়েছে, মার্ক্স্‌বাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের চেহারা এখন থেকে কেমন হবে, সত্তরের দশকের ফেমিনিস্ট আন্দোলনের উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গগুলির পর এই মুহূর্তে কী জাতের মূল্যায়ন ও বোঝাপড়ার প্রয়োজন, শ্রীমতী শুলামিথ ফায়ারস্টোনের (Shulamith Firestone, *The Dialectic of Sex*, 1970) প্রবলভাবে মৌলিক প্রস্তাবসমূহের উত্তরাধিকারে আমরা শেষ পর্যন্ত কী পেলাম, ফেমিনিস্ট চিন্তায় চরমপন্থার কোনো অর্থ বা ভূমিকা থাকতে পারে কিনা : এই ধরনের নানান প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এখানে পাওয়া যাবে। যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে এখানে মিলিত হয়েছে মাত্রাজ্ঞান এবং একটি বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারার ক্ষমতা ; নেই কোনো আতিশয্য, কচকচানি বা অহেতুকভাবে পারিভাষিক শব্দাবলীর আমদানি। আমার ব্যক্তিগত রুচির পক্ষে বইটির রচনা-শৈলী একটু বেশি সাদামাঠা, সমতল ; স্টাইলটা আরও উচ্চাবচ, আলোছায়াভরা হলে আমি আরও উপভোগ করতাম। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে একটা সাহিত্য-সমালোচনা-ঘেঁষা কথা হলো ; আলোচ্য প্রসঙ্গে এ অভিযোগ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

লেখিকাদ্বয় চেষ্টা করেছেন নির্বাচনের বিভিন্ন মিথ্যা দ্বান্দ্বিকতা থেকে নারীর এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের জীবনকেও উদ্ধার করতে। যে-দ্বান্দ্বিকতাগুলির মুখোমুখি আমাদের বারে বারেই দাঁড় করানো হয় সেগুলি আবশ্যিক নয়, তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব। আপাতবিচ্ছিন্নদের নৈকট্যসাধনই, আপাতবিপরীত-দের সমন্বয়সাধনই মনুষ্যধর্ম, উভয় লিঙ্গের পক্ষে। সে-সাধনায় উভয় লিঙ্গই যাতে উত্তীর্ণ হতে পারে তার জন্যে উপযুক্ত নির্ভরস্বরূপ সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা যায়, নারী আর পুরুষ মিলিতভাবে চেষ্টা করে যদি।

তার জন্যে সর্বাগ্রে মুক্ত করতে হবে বুদ্ধিকে। বর্জন করতে হবে যোদ্ধসুলভ সেই চিন্তাভঙ্গিকে, যা জীবনের যাবতীয় জটিলতাকে সরলীকৃত ক'রে নিয়ে প্রথমেই নির্দিষ্ট করে একটি শত্রুকে, তার পর তাকে বিনাশ করতে ঝাঁটার মতন এগিয়ে যায়, বিনা দ্বিধায়, 'ফরাসী-বিপ্লবী কায়দায়'। জীবনের সূক্ষ্ম সমস্যাগুলির সমাধান ওভাবে হয় না। তার জন্যে লাগে আরও সংবেদন, আরও বহুমাত্রিক প্রতিন্যাস, সূক্ষ্মতর পরিকল্পনা এবং তার সযত্ন বাস্তবায়ন।

জ্যামিতিক সাম্যের আদর্শের সীমাবদ্ধতাগুলি ধরিয়ে দিয়ে এঁরা দু'জনে বলেন : দুই লিঙ্গের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু পার্থক্য মানে এ নয় যে একটি অপরটির থেকে নিকৃষ্ট। যেগুলি তথাকথিত 'মেয়েদের কাজ' সেগুলি কোনো বিচারেই তথাকথিত পুরুষদের কাজের থেকে গুরুত্বে হীন নয়। আজকের মেয়েরা কী-কী কাজ করবে, কীভাবে করবে, কীভাবে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে, এ-সমস্তর মীমাংসা করতে হবে মেয়েদের জীবনেরই প্রয়োজন অনুসারে ('adaptation of women's work and pay to a woman-shaped life'), এবং সেই নীতি হবে লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব মানুষের শ্রমকে এবং তার মূল্যায়নকে আরও মনুষ্যোচিত ক'রে তোলার বৃহত্তর প্রচেষ্টারই অন্তর্গত ('part of a wider attempt to adapt everybody's work and pay to a human-shaped life'), কেননা কর্মজীবনের যে-মডেলটা পুরুষরা এ-যাবৎ গ'ড়ে তুলেছেন সেটা কোনো নিখুঁত মডেল নয় (the existing and supposedly man-shaped career suits many men as well as women very badly')। (এই শেষ উদ্ধৃতিটি থেকে লেখিকাদের নিচু গলায় কথা বলার স্টাইলটা আশা করি খানিকটা বোঝা যাচ্ছে।) সংক্ষেপে :

> ...once we stop being obsessed with the idea of treating men and women exactly alike, the immediate aim for women

will be to make it possible for them to pass in and out of the child-bearing phase of life without either penalizing children or grotesquely interrupting and distorting women's useful careers.

এখানে উল্লেখ করি যে প্রজনন-প্রক্রিয়ার উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা আজকাল এত দ্রুতগতিতে বাড়ছে যে সাধারণ মানুষ কেন, দার্শনিকরাও তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন না। মিজলি এবং হিউজের এই বইটি বার হবার পরে গত কয়েক মাসের মধ্যে বেশ কিছু বৈপ্লবিক খবরই বেরিয়েছে। কাচপাত্রে সফল গর্ভাধানের এবং সেভাবে আহিত প্রাণের নিরাপদ মানবজন্মের খবর এখন আর নতুন নয়, কিন্তু কিছু দিন আগেই পড়লাম এই প্রক্রিয়ার আরেক ধাপ অগ্রগতির কথা। কাচপাত্রে আরব্ধজীবন ভ্রূণকে হিমপেটিকায় রাখা হয়েছে, তার পর তাকে বার ক'রে তার হিমত্ব ঘুচিয়ে তাকে মাতৃজরায়ুতে ঢোকানো হয়েছে, এবং সেই শিশু সুস্থদেহে জন্মলাভ করেছে। হিমসংরক্ষিত ভ্রূণকে ডিম্বদাত্রী মাতার জরায়ুতে না ঢুকিয়ে অন্য নারীর জরায়ুতেও ঢোকানো যায়। মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে একজন মেয়ে অপর কোনো মেয়ের ডিম্বজাত ভ্রূণকে নিজের গর্ভে ধারণ করতে পারে এবং যথাসময়ে সেই শিশুকে প্রসব করতে পারে। তেমন শিশুর দু'জন মা থাকবে : ডিম্বদাত্রী 'জৈব' জনয়িত্রী এবং গর্ভধারিণী প্রসূতি। বহু ভ্রূণ এখনই ত্রিশঙ্কুতুল্য অবস্থায় হিমপেটিকায় সুপ্তিমগ্ন, এবং বিদ্যুতের সরবরাহে ঘাটতি না ঘটলে অনির্দিষ্টকাল ওভাবে থাকতে পারে। হয়তো আজকের ভ্রূণ জন্ম নেবে ভবিষ্যতের কোনো নারীর গর্ভে, যে-নারী এখনও অজাতা। অর্থাৎ কিনা কোনো নারীর পক্ষে তাঁর পিসীমাকে গর্ভে ধরা অসম্ভব হবে না! এইসব সম্ভাবনার তাৎপর্য ও পরিণাম নিশ্চয়ই যুগান্তকারী। এদিকে কাচপাত্রে আহিত প্রাণকে জরায়ুর বদলে কৃত্রিম কোনো আশ্রয়ে, টিশুর নীড়ে কত দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়, বর্ধিত করা যায়, তা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এইসব গবেষণার নৈতিকতা নিয়ে সমাজপতিদের মাথাব্যথাও বাড়ছে। কিন্তু গবেষণা পিছিয়ে নেই।

সত্তরের দশকের গোড়ায় আমরা প্রথম যখন শুলামিথ ফায়ারস্টোনের ভবিষ্যৎ-কল্পনায় পড়েছিলাম যে ভবিষ্যতের শিশুরা নারীদেহের বাইরে জরায়ুর বিকল্প আশ্রয়ে লালিত হয়ে আমাদের অধুনা-পরিচিত জীবনের ছককে একেবারে পালটে দেবে, তখন সে-চিন্তাকে ইউটোপীয়ই মনে হয়েছিলো অধিকাংশ পাঠকের ; কিন্তু

বস্তুত এখন অস্বীকার করা যায় না যে যদিও সেই ইউটোপিয়া এখনও পুরোপুরি এসে পৌঁছয়নি, তবু তার পদধ্বনি ক্রমশ এগিয়েই আসছে, পিছু হ'টে যাচ্ছে না। যা আজকে অচিন্তনীয় তা-ই ভবিষ্যতে হয়ে দাঁড়াতে পারে অত্যন্ত মামুলি ঘটনা। আজকের গরম-গরম ইশুগুলি তত দিনে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন মানুষের সামনে হাজির হবে কত নতুন নতুন 'চয়েস্', কত নতুন 'ডিলেমা'।

পরিশেষে উল্লেখ করি যে শ্রীমতী মেরি মিজলি-র *Beast and Man, The Roots of Human Nature* (Methuen প্রকাশভবন থেকে পেপারব্যাক হিসেবে পাওয়া যায়) একটি নাম-করা বই, যেখানে মনুষ্যচরিত্র বুঝতে আধুনিক জীববিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা কীভাবে সাহায্য করে তা বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যালোচিত হয়েছে। আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সেটি একটি অবশ্যপাঠ্য বই।

অপেরার গান্ধী

কখনো কখনো টেলিভিশনের পর্দায় দূর দূর দেশের এমন সব আশ্চর্য শিল্পসৃষ্টির সাক্ষাৎ মেলে, টেলিভিশনের মধ্যস্থতা ছাড়া যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটবার সম্ভাবনা ছিলো কম, এবং যাদেরকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে প্রচারকদের উদ্দেশে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করে। মনে পড়ছে দু' বছর আগে এক হেমন্ত রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অন্য কাজ ফেলে রেখে হীটার জ্বালিয়ে পা গুটিয়ে ব'সে এমন একটি ইতালীয় ছায়াছবি দেখেছিলাম, যার সূক্ষ্ম কাজের অনুরণন আজও অনুভব করি। সেটি ছিলো ইতালীর লম্বার্দি অঞ্চলে কৃষকজীবন-অবলম্বনে এর্মান্নো অল্‌মি নামক পরিচালকের তৈরি একটি ছবি, বাংলায় যার নাম দাঁড়াবে 'কাঠের জুতোর গাছ', যেটিকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে একটি ইতালীয় 'পথের পাঁচালী'। (সেই ইতালীয় পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ছবিটি থেকে কোনো অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন কি না তা জানা নেই আমার। হয়তো অনুসন্ধান করলে বেরোবে।) তেমনি বছরখানেক আগে হেমন্তের এক রোববারের বিকেলে—এ দেশে হেমন্ত হচ্ছে উচ্চমার্গীয় শিল্প পরিবেশনের ঋতু—বাইরের প্রদোষকে পর্দা দিয়ে সরিয়ে রেখে ব্রাজিলের একটি তেজস্বী শিল্পকর্ম দেখেছিলাম। 'মর্তে ই ভিদা সেভেরিনা' একজন সমকালীন ব্রাজিলীয় কবির রচিত একটি অসাধারণ রূপকনাট্য; টেলিভিশন-সংস্করণে যেমন মনে রাখবার মতো ছিলো তার দৃশ্য রূপ, তেমনি মর্মস্পর্শী ছিলো তার সংগীতাংশ।

তাই সাম্প্রতিক হেমন্তের এক সন্ধ্যায় যখন টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসূচিতে লক্ষ করলাম যে রাত ন'টা থেকে এখানকার 'চতুর্থ চ্যানেল'-এ প্রচারিত হবে একটি দীর্ঘ অপেরা, যার উপজীব্য গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম, তখন ঠিক করলাম, অবশ্যই দেখতে হবে ব্যাপারটা কী। বিজ্ঞপ্তি প'ড়ে আন্দাজ করেছিলাম যে একটা উল্লেখযোগ্য শৈল্পিক অভিজ্ঞতা ঘটতে পারে। মিথ্যে আঁচ করিনি। মাঝরাতেরও পরে সেটটি যখন সুইচ অফ্ করলাম, পারলে তখনই একটি আলোচনা লিখতে বসি। অবশেষে সেদিন বিকেলেই কলকাতাস্থ এক বন্ধুকে যে-বৃহৎ চিঠি লিখেছিলাম তারই পুনশ্চ হিসেবে আমার তাৎক্ষণিক শিল্পরসপ্লাবিত মানসিক অবস্থার একটি প্রতিবেদন ত্বরিত কলমে সংযোজন ক'রে ফেলেছিলাম।

আমি সংগীতসমালোচক নই; একটি অপেরার পেশাদার সমালোচনা লেখার যোগ্যতা আমার নেই। গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের সমসাময়িক একজন শিল্পী একটি অসামান্য অপেরা রচনা করেছেন, এই খবরটি বাঙালীদের কাছে পৌঁছে দেবার তাগিদেই এই লেখার জন্ম। অ্যাটেনবরোর গান্ধীবিষয়ক ছায়াছবিটি মুক্তি লাভ করার আগেই এই অপেরাটি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিদগ্ধ মহলে উচ্চপ্রশংসা অর্জন করে।

সংগীতরচয়িতা ফিলিপ গ্লাস্ জন্মসূত্রে মর্কিন ইহুদী; নিউ ইয়র্কে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবনে অনেক সংগ্রাম ক'রে তিনি 'উপরে উঠেছেন'। রুটি রোজগারের জন্য তাঁকে এককালে ছুতোর, প্লামবার, 'ফার্নিচার রিমুভার' এবং ট্যাক্সিচালকের কাজ করতে হয়েছে। সৌভাগ্যবশত এখন তিনি সংগীত দ্বারাই জীবিকানির্বাহ করতে পারেন।

'সত্যাগ্রহ' তাঁর একটি অপেরা-ট্রিলজির অন্তর্গত দ্বিতীয় অপেরা। প্রথম অপেরাটির বিষয়বস্তু আইনস্টাইন। তৃতীয়টির বিষয়বস্তু প্রাচীন মিশরের রাজা আখনাতন, যিনি তাঁর রাজ্যে একেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত করার চেষ্টা করেছিলেন। টেলিভিশনে 'সত্যাগ্রহ'-এর যে-প্রযোজনাটি দেখলাম সেটি বিশেষভাবে টেলিভিশনের জন্যেই অনুষ্ঠিত হয় স্টুটগার্ট শহরের রাষ্ট্রীয় থিয়েটারে, গীত ও অভিনীত হয় জার্মান গায়কগায়িকাদের দ্বারা। পরিচালনা, দৃশ্য, পোশাক ইত্যাদির দায়িত্ব যিনি বহন করেছেন তাঁর নাম আকিম ফ্রায়ার।

অপেরাটির যে-গুণ আমাকে অভিভূত করেছে সেটি হলো এর মধ্যে ধ্বনি ও দৃশ্যের এক মহান সমন্বয়। কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত এবং থিয়েটার: তিনটি উপাদানের সমবায়ে গঠিত এটি একটি মহাকাব্যিক, এপিক নাট্য, যার ন্যায্য তুলনা গ্রীক ট্র্যাজেডি কিংবা হ্বাগ্‌নারের 'নীবেলুং-দের আংটি' নামক টিউটনিক-পুরাণাশ্রয়ী বিখ্যাত অপেরাচক্র। স্রষ্টার প্রতিভা এবং তাঁর সহযোগী পরিচালকের সাহসী কল্পনা অপেরাটিকে উত্থিত করেছে এক নাক্ষত্রিক, মহাজাগতিক মাত্রায়। ঐতিহ্যিক অপেরার সঙ্গে এর সংগীতের ধ্বনিসাদৃশ্য ততটা নেই যতটা আছে গীর্জা-ভিত্তিক কোরাল সংগীত, বিশেষত 'মাস্' অনুষ্ঠানের সংগীতের সঙ্গে। রচয়িতা পাশ্চাত্য সংগীতের আধুনিকতম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কয়েকটি বিশেষ ধারার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। গতিবেগ ও হার্মনিক্সের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুনরাবৃত্তির ব্যবহার তাঁর আঙ্গিকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই আঙ্গিক তাঁর সংগীতকে দেয় সম্মোহক মন্ত্রশক্তি ও ধ্যানগম্ভীরতা।

অপেরাটির টেলিভিশন-পরিবেশনের একটি বাড়তি আকর্ষণ ছিলো বিভিন্ন অঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে গ্লাস্-কর্তৃক প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকার। একজন শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে কী-কী করতে চেয়েছেন, কী তাঁর উদ্দেশ্য, কী তাঁর কর্মপদ্ধতি : এ ধরনের খবর জানতে ব্যক্তিগতভাবে আমার খুবই ভালো লাগে। আমার ধারণা, এ জাতের জবানবন্দি পরীক্ষামূলক, নতুন আঙ্গিকের শিল্পকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে। তাই বিশেষত আধুনিক শিল্পের জগতে এর একটা মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা আছে। কয়েকটা অন্ধকার কোণ-কানাচে টর্চের আলো পড়ে, শিল্পীর সৃষ্টিশীল অবসেশনগুলির একটা দিশা পাওয়া যায়, কয়েকটা জটিলতার জট ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। 'সত্যাগ্রহ' যেহেতু কোনো সরল নাটক নয়, বরং বহুস্তরান্বিত তার তাৎপর্য, তাই শিল্পীর বক্তব্য শুনে শ্রোতা এবং দর্শক হিসেবে আমি উপকৃত বোধ করেছি।

ফিলিপ গ্লাস্ তাঁর অপেরার জন্যে পছন্দ করেন 'সংগীতের থিয়েটার' নামটি। থিয়েটার তাঁর কাছে একটা প্রচণ্ডরকমের জীবন্ত ব্যাপার। কোনো নিটোল নাটক, যা আগেই কেউ লিখেছে, তাকে অপেরার রূপ দেবার আইডিয়া তাঁকে উত্তেজিত করতে পারে না। নাটকটিকে তাঁর তত্ত্বাবধানে 'হয়ে উঠতে' হবে। তাই তিনি কোনো পূর্বনির্দিষ্ট নাট্যে বা কাব্যে স্বরারোপ করেন না। অপেরায় যাকে বলা হয় 'লিব্রেটো' সেই গেয় শব্দরাজীকে তিনি আবিষ্কার করেন, সনাক্ত করেন সহকর্মীদের সঙ্গে পর্যালোচনা ক'রে, অনুসন্ধান চালিয়ে।

সংগীতের থিয়েটারে তাঁর প্রথম বৃহদায়তন কাজ 'সৈকতে আইনস্টাইন'। অপেরা লিখবেন এমন ভেবে কাজ শুরু করেননি। কিন্তু সমস্ত জিনিসটাকে এমন একটা আয়তনে কল্পনা করেছিলেন, যার জন্যে দরকার ছিলো অনেকখানি জায়গার : অভিনয়ের জন্যে জায়গা, গাইয়েদের জন্যে জায়গা, বাজিয়েদের জন্যে জায়গা। একমাত্র অপেরা-হাউস ছাড়া আর কোথাও তার মঞ্চায়ন সম্ভব নয়।

ট্রিলজি নির্মাণ করবেন এমন পরিকল্পনাও গোড়ায় তাঁর মাথায় ছিলো না। সেটি রূপ নেয় 'সত্যাগ্রহ' রচনা করারই সময়ে। তিনটি অপেরা তিনটি প্রতিকৃতি : তিনজন মানুষের। নায়করাই এই তিন নাট্যের প্রাণস্বরূপ। গ্লাস্ বলেন যে তাঁর কল্পনা বিষয়াশ্রয়ী : মনের মতো বিষয় পেলে তবেই তিনি তাকে নিয়ে সংগীত সৃষ্টি করতে পারেন। এমন তিনটি মানুষকে তিনি বেছে নিয়েছেন যাঁরা প্রত্যেকেই যে-যার দুনিয়াকে বদলে দিয়েছিলেন, উলট-পালট ক'রে দিয়েছিলেন,—অস্ত্র কোনো উপায়ে নয়, সম্পূর্ণত একটা আইডিয়ার জোরে, একটা অন্তঃস্থ স্বপ্নোপম প্রত্যক্ষের তাগিদে। 'সৈকতে আইনস্টাইন' বিজ্ঞানকে নিয়ে, 'সত্যাগ্রহ'-এর

উপজীব্য রাজ নীতি, 'আখনাতন'-এর অবলম্বন ধর্ম। আবার প্রত্যেকটি রচনাতেই ভাবের মিশ্রণও বর্তমান যেহেতু গান্ধীর ক্রিয়াকলাপে ছিলো ধর্মীয় মাত্রা, আখনাতনের কাজে রাজনৈতিক মাত্রা, এবং আইনস্টাইনের কাজে কবিত্বের মাত্রা। গ্লাস্ আশা রাখেন যে অদুর ভবিষ্যতে পর-পর তিন রাত্রে সমগ্র ট্রিলজির মঞ্চায়ন সম্ভব হবে। বলা বাহুল্য, তার জন্যে গায়কবাদকদের তিনটি আলাদা দল লাগবে।

ফিলিপ গ্লাস্ গান্ধী সম্পর্কে তথ্য আহরণ করেছেন ভারতভ্রমণ, অধ্যয়ন এবং অভিনিবিষ্ট গবেষণার মাধ্যমে। গবেষণার সূত্রে বহু ফুট ডকুমেণ্টরি ছবি তিনি দেখেছেন। বিশেষত গান্ধীর লবণ-অভিযান সম্পর্কে তথ্যচিত্রটি তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কাটে।···হাজার হাজার লোক ছোটখাট মানুষটির পিছনে হেঁটে সমুদ্রের দিকে চলেছে···একটি মহৎ মুহূর্ত···।' মূলত গ্লাস্ এমন এক গোত্রের অপেরা সৃষ্টি করতে আগ্রহী, বিষয়মাহাত্ম্য যার পক্ষে জরুরী। তাকে তিন-চার ঘণ্টা ধ'রে মঞ্চ জুড়ে থাকতে হবে, শ্রোতা-দর্শকদের তন্ময় ক'রে রাখতে হবে। বিষয়বস্তু যদি নিজের জোরে বড় হয়, তাঁর পক্ষে সেটা অনুকূল পরিস্থিতি। সে-ক্ষেত্রে বিষয়কে সুরারোপের সাহায্যে টেনে-ফাঁপিয়ে বড় করার দরকার হয় না, সংগীত অবাধে স্রষ্টার ঈপ্সিত উচ্চতা লাভ করতে পারে, নিজস্ব আকাশে উড্ডীন হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় সংগীত, মন্ত্রপাঠ, দক্ষিণ ভারতের নাট্যশিল্প ইত্যাদিতে গ্লাস্ আগ্রহী, এবং এদের অভিজ্ঞতা তাঁর নিজের শিল্পকলাকে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করেছে।

গবেষণা করতে করতে ক্রমশ তিনি তাঁর দৃষ্টিকে ফোকাস করেন গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার বছরগুলির দিকে, যে-বছরগুলিতে গান্ধী গ'ড়ে তোলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনকে। এই সময়টা হচ্ছে সেই সময়, যখন গান্ধী গ'ড়ে তোলেন নিজেকেই, যে-গান্ধীকে আমরা জানি, গান্ধী বলতে আমরা যে-মানুষটাকে বুঝি, গান্ধী নামটি যে-ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞান। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি যখন কাজ করতে গেলেন, তখন তিনি একজন তরুণ ব্যারিস্টার, টপ্ হ্যাট এবং ডুরে স্যুট-পরা কেতাদুরস্ত ছোকরা।

> সেই যে-দৃশ্যটা, যেটা এখন ফিল্মটার কল্যাণে বিখ্যাত হয়ে গেছে, সেই যখন তাঁকে ট্রেনটা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হলো, সেই মুহূর্তটা তাঁর জীবনে একটা এপিফ্যানির বা দেবাবির্ভাবের মতো, যখন তিনি সহসা দেখতে পেলেন তাঁর জীবনের কাজকে, স্পষ্টভাবে, যে-মুহূর্ত থেকে তিনি কাজ শুরু করলেন। প্রসঙ্গত বলি, প্রথমদিকে আমিও চেয়েছিলাম আমার

> অপেরাটাকে ট্রেনের দৃশ্য দিয়েই আরম্ভ করতে। ফিল্মটা বেরোনোর আগেই আমার অপেরা করা হয়ে গেছে। আমি তো জানতামও না অ্যাটেনবরো কী করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-আইডিয়াটা থেকে আমি স'রে আসি। তার আসল কারণ 'সৈকতে আইনস্টাইন'ও আমি ট্রেনের দৃশ্য দিয়ে আরম্ভ করেছি। আমি ভাবলাম, দ্বিতীয়বার ট্রেন দিয়ে আরম্ভ করা যায় না। শেষে লোকে বলবে, নাঃ, এ লোকটা ট্রেন না দেখিয়ে অপেরা আরম্ভ করতে জানে না। তাই আমি ওটা বাদ দিলাম।

শেষ পর্যন্ত গ্লাস্ শুরু করেন একটি প্রতীকধর্মী প্রস্তাবনা দিয়ে : গীতা থেকে আহৃত যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য দিয়ে, যুদ্ধসূচনার লগ্নে অর্জুনের মানসিক সংকটের কঠোর লগ্নকে তাঁর অপেরার উপরে অভিক্ষিপ্ত ক'রে।

> আপনারা যা দেখতে পাবেন তা হচ্ছে একটা মানুষের রূপান্তরের মুহূর্ত। একটা মানুষ আবিষ্কার করেছে তার জীবনের ব্রতকে। সৃষ্টি করেছে এমন এক ব্যক্তিকে যার জন্যে সে-সময়ে কোনো মডেল ছিলো না। কোনো জুড়ি ছিলো না। আমার ধারণা, আত্মবিকাশ নিয়ে মানুষ যতরকমের পরীক্ষা করেছে, তাদের মধ্যে সব থেকে কৌতূহলোদ্দীপক যেগুলি, এটি নিশ্চয়ই তাদের একটি। এবং সেটিই হয়ে উঠলো আমার অপেরার বিষয়বস্তু। গান্ধীর রূপান্তর। ...যখন তিনি ভারতে ফিরে এলেন তখন তাঁর মধ্যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাধনীগুলি পুরোপুরি তৈরি।

এবং গ্লাস্ কেবল যে তাঁর অপেরায় কৃষ্ণ, অর্জুন এবং কুরুক্ষেত্রকে টেনে এনেছেন তাই নয়, অপেরাটির সমগ্র 'লিব্রেটো' বা গেয় বস্তুই হচ্ছে গীতা থেকে নির্বাচিত শ্লোকের সংকলন, যেগুলি গাওয়া হয় সংস্কৃতভাষাতেই। অপেরাটির নির্মাণ-পদ্ধতির এইটেই হচ্ছে মৌলিক কৌশল বা জটিলতা : গান্ধীর জীবননাট্যের উপরে গীতার ভাষার অভিক্ষেপ। ফলে শ্লোকগুলি গীত হয়ে শিল্পের চক্রান্তে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে গান্ধীর জীবননাট্যের ভাষ্য হিসেবে।

অপেরাটির ভাষা হিসেবে সংস্কৃতকে নির্বাচন করতে পেরে গ্লাস্ বিশেষভাবে খুশী। বিষয়গৌরবের সঙ্গে মানানসই ঠিক এই জাতের ধ্বনিগাম্ভীর্যকেই তিনি চাইছিলেন। দক্ষিণ ভারতের গানের ভাষায় সংস্কৃতের ব্যবহার, কেরলের নাট্য-ঐতিহ্যে সংস্কৃতের ব্যবহার এ ব্যাপারে তাঁর আত্মপ্রত্যয়কে বলিষ্ঠ করেছে। তা ছাড়া সংস্কৃত অপেরাটিকে এক ধরনের সর্বজনীনতা দেয়। আমেরিকা-ইয়োরোপের

যেখানেই একে গাওয়া হোক না কেন, ভাষান্তরের প্রয়োজন হবে না। যে-কোনো দেশেই এর মঞ্চায়ন হোক, সবাইকে গাইতে হবে প্রাচীন ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃতে।

গান্ধীর জীবনের ছবির উপরে তিনি কেন গীতার কথাদের অভিক্ষিপ্ত করেছেন বোঝাতে গিয়ে গ্লাস্ বলেন গান্ধীর অন্তর্জীবনে গীতার প্রচণ্ড গুরুত্বের কথা। গীতার বাণী ছিলো গান্ধীর স্মৃতিধৃত। গোটা বইটাকে তিনি ভালো ক'রে জানতেন, বারে বারে পড়তেন। তাঁর সমগ্র চৈতন্য ছিলো গীতা-দ্বারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। গীতার মাপকাঠি দিয়ে তিনি নিজের কাজকে মাপতেন, গীতার সাহায্যে কর্তব্যের সিদ্ধান্ত নিতেন। গীতা ছিলো তাঁর পথপ্রদর্শক, প্রাত্যহিক জীবনের দিঙ্‌নির্ণায়ক। গীতাকে এমন গভীরভাবে আপন কর্মজীবনে তাঁর পূর্বে আর কে ব্যবহার করেছে, কোন্ কর্মযোগী? অতএব গ্লাসের মনে হয়েছে যে তাঁর অপেরার অ্যাক্‌শনের সঙ্গে সব থেকে ভালোভাবে খাপ খাবে গীতার টেক্স্‌ট্। আঙ্গিকগত এই সৃষ্টিশীল, অনুপ্রাণিত সিদ্ধান্ত তাঁর অপেরাকে একটি ঈর্ষণীয় শৈল্পিক মুক্তি দিয়েছে। টেকনিকটা মূলত সাংগীতিক, হার্মনির সগোত্র। তারই সম্প্রসারণ। দুটো জিনিসের সমান্তরাল বিকাশ দুটোকেই স্বাধীনসঞ্চরণ করে। মঞ্চের ভূলোকে বীর নায়ক ল'ড়ে যান, গীতার শব্দগুলি ছাড়া পায় সংগীতের দ্যুলোকে। এবং দুটো জিনিস পরস্পরের মধ্যে একটা স্পেস বা ফাঁককে রক্ষা করে ব'লেই মুহূর্তে মুহূর্তে পরস্পরকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে, পরস্পরের ভাষ্য হয়ে ওঠে, দু'জন বন্ধু যেমন, দু'জন নর্তক যেমন, ভারতীয় সংগীতের উপমা এনে বলা চলে,—সেতার আর তবলা যেমন। 'সত্যাগ্রহ' তাই কেবল গান্ধীর জীবননাট্যের প্রকটন নয়, অপ্রতিরোধ্যভাবে হয়ে ওঠে গীতার ইণ্টারপ্রিটেশনও বটে। শিল্পীর পক্ষে এটা একটা বিরাট মাপের বিজয়।

এই আঙ্গিকের সাহায্যে শিল্পী তাঁর অপেরাটিকে সিদ্ধির এমন একটা স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন যে সংস্কৃতভাষার ব্যবহার পাশ্চাত্য শ্রোতাদের মধ্যে আপত্তির কোনো ঢেউ তুলতে পারেনি। তাঁদের কান 'মাস্' সংগীতের লাতিনের মতোই এই সংগীতের সংস্কৃতকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এবং এখানে উল্লেখ করা উচিত যে 'আখনাতন'-এ গ্লাস্ ব্যবহার করেছেন তিনটি প্রাচীন ভাষা: মিশরী, ব্যাবিলনীয় এবং হিব্রু।

অপেরাটির একটি বিশিষ্ট প্রতীকব্যবহার হচ্ছে গান্ধীর জীবন সম্পর্কে 'তিনজন সাক্ষী'-র অবতারণা। প্রথম সাক্ষী যুক্ত অতীতের সঙ্গে: তলস্তয়, যাঁর কাছে

থেকে গান্ধী প্রথম জীবনে অনেক কিছু শিখেছিলেন, পরামর্শ এবং অনুপ্রাণনা পেয়েছিলেন। তলস্তয় আর গান্ধী পরস্পরকে চিঠিপত্র লিখতেন। তলস্তয়ের মৃত্যু পর্যন্ত পত্রবিনিময় করেছিলেন তাঁরা। তলস্তয়লিখিত সর্বশেষ চিঠিগুলির মধ্যেও একটি হচ্ছে গান্ধীর উদ্দেশে। গান্ধীর জীবনে দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে গ্লাস্ নির্বাচন করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। অবশ্য সময়ের দিক দিয়ে গান্ধী আর কবির মধ্যে আদান-প্রদান ঘটে প্রথমোক্তের দক্ষিণ-আফ্রিকা-জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে, ভারতে তাঁর ক্রিয়াকলাপের কালে। কিন্তু যেহেতু তাঁরা মোটের উপরে সমসাময়িক দুই ব্যক্তি, এবং সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের করা সমালোচনাই গান্ধী মন দিয়ে শুনতেন, তাই গ্লাস্ গান্ধীর জীবনে রবীন্দ্রনাথকে করেছেন 'বর্তমানের সাক্ষী'। তৃতীয় সাক্ষী গান্ধীর চিন্তাধারার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মার্টিন লুথার কিং। ইনি যুক্ত গান্ধীর ভবিষ্যতের সঙ্গে। ইনি ভাবীকালে গান্ধীর হয়ে সাক্ষ্য দেবেন, অন্যদেশে অন্যকালে গান্ধীর অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে যাবেন।

এই ব্যক্তিত্রয় সাংগীতিক নাটকে সবাক্ অংশ গ্রহণ করেন না। এঁরা মঞ্চের পিছনে পিরামিডসদৃশ স্ট্রাক্‌চারের উপরে দাঁড়িয়ে উঁচু থেকে মঞ্চের ক্রিয়াকলাপকে নীরবে পর্যবেক্ষণ করেন, প্রথম অঙ্কে তলস্তয়, দ্বিতীয় অঙ্কে রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয় অঙ্কে মার্টিন লুথার কিং: ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, ত্রিকালের প্রতিভূস্বরূপ। উপর থেকে এঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নিচের দিকে, আর দর্শকরা তাকান খানিকটা নিচ থেকে উপরের দিকে। দুই দৃষ্টি এসে মেলে রঙ্গমঞ্চে, যেখানে অ্যাক্‌শন ও সংগীত। ধর্মীয় খ্রীষ্টীয় ছবিতে দেবদূতরা যেমন অন্তরীক্ষ থেকে খেয়াল রাখেন ধরাধামের কাণ্ডকারখানার দিকে, এ-ও খানিকটা তেমনি ব্যাপার, কিংবা দুর্গাপূজার পরিচিত প্রতিমা-ব্যবস্থাপনে কৈলাস থেকে মহাদেব যেমন লক্ষ করেন পত্নীর পরাক্রান্ত কীর্তি-কলাপ। বস্তুত, অপেরার এই কল্পনাটিতে বেশ একটা 'আইকনিক', প্রতিমা-ঘেঁষা ভাব আছে। একটি দৃশ্যে গান্ধীর কাছ থেকে একটি চিঠি সুতোর সাহায্যে উপরে তলস্তয়ের কাছে যায়।

'আসলে কাহিনীটা হচ্ছে প্রাচীনতম কাহিনী: মানুষের প্রতি মানুষের অমানুষিকতা,' বলেন গ্লাস্।

> নানাভাবে বলা যায় সে-কাহিনী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে সেই একই। গান্ধী আমাদের যা দিয়ে গেছেন তা হচ্ছে ঐ অবস্থার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিকার করার জন্যে একটা সম্পূর্ণ নতুন হাতিয়ার।…বলছি না যে এই অপেরা অবস্থাকে বদলে দেবে। আমি মনে করি না যে দুনিয়াকে ওভাবে

বদলানো যায়। কিন্তু বলতে চাই, আমরা যেন মনে রাখি গান্ধী ব'লে একজন মানুষ ছিলেন, যিনি পৃথিবীতে একেবারে নতুন একটা আইডিয়া এনেছিলেন: যে পরস্পরের প্রতি বোমা না ছুঁড়েও—তা হোক না কেন 'ক্রুজ' ক্ষেপণাস্ত্র বা পেট্রল-বোমা, ব্যক্তিগতভাবে ও দু'য়ের মধ্যে আমি বড় একটা তফাত দেখি না.—বিবাদের মীমাংসা করা যায়, আরেকটা উপায় আছে। আজকের দিনে এমন কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন নেই যেখানে গান্ধীর তাৎপর্য অনুপস্থিত। মঞ্চের উপরে কী ঘটছে তা বুঝে নেবার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস অধ্যয়ন করবার দরকার নেই। আমাদের চারদিকে এখনই যা ঘটছে তা জানা থাকলেই মঞ্চে কী ঘটছে তা-ও বোঝা যাবে।

অপেরাটির সৃষ্টিশীল কোলাজে তাই একই সঙ্গে মিশে আছে ইতিহাস, পুরাণ এবং আমাদের এই আজকাল। গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনের বিভিন্ন ঔৎসুক্যজনক ঘটনাগুলিকে গ্লাস্ সরাসরি আহরণ করেছেন ডকুমেণ্টারি উৎস থেকে। ওদিকে গীতা থেকে এনেছেন কৃষ্ণ, অর্জুন এবং কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধাদেরকে। পরিচালক আকিম ফ্রায়ার মঞ্চে এনেছেন নানান আধুনিক চিত্রকল্প। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, গ্লাস্ যেখানে দেখাতে চান যে উনিশ শতকের শেষ দশকেই গান্ধীজী দুনিয়াজোড়া জনমতের এবং প্রেসের শক্তিকে বুঝতে পেরেছিলেন, সেখানে আকিম ফ্রায়ার, যাঁর থিয়েটারের বোধ নির্ভুল, মঞ্চে টেনে এনেছেন কয়েকটা টেলিভিশনের সেটকেও। 'দ্য মিডিয়ম ইজ দ্য মেসেজ', যেমন বলতেন মার্শাল ম্যাক্‌লুহান। এইভাবে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও আধুনিক, এই তিনের মধ্যে একটা সহজ, অবাধ আদান-প্রদান নাটকটির বিশালত্বকে এবং নৈতিক প্রাধিকারকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

চিত্রভাষা কীভাবে সংগীতের পরিপূরক হয়ে উঠেছে তার একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যাবে একটি দৃশ্যে, যেখানে গান্ধীকে গান গাইতে গাইতে পিছনে হেঁটে একটা মই চড়তে দেখা যায়। গানের মান বজায় রেখে একজন গায়কের পক্ষে সোজা নয় কাজটা করা! এই ধরনের দৃশ্যগত খুঁটিনাটি ফ্রায়ারের অবদান। 'যতবার ওটা দেখি', বললেন গ্লাস্, 'ততবার ভাবি, ওঃ! ঈশ্বর! বেচারা!' দৃশ্যটির তাৎপর্য হচ্ছে নিজের সঙ্গে লড়াই ক'রে নিজের উপরে নিজের জয়। গান্ধীর আত্মবিজয়ের নাটকীয় ইমেজ।

জনগণের সঙ্গে গান্ধীজীর সংযোগকে বোঝাতে গ্লাস্ ব্যবহার করেছেন

অ্যাক্শনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী, মঞ্চে আন্দোলিত বৃহৎ কোরাসকে। এই গায়কগায়িকাবৃন্দ অপেরার সূচনায় কুরুক্ষেত্রের সৈন্যদের ভূমিকায় অবতীর্ণও বটে।

> একটা বড় কোরাস ছাড়া গান্ধীর বিষয়ে অপেরা করার কথা ভাবা যায় না। তিনি জড়িত ছিলেন মানুষের সঙ্গে, মানুষদের বড় বড় দলের সঙ্গে। তা ছাড়া আর কী। তাই এই অপেরায় আছে প্রচুর সমবেতসংগীত। কোরাসের গেয় আছে অনেকটাই। এবং অপরিচিত একটা ভাষায় বহুসংখ্যক গায়ক-গায়িকার পক্ষে বৃহৎপরিমাণ গীতবস্তু কণ্ঠস্থ করা : এটাই হয়ে দাঁড়ায় মহড়ার সময়ে সব থেকে বড় ব্যবহারিক সমস্যা।

ঠিকই, কিন্তু এমনই দুর্দান্ত পাশ্চাত্য অপেরাগায়কদের ট্রেনিং যে সে-সমস্যাকেও তাঁরা শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করেন। অসাধ্যসাধন করেন। অপেরাগায়কদের এই আশ্চর্য ক্ষমতাটা আমাকে বরাবরই বিস্মিত ক'রে এসেছে। স্টুটগার্টের গায়ক-গায়িকাদের গান শুনে মনে হলো তাঁরা যেন জন্মাবধি সংস্কৃত শ্লোক গাইতে অভ্যস্ত!

টেলিভিশনের ক্ষুদ্র দ্বিমাত্রিক পর্দাতেই, যন্ত্রটির অত্যন্ত সীমিত ধ্বনিসম্পদের মাধ্যমেই (এমনকি তা 'স্টিরিও সাউণ্ড' পর্যন্ত নয়) যে-অপেরাটি আমাকে এতটা মুগ্ধ করেছে, একটা বৃহৎ অপেরা-হাউসে ব'সে তার মঞ্চায়ন প্রত্যক্ষ করতে পারলে তার দৃশ্যগত ও ধ্বনিগত অভিঘাত না জানি আরও কত বিশাল, বহুমাত্রিক হতে পারতো। সেই চিত্তগ্রাহী অভিজ্ঞতা আমার কখনো হবে কি না জানি না, তবে আশা করি ভারতের দূরদর্শন টেলিভিশনের জন্যেই বিশেষভাবে তৈরি 'সত্যাগ্রহ'-এর এই সংস্করণটিকে ভারতে আনাবার ব্যবস্থা করবেন। ভারতের স্বনামধন্য সন্তান গান্ধীর জীবন একজন বিদেশী শিল্পীর কল্পনাকে কীভাবে উন্মথিত করেছে, কীভাবে তাকে সৃষ্টির দুর্গম শিখরে আরোহণ করতে প্ররোচিত করেছে, তা চোখে-কানে জেনে না নিলে বোঝা যাবে না। অভিনন্দনীয় এই শিল্পীর প্রতিভা।

স্বীকৃতি :

গ্লাস্-কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষাৎকারটির একটি প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিয়ে বিশেষ উপকার করেছিলেন লণ্ডনের 'লুপার প্রোডাক্শন্স্'-এর তরফে পীটার গ্রীনাওয়ে।

কবিতার নাবী ফসল

সকলের সুপরিচিত ইংরেজী প্রবচন অনুসারে, বেটার লেট দ্যান নেভার। আমি একজন ইংরেজকে জানি, যিনি বাষট্টি বছর বয়সে পৌঁছে ষোলোটি-কবিতা-সংবলিত তাঁর প্রথম কবিতাসংকলন বার করেছিলেন। বিরাম মুখোপাধ্যায়, পুস্তকপ্রকাশ যাঁর কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ আর্ট, এবং বাংলা বইয়ের প্রকাশকে সুরুচি-মণ্ডিত আভিজাত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যাঁর তাগিদ এবং শ্রম আমাদের অনেকেরই পরিজ্ঞাত, আরও দেরি করেছেন: তাঁর পনেরোটি-কবিতা-সংবলিত প্রথম কবিতাসংকলনটি তিনি বার করেছেন সত্তরে পৌঁছে। কেন যে তিনি এত দেরি করলেন, তা তাঁর মুখবন্ধটি পড়া সত্ত্বেও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। কবিতা লেখা, আমরা জানি, তিনি আরম্ভ করেছেন বহুকাল আগেই, এবং সেজন্য স্বীকৃতিও পেয়েছেন, যেমন বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে। না-হয় মাঝখানে বেশ কয়েক বছর কলম ধরেননি তিনি,—এমন ঘটনা তো সিরিয়াস লেখকদের জীবনে হামেশাই ঘ'টে থাকে,—কিন্তু অন্তত একটি কৃশ অথচ উজ্জ্বল বই তিনি কি অনেক আগেই আমাদের উপহার দিতে পারতেন না?

প্রশ্নটা নেহাত বেমক্কাভাবে ছুঁড়ছি না। কবিতা নিয়ে নানা সময়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ আমার ঘটেছে, এবং সেইসব কথাবার্তা থেকে জানি কবিতার ব্যাপারে কী গভীর তাঁর সংবেদন, কী সূক্ষ্ম তাঁর বিচারবুদ্ধি। 'তিলফুলে তিলোত্তমা'-র মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'অবিনয়ের চেয়ে অতিবিনয় অনেক ক্ষেত্রেই অবজ্ঞেয়—এই অব্যয় অনুভাবের অটলতায় ভালো মাঝারি চলনসই লেখার সংকলন-প্রকাশের প্রশ্নে নির্মোহ বিচার ও নিক্তির তুলাদণ্ডে এতোদিন সংযত ও অচ্যুত ছিলাম।' কিন্তু অবিনয়ের চাইতে অতিবিনয় যদি হয় অনেক ক্ষেত্রেই অবজ্ঞেয়, তাহলে নিজের কবিতাসংকলন প্রকাশে তাঁর বহু বৎসরের অনীহা কি তাঁর প্রশংসনীয় বিনয়, অথবা নিন্দনীয় অতিবিনয়? (তিনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ও শ্রদ্ধাভাজন, আমি তাঁর স্নেহাস্পদ, তবু প্রশ্নটা করছি সাহস ক'রেই, যেহেতু তিনি আমার কাছ থেকে দাবি করেছেন এমন একটি রিভিউ, যেটি স্তুতিকীর্তন হবে না, হবে নিরপেক্ষ সমালোচনা।) অপিচ, এ ব্যাপারে যে-

কঠোর আত্মবিচারের আভাস তিনি মুখবন্ধে দিয়েছেন, তার সঙ্গে তাঁর কবিতাগুলির চারিত্র্যের একটা নিবিড় সম্পর্ক কি আবশ্যিকভাবেই থাকবে না ?

এই কবির যে-গুণ সর্বপ্রথমেই আমাদের মনোযোগ দাবি করে তা এঁর সপ্রতিভ, ঝকমকে বাক্‌চাতুর্য। আঙ্গিকসচেতনতায়, পরিশীলিত কারুশিল্পে, উপমা-রূপকের ঠাসবুনটে, শব্দপ্রয়োগের বাহাদুরিতে, ভাষাব্যবহারের আকস্মিক লক্ষ্যবেধক গুরুচণ্ডালীতে, শ্লেষ-বক্রোক্তির প্রায়বিপজ্জনক ধারে পাঠককে চমকে দিতে পারেন তিনি। বৈদগ্ধ্য-নামক যে-গুণটি পাশ্চাত্য সমালোচকদের কাছ থেকে জোরালো হাততালি পায়, বাঙালীদের মধ্যে যেটির কদর সম্প্রতি বিপজ্জনকভাবে কম (কিন্তু দু'-তিন দশক আগেও অবস্থাটা এতদূর খারাপ ছিলো না), বিরাম মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে সেই গুণটি আনন্দদায়ক ভঙ্গিতে ঝলকিত। বইটির নামকরণে রূপের নির্মাণের প্রতি তন্ময় নিষ্ঠার যে-প্রতিশ্রুতি আভাসিত, কবিতাগুলি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

মেধাবী প্রহরগুলো
মাল্‌কাজানের নাকছাবি-
হীরে ঝিলকোচ্ছে
পাল্লাদার তবল্‌চী-চোখের তির্যকে,

("ছত্রিশ রাগিণী ৩")

তীব্র ও তুখোড় যৌবনের সম্রাট-ইচ্ছারা
চৈত্যবৃক্ষের মগ্‌ডালে
ভরণী নক্ষত্রের মতো স্থির বিঁধে আছে ;

("ছত্রিশ রাগিণী ৪")

এলানো হেলানো আকাশের অগোছালো আলনায়
এখনো ঝুলছে মস্ত মস্ত মেঘের তোয়ালে,—

("ছত্রিশ রাগিণী ৫")

ফুরফুরে জগাইমাধাই-হাওয়ায়
দঙ্গলের খোঁটা-ওপ্‌ড়ানো
এঁড়ে-বকনারা

উন্মার্গ ও অবলীল আরো,
সহবত নিরুদ্দেশ।...

("আত্মসূক্ত")

এমন সব পঙ্‌ক্তিনিচয় যিনি লিখতে পারেন তার ক্ষমতা নিয়ে তর্ক চলে না। এবং এই ক্ষমতার সবটাই যে কেবল চোখ-ধাঁধানো মুনশিয়ানা তা নয়, এর একটা মন-কেড়ে-নেওয়া রূপ, একটা মন-উদাস-করা নস্টালজিক রুনুঝুনুও আছে।

বাংলার মাঠে মাঠে কৃশ ও কৃপণ হরিৎ
আর দু'দিনেই মরা সোনা।

("ছত্রিশ রাগিণীর মাত্র একটি")

...একটি মন-কেমন-করা মন চাই
মৃগনাভি মন।

(তদেব)

ঝিকমিকিয়ে উঠলো
ভি. আই. পি.-রোডের আনাচ-কানাচ
হঠাৎ মুক্তো-ঝরানো
মুক্তছন্দের গদ্যকবিতা।

("ছত্রিশ রাগিণীর আরো-একটি")

(আহা, দূর প্রিয়াঙ্কার গলা যেন মিছরিদানা
মধু ঢালছে—না-শোনা নতুন ঘরানার
সহেলি রাগিণী!)

("ছত্রিশ রাগিণী ৬")

সবুজ ঘাসের মুখ শিশিরের মসলিনে ঢাকা,
অপরাজিতার বুকে খেলা করে প্রজাপতি-রোদ,
অমায়িক একটু সময়।

("অতিসন্ধ্যার কবিতা")

তবু মানতে হয় যে এই কবিতাগুচ্ছে সামগ্রিকভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে যে-মেজাজ তাতে রয়েছে একটা ত্বরান্বিত ঝাঁজ, একটা অস্থির ও আত্মসচেতন আর্তি, থেকে থেকেই একটা প্রচণ্ড রাগের ঝাপ্‌টা (যা সম্ভাবনার দিক দিয়ে বিস্ফোরক

এবং যাকে কবি তাঁর শিল্পের নিয়ন্ত্রণাধীন ক'রে রেখেছেন), নৃত্যমুদ্রায় একটা টানটান ভাব, একটা টেনশন। বিরাম মুখোপাধ্যায় একজন যন্ত্রণাজর্জর কবি, একটি আর্ত সত্তা। এই মানসতার আংশিক কারণ তাঁর পরিপার্শ্ব, তাঁর সমাজ, যেখানে খরার নিঃশ্বাসে 'ধানের বুকের দুধ চিটে ; / ঠাস ঠাস অভাবের নিয়ত প্রহারে / আপামর মানুষের মুখে আর পিঠে / পুরু কালশিটে' ; যেখানে সক্রিয় 'শত শত শঠ শয়তান, / চৌকশ চোয়াড়ে / ফিচেল ও ফন্দিবাজ ছদ্ম দেশপ্রেমী' ; যেখানে 'কালো দিয়ে শাদা' আঁকতে হয়। বাকিটা নিহিত তাঁর নিজস্ব অস্মিতার গুহায়, সেই 'প্রত্নপুঞ্জে-ঠাসা জাদুঘর'-এ, যেখানে তাঁর 'অহং ও আমি'। চতুর্দিকের গ্লানি, আর অভ্যন্তরীণ এক ব্যর্থতাবোধ, একটা হাহাকার : এ দু'য়ে মিলে তাঁর যন্ত্রণাবোধের সাংগীতিক কাউন্টারপয়েন্ট।

নষ্ট ভ্রষ্ট বেয়াড়া সময়···
এখন অতুষ্ট এই ছন্নছাড়া সময়ের মুখ,
ফুসফুস ভ'রে আছে কালাচের বিষ
কিংবা দুরারোগ্য আরো ভীষণ অসুখ।

আমারো এ-এনামেল-মুখে
বলিরেখাগুলো
যন্ত্রণাজর্জর মনে হয় ?
আমি—সেই আমি ?
সেরা বেলজিয়াম-আয়নাও স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি
দিচ্ছে না দিচ্ছে না ;
চেহারাটা খুঁজবো কোথায় ?

("আত্মসূক্ত")

প্রায়ই এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা শাণিত, শুকনো কৌতুকবোধ :

চিড়-খাওয়া প্রৌঢ় পাঁজরার
আর্ত উত্তর :
আমি তো বচ্চন নই,
জখ্‌মীদিল-চাউনিটা নামাও ॥

("ছত্রিশ রাগিণীর আরো-একটি")

অতিচোস্ত ক্রান্তিকারী এ-কবিতা কে বলবে কীসে
শুধুমাত্র কান্তিসার ক্লীশে!
মস্তান শিল্পের অভ্যর্থনা-আসরেও
টিকিটের ব্ল্যাক
বেমালুম চেপে যাও, গুরু ;—
দু' একটা লাল ক্যাক্‌টাস
মরুবালু পারে তো ফোটাক!

("আত্মসূক্ত")

তিলচাষ—মুনাফা তো দূরঅস্ত্—
জোগায় না পেটভরা-ভাত।

("তিলফুলে তিলোত্তমা")

বিদ্রূপের ধনুকের ছিলা যেন একটু বেশিরকমই টানটান হয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, যেমন "রাত্রির তাঁবুর নিচে" কবিতাটিতে, ক্লান্ত নির্বিণ্ন হাই-তোলা স্থবির সার্কাস-সিংহের ইমেজে। এখানে তাঁর গলা যেন ফেঁসে গেছে। যেন বড্ড বেশি চেঁচিয়ে ফেলেছেন, আরও নিচু গলায় কথা বললে পারতেন।

তাঁর নারী-উল্লেখগুলিতে কখনো কখনো একটা জ্বালার ভাব লক্ষ করেছি: 'উঠোনের দামাল কামরাঙাগাছের মতো / মদন মস্তানের ডব্‌কা বউটা!'; 'সলিডস্টেট টি. ভি.-র রঙিন ফোয়ারা / নগ্নকটি নটিনীদের অপাঙ্গ হিল্লোলে'; 'কেয়াবাত! কেয়াবাত! / এতোদিনে নগ্ননাভি তন্বঙ্গীও ঘেয়ো-কুকুরের / চোখোচোখি তেরছা তাকালো, / তাকাতে পারলো!'; 'নিরন্ত আকাশ যেন এনামেল-মুখ / পটিয়সী স্বৈরিণী নায়িকা'; 'সব সুখ স্বৈরিণীর যোনি'; 'খুবসুরত গণিকা বিদুষী' ইত্যাদি। এই ধরনের ইমেজ মেয়েদের যৌনতার বিরুদ্ধে একটা অবরুদ্ধ 'ব্রাহ্মণ্য' ক্রোধের হদিস দেয়, যেন ব্যাপারটা কবিসত্তায় মীমাংসিত হতে পারেনি। আমি মনে না ক'রে পারছি না যে 'স্বৈরিণী' শব্দটার প্রথম অর্থ ছিলো 'স্বাধীনা'। স্ব+ঈর=স্বৈর। স্বৈরিণী মূলত সেই মেয়ে যে তার নিজের ইচ্ছামতো চলে-ফেরে, যেখানে খুশি যায়, স্ব-তন্ত্র, স্ব-বশ, নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। তা থেকে অর্থের অধোগতি হয়ে দাঁড়িয়েছে: স্বেচ্ছাচারিণী, ব্যভিচারিণী, কুলটা। ওদিকে গণিকাদের কাছেও পুরুষরা যায় তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই, এবং বৃত্তিটা পুরুষশাসিত সমাজের দ্বারা ব্যবস্থাপিত ও অনুমোদিত বটে।

তবে শিল্প সর্বভুক্, প্রয়োজনবোধে কঠিন উপাদানকেও হজম ক'রে নিতে জানে। একজন নিপুণ শিল্পী তাঁর মানস বিশ্বের অমীমাংসিত দ্বন্দ্বকে তাঁর শিল্পকর্মের বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে ফেলতে পারেন। বাহবা দিতে হয় যখন বিরাম মুখোপাধ্যায় কয়েকটি জ্বালাময়, অবসেসিভ আঁচড়ে দক্ষ কার্টুনিস্টের মতন এঁকে দেন কলকাতার দৈহিক ও আত্মিক অবক্ষয়ের রেখাচিত্র :

মান্ধাতা-আমলের
গ্যাসলাইটের ফাটা-কাঁচের দেয়াল পেরিয়ে
আধ-পোড়া ঝিমনো ম্যাণ্ট্‌ল্‌গুলো
তাকিয়ে দেখছে খুঁটিয়ে
রাস্তার দেয়ালে-সাঁটা ঘনপিনদ্ধ স্তন, স্তনচূড়া—
'রতিসুখসারে গতমভিসারে'-র
তারকা-নায়িকার চোখ-বোঁজা সুখের সাওয়ারবাথ্—

("ছত্রিশ রাগিণী ৬")

সামগ্রিক প্রেক্ষায় এ কথা আমার মনে হয়েছে যে এই কবিতাগুলিকে অনেকাংশে জ্বালানি সরবরাহ করেছে কবিসত্তার শিরা-উপশিরায় পুনরাবৃত্ত কোনো অনবদম্য রুদ্র শর্ট সার্কিট, যার ভেতর থেকে বেরোবার কোনো স্থায়ী পথ কবি খুঁজে পাচ্ছেন না, কারণ তাহলে নিজের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসতে হয়, অথবা যেন অন্তরীণ অগ্নিকাণ্ডকে চেতিয়ে রেখেছেন শিল্পসৃষ্টির তাগিদেই। কখনো কখনো প্রাকৃতিক বর্ণনাতেও বৈদ্যুতিক শকের মতোই ধাক্কা মারে হিংস্র উপমা-রূপক :

হঠাৎ-হঠাৎ বজ্রের কড়া হুম্‌কি
আঁকাবাঁকা ক্রোধ ঝলসাচ্ছে
বিদ্যুতের আগুনে চাবুক
আকাশের চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে
ডমরু বানাবে।

("ছত্রিশ রাগিণী ৫")

ঘুমন্ত শান্ত শেষরাতের কল্‌জে
ধারালো নখের ছুরিতে
টুকরো-টুকরো ছড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে

সাপের জিভ-ছেঁড়া বৃষ্টির বহর
এতোক্ষণেও কমলো না একটু।

(তদেব)

কিন্তু এ-ও শেষ কথা নয়, কেননা মধ্যে মধ্যে এই কবিকে নদীর উৎসের মতন ডাক দেয় অতীতের অপাপবিদ্ধতার স্মৃতি : 'সেইসব সুদূর পেলব / মুখচোরা কৈশোরের মৃদুল লাজুক তিলফুল / মধুপর্কে ডোবানো-আঙুল / ক্ষণিকার কাঁপা-কাঁপা চন্দন-তিলক' (মনে হয় এখানে সত্যিকারের কান্না আছে) ; অথবা তিনি প্রকৃতিরই বুক থেকে আহরণ করেন শুদ্ধি. সৌন্দর্য, কল্যাণ ও আশার পাপড়িগুচ্ছ : 'অমাবস্যা-কালো খোসাটা ছাড়িয়ে দেখ / শত শত কোজাগরীপূর্ণিমা-শুভ্রতা,' দুধশাদা মুখশ্রী ও স্বাদুতর দানা' । গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতায়, যেটি থেকে বইয়ের নাম, বিক্ষুব্ধ চেতনার সঙ্গতিসাধনা শিল্পোচিত সিদ্ধি লাভ করেছে।

পিতাকে উৎসর্গীকৃত 'তিলফুলে তিলোত্তমা'-র অন্তর্গত হয়নি 'জিজ্ঞাসা'-র ৫ : ১ সংখ্যায় প্রকাশিত বিরাম মুখোপাধ্যায়ের "দশ-ঘা বেত" কবিতাটি, যেটিতে ধরা পড়েছে জনকের 'জামদগ্ন্য ক্রোধ'-এর মুখোমুখি এক সুকুমার বালকসত্তার রোদন। অতীতের অন্যতম দাহস্মৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেবার প্রয়াস বলা চলে কি তাকে? এই আলোচনার প্রারম্ভে যে-ইংরেজ কবির কথা বলেছিলাম, যিনি বাষট্টি বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতার বই বার করেছিলেন, তাঁর একটি কবিতাতেও স্কুলমাস্টার বাপের হাতে বেতের ঘা খাওয়ার মর্মন্তুদ স্মৃতি আছে, কিন্তু সে-স্মৃতিচারণার মেজাজ আলাদা,—আয়রনিই তার প্রাণ, যদিও রক্তের টানও অস্বীকৃত হয়নি। (ছেলেবেলার রুদ্র শাসনের সঙ্গে এই দুই কবির কবিতার বই প্রকাশে অনীহার কোনো গূঢ় সম্পর্ক আছে কি?)

Sixpence from the teacher
Who caned me every day
To show he had no favourites.
He was my father.
'Honour thy father and thy mother.'
(Tom Rawling, 'Honour thy father and thy mother',
A Sort of Killing)

বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ছুরিতে স্পষ্টত যে ঝুঁকিপূর্ণ ধার, সে-প্রসঙ্গে তাঁকে ঐ ইংরেজ কবির আরেকটি কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে বলি :

"Sharp knives don't slip.
But it will do
What you
Make it do,
Remember."

(Tom Rawling, 'Uncle', *A Sort of Killing*)

'তিলফুলে তিলোত্তমা' যেমন একগুচ্ছ উৎকৃষ্ট কবিতার সমাহার, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন, তেমনি নাভানা প্রকাশভবনের রীতি মেনে এর অঙ্গসজ্জাও শোভন ও মর্যাদামণ্ডিত। হাতে নিয়ে পাতা উল্টাতেও ভালো লাগে। বিরাম মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী বইয়ের জন্য উৎসুক অপেক্ষায় রইলাম।

বিরাম মুখোপাধ্যায়, 'তিলফুলে তিলোত্তমা', নাভানা, বারো টাকা।

মানবেন্দ্র-পরিচিতি

Sibnarayan Ray (ed.), *M. N. Roy, Philosopher-Revolutionary*, Renaissance Publishers, Calcutta, 1984 ; Rs. 60 (hardback) and Rs. 40 (paperback).

মানবেন্দ্রনাথ রায়কে আমি কখনো দেখিনি। কোনো উপায়ই ছিলো না। ১৯৫৪ সালের সূচনায় তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমি নিতান্তই এলেবেলে, আসন্ন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। নিতান্ত বালিকা-বয়সেও পারিবারিক বন্ধুত্বের সূত্রে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের যে-আখড়াটিতে আমার অল্পবিস্তর যাতায়াত ছিলো সেটি হচ্ছে বুদ্ধদেব বসুদের বাসস্থান, কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ; কিন্তু সেখানে মানবেন্দ্রনাথকে কখনো দেখিনি ; সেখানকার আড্ডাগুলোতে তিনি কখনো যেতেন কিনা তা-ও এ-মুহূর্তে চট্ ক'রে কাউকে শুধিয়ে নেবার উপায় নেই আমার। কলেজ স্ট্রীটের যে-ক্যাম্পাসে পঞ্চাশের দ্বিতীয়ার্ধে আমার সাবালিকাত্বপ্রাপ্তি হয় সেখানেও মানবেন্দ্রনাথের কথা আলোচিত হতে শুনিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজ-আমলে আমার অধিকাংশ বন্ধুরা ছিলো স্ত্রীজাতীয়া, এবং মানবেন্দ্রনাথের চিন্তার সঙ্গে তাদের কোনো পরিচয় ছিলো ব'লে মনে হয় না। মাস্টারমশাইদের মুখেও এ নিয়ে কোনো আলোচনা শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। আমার তৎকালীন জীবনের প্রধান প্রভাবগুলি ছিলো সাহিত্যিক-শৈল্পিক। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পড়তাম, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বন্ধু মানবেন্দ্রনাথের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতাম না। অর্থাৎ তাঁর নামটা জানতাম, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের বা ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে কোনো প্রকৃত ধারণা ছিলো না। তার পর অনেক বছর সে-আবছা ধারণাকে স্পষ্ট করার কোনো সুযোগ আমার জীবনে আসেনি। মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রকৃত পরিচয় সাম্প্রতিক : 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো-কোনো রচনার মাধ্যমে, শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায়ের কোনো-কোনো লেখার মাধ্যমে, তিন খণ্ডে মানবেন্দ্রনাথের 'ফ্র্যাগ্‌মেণ্ট্‌স্ অফ্ আ প্রিজনার্স ডায়েরি'-র মাধ্যমে।

মানবেন্দ্রনাথের রচনাবলীর কোনো প্রামাণ্য সংস্করণ এখনও তৈরি হয়নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে যাঁদের নিজেদের জীবনে দিক-বদল ঘটেছে শিব-

নারায়ণ রায় তাঁদের একজন, এবং তিনি বর্তমানে ছয় খণ্ডে মানবেন্দ্রনাথের নির্বাচিত রচনাবলীর একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রস্তুত করার কাজে নিযুক্ত আছেন। তিনি একজন সুযোগ্য সম্পাদক, তাঁর তত্ত্বাবধানে এ কাজ নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হবে। মানবেন্দ্রনাথের বিষয়ে যাঁরা অল্পই জানেন তাঁদের কথা মনে রেখে আপাতত তিনি তৈরি করেছেন ২৪৮ পৃষ্ঠার একটি বই, ১৯৫৯ সালে প্রথম প্রকাশিত একটি বইয়ের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। এতে সংকলিত হয়েছে মানবেন্দ্রনাথের নিজের রচনার কিছু-কিছু নমুনা, তাঁর সম্বন্ধে অন্যদের কিছু সাক্ষ্য এবং কিছু আলোচনা, তাঁর জীবনসংক্রান্ত দু'-একটি ঔৎসুক্যকর দলিল, এবং তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা, যেটি প্রস্তুত করেছেন সম্পাদক নিজে। একটি মাঝারি আকারের বইয়ের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁরা একটা প্রাথমিক ধারণা ক'রে নিতে চান এই বইটি তাঁদের কাজে তো লাগবেই, পণ্ডিতরাও তাঁদের নানা অনুসন্ধানে বিশেষ সাহায্য পাবেন এই প্রকাশন থেকে।

যে-কোনো জিজ্ঞাসুর মনের উপরেই মানবেন্দ্রনাথের যে-দিকটার অভিঘাত সর্বপ্রথমে হওয়া স্বাভাবিক তা হলো তাঁর রঙদার, বৈচিত্র্যময়, চমকপ্রদ জীবনের। ১৮৮৭ সালে চব্বিশ পরগনার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরে জাত এই দামাল ছেলে কী না করেছেন। গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী ব্রিটিশ-খেদানো আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে প'ড়ে একাধিক রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ নিয়েছেন। তখনও তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আটাশ বছর বয়সে দেশত্যাগ ক'রে আরম্ভ করেছেন এমন এক লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার, কথাদের কয়েকটা আঁচড়ে যার কোনো প্রকৃত রেখাচিত্র তুলে ধরাও প্রায়-অসম্ভব কাজ। পনেরো বছর ঘুরে বেড়িয়েছেন এশিয়া-আমেরিকা-ইয়োরোপের নানা অঞ্চলে, চীনে জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেক্সিকোতে জার্মানিতে রাশিয়ায় এবং অন্যান্য দেশে। মেক্সিকোতে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এবং উচ্চতম স্তরে অংশগ্রহণ করেছেন আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে। সে-আন্দোলন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বহিষ্কৃত হয়েছেন। ছদ্মবেশে স্থলপথে দেশে ফিরে আসার পর ধরা পড়েছেন পুলিশের হাতে এবং সাড়ে পাঁচ বছর কাটিয়েছেন উত্তর ভারতের বিভিন্ন হাজতে। লিখেছেন অজস্র, প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে কয়েকটি ইয়োরোপীয় ভাষায়, তবে প্রধানত ইংরেজীতে। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর চিন্তায় ঘটেছে নানা উল্লেখযোগ্য দিক-বদল। আকার দিয়েছেন মার্কস্‌বাদী তাত্ত্বিক আলোচনা এবং

বিশ্লেষণকে, আবার ঐ চিন্তাধারার মৌলিক এবং তীব্র সমালোচনাও করেছেন। মার্কস্‌বাদের অবস্থানক্ষেত্র থেকে স'রে এসে গ'ড়ে তুলেছেন নিজস্ব র‍্যাডিকাল মানবতান্ত্রিক জীবনদর্শনকে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে লিপ্ত থেকেছেন; সেখান থেকে স'রে এসেছেন প্রধানত বৌদ্ধিক জীবনে। এ-সমস্ত খুঁটিনাটি ছাড়াও আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে তাঁর জীবনের বিশুদ্ধ-ভাবে ব্যক্তিগত দিক: বিভিন্ন বিদেশিনীদের সঙ্গে তাঁর প্রণয়, প্রথমে ঈভলিন ট্রেণ্ট এবং পরে এলেন গট্‌শাল্‌কের সঙ্গে তাঁর বিবাহ ইত্যাদি।

তাঁর চিন্তাজীবনের যে-বৈশিষ্ট্যটি আমাদের আকর্ষণ না ক'রে পারে না তা তাঁর আত্মনবীকরণের বিস্ময়কর ক্ষমতা। দীপ্তবুদ্ধিসম্পন্ন মূলত স্বশিক্ষিত এই কর্মযোগী বারে বারে নিজেকে নতুন ক'রে গ'ড়ে নিয়েছেন, নতুন অভিজ্ঞতার নিরিখে মত বদলে নিতে দ্বিধা করেননি, কোথা থেকে কোথায় পৌঁছেছেন তার বিবরণ পড়লে চমৎকৃত না হয়ে পারা যায় না। আধুনিক ভারতের চিন্তার ইতিহাসের অন্তর্গত তিনি, অগ্রগণ্য ভাবুকদের মধ্যে একজন। গোঁড়ামি কেন বিপজ্জনক, প্রকৃত গণতন্ত্রের চেহারা কেমন হওয়া উচিত, বিকেন্দ্রীকরণ কেন প্রয়োজনীয়: এই সমস্ত বিষয়ে তাঁর চিন্তা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, হয়তো-বা আগেকার চাইতেও বেশি জরুরী। তাঁর রচনাবলী নিঃসন্দেহে আরও অনেক বেশি পঠিত, বিশ্লেষিত ও আলোচিত হওয়া উচিত।

তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে দেশ-বিদেশের নানা গুণী ব্যক্তির যে-নিবন্ধগুলি এই বইটিতে সংকলিত হয়েছে সেগুলির সাহায্যে মানবেন্দ্রনাথের চারিত্র্যের দ্বৈত রূপটির একটা ধারণা ক'রে নেওয়া যায়। তিনি ছিলেন জড়বাদী, যুক্তিবাদী, নাস্তিক, আবার একই সঙ্গে ভাববাদী, আদর্শবাদী, রোম্যান্টিক। এইচ. জে. ব্ল্যাকহামের মতে মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন 'একজন আগুন-ধরা জড়বাদী', এমন এক জড়বাদী যাঁর মধ্যে ছিলো আইডিয়াদের এবং আদর্শদের কর্মক্ষমতায়, অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টিশীল ক্ষমতায়, এক সংরক্ত বিশ্বাস,—মানবতন্ত্রীর বিশিষ্ট প্রত্যয় যেটি। তিনি যদিও রোম্যান্টিক ছিলেন, তাঁর আইডিয়াগুলি ছিলো না দিবাস্বপ্নজাতীয়, শূন্যে গুঞ্জরিত বিমূর্ত ধারণাদের ঝাঁক। সেগুলি ছিলো ঐতিহাসিক ধারণাসমূহ, মানুষের অভিজ্ঞতাই যাদের সদাসক্রিয় উৎস। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা থেকে জন্ম নিতে পারে সুপরিকল্পিত ক্রিয়াসমূহ, এবং সেই চিন্তাকে বারে বারে মার্জিত ক'রে নেওয়া দরকার ঘটনাবলীর এবং কর্মের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশীর বিচারে মানবেন্দ্র একদিকে যুক্তিবাদের

প্রতীক, অন্যদিকে এমন এক মানুষ যাঁর জীবনকে দেখা যায় শুদ্ধ ও অনন্ত প্রত্যয়ের জীবন হিসেবে : তাঁর মধ্যে ছিলো 'যুক্তি ও প্রত্যয়ের এক মহৎ সংশ্লেষণ', একটা 'মহৎ আধ্যাত্মিকতা'। সুধীন্দ্রনাথ আর মানবেন্দ্রনাথের তুলনা ক'রে মানবেন্দ্রর পত্নী এলেন বলেন যে উভয়ের মধ্যেই চিন্তা করা ছিলো প্যাশন : চিন্তা করা থেকে তাঁরা অনুপ্রেরণা পেতেন, তাঁদের আবেগগত জীবন তীব্রতর হয়ে উঠতো। অম্লান দত্ত লক্ষ করেন যে দক্ষিণপন্থী অথবা বামপন্থী যুক্তিহীনতার হিংস্র আক্রমণেও মানবেন্দ্র হারাননি যুক্তিতে তাঁর আস্থাকে। ডেনিস ডাল্‌টন আমাদের মনে রাখতে বলেন যে মানবেন্দ্রনাথের নব-নব অবতার সত্ত্বেও, স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর চিন্তাধারার নব-নব বিবর্তন সত্ত্বেও, তাঁর জীবনচর্যার নানা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন দিক সত্ত্বেও, মানুষটির ব্যক্তিত্ব এবং ভাবনার প্রকৃত ভিত তৈরি হয়েছিলো তাঁর বাল্যে, কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে, বাংলার জলমাটিতে, পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষার আওতায় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তেজনায়। তাঁর অস্মিতার গঠনে বিদেশযাত্রার প্রাগ্‌বর্তী জীবনের প্রথম আটাশ বছরই বিনিশ্চায়ক। তাঁর এলিট মেজাজ, থিওরিদের দিকে এবং জীবনের মূল্য অন্বেষণের দিকে তাঁর আভিমুখ্য, নৈতিক উচ্চগ্রামে বাঁধা তাঁর কণ্ঠস্বর, দুনিয়াকে ভালো-মন্দের কঠোর শাদা-কালোতে ভাগ ক'রে দেখবার একটা প্রবণতা : এ-সমস্ত তৈরি হয়েছে হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরে। স্বাধীনতাস্পৃহাতাড়িত বুদ্ধিমান যুবকটি বুঝতে চেয়েছে নিজেকে এবং নিজের পরিপার্শ্বকে, মুছে দিতে চেয়েছে দেশের পরাধীনতার গ্লানিকে। সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্কস্‌বাদ, মার্কস্‌বাদ থেকে মানবতন্ত্র, গান্ধীর কঠোর সমালোচনা থেকে তাঁর গুণগ্রহণে উত্তরণ : মানবেন্দ্রনাথের সব যাত্রাই এক জীবনব্যাপী চঞ্চল আত্মঅন্বেষণ, অপিচ আপন পৃথিবীকে বুঝে নেবার তাগিদে একের পর এক ইডিওলজির নকশা-অন্বেষণ।

আমার মনে হয়, ডাল্‌টনের বিশ্লেষণের মধ্যে ভাবীকালের মানবেন্দ্র-গবেষকদের পক্ষে প্রতিশ্রুতিময় সংকেত বর্তমান। হাজার হোক, মানবেন্দ্রনাথও 'মায়ের ডাক' লিখে এবং সরলাবালা সরকারকে 'মা মা মা মা' ক'রে চিঠি লিখে তাঁর যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর প্রবল নিরীশ্বরবাদী মানবতন্ত্র সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণভঙ্গি কখনো কখনো মনে করিয়ে দিতে পারে বঙ্কিমকে, বিবেকানন্দকে, অরবিন্দকে। যেন এঁরা কয়েকজন অভিনেতা, যাঁদের ভূমিকা-গুলো আলাদা-আলাদা, কিন্তু অভিনয়ের স্টাইলটা এক, একই ড্রামা-স্কুলে শিক্ষা-পাওয়া যেন। বিশেষত যাঁরা তাঁদের দৃষ্টিকে দূর থেকে ফোকাস করবেন

তাঁদের চোখে এই বিভিন্ন বঙ্গসন্তানদের মধ্যে একটা চারিত্রিক আত্মীয়তা নিশ্চয় ধরা পড়বে। মানবেন্দ্রনাথের রচনার যে-কয়েকটি নিদর্শন এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলির মধ্যেও দেখা যাবে যে তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো অস্থিরভাবে প্রায়ই খুঁজে বেড়াচ্ছেন সূত্রকে, সূত্রধর্মী বাক্যকে। হয়তো প্রোতাগোরাস বলেছেন যে 'মানুষ সব-কিছুর মাত্রা' বা মার্কস্ বলেছেন যে 'মানুষই মনুষ্যজাতির শিকড়' : এ-জাতীয় উক্তি তিনি সাগ্রহে পুনরুদ্ধার করতে ভালোবাসেন। এই আগ্রহ আমার মনে একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তির রেশ রেখে যায়। মানুষ তার আপন দুনিয়ার মাত্রা হতে পারে, কিন্তু তাকে সব-কিছুর মাত্রা ভাবার মধ্যে বিপদ আছে। বিশ্বজগৎটা তার চেয়ে অনেক বড়, সে তার অংশমাত্র : মানবিক মাত্রা আর মহাজাগতিক মাত্রা যে এক হতে পারে না তা বোঝার জন্যে ঈশ্বরবাদী হওয়ার প্রয়োজন নেই। (শিবনারায়ণ তাঁর অন্য একটি বইয়ে রবীন্দ্রনাথের যে 'বাইফোকাল দৃষ্টি'-র কথা বলেছেন পরিণত মানবেন্দ্রনাথে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু পাওয়া যায় কি?) মার্কস্ যা-ই ব'লে থাকুন, মনুষ্যজাতির শিকড় খুঁজতে বেরোলে কেবল মানুষে থেমে থাকলে চলবে কেন, প্রকৃতির যে-বিপুল গর্ভ থেকে উদ্ভিদজগৎ এবং অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে আমরা বেরিয়েছি সেখানেও ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে হবে বৈ কি, এবং মনুষ্যকেন্দ্রিকতা যদি আমাদের সেই বিশাল প্রাকৃতিক জরায়ুর প্রতি উদাসীন ক'রে দেয়, তাহলে এই গ্রহকে আমরা অচিরেই রূপান্তরিত করতে পারি বাসের অযোগ্য মরুভূমিতে। প্রবল ঈশ্বরবাদকে সিংহাসন-চ্যুত ক'রে মানুষ মানবতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ'ড়ে তুলেছে; কিন্তু মানবতন্ত্র যদি দর্পণের নিয়মে মানুষকে ফের সেই নিহত ঈশ্বরের প্রতিবিম্বরূপেই খাড়া ক'রে বসে, তাহলে কি তার মধ্যেও একটা পরিপ্রেক্ষিতহীনতা, একটা দানবতা, গ্রীকরা যাকে বলতেন 'হুব্রিস' সেই ঔদ্ধত্যের একটা মাত্রা এসে যাবে না? মানুষের উৎকাঙ্ক্ষা যেমন দুর্দান্ত, তেমন প্রকট তার সীমাবদ্ধতা এবং ভঙ্গুরতা, এবং তার হিংসার পেয়ালা এখনও পূর্ণ হয়নি। যে-কোনো ইডিওলজির প্রাবল্যের মধ্যেই কিছু-কিছু দুর্বলতা থাকে, তা যতই আদর্শবাদী হোক না কেন। মানবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে-সংরক্ত তার্কিকতা আছে তা চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তাঁর মধ্যে মানবতান্ত্রিক আদর্শবাদ কি কিছুটা ভোঁতা ক'রে দিয়েছিলো কীট্স্-কথিত সেই 'নেগেটিভ কেপেবিলিটি'-কে, যা সাহিত্যিকদের পক্ষে অপরিহার্য, যা মানুষকে সক্ষম করে 'তথ্য আর কারণের জন্যে খিটখিটে ভঙ্গিতে হাঁকুপাঁকু না ক'রে অনিশ্চয়তা, রহস্য আর সংশয়দের মধ্যে অবস্থান করতে'?

সেইরকমই একটা আভাস যেন পাই শিবনারায়ণ-সম্পাদিত 'দ্য ওয়ার্লড্ হার ভিলেজ, আ বুক অফ্ এলেন রয়' নামক বইটিতে (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৯), যেখানে মানবেন্দ্রজায়া এলেনের একাধিক মনোজ্ঞ আলেখ্য ছাড়াও লভ্য মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা জনের নানা ঔৎসুক্যকর মন্তব্য। (এখানেও একজন মানবেন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করেছেন 'সেকুলার ব্রাহ্মণ'-রূপে এবং আরেকজন সনাক্ত করেছেন মানবেন্দ্র-এলেনের দেরাদুনের আস্তানার আশ্রম-রূপটি। আশ্রমটি সেকুলার অবশ্যই। সে-আশ্রমিক আবহাওয়ার অন্তত আংশিক কারণ কি নয় দম্পতিটির সন্তানহীনতা, যা ছিলো মানবেন্দ্রর ইচ্ছাকৃত?) পাঠক লাভবান হবেন যদি তিনি 'এম. এন. রয়' বইটির পাশাপাশি এলেনের উপরে এই বইটিও প'ড়ে নেন। এর সুলিখিত ভূমিকায় শিবনারায়ণ সংক্ষেপে বোঝাতে চেষ্টা করে-ছিলেন। মানবেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আর এলেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এ দুটোর মধ্যে কোথায় কোথায় পার্থক্য ছিলো, মানবেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর কোথায় কোথায় মতভেদ ছিলো, কোন্ কোন্ ব্যাপারে সংবেদনের বৈসাদৃশ্য ছিলো। এ বিষয়ে তিনি আরও বিশদভাবে লিখবেন তাঁর পরিকল্পিত মানবেন্দ্রজীবনীতে, যার জন্যে তিনি অনেক বছর ধ'রে তথ্যসংগ্রহ ক'রে যাচ্ছেন। আমার ধারণা সেই বিশ্লেষণ হবে জীবনীকারেরও আত্ম-অন্বেষণ, কেননা তাঁর নিজের মধ্যেও আছে দু'টি ধারা: একদিকে মানবেন্দ্রর মতো যুক্তিবাদ, সংরক্ত তার্কিকতা, দার্শনিক মেজাজ, অন্য-দিকে এলেনের মতো প্রকৃতিপ্রীতি, সৌন্দর্যচেতনা ও সাহিত্যসংগীতরসিকতা।